সুলতান জালালুদ্দীন খাওয়ারিজমশাহ
ও তাতার আগ্রাসনের গোড়ার কথা

খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের ইতিহাস

মাওলানা ইসমাইল রেহান
আলমগীর মুরতাজা
অনূদিত

সুলতান জালালুদ্দীন খাওয়ারিজমশাহ
ও তাতার আগ্রাসনের গোড়ার কথা

খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড



মূল
মাওলানা ইসমাইল রেহান
অনুবাদ
আলমগীর মুরতাজা

নাশাত

খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের ইতিহাস -১

প্রথমপ্রকাশ : ডিসেম্বর ২০২০
পুনর্মুদ্রণ : অক্টোবর ২০২৩

প্রকাশক
আহসান ইলিয়াস
নাশাত পাবলিকেশন
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৮৪১৫৬৪৬৭১, ০১৭১২২৯৮৯৪১
nashatpub@gmail.com

প্রচ্ছদ : ফয়সাল মাহমুদ
অনুবাদস্বত্ব : নাশাত

বিনিময় : ৫০০ (পাঁচশ) টাকা মাত্র

মুদ্রণ
আফতাব আর্ট প্রেস
২৬ তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা

ISBN : 978-984-97763-7-6

অনুবাদকের কৈফিয়ত

এখানে বই নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা জুড়বার প্রয়োজন দেখছি না। 'খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের ইতিহাস' সম্পর্কে খানিক পরেই সমস্তকিছু বলবেন লেখক ইসমাইল রেহান হাফিজাহুল্লাহ; আমি বরং কিছু খুচরো আলাপ করি।

আমার ক্ষুদ্র লেখক-জীবনে ঘূণাক্ষরেও ভাবিনি যে, অনুবাদ-সাহিত্য নিয়ে আমাকে কাজ করতে হবে। তার চেয়েও বড় কথা হল, আমার প্রথম প্রকাশিত বইটি যে হবে অনূদিত, সেই ভাবনা মনের ভেতর উঁকিই দেয়নি কখনো। কিন্তু তাকদিরের খাতায় যা লেখা হয়ে গেছে, বাস্তবে তা-ই সংঘটিত হয়।

আমি মূলত কথাসাহিত্যের লোক। প্রথমদিকে কোনো গল্পগ্রন্থ কিংবা উপন্যাসের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করব—এমনই পরিকল্পনা এঁটেছিলাম। কিন্তু হুট করেই একটা ব্যক্তিগত জেদ থেকে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি অনুবাদের জন্য আমি প্রস্তুত হয়ে উঠি।

কিন্তু কাজ শুরু করতে গিয়ে বড়সড় হোঁচট খাই—এ যে এক বিশাল সমুদ্র! তার উপর মানববিশ্বে তখন নেমে এসেছে প্রাণঘাতী মহামারি করোনা ভাইরাস। আমিও তখন মানসিক মারি ও মড়কের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলাম। এজন্য পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন আবহে বারবার ভেঙে যাচ্ছিল মনের সংকল্পের দেয়াল। আশাহত হয়ে কয়েকবারই কাজ ছেড়ে দিয়েছি; কিন্তু মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে প্রতিবার ফুসফুস-ভর্তি সাহস নিয়ে ফের উঠে দাঁড়াতে পেরেছি।

পাশাপাশি নাশাত পাবলিকেশনের স্বত্বাধিকারী শ্রদ্ধেয় আহসান ইলিয়াস ভাই বরাবর আমাকে তাগাদা দিয়ে গেছেন; অনুবাদ চলাকালে তরুণ ইতিহাসবিশ্লেষক মুহতারাম ইমরান রাইহান হাফিজাহুল্লাহর সঙ্গে যখনই যোগাযোগ হয়েছে, পরামর্শ দিয়ে বিপুল প্রেরণা যুগিয়েছেন তিনি। কাজটি এগিয়ে নেবার ক্ষেত্রে এই দুজনের তাগিদ ও ভালোবাসা অনেকাংশেই ভূমিকা রেখেছে।

মাঝেমধ্যে কিছু সহপাঠীও খোঁজখবর নিয়েছে, যা প্রাণশক্তিবর্ধক হিসেবে কাজ করেছে। আল্লাহ তায়ালা তাদের সকলকে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন।

আমাদের কালের গুরুত্বপূর্ণ একজন ইতিহাসবিদ মাওলানা ইসমাইল রেহান হাফিজাহুল্লাহ। তার এই ব্যাপাক সাড়াজাগানো অসাধারণ গ্রন্থটি অনুবাদ করতে গিয়ে মাঝেমধ্যেই ইতিহাসের রক্ত হিম-করা এমনসব দৃশ্যের মুখোমুখি হতে হয়েছে, যেগুলো বহুবার প্রায় স্তব্ধ করে দিয়েছে আমার কলম।

হিজরি সপ্তম শতকে মধ্য-এশিয়ার সর্ববৃহৎ মুসলিম সাম্রাজ্য ছিল খাওয়ারিজম। সেই খাওয়ারিজমের দুর্ধর্ষ বীর সুলতান জালালুদ্দীনের জীবন-বিসর্জনের শ্বাসরুদ্ধকর সহস্র অধ্যায় দেখে মস্তিষ্কে কখনো এমন চাপ সৃষ্টি হয়েছে, মনে

কুরআনের আয়নায় দেখা ইতিহাস

আমি বনি ইসরাইলকে একথা স্পষ্ট বলে দিয়েছিলাম যে, ভূপৃষ্ঠে তোমরা দু-বার অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং মারাত্মক দাপট দেখাতে আরম্ভ করবে। অতঃপর যখন ঐ দুটোর প্রথমবারের ওয়াদা আসবে, তখন তোমাদের বিরুদ্ধে এমন প্রচণ্ড শক্তিশালী বান্দাদের আমি পাঠাব, যারা হবে খুব যুদ্ধবাজ। তারপর তারা তোমাদের ঘরবাড়ির ভেতর ঢুকে পড়বে তোমাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য।

এটা একটা কার্যকর ওয়াদা; সংঘটিত হবেই হবে। তারপর তোমাদের তাদের উপর প্রবল করে দেব আমি। তোমাদেরকে ধনসম্পদ ও পুত্রসন্তান দ্বারা সাহায্য করব। জনসংখ্যার দিক থেকে বিরাট এক বাহিনীতে পরিণত করব তোমাদের।

যদি তোমরা ভালো কাজ করো, নিজেদের জন্যই করবে। আর যদি মন্দ করো তবে তা-ও তোমাদের নিজেদের জন্য।

অতঃপর যখন দ্বিতীয়বারের প্রতিশ্রুতি আসবে, তোমাদের বিরুদ্ধে ফের আমি অন্যদের কর্তৃত্ব প্রদান করব, যাতে তারা মেরে-মেরে বিকৃত করে দেয় তোমাদের মুখমণ্ডল। এবং প্রথমবার যেভাবে ওই লোকগুলো ঢুকে পড়েছিল মসজিদে, এরাও সেরকমভাবে প্রবেশ করবে। যাদের উপরেই এদের কর্তৃত্ব ও জবরদস্তি চলবে—সবাইকেই বরবাদ করে দেবে।

আশ্চর্যের কিছু না—তোমাদের রব হয়তো তোমাদের উপর অনুগ্রহশীল হবেন। আর তোমরা পুনরায় যদি সেই একই মন্দ কাজ করো, তা হলে তোমাদের সাথে আমিও ফের তা-ই করব। আর আমি কাফেরদের জন্য জাহান্নামকে জেলখানা বানিয়ে রেখেছি।[১]

---

[১] সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত নং : ৪-৮। তরজমা বায়ানুল কুরআন থেকে

হাদিসের আয়নায় দেখা ইতিহাস : ভবিষ্যদ্বাণী

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (১) কেয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ মুসলিমরা এমন এক তুর্কি সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুদ্ধ না করবে, যাদের চেহারা হবে ঢালের মতো চওড়া; প্রশস্ত। এ সম্প্রদায়ের লোকজন পশমের পোশাক পরিধান করবে। তাদের জুতোও হবে পশমের তৈরি।

(২) তোমরা কেয়ামতের পূর্বে এমন এক সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করবে, যাদের জুতো হবে পশমের তৈরি। চেহারার গঠন হবে এমন—যেন-বা চওড়া-প্রশস্ত এক ঢাল। মুখ হবে টকটকে লাল। চোখ ছোট-ছোট এবং খুব তীর্যক।

(৩) কেয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত আসবে না, যতক্ষণ তোমরা এমন লোকদের সাথে যুদ্ধ না-করবে, যারা হবে ক্ষুদ্রাকার তীর্যক চোখ এবং চ্যাপটা-ছোট নাকবিশিষ্ট।[২]

সহিহ মুসলিমের ব্যাখ্যাকার ও মুসলিমবিশ্বে ঘটে-যাওয়া তাতার-আগ্রাসনের প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী মহান ইমাম নববি (মৃত্যু : ৬৭৬) এইসব হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন—নিঃসন্দেহে রাসুলের বলা আলামতগুলোর পূর্ণ ধারক এই তুর্কিরাই (অর্থাৎ তাতাররা)।[৩] তাদের সাথে মুসলিমদের যে যুদ্ধ বেধেছিল, সেদিকেই রাসুলের এসব হাদিসের ইঙ্গিত। আমাদের জামানায় এই লোকগুলো হাদিসে উল্লিখিত সবক'টি আলামত পুরোপুরি পেয়ে গেছে। মুসলমানরা এদের সাথে বহুবার যুদ্ধ করেছে, যা এখনও জারি আছে।[৪]

মোল্লা আলি বিন সুলতান আল-কারি বলেন—এটাই অধিক বোধগম্য যে, এই হাদিসগুলিতে চেঙ্গিজ খান ও তদীয় সহচরদের মাধ্যমে সংঘটিত ফাসাদের দিকে ইশারা করা হয়েছে।[৫]

ইমাম আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে উমর আল-কুরতুবি রহ. এই হাদিসগুলোর ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে বলেছেন—রাসুলের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী

---

[২] সহিহ মুসলিম, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৯৫

[৩] তাতাররা ছিল তুর্ক ইবনে ইয়াফিস ইবনে নুহ আলাইহিস সালামের বংশধারার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে তুর্কিদেরই প্রাচীন কিন্তু অপ্রসিদ্ধ একটি শাখা।

[৪] মুসলিম শরিফ, হাশিয়াতুল মিনহাজ শারহুল মুসলিম লিন-নাবাবি। খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৯৫

[৫] মিরকাত, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ১৪২

এই ঘটনা হুবহু ঘটে গেছে। মুসলমানরা খাওয়ারিজমের সুলতানের নেতৃত্বে ইরাকে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে।[৬]

এই কাফেরদের মোকাবেলায় সুলতানকে আল্লাহ তায়ালা নুসরত প্রদান করেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের নাটাই শেষ পর্যন্ত তাতারদের হাতেই থেকে গেছে। তারা ইরাকসহ অন্যান্য মুসলিম সাম্রাজ্য আয়ত্ত করে নিয়েছে। সে-সময় তাদের এত বড়-বড় সৈন্যদল আগ্রাসন চালাচ্ছিল—যাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না।[৭] মুসলিমদের থেকে তাদেরকে হটাবার মতনও কেউ ছিল না আল্লাহ ছাড়া।

তাদের বিপুল সংখ্যাধিক্যের কারণে মনে হচ্ছিল—এরা ইয়াজুজ-মাজুজ, অথবা ইয়াজুজ-মাজুজের আগমনের পটভূমিকা হিসেবে এরা এসেছে।

আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি—তিনি যেন এদের হালাক করে দেন, এদের জমাটবদ্ধতাকে বিক্ষিপ্ত ও চূর্ণিত করে দেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু এ সম্প্রদায়ের সংখ্যা, এদের আধিক্য, শক্তি ও প্রতিপত্তি সম্পর্কে অবগত ছিলেন, সেজন্য তিনি নসিহত করেছিলেন—তুর্কিদের তাদের অবস্থাতেই ছেড়ে দেবে।

এখনও আমরা আল্লাহর অনুগ্রহে এই কাফেরদের বিরুদ্ধে নুসরত ও বিজয়ের আশা রাখি।[৮]

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনি এই হাদিসগুলোর ব্যাখ্যায় লেখেন—রাসুলের খবর অনুযায়ী এই ঘটনাগুলোর একাংশ ৬১৭ হিজরিতে সংঘটিত হয়ে গেছে। তুর্কিদের এক বিরাট বাহিনীর অভ্যুদয় ঘটেছে। তারা মা-ওয়ারাউন-নাহার বা ট্রান্স-অক্সিয়ানার ও খোরাসানের বাসিন্দাদের হালাক করে দিয়েছে। এদের হাত থেকে তারাই শুধু বাঁচতে পেরেছে, যারা পাহাড়ের গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

পৃথিবী থেকে মুসলমানদের বরবাদ করে এরা গিয়ে কাহাস্তান পর্যন্ত পৌঁছেছে। এদের হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় রায়, কাজবিন, আবহার, যানজান, আরদাবিল ও আজারবাইজানের রাজধানী।[৯]

---

[৬] সুলতান জালালুদ্দীন খাওয়ারিজম শাহ উদ্দেশ্য। কারণ, তাতারদের তিনিই কয়েকবার পরাজিত করেছিলেন। তাতারদের মোকাবেলায় তার পিতা আলাউদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহের একটিবারও বিজয় অর্জিত হয়নি।

[৭] এই রচনা ৬৩৭ হিজরির।

[৮] আলমুফহিম লি-আশকালা মিন তালখিসি কিতাবিল মুসলিম, ৭/২৩৮;

[৯] উমদাতুল কারি, বাবু কিতালিত তুর্কি

লেখকের কথা

মুসলিমবিশ্বে ঘটে-যাওয়া তাতার-আগ্রাসনের লোমহর্ষক গল্পগাথাই মূলত এই শিক্ষামূলক কাহিনিকাব্যের প্রধান পটভূমি। তাতার হামলার মূল কার্যকারণ, পরিণতি ও প্রতিক্রিয়া—বিস্তৃত পরিসরে সবকিছুই উঠে এসেছে চওড়া কাগজের বুকে।

এই ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের মুখ-গহ্বর থেকে মুসলিম-বিশ্বের, বিশেষত, পবিত্র হারামাইন শরিফাইনের প্রতিরক্ষায় সুলতান জালালুদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহের জিহাদি অগ্রগামিতা কেমন ছিল, সেই পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে লেখা হয়েছে এই বই।

গা শিউরে-তোলা এই বিষয় নিয়ে আমার কেন লিখতে ইচ্ছে হল, প্রিয় পাঠক, অল্পক্ষণের মধ্যে আপনার সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে এই প্রশ্নের উত্তর।

হাদিসের গ্রন্থাবলির (বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ ইত্যাদি) কেয়ামতের আলামতবিষয়ক আলোচনায়, কেয়ামতের আগে মুসলিম ও তুর্কি জাতির যুদ্ধের ব্যাপারে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে, একাধিক সনদে এবং বিভিন্ন শব্দ সহযোগে। সেসব হাদিসে রয়েছে রক্তক্ষয়ী এই যুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী। তাতে তুর্কিদের দৈহিক গঠন-প্রকৃতি পর্যন্ত বলে দিয়ে গেছেন রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অধিকসংখ্যক হাদিসব্যাখ্যাতা দিলের পুরো একিন নিয়ে বলেছেন, মূলত তাতার-আগ্রাসনের প্রতিই ছিল এসব হাদিসের ইঙ্গিত। বিশেষত, হিজরি সপ্তম শতকের হাদিসব্যাখ্যাতাগণ, যারা তাতারদের আগ্রাসনের সময় জীবিত ছিলেন, দিব্যচোখে রাসুলের ওই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিফলন ঘটতে দেখেছেন। হয়েছেন রাসুলের মুজেযা-প্রকাশের প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী।

রাসুলের এসব হাদিস মুহাদ্দিসদের ব্যাখ্যা আর ঐতিহাসিক-বাস্তবতার আলোকে আমাদের সামনে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ওই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ধ্বংসাবশেষ, মন-মুচড়ে দেওয়া ঘটনাবলি এবং মুসলিমবিশ্বের ভয়াবহ বিপন্নতার গল্পগুলি আমাদের বড় সতর্ক করে তোলে; যেভাবে বিপদের আভাস পেতেই নিজের অজান্তে ছাতার মতো খাড়া হয়ে ওঠে হরিণের কান।

এই হাদিসগুলো সম্পর্কে আমি তখনও জানি না। তারপরও ইতিহাসপাঠের বদৌলতে আগে থেকেই এ বিষয়ের প্রতি আমার প্রবল আগ্রহ ছিল। ইসলামের ইতিহাসে, বাগদাদ সাম্রাজ্যের পতন এবং তাতার ফেতনার অধ্যয়নের ভেতর সুলতান জালালুদ্দীনের বীরত্বগাথার প্রতি প্রথমদিকেই আমি দারুণভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলাম।

তারপর একদিন উল্লিখিত হাদিসগুলো সামনে এল, ফলে এই বিষয়টি আমার সামনে দ্বিগুণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল।

ধীরে-ধীরে দিন কেটে যাচ্ছিল। একসময় মুফাক্কিরে ইসলাম মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদবি রহ. এর অনবদ্য গ্রন্থ 'তারিখে দাওয়াত ওয়া আজিমাত' (সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস) পড়ার সুযোগ মিলল। যার প্রথম খণ্ডে লেখক 'তাতার-ফেতনা এবং ইসলামের এক নতুন পরীক্ষা' শিরোনামে প্রায় বত্রিশ পৃষ্ঠার গবেষণাধর্মী একটি আলোচনা লিখেছেন। ওতে তাতার-আক্রমণের কার্যকারণ, তখনকার মুসলিমবিশ্বের দুর্দশাকবলিত চালচিত্র, দৈত্যের মতো নেমে আসা ভয়াবহ বিপর্যয় ও ক্রমান্বয়ে তাতারদের ভেতর ঘটে-যাওয়া ইসলামের প্রসার-বিস্তার ইত্যাদি বিষয়ে নির্মোহ গদ্যে নিরীক্ষা চালিয়েছেন। খুব সাহিত্যপূর্ণ, অলংকারসমৃদ্ধ ভাষায় খুলে দিয়েছেন চিন্তা-চেতনার নতুন নতুন সব জানালা।

এ বিষয়ের প্রতি ইতিহাসপাঠকদের আরও গভীর অভিনিবেশের প্রয়োজন রয়েছে বলেও মনে করেছেন তিনি। কিতাবের ভূমিকায় লিখেছেন—'তথ্য এবং সময়—দুটোরই স্বল্পতা আর লেখকের কিছু ওজর থেকে যাওয়ার দরুন বলতে হচ্ছে, এই আলোচনায় আরও বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির অবকাশ আছে। এটাকে একপ্রকার প্রাথমিক প্রচেষ্টা আর ঈমানি চেতনার একটুখানি বহিঃপ্রকাশ বলা যায়। আরও দ্বিগুণ অভিনিবেশের দাবি রাখে এই বিষয়।'

তারিখে দাওয়াত ওয়া আজিমাতের লেখকের এই অঙ্গুলি-নির্দেশের ফলেই এ নিয়ে কাজ করতে প্রবলভাবে আগ্রহী হয়ে উঠি আমি। ধীরে-ধীরে এ বিষয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের নতুন নতুন দিক আমার সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে লাগল। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট অনেক বিষয় সামনে চলে এল, যার উপর আলাদা আলাদা ঢাউস সাইজের কিতাব লিখে ফেলা যায়। কিন্তু, ফিলহাল আমি লিপিবদ্ধ করতে চেয়েছি তাতার-আগ্রাসনের প্রেক্ষাপট, এর প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ কার্যকারণ, সেই প্রলয়কাণ্ডের বিস্তৃত বিবরণ আর খাওয়ারিজম শাহি খানদান সম্পর্কিত জরুরি তথ্যানুসন্ধান।

লিখতে চেয়েছি সেই মহা সয়লাবের সামনে শক্ত প্রাচীর হয়ে দাঁড়ানো মহান মুজাহিদিন, বিশেষত, সুলতান জালালুদ্দীন খাওয়ারিজম শাহের প্রাণান্তকর চেষ্টা-প্রচেষ্টা আর জীবনোৎসর্গের অম্লান দাস্তান।

এই লক্ষ্য সামনে রেখে তথ্যানুসন্ধানের জন্য ইতিহাসের পাতার ভেতর ডুব দিতে লাগলাম আমি। নাওয়া-খাওয়া ভুলে ঘেঁটেঘুঁটে সুলতান জালালুদ্দীনের জীবনগল্পের আখ্যানপর্বগুলো জমা করতে লাগলাম।

দীর্ঘ একটা সময় ধরে এই আশায় ছিলাম যে, সুলতানের জীবনের উপর লেখা নতুন অথবা পুরোনো কোনো পূর্ণাঙ্গ বইয়ের সন্ধান হয়তো পেয়ে যাব। আমার কাজটাও তাতে সহজ হয়ে যাবে।

কিন্তু সময়ে-অসময়ে বড় বড় কুতুবখানায় ঢুঁ মেরেও তেমন কোনো বই মেলেনি। এই মহান মর্দে মুজাহিদের জীবনবৃত্তান্ত আলাদাভাবে কোনো এক কিতাবে পেয়ে

উঠিনি। যেসব গ্রন্থে সুলতান জালালুদ্দীনের আলোচনা এসেছে, সেখানে অন্য কোনো আলোচনার ফাঁকেফুঁকে টুকিটাকি এসেছে কেবল। পূর্ণাঙ্গ না, ছেঁড়া-ছেঁড়া কিছু ঘটনা। শুধু তার জীবনী সংরক্ষণই সেসব গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য ছিল না।

ইতিহাসে সুলতান জালালুদ্দীনের সংগ্রামমুখর জীবনযাপন খুব গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার পরেও, যে বিন্যাস-বিশ্লেষণ আর ব্যাখ্যার দাবি রাখত ঐতিহাসিকদের কলমের কাছে, সেইসব টুকিটাকি আলোচনায় তার এক সুতোও উঠে আসেনি। আমার মনে তখন আবারও উদয় হল যে, হায়, এই মহান মুজাহিদের অসাধারণ কীর্তিগাথা যদি একসঙ্গে কোনো এক কিতাবে পেয়ে যেতাম!

এত খোঁজাখুঁজির পরেও যখন তেমন কোনো পূর্ণাঙ্গ বই আমার হাতে আসেনি, তখন হঠাৎই একদিন মনে হল, সুলতানের জীবনীভিত্তিক যাবতীয় তথ্য-উপাত্ত ঘেঁটে আমি নিজেই কেন আলাদা একটা বই লিখে ফেলছি না? জানি, শত অযোগ্যতা রয়েছে আমার। রয়েছে পুঁজির স্বল্পতা। তবু সময়ের বিশেষ প্রয়োজন এবং সুলতান জালালুদ্দীন রহ. এর পক্ষ থেকে অর্পিত গুরুভার ভেবে এই কাজের বোঝা আমার এই দুর্বল কাঁধেই তুলে নিয়েছি।

তখন শাওয়াল মাস, হিজরি ১৪১৮। ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮ ঈসাব্দ। একদিন হঠাৎ পরম করুণাময়ের নামে আমি লিখতে বসে গেলাম—বিগত আট শতাব্দী ধরে উম্মাহর আলেমদের উপরে বর্তে ছিল যার মহা দায়ভার।

মুসলিমবিশ্বের প্রতিরক্ষায় সুলতান জালালুদ্দীনের সুমহান কীর্তিগাথাকে উপজীব্য করে সাজানো এই বিষয় ছিল খুব গভীর, খুবই বিস্তৃত। ফলে সময়ের শক্ত আবরণ ছিঁড়ে-খুঁড়ে বাস্তব ইতিহাস তুলে আনতে গিয়ে এমন অনেক বিষয় সামনে এসে গিয়েছিল, যেগুলো হয়ে উঠেছিল দ্বিগুণ তাহকিক আর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দাবিদার।

ইতিহাস এমনই এক শক্ত-নিরস-কঠিন বিষয় যে, বিভিন্ন এলাকার ঘটনাপরম্পরার বিবরণ দিতে গিয়ে লেখককে কখনও আবেগী আর একপেশে হয়ে উঠলে চলে না। নির্মোহ-নিরাসক্ত গদ্যে তুলে আনতে হয় বাস্তবতা, 'রিওয়ায়াত' আর 'দিরায়াত' শাস্ত্রের গভীর জ্ঞান না-থাকলে যা কখনোই সম্ভব হয়ে ওঠে না। আর যদি নির্ধারিত বিষয়ে পূর্ব-লিখিত কোনো বই-ই না থাকে, তা হলে কাজ যে কতটা কঠিন হয়ে ওঠে, সে-কথা সব জ্ঞানী বন্ধুই খুব ভালো জেনে থাকবেন।

পাঠকদের জানিয়ে রাখি, এ বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান করতে গিয়ে কখনও পরিস্থিতি এমন হয়ে উঠেছে, ইতিহাসবিদদের পরস্পর-বিরোধী মতামতের দরুন মাঝেমধ্যে আমি খুব বিমূঢ় হয়ে গেছি যে, আচ্ছা, এই জানবাজ বাদশাহ কি স্রেফ স্বাজাত্যবোধ, বংশগৌরব কিংবা গোত্রকৌলিন্যের জন্য লড়াই-করা সৈনিকদের লিডার ছিলেন?

ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থে সুলতান জালালুদ্দীনের নাম যেখানেই 'এক দুঃসাহসী যোদ্ধা' হিসেবে এসেছে, সেখানে ভিন্ন বর্ণনায় একথাও লেখা থাকতে দেখেছি, তিনি একজন পরাজিত সিপাহি মাত্র, একজন বেপরোয়া যোদ্ধা আর এক অপরিণামদর্শী

বাদশাহ, যিনি ইতিহাসের বিশাল ক্যানভাসে নিজের উল্লেখযোগ্য কোনো চিত্রই এঁকে যেতে পারেননি। তলোয়ার নিয়ে উদ্দেশ্যহীন ঝাঁপাঝাঁপি করে একসময় শীতের হলুদ হয়ে-যাওয়া পাতার মতোই টুপ করে ঝরে গেছেন।

এ-ধরনের কিছু ইতিহাসবেত্তার দোষারোপ আর প্রশ্নবিদ্ধকারী বয়ানে আমি খুব প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েছিলাম। মনে হচ্ছিল সুলতানকে একজন জানবাজ সেনাপতি হিসেবে উপস্থাপন করাটা অতিরঞ্জন হয়ে যাবে। যারা তার প্রশংসার ফুলঝুরি ছুটিয়েছে, তারা ইতিহাসপাঠে বোধহয় পরিচয় দিয়েছে নিজেদের অযোগ্যতার।

অথচ তখন আমি এই বইয়ের প্রথম খণ্ডের দুইশ পৃষ্ঠার কাছাকাছি লিখে ফেলেছি। কিন্তু আমার ভেতর কেমন যেন একটা দ্বিধা-জড়তার কাঁটা বিরামহীনভাবে খচখচ করে চলছিল। সুলতানের ব্যাপারে আমার আকিদা ছিল কেমন, আর এখন আমি কী-সবের মুখোমুখি! ভাবলাম—যাহ, আমার পুরো পরিশ্রমটাই জলে গেল। এবং তখন লেখা বন্ধ করে কাগজ-কলম তুলে রেখে দিলাম।

তারপর হঠাৎ একদিন, কেন জানি না, আমার ভেতর খুব জেদ চেপে গেল যে, কালের শক্ত খোলস ভেঙে প্রকৃত ইতিহাস আমি বার করে আনবই। হোক না যতই অপ্রীতিকর, তিক্ত-বিস্বাদ। তখন পর্যন্ত আমার পাঠ-তালিকায় ছিল শুধু ওই সমস্ত বই, যেগুলো বাজারে অন্যান্য ইসলামি বইয়ের পাশেই অহরহ পাওয়া যেত। অথবা বড় বড় কুতুবখানাতে গিয়ে খোঁজ করলেই মিলে যেত। কিন্তু, এরপর থেকে আমি এই বিষয়ের সমস্ত বিরল-দুর্লভ গ্রন্থ-সন্ধানের বিপুল কর্মযজ্ঞে নেমে পড়ি। ছোটাছুটি করি নানান জায়গায়। এবং গভীর পাঠ-মগ্নতার পর আবিষ্কার করে উঠি, পূর্বের বিকৃত কিছু ইতিহাস পড়ে সুলতানের ব্যাপারে যে বিপুল অনীহা, যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া গেঁথে গিয়েছিল আমার ভেতর, তা সম্পূর্ণ অমূলক, ভিত্তিহীন।

তথ্যানুসন্ধান আর পাঠের গভীরতা ক্রমাগত যতই বাড়তে থাকল, ততই উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে লাগল সুলতানের জীবনগল্পের অজানা সব নতুন নতুন অধ্যায়। ধীরে-ধীরে উঠে যেতে লাগল মনে গেঁথে-বসা বিভিন্ন প্রশ্ন-আপত্তির সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম কাঁটা। এবং একসময় খুব গভীরভাবে অনুভব করে উঠলাম, সুলতান জালালুদ্দীন খাওয়ারিজম শাহ রহ. এর অসামান্য নিষ্কলুষ ব্যক্তিত্ব, পুবাকাশে প্রভাত-রোদের বিকিরণ ছড়িয়ে জেগে-ওঠা লাল সূর্যের মতোই আমার সামনে এখন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, পুরোপুরি।

এই বইয়ের একটি নির্ভুল পাণ্ডুলিপি দাঁড় করাতে গিয়ে বহু দিনরাত আমি বিরামহীনভাবে খেটে গেছি। প্রকৃত তথ্য-তালাশে, ইতিহাসের নিখুঁত বিন্যাসে বহু-বহুদিন নিমজ্জমান হয়ে থেকেছি আকণ্ঠ। বলা চলে, আমার তখন ল্যাজে-মুড়োয় নাজেহাল অবস্থা। তবু, ইতিহাসের অচেনা-অজানা চোরাগলি বেয়ে আসল বাস্তবতা তুলে আনতে পেরে আজ আমার খুব আনন্দ লাগছে।

সুলতান জালালুদ্দীনের উপর আরোপিত যত প্রশ্ন-আপত্তি আছে, সেসব মূলত তার প্রকৃত জীবন সম্পর্কে না-জানার ফসল। তার ব্যাপারে কিছু ভুল-বোঝাবুঝি

ছড়িয়ে গেছে। মুসলিমবিশ্বের প্রতিরক্ষায় তার যে কী দারুণ জিহাদি উদ্দীপনা ও অগ্রগামিতা ছিল, তা না-জানার কারণেই সৃষ্টি হয়েছে এসব।

তিক্ত বাস্তবতা হল, ইতিহাসের মাত্র দু-চারটে বই যে ব্যক্তি পড়ে উঠেছে, তার মধ্যে সুলতান জালালুদ্দীনের ব্যাপারে অমন বিকৃত ভাবনাই বাসা বাঁধবে যে, অসামান্য সাহসিকতা সত্ত্বেও একজন অযোগ্য শাসক ছিলেন তিনি, যাকে মুসলিম শাসকদের বর্ণিল কীর্তিগাথার সামনে উল্লেখযোগ্য কোনো আসনই দেওয়া যায় না।

কিন্তু গভীর মনোযোগ আর প্রখর অনুসন্ধানী চোখে কেউ যদি হালের সমস্ত গ্রন্থ সংগ্রহ করে ফেলে, গড়ে তোলে গভীর-বিস্তৃত পাঠ-পরিধি, এবং খুব সতর্ক দৃষ্টিতে মুসলিম উম্মাহর উপর বয়ে যাওয়া সেই ভয়াবহ ফেতনা আর সুলতান জালালুদ্দীনের তাজাপ্রাণ জিহাদি অগ্রগামিতার একটি তাত্ত্বিক নিরীক্ষণ করে ওঠে, তবে শুধু অসংখ্য ভুল ধারণারই অবসান ঘটবে না, ইসলামি ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে-দেওয়া যুগান্তকারী সেই দুর্যোগে সুলতান জালালুদ্দীন রহ. এর দুঃসাহসিক অগ্রযাত্রাও হয়ে উঠবে স্পষ্ট।

একথাও খুব পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠবে যে, পামির মালভূমি থেকে নিয়ে কোহেকাফ পর্যন্ত এবং কাসপিয়ান সাগর থেকে সিন্ধু-তীর পর্যন্ত সুলতান জালালুদ্দীনের জিহাদি অভিযাত্রার এমন সব মহান কার্যক্রম বিস্তৃত ছিল, যা খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবি রহ. এর জিহাদ থেকে কোনো অংশেই কম ছিল না।

মুসলিম সুলতান এবং বিজেতাদের মধ্যে সুলতান জালালুদ্দীনই সেই অনন্য-বিরল বাহাদুর, যিনি পৃথিবীর এমন চারটে সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, যারা ছিল পুরো মুসলিমজাতির শক্ত দুশমন।

তিনি মোঙ্গলিয়া থেকে ধেয়ে আসা তাতারদের আক্রমণের মুখে মুষ্টিবদ্ধ যুদ্ধে নেমেছিলেন। তারই ধারালো তরবারি হিন্দুরাজাদের হাত থেকে স্বাধীন করেছিল উপমহাদেশের বিশাল-বিস্তৃত এলাকা। তিনি ক্রুসেডারদের (খ্রিষ্টানদের) সাথেও জিহাদ করেছেন। তাদের থাবার ভেতর থেকে জর্জিয়াকে বার করে এনেছিলেন, এবং প্রথমবারের মতো একে করেছিলেন পূর্ণরূপে ইসলামি হুকুমতের অন্তর্ভুক্ত। তারই তরবারি ঝলসে উঠেছিল বাতেনি ফেদাইদের খঞ্জরের মোকাবেলায়। এবং ইসলামের এই দুশমনদের তিনি এমনভাবে থেঁতলে দিয়েছিলেন যে, তারা আর মাথাই ওঠাতে পারেনি বহু শতাব্দীকাল।

আফসোস, তার এই মহান কীর্তির কথা যত্ন নিয়ে কেউ সংরক্ষণ করেনি ইতিহাসের পাতায়। বড় অনীহা দেখানো হয়েছে। উচিত তো ছিল তার একনিষ্ঠ জিহাদ আর সুচিন্তিত পদক্ষেপ থেকে মুসলিম উম্মাহর হৃদয়ে আলোকবিভার সঞ্চার করা। তার অসামান্য বীরত্বগাথা এবং প্রতিরক্ষামূলক দুঃসাহসিকতা থেকে গভীর পাঠ গ্রহণ করা।

একারণে আমি জরুরি মনে করেছি যে, যেখানেই পাঠকদের সামনে উন্মোচিত করব সুলতান জালালুদ্দীনের জীবননামার অচেনা-অজানা সব জানালা, সেখানে পাশাপাশি তার ব্যাপারে ছড়িয়ে-পড়া ভুল ধারণাগুলোরও শেকড় কেটে দেব। ফুটিয়ে তুলব দীপ্ত সত্য সব কাহিনিকাব্য, যেন পাঠকদের ভুল ধারণার কবলে পড়তে না হয়, জানতে পারেন ইতিহাসের আসনে সুলতানের প্রকৃত অধিষ্ঠান কেমন ছিল।

এই গুরুভার সম্পন্ন করতে আমি নিচের কয়েকটি বিষয়ের পথ ধরে হেঁটেছি—

১. প্রকৃত ইতিহাসের দুর্লভ উৎসের অনুসন্ধান। পরম মমতায় ও একনিষ্ঠ মগ্নতায় বাস্তবতা তুলে আনা।
২. গভীর পাঠপর্ব।
৩. পরস্পর-বিরোধী বর্ণনাগুলো গভীরভাবে অনুধাবন করে তাতবিক তথা সামঞ্জস্য-বিধানের পথ বের করা। অথবা, দিরায়াতশাস্ত্রের মূলনীতি মেনে কিছু বর্ণনাকে অন্য বর্ণনার উপর প্রাধান্য দেওয়া।
৪. পরস্পর-মিলিত বর্ণনাগুলো, যাতে একই ঘটনা বলা হয়েছে, সেসবের টুকরো টুকরো অংশকে ধারাবাহিকভাবে একসঙ্গে মেলানো, সুসম্পন্ন এক অবয়ব দেওয়া।
৫. শেষমেশ, অর্জিত সমস্ত তথ্য-উপাত্ত বিন্যস্ত করে প্রাঞ্জল এক গদ্যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে যাওয়া।

হ্যাঁ, আমি এমনভাবে লিখে গেছি সব ঘটনা, সাহিত্যের রঙে রঙিন হয়ে উঠেছে গদ্য। ফুটে উঠেছে জীবন্ত সব দৃশ্যকল্প। আমার উদ্দেশ্য, যেন পাঠকের কাছে বইটি খুব ভারী না ঠেকে—সাধারণত ইতিহাসপাঠে যেমন অভিজ্ঞতা হয় সবার। মোটকথা, ছত্রে-ছত্রে পাঠকের মনোযোগ ধরে রাখতে চেয়েছি পুরো মাত্রায়। ইতিহাস-বিশ্লেষণের পাশাপাশি সাহিত্যের মিষ্টি ছোঁয়াও আমি পুরোপুরি ছড়িয়ে দিয়েছি।

এই পাঁচটি কর্মপদ্ধতির ভেতর প্রথম এবং পঞ্চমটি ছিল সবচেয়ে কঠিন। এ সংক্রান্ত যাবতীয় গ্রহণযোগ্য কিতাব খুঁজে বের করা কিন্তু সহজ কথা না! নাগালের ভেতর যা পেয়েছি, সেসবে তথ্য খুবই কম ছিল। একসঙ্গে এক কিতাবে সব পাওয়া যেত না। বিচ্ছিন্নভাবে একটু-একটু থাকত। অধিকাংশ গ্রন্থেই তার আলোচনা তেমন পেতাম না। খুঁজে পাওয়া বড় দুষ্কর ছিল।

তবু অনুসন্ধান চলতে থাকল বিরামহীন। শেষমেশ আমাকে ছুটতে হয়েছে দেশের বড়-বড় সব কুতুবখানায়, নাওয়া-খাওয়া একরকম ভুলে গিয়ে বলা যায়। ফলে বিশেষ-বিশেষ কিছু তথ্য হস্তগত হয়েছে। কিন্তু তবু, কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব হয়ে ওঠেনি। যদি কখনও তা মিলে যায়, তা হলে ভবিষ্যতে খুব উপকারী চমৎকার কিছু সংযোজন হতে পারে।

ইতিহাস সংকলনের বেলায় বিভিন্ন ঘটনার দিন-মাস-বছরের সঠিক বর্ণনা দেওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আমি যে-কাজে ডুব দিয়েছি, তার অনেক ঘটনার সঠিক দিন-ক্ষণের উল্লেখ নেই কোথাও। অনেক ঘটনার বর্ণনায় বড়সড় মতপার্থক্যও ঘটে গেছে।

এ পরিস্থিতিতে, কিছু জায়গায় আমি তাতবিক তথা পূর্বাপর বিষয়গুলোর পারস্পরিক সমতা-বিধানের মাধ্যমে কাজ আঞ্জাম দিয়েছি। মাস-বছরের আন্দাজ নিজেকেই করে নিতে হয়েছে। কিছু জায়গায় ঐতিহাসিক মতপার্থক্যের ভেতর তারজিহের (প্রাধান্যদান-নীতি) পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার বড় মেহেরবানি ও সাহায্য যে, ১৩ বছর ধরে আমার মতো অযোগ্য লোকের হাতে এই কাজ সম্পন্নতা পেয়েছে। তার অপার কৃপা না-হলে এ কাজে আবর্তিত কঠিন-কঠিন সমস্যা উতরে যাবার ক্ষমতা আমার ছিল না।

এই সংকলনে শুধু শুকনো-খটখটে লাগামহীন গদ্যে ইতিহাস বিশ্লেষণ করে যাওয়া হয়নি, কিতাবের প্রায় সব জায়গায় তরতাজা সব চিত্রকল্পের অবতারণা করা হয়েছে। পড়তে পড়তে পাঠকের মনে হবে, যেন এখনই তার চোখের সামনে ঘটছে সব ঘটনা। কারণ, যখন ইতিহাস খুঁজতে নেমেছি আমি, বারবার মনে হয়েছে, আমিও যেন চলে গেছি ওইসব ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী রণাঙ্গনে। চোখের সামনে ঘটতে দেখছি বেদনাবিধুর সব দৃশ্য। এজন্য পাঠকদেরকেও দৃশ্যকল্পের ভেতর দিয়ে আটশ বছর আগের সেই খুনরাঙা প্রান্তর থেকে ঘুরিয়ে আনতে চেয়েছি।

বিশেষত, যখনই কোনো ইতিহাসবিদ হকের জানবাজ মুজাহিদ আর বাতিলপন্থিদের মুখোমুখি যুদ্ধের কথা বর্ণনা করেছেন, বাতাসে একসঙ্গে অসংখ্য তির ছুটে যাওয়ার সাঁ-সাঁ শব্দ, বুকে-পিঠে তির বেঁধার খচখচ আওয়াজ আর চকচকে তরবারির ঝলকানি ভেসে উঠেছে আমার কল্পনায়। আমার পাঠকদেরও আমি সেই অনুভূতির দোরগোড়ায় দাঁড় করাতে চেয়েছি।

অন্যভাবে বললে বলা যায়, এই বই শুধু বিশ্লেষণের জন্যই বিশ্লেষণ না, বরং ইতিহাস থেকে ইবরত তথা শিক্ষাগ্রহণের আহ্বান করবার জন্য বিশ্লেষণ।

এই কিতাব বিস্তর বিশ্লেষণী মেজাজে না লেখার আরেকটি বড় কারণ, পরস্পর-বিরোধী ঘটনাগুলির উপর বিস্তারিত আলোকপাত, তাতবিক অথবা তারজিহ-পদ্ধতি অবলম্বন এবং পাশাপাশি দলিল-প্রমাণ উল্লেখের দায়িত্ব যদি কাঁধে তুলে নিতাম, তবে স্পষ্টতই এই কাজ দুঃসাধ্য ছিল। এবং কিতাবের কলেবরও বেড়ে যেত কয়েক গুণ। আর পাঠকদের এত মোটা বই কেনা শুধু কঠিনই হতো না, বিশ্লেষণধর্মী লোহা-লক্করপূর্ণ বইপাঠের আগ্রহও অনেকখানি দমে যেত।

আবার এর অর্থ এই নয় যে, মতবিরোধপূর্ণ বর্ণনাগুলি এমনি-এমনি ছেড়ে দিয়েছি, চিন্তাগবেষণা করে লিখিনি! বরং, এইসব বর্ণনায় আমি গভীর নজর দিয়েছি, এবং যেখানে সমতা-বিধান সম্ভব হয়নি, প্রাধান্য দিয়েছি। এজন্য যথাসম্ভব সম্ভাব্য বিভিন্ন দলিল ও আলামতের আশ্রয় নিয়েছি।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমার নিজস্ব রুচিবোধের ছাঁচে বেছে নিয়েছি নির্দিষ্ট কোনো ঘটনা। পাঠকদের দোলাচলের ভেতর থেকে তুলে আনতে যথাসম্ভব মতবিরোধপূর্ণ বর্ণনাগুলো এড়িয়ে গেছি। পরিবর্তে গ্রহণ করেছি প্রাধান্যযোগ্য কোনো বর্ণনা। অথবা

এমন গদ্যভঙ্গিতে সাজিয়েছি, যা দ্বারা অন্যসব বর্ণনার মধ্যে পারস্পরিক একটা সমতা দাঁড়িয়ে গেছে। কিংবা আগের তুলনায় মতবিরোধ কমে গেছে অনেকখানি।

কিছু স্থানে কিতাবের মূলপাঠে, না-হয় পাদটীকায় বিরোধপূর্ণ বর্ণনার প্রতি নির্দেশ করেছি। কখনও ভুল বর্ণনার উপর ছোটখাটো আলোচনাও করে গেছি।

আমার মনে হয়েছে, ইতিহাসে সুলতান জালালুদ্দীনের সঠিক অবস্থান পাঠক ততক্ষণ পর্যন্ত উপলব্ধি করে উঠতে পারবে না, তার উদ্দাম অভিযাত্রার সুকঠিন অধ্যায়গুলো যতক্ষণ জেনে না-উঠবে।

ফলে, এই প্রয়োজনবোধেই আমি বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটিকে দুখণ্ডে লিখেছি। প্রথম খণ্ডে সেইসব প্রাথমিক পটভূমি সাজিয়ে তুলেছি, যার ছাঁচে ফেলে সুলতানের প্রাণান্তকর মেহনত-মুজাহাদার একটা বিচার করে ওঠা যাবে। বলা যায়, সুলতানের জীবন-কীর্তির একপ্রকার ভূমিকাই প্রথম খণ্ড। এতে বিভিন্ন ঘটনার প্রাসঙ্গিক বর্ণনায় ফাঁকে-ফুঁকে তার জীবনচিত্রের টুকটাক ঝলক ফুটেছে মাত্র।

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পঙক্তিই সুলতানের জিহাদি প্রেক্ষাপটের গল্প বলা শুরু করে দেয়। একদম তার ক্ষমতাগ্রহণ থেকে শাহাদাত পর্যন্ত যাবতীয় আখ্যানের বর্ণনা চলে এসেছে।

বলি, খুব মনে রাখবেন, এটি সুলতানের সমস্ত জীবনকাহিনির অনুপুঙ্খ বর্ণনা নয়। বরং, উম্মাহর সেই দুর্যোগের কালে সুলতান জালালুদ্দীনের জিহাদি কীর্তিকলাপের প্রতি আলোকপাত-মাত্র। এজন্য তার জীবনের সেইসব পর্ব, যা কোনোভাবেই আমার আলোচ্য বিষয়ের সাথে সম্পর্ক রাখে না, খুব সতর্কতায় এড়িয়ে গিয়েছি। সে বিষয়ে আগ্রহী পাঠকদের এ কিতাবের উৎসমূল গ্রন্থসমূহে ফিরে যেতে বলব। সেখানে তার বিস্তারিত আলোচনা আছে।

এও ভুলে যাবেন না, তার জীবনের আখ্যানপর্ব নিয়ে আমি যে পাণ্ডুলিপিটি সাজিয়েছি, তা মুসলিমবিশ্বের প্রতিরক্ষা-ক্ষেত্রে সুলতানের দরদমাখা জীবনোৎসর্গের গল্প। আমরা কখনও কোনো-কোনো ক্ষেত্রে হয়তো তার কিছু ত্রুটিও দেখে উঠব। কিন্তু সেই দুর্বলতার কারণে তার প্রতিরোধমূলক ভূমিকাকে একদম নাকচ করে দেওয়া ভুল। নিতান্তই ভুল। ব্যক্তিগত ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে আমবিয়া আলাইহিমুস সালাম ছাড়া কেই-বা পবিত্র থাকতে পারে?

আমি চাই, এই কিতাব আপনি এমন এক মনোভাব নিয়ে পড়ুন যে, লেখক আমার সামনে এক মুসলিম বাহাদুরের টুকরো-টুকরো গল্প বলে যাচ্ছেন। এতে তার উদ্দেশ্য, যেন আমিও তার হৃদয়ের গভীর আকুতি শুনতে পাই, সেই অনুযায়ী আমল করি, এ থেকে দুঃসাহসিকতার পাঠ আর শিক্ষার উপকরণ গ্রহণ করি।

প্রিয় পাঠক, আমি হৃদয়ের পূর্ণ আকুতি মিশিয়েই লিখতে চেয়েছি এই বই। পড়তে পড়তে আপনিও যদি আমার হৃদয়ের সেই উত্তাপ, সেই গভীর প্রভাব নিজের মাঝে অনুভব করে ওঠেন, দীনের পথে আবর্তিত বিভিন্ন সাময়িক দুর্যোগে ও

দুর্বিপাকে ভয় না পান, হৃদয়ের গভীরে যদি লালন করেন সত্যে অবিচলতার মুষ্টিবদ্ধ সংকল্প, বুঝব, আমার এ রাতজাগা পরিশ্রম বিফলে যায়নি।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ফজল ও করমে, ১৪১৮ হিজরির শাওয়াল মাসে (ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮) গৃহীত এ কাজ ১৪৩১ হিজরির পবিত্র রমজানে (আগস্ট, ২০১০) পূর্ণতা পেতে যাচ্ছে।

আমার মতো দুর্বল অযোগ্য লোকের হাতে এই মহান কর্মের আঞ্জাম কেবল স্রষ্টার অপার কৃপাতেই সম্ভব হয়েছে।

বান্দা আজ পুরোপুরি হয়রান, সে এই মহিমান্বিত তাওফিক পেয়ে কোন ভাষায় তার মালিকের শুকরিয়া আদায় করবে?

اللهم لک الحمد کما انت اهله اللهم لا احصی ثناء علیک ۱۸ کما اثنیت علی نفسه

সংকলনটির পাতার ভাঁজে-ভাঁজে যৎসামান্য কল্যাণ যদি থাকে, তা আমার রবের তরফ থেকে। যত ত্রুটি আর অকল্যাণ রয়েছে, সব আমার পক্ষ থেকে ঘটেছে।

শেষমেশ একজনের কথা না বললেই নয়। প্রিয় বন্ধু মাওলানা রাশিদ আহমাদ মুনিব এই গ্রন্থ নির্ভুলকরণে দারুণভাবে খেটে গেছেন। বহু উপকারী বিষয়ের প্রতি নির্দেশ করেছেন। কিছু কিছু জায়গায় পাদটীকাও জুড়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা সমস্ত সহযোগী বন্ধুকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান
করাচি
১০ রমজান ১৪৩১; ২০ আগস্ট ২০১০
সময় : রাত ৩টা

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : খাওয়ারিজম ও খাওয়ারিজমের বাদশাহগণ

খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক অবস্থান।। ৫৫
প্রাচীনকালের খাওয়ারিজম।। ৫৬
খাওয়ারিজমে ইসলাম ।। ৫৬
কাস ও জুরজানিয়া ।। ৫৬
ইসলাম-যুগের খাওয়ারিজমি শাসক ।। ৫৭
খাওয়ারিজমের প্রথম স্বাধীন মুসলিম শাসক ।। ৫৮
কুতুবুদ্দীন ইবনে আনুশতেগিন ।। ৫৮
মুজাফফর উদ্দীন আতসিয ।। ৫৮
ইল আরসালান ।। ৬০
সুলতান শাহ ও আলাউদ্দীন তাকিশ ।। ৬০
পার্শ্ববর্তী সাম্রাজ্যের চালচিত্র ।। ৬১
তুর্কানেখাতা ।। ৬১
আব্বাসি খেলাফতের প্রাণকেন্দ্র বাগদাদ ।। ৬২
সিরিয়া ও মিশর সাম্রাজ্য ।। ৬৪
ঘুর সাম্রাজ্য ।। ৬৬
শিরাজের আতাবেগ ।। ৬৭
ইরাকের সেলজুকগণ ।। ৬৭
রোমের সেলজুকগণ ।। ৬৮
আজারবাইজানের আতাবেগগণ ।। ৬৮
আলামুত ।। ৬৮
ইরবিল ।। ৬৮
সুলতান আলাউদ্দীন তাকিশের শাসনকাল ।। ৬৯
খলিফা নাসিরের অস্থিরতা ।। ৬৯
তুর্কানেখাতার দুঃখের দিন ।। ৬৯
হাসান ইবনে সাব্বাহর অনুসারীদের সাথে লড়াই ।। ৭০
সুলতান তাকিশের জীবন নিয়ে পর্যবেক্ষণ ।। ৭২
তাকিশের ক্ষমাশীলতা ও সদাচারের একটি ঘটনা ।। ৭৩

দ্বিতীয় অধ্যায় : সুলতান আলাউদ্দীন মুহাম্মদের ক্ষমতাগ্রহণ

ঘুরিদের সাথে লড়াই ।। ৭৫
তুর্কানেখাতার সাথে লড়াই ।। ৭৭
সাইয়েদ মুরতাজার অন্তর্দৃষ্টি ।। ৮০
দুশমনের বন্দিশালায় ।। ৮০
ভেতর-বাইরের যুদ্ধ ।। ৮৩
তুর্কানেখাতার শেষপরাজয় ।। ৮৩
কিশলুক খানের সাথে যুদ্ধ ।। ৮৫
গজনি দখল ।। ৮৬
সম্রাজ্ঞী তুর্কান খাতুন : রাজ-ব্যবস্থাপনায় ভাঙন ।। ৮৬
অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিকগুলো নিয়ে পর্যালোচনা ।। ৮৭
ফসলের প্রাচুর্য ।। ৮৯
কারিগরি ও ব্যবসা-বাণিজ্য ।। ৯০
খনিজ সম্পদ ।। ৯১
শহরগুলোর চালচিত্র ।। ৯১
মসজিদ ।। ৯১
অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা ।। ৯২
জ্ঞানচর্চা ।। ৯২
অপার মায়াবী কুদরতি দৃশ্য ।। ৯৩
বিভিন্ন মৌসুম ।। ৯৪
ভৌগোলিক পর্যালোচনা ।। ৯৫

তৃতীয় অধ্যায় : চেঙ্গিজ খান

গোবি মরুভূমির ভূত ।। ১০০
মোগল ।। ১০১
তেমুজিন ।। ১০২
তেমুজিনের প্রথম বিজয় ।। ১০৪
উঁগ খান ।। ১০৪
কুরুলতাই ।। ১০৫
খাতা (চীন) হামলার ফন্দি ।। ১০৬
পূর্বপ্রস্তুতি ও গুপ্তচরবৃত্তি ।। ১০৬
যুদ্ধের বাহানা ।। ১০৭
কারাকোরামে বিশ্রামগ্রহণ ।। ১০৮
তাতারদের সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ।। ১০৯
ইয়াসার নিয়ম-নীতি ।। ১০৯
সূক্ষ্ম পন্থায় আক্রমণ ।। ১১০

ভয়াবহ জুলুম-নির্যাতন ।। ১১১
হাড্ডির পাহাড় ।। ১১১
তাতারদের ধর্ম ।। ১১১
কিশলুক খানকে শায়েস্তা ।। ১১২
চীনা মুসলমান ।। ১১৩
জরুরি জ্ঞাতব্য ।। ১১৩

চতুর্থ অধ্যায় : শাহজাদা জালালুদ্দীন মুনকাবিরাতি

জন্ম ।। ১১৫
সুলতান জালালুদ্দীন মুনকাবিরাতি ।। ১১৫
শিক্ষানবিশি ।। ১১৬
ইমাম রাজির শিষ্যত্বগ্রহণ ।। ১১৬
সেনাদলের দীক্ষা ও দায়িত্ববোধ ।। ১১৮
জনসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা ।। ১১৯
জালালুদ্দীনের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী ।। ১১৯

পঞ্চম অধ্যায় : বিপদের ঘনঘটা

উম্মাহর সামষ্টিক অধঃপতনের প্রধান পাঁচ কারণ ।। ১২২
দুনিয়ার মোহ ।। ১২৩
জিহাদ ত্যাগ ।। ১২৪
আল্লাহর দীনপ্রচারে অলসতা ।। ১২৫
আকিদাগত ভ্রান্তি ও দুর্বলতা ।। ১২৭
পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহ ।। ১২৭
অমোঘ বাস্তবতা ।। ১২৮
গায়েবি বিপদ ।। ১২৯

ষষ্ঠ অধ্যায় : ভীতিকর ভবিষ্যদ্বাণী ও তাতার-আগ্রাসনের কারণ

আল্লাহওয়ালাদের ভবিষ্যদ্বাণী : গায়েবি ইশারা ।। ১৩৪
শায়েখ নাজমুদ্দীন কোবরার ভবিষ্যদ্বাণী ।। ১৩৪
সাইয়েদ মুরতাজা শাদইয়াখির বাণী ।। ১৩৫
পাখির ডাক ।। ১৩৬
তাতার-আগ্রাসনের কিছু কারণ ।। ১৩৮
প্রথম কারণ : খাওয়ারিজম শাহ ও বাগদাদের খলিফার বৈরী সম্পর্ক ।। ১৩৮
শায়েখ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দির আগমন ।। ১৩৯
খাওয়ারিজম শাহের খলিফা নাসিরের খেলাফত অস্বীকার ।। ১৪৪
খাওয়ারিজম শাহের যুদ্ধযাত্রা ।। ১৪৫
তুষার ঝড়ের কবলে ।। ১৪৫

বিরল কাণ্ড ।। ১৪৭
বঞ্চনা ।। ১৪৭
সাম্রাজ্যের ভাগ-বাটোয়ারা ।। ১৪৮
আক্রমণের দ্বিতীয় কারণ ।। ১৪৯
তৃতীয় কারণ : চুক্তিনামা ।। ১৫০
চেঙ্গিজ খানের দোদুল্যমানতা ।। ১৫৩
চতুর্থ কারণ : খলিফা নাসিরের ষড়যন্ত্র ।। ১৫৪
খলিফা নাসিরের পরামর্শসভা ।। ১৫৪
ইবনুল আসিরের সাক্ষ্য ।। ১৫৬
পঞ্চম কারণ : খাওয়ারিজম শাহের বোকামি ।। ১৫৬
কাফেলা ।। ১৫৭
বার্তাবাহক হত্যা ।। ১৬০
চেঙ্গিজ খানের পরিকল্পনা ও গোয়েন্দা-ব্যবস্থা ।। ১৬৩
সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আক্রমণ ।। ১৬৫
শিয়া ও বাতেনি ফেরকার গাদ্দারি ।। ১৬৬
খলিফা নাসির শিয়া : দলিল কী? ।। ১৬৬

সপ্তম অধ্যায় : মুসলিমবিশ্বে চেঙ্গিজ খানের আক্রমণ

চেঙ্গিজ খানের ক্রোধাগ্নি ।। ১৬৯
তাতার-বাহিনীর সঠিক সংখ্যা ।। ১৭০
ইউরোপিয়ান ইতিহাসবিদের ভুল ।। ১৭০
প্রথম হামলা ।। ১৭১
জোচি খানের অগ্রযাত্রা ।। ১৭২
জোচিকে প্রদত্ত নির্দেশনা ।। ১৭২
খাওয়ারিজম শাহের পরামর্শ ।। ১৭৩
খাওয়ারিজমি বাহিনীর সীমান্তের দিকে রওনা ।। ১৭৫
শাহজাদা জালালুদ্দীন তাতারদের ঘাঁটিতে ।। ১৭৫
তুকতুগানের সাথে জোচির মোকাবেলা ।। ১৭৬
মুসলমান ও তাতারদের মাঝে প্রথম যুদ্ধ ।। ১৭৯
যুদ্ধের নাজুক মুহূর্ত ।। ১৮০
জালালুদ্দীনের পালটা আক্রমণ ।। ১৮১
প্রত্যাবর্তন ।। ১৮৩
বিজয়োৎসব ।। ১৮৩
চেঙ্গিজ খানের অবস্থান ।। ১৮৩
খাওয়ারিজম শাহের অনুভূতিশূন্যতা ।। ১৮৪
জুবি নৈয়ানের আক্রমণ ।। ১৮৫

খাওয়ারিজমি শক্তির বিভক্তি ।। ১৮৫
সাইহুনের পারে রক্তের মহোৎসব ।। ১৮৭
মুসলিমবিশ্বে দু-দিক থেকে আক্রমণ ।। ১৮৮

অষ্টম অধ্যায় : সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী

কুকন্দের মর্দে মুজাহিদ ।। ১৯১
মাঝদরিয়ায় রাস্তা ।। ১৯৩
আগ্নেয়াস্ত্র ।। ১৯৩
তৈমুর মালিকের পশ্চাদ্ধাবন ।। ১৯৫
তৈমুর মালিকের জিহাদি অগ্রযাত্রা ।। ১৯৬
আতরারের রণক্ষেত্র ।। ১৯৭
অফিসার কেরাছার গাদ্দারি ।। ১৯৯
নৈশ হামলা ।। ২০০
ইয়ান্নাল খান গ্রেফতার ।। ২০০

নবম অধ্যায় : বোখারা ও সমরকন্দের পতন

তাতার-বাহিনী বোখারা অভিমুখে ।। ২০৩
সমরকন্দে আতঙ্কিত খাওয়ারিজম শাহ ।। ২০৪
পলায়ন ।। ২০৪
বোখারা অবরোধ ।। ২০৬
মসজিদ-মাদরাসার শহর ।। ২০৬
মুসলিমদের আক্রমণ ও পরাজয় ।। ২০৭
শয়তানদের রাজত্ব ।। ২০৮
জামিউল কাবিরে চেঙ্গিজ খান ।। ২০৮
ইমামজাদা রোকনুদ্দীনের জবাব ।। ২১০
হুকুমনামা ।। ২১০
দুর্গে আক্রমণ ।। ২১১
জুলুমের দ্বিতীয় অধ্যায় ।। ২১১
আজাবের দিন ।। ২১২
রক্তের হোলিখেলা ।। ২১৩
সমরকন্দ ট্রাজেডি ।। ২১৪
প্রতিরোধ-ব্যবস্থা ।। ২১৪
ত্রিমুখী আক্রমণ ।। ২১৫
সমরকন্দ অবরোধ : ইয়ান্নাল খান হত্যা ।। ২১৫
সমরকন্দের আমিরদের পরামর্শ ।। ২১৬
যুদ্ধের প্রথম দিন ।। ২১৭

দ্বিতীয় দিন ।। ২১৭
যুদ্ধের তৃতীয় দিন : গাদ্দারি ও পরাজয় ।। ২১৮
সমরকন্দে চেঙ্গিজ খান ।। ২১৯
রক্তের হোলিখেলা ।। ২২০
গাদ্দারির ফল ।। ২২০
খাওয়ারিজমিদের সহযোগী বাহিনীর ব্যর্থতা ।। ২২১
পাথরদিল খলিফা ও মুসলিম গভর্নর ।। ২২১
খাওয়ারিজমি মুসলিমদের হিজরত ।। ২২২

দশম অধ্যায় : বিরানভূমির মুসাফির

দক্ষিণের সফর ।। ২২৫
শাহজাদা জালালুদ্দীনের প্রচেষ্টা ।। ২২৫
দরবারি জ্যোতিষীদের পরামর্শ ।। ২২৬
আমুদরিয়ার পারে ।। ২২৬
পরামর্শসভা ।। ২২৭
হিন্দুস্থান অভিমুখে ।। ২২৭
শাহজাদা রোকনুদ্দীনের সফর ।। ২২৮
শাহজাদা জালালুদ্দীনের ভাষণ ।। ২২৮
বদরুদ্দীন আমিদের ষড়যন্ত্র ।। ২৩০
জিঘাংসা ।। ২৩২
পশ্চাদ্ধাবন ।। ২৩৪
নিশাপুরে খাওয়ারিজম শাহ ।। ২৩৫
শাহি হেরেমের হিজরত ।। ২৩৬
শাহজাদা রোকনুদ্দীনের সাথে সাক্ষাৎ ।। ২৩৭
শাহি খাজানার সুরক্ষা ।। ২৩৮
ধ্বংসশালায় খাওয়ারিজম শাহ ।। ২৩৯
মাজেন্দ্রানে একদিন ।। ২৩৯
সমুদ্রপারের বস্তিতে আত্মগোপন ।। ২৪০
শাহি হেরেমের পরিণতি ।। ২৪৩

একাদশ অধ্যায় : পশ্চিমা তাতারদের রক্তোন্মত্ততা

শাহজাদা রোকনুদ্দীনের শাহাদাত ।। ২৪৭
রায় শহরে তাতার তাণ্ডব ।। ২৪৮
চূড়ান্ত বিচ্ছিন্নতা : ভয়ানক পরিণাম ।। ২৪৯
হামাদানের গভর্নরের সন্ধি ।। ২৪৯
কাজবিন আক্রমণ ।। ২৫০

ইরবিল ট্রাজেডি ।। ২৫০
সারাও ।। ২৫১
তিবরিজবাসীর সন্ধিচুক্তি ।। ২৫১
বিধ্বস্ত বিলকান ।। ২৫১
মারাগেহ ।। ২৫১
ইউরোপ আক্রমণ ।। ২৫২
তাতার-আগ্রাসনের বছরপূর্তি : ইবনুল আসিরের মূল্যায়ন ।। ২৫২
ইউরোপ-রাশিয়ায় তাতারদের অগ্রযাত্রা ।। ২৫৫

দ্বাদশ অধ্যায় : বিদায় হে পৃথিবীর মেহফিল

মৃত্যুর পদধ্বনি ।। ২৫৭
সুলতান আলাউদ্দীনের মৃত্যু : ইবনুল আসিরের মূল্যায়ন ।। ২৫৯
সুলতান আলাউদ্দীনের বিস্ময়কর জীবনচিত্র ।। ২৬০
এক বণিকের মুখে শাহের প্রশংসা : মুসলিমবিশ্বে তার অবস্থান ।। ২৬০
প্রথমকালের গল্প ।। ২৬১
মরেও তোমার মেলেনি খানিক স্বস্তি ।। ২৬২
ধর্মের প্রতি অনুরাগ ।। ২৬৩
মুওয়াফফিক বাগদাদির প্রতিক্রিয়া ।। ২৬৪
খাওয়ারিজম শাহের বয়স ।। ২৬৫
টুকরো টুকরো জীবনচিত্র ।। ২৬৬
পরাজয়ের কারণসমূহ ।। ২৬৬
কৈফিয়তের দায়ভার ।। ২৬৯
কারাকোরাম সম্পর্কিত একটি ভুল ধারণার অবসান ।। ২৭০
তুর্কি, তাতারি ও মোগল ।। ২৭১
তুর্কিস্তান ও বর্তমান তুরস্ক ।। ২৭৩

ত্রয়োদশ অধ্যায় : শিক্ষাগৃহ আরগেঞ্চ

সুলতান জালালুদ্দীনের প্রত্যাবর্তন ।। ২৭৫
পুরো মুসলিমবিশ্ব ও পুণ্যভূমির সুরক্ষার চ্যালেঞ্জ ।। ২৭৬
আরগেঞ্চে সুলতান ।। ২৭৮
কঠিন মুহূর্ত ।। ২৭৯
তাতারদের সৈন্য পরিচালনা ।। ২৭৯
জিহাদ ঘোষণা ।। ২৭৯
চক্রান্তের জাল ।। ২৮০
রাজধানী ছাড়ার কাহিনি : এক কঠিন পরীক্ষা ।। ২৮১

তুলি খানের নিশাপুর আক্রমণ ।। ৩১৩
শায়েখ ফরিদুদ্দীন আত্তারের শাহাদাত ।। ৩১৫
বিরানভূমির ইয়াকুত পাথর মার্ভ ।। ৩১৫
সংঘর্ষ-সংঘাত ।। ৩১৬
এক হাজার তাতার বাহাদুরের মৃত্যু ।। ৩১৬
অবরোধ : তুলি খানের ধূর্ততা ।। ৩১৬
গণহত্যা ।। ৩১৯
দুর্ভাগা শহরের বারবার ধ্বংস হওয়ার গল্প ।। ৩২০
হামাদানের জিহাদ ।। ৩২১
হামাদানবাসীর অস্থিরতা ।। ৩২২
হাকিমের সঙ্গে আলোচনাপর্ব ।। ৩২২
হামাদানের ফকিহ সাহেবের জিহাদের ডাক শহরবাসীর ঐকমত্য ।। ৩২৩
যুদ্ধের সিদ্ধান্ত ।। ৩২৪
অবরোধ ।। ৩২৫
যুদ্ধের প্রথম দিন ।। ৩২৬
যুদ্ধের দ্বিতীয় দিন ।। ৩২৬
তাতারদের শহর দখল ।। ৩২৮
শহিদদের সংখ্যা : অতিরঞ্জন কিংবা বাস্তবতা ।। ৩২৮

পঞ্চদশ অধ্যায় : পুণ্যভূমি আফগানিস্তানের যুদ্ধক্ষেত্র

হেরাতের যুদ্ধ ।। ৩৩৩
মুহাদ্দিস বাযযাযের শাহাদাত ।। ৩৩৬
কাজি ওয়াহিদুদ্দীনের বিস্ময়কর ঘটনা ।। ৩৩৬
সুলতানের আফগানিস্তান রওনা ।। ৩৩৮
যুযানবাসীর নির্লজ্জতা ।। ৩৩৯
হজরত খিজির আ. এর সুসংবাদ : গায়েবি ইলহাম ।। ৩৪১
চেঙ্গিজ খানের অগ্রযাত্রা ।। ৩৪১
বিধ্বস্ত বলখ ।। ৩৪১
ফারিয়াব ও যুযান ।। ৩৪২
তালকান অবরোধ ।। ৩৪২
গরাযওয়ান দুর্গ ।। ৩৪৩
বাৎসরিক শিকার-খেলা ।। ৩৪৪
জিহাদের স্মরণীয় ইতিহাস ।। ৩৪৪

কালিয়ুন দুর্গ ।। ৩৪৫
এশয়ার ও ফেওয়ার দুর্গ ।। ৩৪৬
সাইফরোদ দুর্গ ।। ৩৪৭
ফিরোজকুহ ।। ৩৪৯
তুলক দুর্গ ।। ৩৫০
জিহাদভূমিতে সুলতান জালালুদ্দীন ।। ৩৫০
কান্দাহারযুদ্ধ : শানদার বিজয় ।। ৩৫১
গজনির জিহাদি মারকাজ ।। ৩৫৩
মুজাহিদদের ছাউনি ।। ৩৫৪
সুলতানের বিবাহ ।। ৩৫৪
তাতার-বাহিনীর অগ্রযাত্রা ।। ৩৫৪
সুলতানের বাহিনীর যুদ্ধযাত্রা ।। ৩৫৫
গজনির যুদ্ধ ।। ৩৫৫
গজনিবাসীর অবস্থা ।। ৩৫৮
গজনি যুদ্ধে জয়ের প্রভাব ।। ৩৫৮
হেরাতবাসীর জাগরণ ।। ৩৫৮
চেঙ্গিজ খানের ক্রোধান্ধতা ।। ৩৫৯
হেরাতবাসীর ভেতর গণহত্যা ।। ৩৫৯
হেরাতের গণহত্যা থেকে ইমাম রাজির পরিবারের হেফাজত ।। ৩৬১
খোরাসানে দ্বিতীয়বার গণহত্যা ।। ৩৬১
সুলতান জালালুদ্দীনের চ্যালেঞ্জ ।। ৩৬৩
কাবুলের দিকে সুলতানের অগ্রযাত্রা : পারওয়ানে অবস্থান ।। ৩৬৩
ওয়ালিয়ান দুর্গের যুদ্ধ ।। ৩৬৪
তুলি খানের যাত্রা ।। ৩৬৫
ইসলামি বাহিনীর কাতারবন্দি ।। ৩৬৫
সুলতানের হেকমতপূর্ণ বিস্ময়কর পদক্ষেপ ।। ৩৬৬
যুদ্ধের নকশা ।। ৩৬৭
তাতারদের প্রতারণা ।। ৩৬৮
সুলতান জালালুদ্দীনের দৃঢ়তা ও স্থিরতা ।। ৩৬৯
পালটাপালটি যুদ্ধ ও বিজয় ।। ৩৬৯
বামিয়ান যুদ্ধ ।। ৩৭১
কিছু জরুরি আলোচনা ।। ৩৭১
এক আচানক বিজয় অথবা বিজয়ের ধারা ।। ৩৭৩

মার্কিন ঐতিহাসিকের ভুল বিবরণ ।। ৩৭৪

ষষ্ঠদশ অধ্যায় : সিন্ধুতটের প্রলয়ংকরী যুদ্ধ

মুসলিমবাহিনীর ভেতর ফাটল ।। ৩৭৯
শিক্ষা ।। ৩৮১
চেঙ্গিজ খানের আক্রমণ ।। ৩৮২
অগ্রগামী দলের ধ্বংস-কথা ।। ৩৮৪
নৌকার খোঁজে ।। ৩৮৫
সুলতানের গায়রত ।। ৩৮৬
নিলাবের তট ।। ৩৮৭
সুলতানের সূক্ষ্ম সারিবদ্ধকরণ ।। ৩৮৮
নৌকা জ্বালিয়ে দাও ।। ৩৮৯
যুদ্ধের শুরু : প্রথম দিন ।। ৩৯০
যুদ্ধের দ্বিতীয় দিন ।। ৩৯০
তৃতীয় দিন : নিষ্পত্তিমূলক লড়াই ।। ৩৯১
সুলতানের হেকমতপূর্ণ কর্মপন্থা ।। ৩৯২
যুদ্ধের শুরু ।। ৩৯৪
আমান মালিকের বীরত্ব ।। ৩৯৪
বাম বাহুর হালচিত্র ।। ৩৯৫
জীবন-মরণের বাজি ।। ৩৯৫
সুলতানের ভয়ানক আক্রমণ ।। ৩৯৭
মুখোমুখি : খাওয়ারিজমের শার্দূল ও গোবির ভল্লুক ।। ৩৯৮
চেঙ্গিজ খানের চাল ।। ৩৯৯
মুসলিমবাহিনীর বাম বাহুর পরাজয় ।। ৪০০
ছিঁড়ে গেছে যুদ্ধের সুতো ।। ৪০১
শেষনিঃশ্বাস পর্যন্ত চলবে জিহাদ ।। ৪০২
সুলতানের পুত্রের শাহাদাত ।। ৪০৪
চেঙ্গিজ খানের খায়েশ ।। ৪০৫
মৃত্যুর নগ্ননৃত্য ।। ৪০৬
মুজাহিদের অট্টহাসি ।। ৪০৭
চেঙ্গিজ খানের প্রশংসা ।। ৪০৯
সিন্ধুযুদ্ধের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ।। ৪১১
নিলাব কোথায় বিদ্যমান ।। ৪১২

পাঠপূর্ব পর্যালোচনা

সৃষ্টিলগ্ন থেকে সময়ের এক কঠিন চক্রাবর্তের ভেতর আটকা পড়ে আছে এই গ্রহ—পৃথিবী। তখন থেকে অদ্যাবধি একে-একে কেটে গেছে বহু শতাব্দী। ইতোমধ্যে মানবসম্প্রদায় প্রত্যক্ষ করেছে যুগ-বদলের করুণ কিছু অধ্যায়।

জগতের এক অমোঘ বিধানের নাম 'মানবের কর্মের প্রতিফল'। সকল যুগের ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এই বিধানেরই কিছু বাস্তব দৃশ্য আমরা প্রতিফলিত হতে দেখেছি।

মানবজাতির উন্নতি-অবনতির ইতিহাস, বড় বড় রাজা-বাদশাহর প্রতিষ্ঠা ও পতনের উপাখ্যান, পৃথিবীর প্রাচীন সব মতবাদ কিংবা ধর্মভিত্তিক লড়াইয়ের বিজয়, সফলতা ও অগ্রগতির দাস্তান—সবকিছুই মহান আল্লাহর এই অমোঘ বিধানেরই প্রতিফলন; অবশ্যম্ভাবী বাস্তবায়ন।

বনি ইসরাইলের দুই বিপ্লবের গল্প

কুরআন মাজিদে বনি ইসরাইলের উন্নয়ন ও অধঃপতনের বর্ণনা যে ভাষাভঙ্গিতে দেওয়া হয়েছে, তা মূলত পৃথিবীবাসীকে উত্থান-পতনের এই ব্যাপারটি নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনার প্রতি আহ্বান করে।

এই সম্প্রদায় যখন নাফরমানির সকল সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল, আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন লাঞ্ছনা ও অপদস্থতা। তাদের ধ্বংসদূত হিসেবে বেবিলন হতে উদ্ভব ঘটেছিল নেবুচাদনেজারের, যে বাইতুল মাকদিস গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। বনি ইসরাইলের আকাশ-ছোঁয়া অগ্রগতি মুহূর্তে করেছিল ভূলুণ্ঠিত।

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا

অতঃপর যখন ঐ দুটোর প্রথমটির ওয়াদা আসবে, তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে আমার প্রচণ্ড শক্তিশালী বান্দাদের পাঠাব। তারা (শাস্তি দেওয়ার জন্য তোমাদের) ঘরবাড়ির ভেতরে প্রবেশ করবে। এটা একটা কার্যকর ওয়াদা।

তারপর তাদের ভেতর আল্লাহ তায়ালা একের পর এক নবীদের পাঠালেন। তাদের দাওয়াতের বরকতে বনি ইসরাইলের মৃত আত্মায় পুনরায় সঞ্চার ঘটে জীবনের। ততদিনে পৃথিবীর উপর দিয়ে সময়ের দীর্ঘ এক ঝড় বয়ে গেছে। এরা ফের লাঞ্ছনার

খোলস থেকে বেরিয়ে মানবজাতির ভেতর নিজেদের নতুন অবস্থান পাকাপোক্ত করে ফেলল। কিন্তু এই উন্নতির ধারাও বেশিদূর গড়ায়নি। পুনরায় তাদের ভেতর বাসা বাঁধে কুফর, শিরক, প্রেরিত নবীদের মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা, অন্ধ অহমিকা, জুলুম-নির্যাতন, ধোঁকাবাজি, বিলাসিতাপূর্ণ জীবনযাপন ও পারস্পরিক ঘৃণা-বিদ্বেষ। এইসব ভয়াবহ অপরাধ আল্লাহ তায়ালার ক্রোধের কারণ হয়ে ওঠে এবং নেমে আসে মহা বিপর্যয়।

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَ لِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَّ لِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

তারপর যখন (ঐ দুটোর) দ্বিতীয়টির ওয়াদা আসবে, তখন (তাদের পাঠাব) যাতে তারা তোমাদের মুখমণ্ডল বিকৃত করে, প্রথমবার যেভাবে প্রবেশ করেছিল সেভাবে মসজিদে প্রবেশ করে, এবং চড়াও হয়, সব তছনছ করে দেয়।

ধ্বংস ও বিধ্বস্ততার দ্বিতীয় এই ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবায়ন ঘটে ইউরোপিয়ান তিউতাস রোমির হামলার মধ্য দিয়ে। সে ইয়াহুদ বংশকে বিনাশ করে ফেলেছিল পুরোপুরি। বইয়ে দিয়েছিল গলগলে রক্তের বন্যা। আলকুদসের গায়ে প্রজ্বলিত করেছিল লেলিহান আগুন।

উম্মাহর ইতিহাসে দুই মহা বিপর্যয়

বনি ইসরাইলের এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটুকু মাথায় রাখুন। কারণ, আমরা যদি এখন উম্মাহর বিগত প্রভাব-প্রতিপত্তির ইতিহাস নিরিখ করে উঠি, বুঝব, মুসলিমজাতি যতদিন ইসলামকে জীবনের পরম পাওয়া ভেবেছে, মহান আল্লাহর একত্ব, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত ও পরকালের প্রতি রেখেছে গভীর বিশ্বাস, জিহাদ হয়ে উঠেছে তাদের জীবনের প্রিয় কর্মব্যস্ততা ব্যস্ততা, দুনিয়ার জীবন তাদের চোখে তুচ্ছাতিতুচ্ছ—ততদিনই তারা আল্লাহর জমিনে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের ছড়ি ঘোরাতে পেরেছে। তাদের তখন প্রধান টার্গেট ছিল আল্লাহর জমিনে তার বিধানের পূর্ণ বাস্তবায়ন। তাদের পুরো জীবনটাই যেন ছিল দাওয়াতে ইসলামের প্রোজ্জ্বল নমুনা। তাদের রাত কেটেছে প্রলম্বিত সিজদায়, রবের ভয়ে প্রকম্পিত কান্নায়। দিন কেটেছে মরুভূমির ভেতর তাজাদম ঘোড়ার পিঠে, খুনরাঙা চটচটে রণাঙ্গনে।

চীন থেকে ফ্রান্স পর্যন্ত সমস্ত দেশের বাসিন্দারা তখন মুসলিম খলিফাদের ট্যাক্স প্রদান করে বসবাস করত। খলিফাদের চরিত্রও ছিল মহৎ, পৃথিবীবাসীর কাছে অনুকরণীয় আদর্শ। তাদের যাপিত জীবনের তাহজিব-তামাদ্দুনের ছোঁয়ায় সভ্যতা-বিবর্জিত অন্ধকারাচ্ছন্ন ইউরোপ-আফ্রিকার সমস্ত অঞ্চলে উন্নতির জোয়ার উঠেছিল।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য তাদের থেকে শিখেছে বৈশ্বিক নিয়ম-নীতি। পৃথিবীর সব সম্প্রদায় তাদের সামনে ফলভর্তি গাছের ডালের মতো ঝুঁকে পড়ত বিনয়ে। তাদের সংস্পর্শেই মুখর হয়ে উঠেছিল উন্নতি ও অগ্রগতির প্রতিটি অঙ্গন।

কিন্তু একদিন, সেসব সোনালি দিনের অবসান ঘটেছে। মুখ থুবড়ে পড়েছে উম্মাহর ঊর্ধ্বগতির ধারা। কারণ, সময়ের ঘূর্ণনে আল্লাহ ও তার রাসুলের উষ্ণ ভালোবাসা স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। একদম শীতল, যেন-বা এক টুকরো বরফ, যে বরফের স্পর্শে মিইয়ে গেছে হৃদয়ের সমস্ত উত্তাপ, বেড়ে গেছে বস্তুপূজা, দুনিয়ার মহব্বত ও আয়েশি জীবনযাপনের লোভ বাসা বেঁধেছে বুকের ভেতর।

ধীরে-ধীরে পার্থিবতার মোহে এমনভাবে বাঁধা পড়ে গেছে তারা, অনন্ত আখেরাতের খানিক ভাবনাও আর থাকেনি। ফলে, প্রকাশ্য দিবালোকে চলতে লাগল আল্লাহর নাফরমানি। মৃত্যু বড়ই অপছন্দনীয় ব্যাপার হয়ে উঠল। আল্লাহর পথে মুষ্টিবদ্ধ দৃঢ়পদ মুজাহিদের সংখ্যা দিন-দিন কমে যেতে লাগল। এমনকি, ইসলামে জিহাদ বলে যে একটি ফরজ বিধান আছে, সে-কথাও ভুলে বসল বেমালুম। উম্মাহ ক্রমান্বয়ে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে থাকল। পিঁপড়ের জমাটবদ্ধ অবস্থানে একফোঁটা জল ফেললে যেমন দল ভেঙে ছুটতে থাকে এদিক-ওদিক, ঠিক তেমন। বেড়ে গেল পরনিন্দা, চোগলখোরি।

হিজরি চতুর্দশ শতকে ইসলামি খেলাফতের প্রাণকেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছিল। ব্যক্তিস্বার্থ-সর্বস্ব নতুন-নতুন স্বাধীন রাজ্যের, নতুন নতুন স্বাধীন শাসকের আবির্ভাব ঘটছিল। ফলে, আরও দ্রুততর হচ্ছিল উম্মাহর নিম্নগামিতার গতি।

ষষ্ঠ শতকের শেষদিকে মুসলিমবিশ্ব পারস্পরিক বিক্ষিপ্ততার চূড়ান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। বিপরীতে কাফের শাসকরা শুরু করেছিল মুসলিমবিশ্বকে টুকরো-টুকরো করে ফেলার গোপন পাঁয়তারা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার উম্মাহর 'ঐক্যবদ্ধতা' বোঝাতে গিয়ে চমৎকার একটি উপমা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, টুকরো-টুকরো ইট-সুড়কি নিয়ে যেভাবে গড়ে ওঠে একটি মজবুত সুরম্য প্রাসাদ, হে মুসলমান, তোমাদের সবল-দুর্বল প্রতিটি সদস্য মিলেও ঠিক তেমনই একটি জমাটবদ্ধ সঙ্ঘ, অজেয় এক ঐক্য।

কিন্তু ষষ্ঠ শতকে এসে এই সঙ্ঘবদ্ধ উম্মাহর বিধ্বস্ততার যাবতীয় কার্যকারণ সম্পূর্ণতা পেয়ে গেল। তখন কেবল ধপ করে ভূগর্ভে ধসে পড়বার অপেক্ষা।

কর্মফলের সেই অকাট্য বিধানের বাস্তবায়ন সকল জাতিগোষ্ঠীর জন্যই সমান। এজন্য শেষনবীর উম্মত তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও কামালিয়াতের পরও স্রষ্টার এই বিধানের বাইরে যেতে পারেনি। বনি ইসরাইলের মতো এই উম্মাহর ভেতরেও (ইসলামের শুরুর জামানা থেকে হাল আমল নাগাদ) দু-দুবার সেই কানুনে ইলাহির প্রকাশ ঘটেছে। বয়ে গেছে এমনকিছু আগ্রাসন, যা মুসলিমবিশ্বের কোমর পুরোপুরি দুমড়ে দিয়েছে। পুরো মুসলিমবিশ্ব বাঁচা-মরার টানাটানির ভেতর পড়ে গেছে।

তখন হিজরি ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগ, সপ্তম শতাব্দীর শুরু। মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে ঘটে গেল ভয়াবহ প্রথম দুর্ঘটনাটি। মুসলিমদের পর্বতপ্রমাণ আলস্যের

দরুন নেমে এল আল্লাহর নিয়মের এক শক্ত আঘাত। সেই আঘাতে যেন পিঠজুড়ে হয়ে গেল দগদগে ঘা, উঠে আর দাঁড়াতে পারছিল না অবস্থা।

শুরু হল মোঙ্গলিয়ার তাতার পিশাচদের নারকীয় আগ্রাসন, যা একদম ধুলোর সাথে মিশিয়ে দিয়েছিল পুরো মুসলিমবিশ্বের অস্তিত্ব। পৃথিবীর প্রায় অর্ধেকাংশ বিরান করে ফেলেছিল—যেন সারি-সারি পোড়োবাড়ি, সর্বত্র লেগে আছে ধ্বংস-চিহ্ন, মাঝেমাঝে ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে উঠছে ধোঁয়া, বোঝা যায়—এই ক'দিন আগেও এখানে ছিল মনুষ্যজাতির বসবাস।

তখনই দিগন্তে শেষ লালিমাটুকু ছড়িয়ে ডুবে গিয়েছিল আব্বাসি খেলাফতের সূর্য। এ ছিল ইসলামের ইতিহাসে ঘটে-যাওয়া প্রথম বিপর্যয়।

তারপর দ্বিতীয়টি হল পৃথিবীজুড়ে পাশ্চাত্য জাতির কর্তৃত্ব ও নগ্ন হস্তক্ষেপ। হিজরি দ্বাদশ শতকে (খ্রিষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে) মূলত এর শুরু।

এই সর্বগ্রাসী আগ্রাসন থেকে মুসলিমবিশ্বের কোনো অঞ্চলই বাঁচতে পারেনি। ফ্রান্স, ব্রিটেন, রাশিয়া ও আমেরিকা, কখনও বিচ্ছিন্নভাবে, কখনওবা একযোগে মুসলিমবিশ্বের গলায় দাসত্বের বেড়ি পরিয়েছে। পাশ্চাত্যের এই শক্ত থাবা মুসলিমবিশ্বের ভৌগোলিক মানচিত্রে যেমন পড়েছে, মুসলিমদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও মতাদর্শে তার চেয়ে প্রকটভাবে লেগেছে আঘাত।

আমাদের ভারত উপমহাদেশসহ সমস্ত মুসলিম সাম্রাজ্য দীর্ঘকাল ধরে ওদের গোলামির শেকল পরে আছে। ব্যক্তিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। অধিকসংখ্যক মুসলমান ধর্ম, মাজহাব, পূর্বসূরির ইলমের উত্তরাধিকার, জীবনধারা ও সভ্যতা-সংস্কৃতি—সবকিছু খুইয়ে ফেলেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ এদের কাছে হয়ে উঠেছে গর্বের বিষয়। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

মুসলমান হয়ে গেছে কাফের হামলাকারীদের গোলাম। খুইয়ে ফেলেছে রক্তের সেই পুরোনো উষ্ণতা ও জাতীয়-মর্যাদাবোধ। 'জিহাদ' শব্দ ও তার অন্তর্নিহিত অর্থ ভুলে গেছে বেমালুম। এ যেন চির অপরিচিত একটা শব্দ।

কাফেরদের এই কর্তৃত্ব এখনও পুরোপুরিভাবে বিরাজমান। বর্তমানে তা বরং আরও তুঙ্গে। আফগানিস্তান ও ইরাক ধ্বংসের পর এই শকুনদের চোখ পড়ল পাকিস্তানে। পবিত্র বাইতুল মুকাদ্দাস শতাব্দীকাল ধরে আজও তাদের কবজায়। আল্লাহর পবিত্র ঘর কাবা ও মসজিদে নববিও এদের সার্বক্ষণিক অবরোধের ভেতর রয়েছে! ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

একবিংশ শতাব্দী এখন।

প্রযুক্তির এ স্বর্ণযুগে বসে, মুসলিমবিশ্বে নেমে-আসা মোঙ্গলিয়ানদের সেই ভয়াবহ আগ্রাসন যদি একটু নিরিখ করে দেখি, আমাদের এই রক্তাক্ত বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয় যে, মোঙ্গলিয়ানদের সেই প্রবল ঝড়ে ছয়শ বছরের প্রাচীন

ইসলামি ঐতিহ্য তুলোর মতো উড়ে গিয়েছিল দিগ্বিদিক। মুসলিমদের শক্তি এতটাই লোপ পেয়েছিল যে, পৃথিবীতে তারা পরিণত হয়েছিল এক সংখ্যালঘু জাতিতে।

মুসলিমবিশ্বের পশ্চিমের শহরগুলো ছাড়া কোনো অঞ্চলই তাতার হামলার কবল থেকে রক্ষা পায়নি। তাতারদের কদম যেখানে পড়েনি, সেখানকার লোকজনও তাদের নাম শুনে ভয়ে কাঁপত রীতিমতো। সবার মধ্যে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, তাতাররা হুট করে যেকোনো সময় এসে পড়তে পারে, আজ না-হয় কাল, তারা ঠিকই আমাদের ধ্বংসস্তূপে পরিণত করবে, খেলবে রক্তের হোলি।

সেই দুর্দিনে, উম্মাহর যাবতীয় বিত্ত-বৈভব, আজিমুশশান সমস্ত মসজিদ-মাদরাসা, বিরল-দুর্লভ ও অনবদ্য গ্রন্থে ভরপুর সমস্ত ইসলামি কুতুবখানা এবং মারেফাতের অমৃত সুধার সুরক্ষিত রত্নভান্ডার দীনের সব খানকাহ—কোনো কিছুই বাদ পড়েনি, সেই ঝড়ের কবলে নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়েছিল সব। মুসলিমবিশ্বের মহান ইমাম, ফকিহ-মুহাদ্দিস ও সুফি, ধর্মবিশ্লেষক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক ও কবি-সাহিত্যিক সকলেই সেই সয়লাবের অভ্রভেদী ঢেউয়ের ভেতর তলিয়ে গিয়েছিলেন।

নামজাদা বাদশাহ, শাহজাদা, সিপাহসালার ও মুজাহিদ-কমান্ডাররা ছিলেন এই তুফানের প্রধান টার্গেট। হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ দুর্গ ও বসতিপূর্ণ শহর পৃথিবীর মানচিত্র থেকে একদম মুছে গিয়েছিল। দেড় কোটির মতো মানুষকে হত্যা করা হল। ভূগর্ভে বিলীন হয়ে গেল শত বছরের ঐতিহ্যবাহী বংশের পর বংশ, গোত্রের পর গোত্র। মাত্র কয়েক বছরে এমনভাবে পালটে গেল পৃথিবীর মানচিত্র, যা ধারণা করে ওঠাও দুঃসাধ্য।

ইতিহাসের এমনতরো হাজারও বিরানভূমি ও ধ্বংসস্তূপের বর্ণনা দেওয়ার পর শেষমেশ সে-যুগের এক ঐতিহাসিক একেবারে তব্দা খেয়ে যান। একথা লিখতে বাধ্য হন—এই দুর্ঘটনা এতই ভয়াবহ ছিল যে, ইতাহাস ঘাঁটতে গিয়ে বারবার আমার মস্তিষ্ক অনুভূতিহীন ও বিমূঢ় হয়ে পড়ছিল। কয়েক বছর নাগাদ এই দুর্যোগের কথা আমি উল্লেখই করতে চাইনি। এ নিয়ে আলাপ-আলোচনাও একদম পছন্দ হতো না আমার। এখনও সেই দ্বিধার ভেতরেই আছি—লিখব কি লিখব না। বলি, ইসলাম ও মুসলমানদের মৃত্যুর ঘোষণা দিতে কার-বা সাহস হয়! কে আছে, সেই ভয়াবহ দুর্যোগের কথা কলমের আঁচড়ে-আঁচড়ে লিখতে হিম্মত দেখায়!

হায়, আমার মা যদি আমাকে হারিয়ে ফেলতেন! দুর্যোগের পূর্বেই যদি মৃত্যু হয়ে যেত আমার! পৃথিবীর বুক থেকে আমি চিরকালের জন্য খসে যেতাম!

কিন্তু বন্ধুরা ধরে বসলেন। ইতিহাস লিখতে রাজি করালেন। তবু আমার মন ছিল দোদুল্যমান। একবার মনে হল, না-লেখাতেও তো বিশেষ কোনো ফায়দা নেই। এমন ভয়ানক বিপর্যয় ও বিপন্নতার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে আর মেলে না। এর একটি উপমা খুঁজতে অক্ষমতা প্রকাশ করবে বিগত সমস্ত দিনরাত।

পুরো পৃথিবীকে ছেয়ে ফেলেছিল এই বিপর্যয়ের ঘন কালো মেঘ। কিন্তু অন্য কাউকে না, বিশেষত শুধু মুসলমানদের। যদি কেউ দাবি করে, আদম আলাইহিস সালামের যুগ থেকে অদ্যাবধি পৃথিবীতে এমন মুসিবত আর আসেনি, তা নিশ্চিত সত্য। কারণ ইতিহাসে এই ঘটনার কাছাকাছি, কিংবা কাছাকাছি না-হলেও কোনোভাবে মিল রয়েছে, তেমন কোনো ঘটনা খুঁজে পাওয়া যায় না।

পৃথিবীর বড় বড় কিছু বিপর্যয়ের কথা লিখতে গিয়ে ইতিহাসবিদরা বলেন– বাইতুল মুকাদ্দাসে বনি ইসরাইলের উপর নেবুচাদনেজারের হত্যাকাণ্ড একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তবু সেটাকে নিতান্ত সাধারণই বলা যায়। কারণ, বাইতুল মুকাদ্দাসের হত্যাকাণ্ড সপ্তম শতকের মুসলিম সাম্রাজ্যগুলির হত্যাযজ্ঞের তুলনায় কিছুই না, হতভাগা তাতাররা ধ্বংস করে দিয়েছিল যেগুলো। প্রত্যেকটি শহরই বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে কয়েক গুণ বড় ছিল। এমনকি, তাতারদের হাতে যারা মারা গেছে, বনি ইসরাইলের নিহতদের সংখ্যা তাদের তুলনায় অত্যল্প। শুধু একেকটি শহরের নিহতের সংখ্যাই বনি ইসরাইলের নিহতদের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি ছিল। হয়তো পৃথিবীবাসী মহাপ্রলয় পর্যন্ত এ বিপর্যয়ের অনুরূপ কিছু আর দেখে উঠবে না কখনও; কেয়ামতপূর্ব ইয়াজুজ-মাজুজের ধ্বংসলীলা ব্যতীত। কারণ, ইয়াজুজ-মাজুজের তাণ্ডব হবে আরও ভয়াবহ।

বাকি আছে দাজ্জাল। সেও তো যখন আসবে, তার অনুসারীদের জীবিত ছেড়ে দেবে, শুধু অস্বীকারকারীদের হত্যা করবে। কিন্তু হিংস্র তাতাররা তো কাউকেই জীবিত রাখেনি। সম্মুখে যাকেই পেয়েছে, ধ্বংস করে দিয়েছে। নারী-পুরুষ থেকে নিয়ে ছোট ছোট বাচ্চা পর্যন্ত সবাইকে হত্যা করে ফেলেছে। এমনকি, গর্ভবতী নারীদের পেট কেটে অপুষ্ট-অপরিণত ভ্রূণ বের করে ধারালো ছুরি দিয়ে জবাই করে ফেলেছে।

ইন্না লিল্লাহি ও ইন্না ইলাইহি রাজিউন। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

সে ছিল এমন এক ভয়াবহ ফেতনা, যার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উড়ে গিয়েছিল পৃথিবীর আনাচ-কানাচে। শহরগুলোর উপর দিয়ে গম্ভীর হাঁকডাকপূর্ণ মেঘপুঞ্জের মতো বয়ে গিয়েছিল।[১০]

তাতার হামলার সময় পর্যটক ইয়াকুত হামাবি খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের মার্ভ শহরে অবস্থান করছিলেন। সে-সময়কার ধ্বংসচিত্রগুলো বড় বেদনাপূর্ণ ভাষায় ছোট্ট একটি পত্রে তুলে ধরেছেন তিনি। লিখেছেন, 'খাওয়ারিজমের এই সবুজ-শ্যামল-নিরাপদ শহরগুলোতে আল্লাহর অবাধ্য একদল হিংস্র পশু ঢুকে পড়েছে। এখানে এখন শাসন চলছে দুশমনদের। এরা সমস্ত পাড়া-মহল্লা মানচিত্র থেকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে, যেভাবে পত্র থেকে মুছে ফেলা হয় ভুল হরফ।

---

[১০] তারিখুল কামিল লি ইবনিল আসির, ৭/৫৭০

রাজ্যের সর্বত্র পড়ে রয়েছে অজস্র মরদেহ। বাতাসে ভাসছে পচা লাশের গন্ধ। লাশের উপর উড়ে উড়ে কাক-শকুনের পাল নামছে একের পর এক। এখানে কেবল ভল্লুকের গা-ছমছমে আওয়াজ শোনা যায় এখন। রাজ্যের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে লু-হাওয়ার প্রচণ্ড ঘূর্ণি। কী ভয়াবহ, কী নির্মম!

আমরা দেখছি, ধ্বংসপ্রাপ্ত কাউকে কেউ-একজন সমবেদনা জানাতে গেছে, আর কী আশ্চর্য, কাছে গিয়ে ওই সমব্যথী লোকটিও নাক-মুখ কুঁচকে হিংস্র হয়ে উঠছে। ভয়ানক মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে এ রাজ্য।

এই নারকীয় তাণ্ডবলীলায় ইবলিসও হয়তো আজ গাইছে মর্সিয়া-গীতি :

كأن لم يكن فيها اوانس كالدمى❁واقيال ملكٍ فى بسالتهم اسد

فمن حاتم فى جوده وابن مامة ❁ومن احنف ان عد حلم ومن سعد

تداعى بهم صرف الزمان فأصبحوا ❁لنا عبرة تدمى الحشا و لمن بعد

এখানে মূর্তির মতো নিটোল-মায়াবী নারীকুল আর দুঃসাহসী রাজা-বাদশাহরা কখনোই যেন বসবাস করেননি। আজ দানশীলতায় হাতেম তাই ও ইবনে উমামার সেই মহান কর্ম কে আঞ্জাম দেবে, বলো? সহনশীলতা ও সংবেদনশীলতায় আহনাফ আর সাআদ হবে কে? যুগ-বদলের হাওয়া তাদের এমনভাবে উড়িয়ে নিয়ে গেছে, আমাদের ও পরবর্তীদের জন্য তারা হয়েছে স্রেফ মিথে পরিণত। এ বড় ব্যথাজাগানিয়া উপাখ্যান, যা কলিজা বিদীর্ণ করে দেয়।

সে-যুগের এক সাহিত্যিক তাতারদের আগ্রাসন দেখে বলেছিলেন,

آمدند و گدند و سوختند و بردند و رفتند

ওরা এল, ধ্বংস করল, জ্বালিয়ে গেল, লুটে নিল, তারপর ছুটে গেল।

তার এই বাক্যটি প্রবাদের মতো মানুষের মুখে মুখে ফিরত। এই একটি বাক্যে তাতার-আগ্রাসনের পুরো দাস্তান লুকিয়ে আছে।

তাতার হামলার ব্যাপক প্রসিদ্ধি : উত্থাপিত একটি প্রশ্ন

মুসলিমবিশ্বের এই বিপর্যয়ের কথা পুরো পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। এমনকি, যে কখনও ওলটায়নি ইতিহাসের পাতা, ইতিহাসপাঠের সাথে সামান্য সম্পর্কও নেই যার, সেও এই তাতার হামলার কাহিনি কখনও-না-কখনও শুনেছে।

এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, চেঙ্গিজ খান ও হালাকু খানের নাম শোনামাত্র যার চোখে ভয়াবহ রক্তপাত ও ধ্বংসযজ্ঞের একটি চিত্র ভেসে ওঠে না। এই নির্দয়-পাষণ্ড হিংস্র পশুগুলি মুসলিম উম্মাহর ভেতর এমন ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল, যার শোহরত একদম তাওয়াতুর বা নিশ্চিত সত্যের পর্যায়ে চলে গেছে।

প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত এই পাশবিকতা ও হিংস্রতার নগ্ন উপাখ্যান মুসলিমদের বড় দুঃখী করে তোলে। ভাবতেই যেন ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে মন। এক্ষেত্রে ইতিহাসের গভীর-মনস্ক পাঠকদের মনে খচখচ করে একটি প্রশ্ন। আচ্ছা, এই ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে পারেননি কোনো মুসলিম মর্দে মুজাহিদ? সেই নাজুক পরিস্থিতিতে, রাসুলের কোনো উম্মত الجهاد ماض الى يوم القيامة (জিহাদ জারি থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত) এর প্রোজ্জ্বল নমুনা হয়ে নেমে আসেননি মুষ্টিবদ্ধ লড়াইয়ে?

ইতিহাসের সাধারণ একজন পাঠকেরও উত্তর মেলে—না, কেউ পারেননি।

এর কারণ, এ-বিষয়ক অল্পকিছু গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ ব্যতীত বাকিসব লেখা হয়েছে পরবর্তী জামানায়। এবং খানিকটা থ্রিলারধর্মী হওয়ার কারণে পাঠকদের ব্যাপক সমাদর কুড়িয়েছে।

সেই গ্রন্থগুলোতে, তাতারদের ৪২ বছরব্যাপী আক্রমণের বিরুদ্ধে সুবিন্যস্ত কোনো জিহাদি অগ্রযাত্রার কথা উঠে আসেনি। সাধারণ পাঠকেরা গ্রন্থগুলো এমন প্রতিক্রিয়া নিয়ে পড়ে ওঠেন যে, ৬৫৮ হিজরিতে আইনজালুত শহরের প্রসিদ্ধ যুদ্ধের পূর্বে তাতাররা আর কখনোই পরাজয়ের মুখ দেখেনি। ইতিহাসের এই অগভীর-বিলুপ্ত-বিকৃত ঘটনাবলি যদি কেউ পড়ে ওঠে, মুসলিমদের দুর্বলতা, পরাজয় ও বিপন্নতার একটি ছবি স্বাভাবিকভাবেই মূর্ত হয়ে ওঠে তার মনের আয়নায়। এবং একপ্রকার হীনম্মন্যতাবোধের সৃষ্টি হয় ভেতরে-ভেতরে। মূলত, ইসলামের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সব দুশমন মুসলিমদের ভেতর সূক্ষ্মভাবে এই অনুভূতিরই সঞ্চার ঘটাতে চায় সবসময়।

মুসলিম শাসকদের গাফলতি : সুলতান জালালুদ্দীনের অবদান

কোনো সন্দেহ নেই, সেকালের অনেক রাজ্যের বাদশাহ দুশমনের আক্রমণের মুখে অসহায়ভাবে নিজেদের সঁপে দিয়েছিলেন। নিজেদের গলায় নিজেরাই পরিয়েছিলেন অপদার্থতার লাগাম। জিহাদি জজবা ভুলে মুসলমান তখন চুপচাপ সেই হত্যাযজ্ঞের তামাশা দেখেছে। দরদি আলেমদের রচনাবলি আজও মুসলিম শাসকদের এই অযোগ্যতার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

শায়েখ নাজমুদ্দীন রাজি রহ. সে-যুগের এক মহান বুজুর্গ। তার অনবদ্য গ্রন্থ মিরসাদুল ইবাদের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, 'এই অভিশপ্ত তাতাররা মুসলিমদের যে ভয়ানক ফেতনায় ফেলেছিল, সেসব ধারণ করার মতো কোনো শব্দ আমার কলমে ফুটবে না। ইসলাম ও মুসলমানদের হেফাজতের দায়িত্ব প্রধানত আমাদের শাসকদের। বর্ণিত হয়েছে,

الامير راع على رعيته وهو مسؤول عنهم

আমির তার প্রজাদের নিরাপত্তাবিধান করবে। প্রজাদের অধিকার সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

আল্লাহ না করুক, এখনও যদি মুসলিমদের ভেতর ধর্মীয় আত্মমর্যাদাবোধ ও প্রতিরোধের চিন্তা না-জাগে, দীনি সাহসিকতাশূন্য থাকে তাদের অন্তর, এখনও যদি দৃঢ়ভাবে সবাই সঙ্ঘবদ্ধ না-হয়, اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا (হালকা হোক বা ভারী, সর্বাবস্থায় নিজেদের প্রাণ ও সম্পদ নিয়ে জিহাদে বের হও) আয়াতের হুকুম বাস্তবায়নে কোমর কষে নেমে না-পড়ে, এই ফেতনার মূলোৎপাটনে জান-মাল ও বাদশাহি যদি জলাঞ্জলি না-দেয়, তবে খুব স্পষ্ট যে, ইসলামের অস্তিত্ব হয়তো কিছুদিনের ভেতর মুছে যাবে পুরোপুরি। এ ফেতনার কালো-কুৎসিত-বীভৎস ছায়া ইতোমধ্যে অধিকাংশ মুসলিম সাম্রাজ্যকে ছেয়ে ফেলেছে। খুব শিগগির হয়তো অন্য ইসলামি এলাকাগুলোও চলে আসবে এর থাবার ভেতর। পরিশেষে কুফর-শিরকে ভরে যাবে পুরো পৃথিবী। নাউযুবিল্লাহ! মন বড় শঙ্কিত হয়ে ওঠে—যেটুকু ইসলাম এখনও আছে, মুসলিমদের পাপাচারিতার কারণে তা-ও হয়তো পৃথিবী থেকে উঠে যাবে। বাকি থাকবে না শেষ কোনো চিহ্নও।'

এরকম অনেক ঐকিহাসিক মুসলিম শাসকদের ভয়াবহ গাফলতির কথা লিখতে গিয়ে আফসোস প্রকাশ করেছেন।

তবু তো আশার আলো জ্বেলে কেউ-না-কেউ আসেন। চারপাশে আলো ছড়াতে ভালোবাসেন। ভীরুতা, কাপুরষতা, হীনম্মন্যতা, স্বার্থপরতা, আরামপ্রিয়তা ও অপরিণামদর্শিতার রোগে আক্রান্ত সেই শাসকদের মধ্য থেকে উঠে এসেছিলেন তেমনই এক দুর্দমনীয়-দুঃসাহসী স্বপ্নপুরুষ, ধর্মের যাবতীয় ফরজ বিধান পালনের পাশাপাশি জিহাদের জজবায় ভরপুর অনন্য এক ব্যক্তিত্ব।

তিনি পৃথিবীজোড়া এই ফেতনার করালগ্রাস হতে মুসলিমবিশ্বের প্রতিরক্ষার গুরুভার কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। একদম একা, তার পাশে ছিল না কেউ। মুসলিম শাসকদের পদস্খলনের কাফফারা আদায়ের জন্য, জীবন বাজি রেখে জিহাদের ফরজ বিধান পালনে যথাসম্ভব ভূমিকা রেখেছিলেন। ইতিহাসের সেই বিস্ময়পুরুষের নাম সুলতান জালালুদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহ আল-মুনকাবিরাতি। চরম হতাশাপূর্ণ ও গ্লানিময় সেসব দিনে আশার নতুন প্রদীপশিখা হয়ে জ্বলে উঠেছিলেন তিনি। হিংস্রতা ও পাশবিকতার প্রচণ্ড ঝড়ে তখনকার সব অন্ধ শাসকের ভেতর তিনিই একমাত্র প্রজ্ঞাদীপ্ত ব্যক্তিত্ব, ইসলামের প্রতিরক্ষায় যিনি ব্যয় করেছিলেন যাবতীয় শক্তি ও সামর্থ্য।

ইতিহাসের প্রকৃত অবস্থান থেকে বঞ্চনা

চিন্তার গণ্ডি একটু প্রশস্ত করুন। নিরপেক্ষ মনে ইতিহাসের গভীর পাঠ নিয়ে উঠুন। বিশেষত, এ বিষয়ের দুর্লভ-প্রাচীন গ্রন্থগুলো পড়ে ফেলুন। তারপর সামনে রাখুন এই বিশ্বব্যাপী রক্তপাতের প্রাথমিক পটভূমিগুলো, দেখবেন, আপনার সামনে এমন বাস্তবতা প্রকাশ পেয়েছে যে, সে-সময় সুলতান জালালুদ্দীনই ছিলেন সেই লৌহমানব, চেঙ্গিজীয় হিংস্রতার মুখে যিনি সিকান্দার বাদশাহর অনতিক্রমণীয়

মহাপ্রাচীরের ভূমিকা পালন করেছিলেন। যতক্ষণ তার ধমনীতে ছিল রক্তের উদ্দাম স্রোত, ফেতনার প্রবল প্রবাহকে একটুও সামনে বাড়তে দেননি। তার শক্ত আঘাতে বিশ্ববিজেতা চেঙ্গিজ খানের সকল প্রতারণা ও পরিকল্পনা ধুলোয় মিশে গিয়েছিল।

তখন হিজরি ৬১৮ সাল। সুলতান জালালুদ্দীন শুধু এই একটি বছরেই চেঙ্গিজীয় সেনাদের পরপর কয়েকটি রণাঙ্গনে পরাজিত করেছিলেন। যদি স্বজাতীয় গাদ্দারদের আবির্ভাব না-ঘটত, তা হলে জীবৎকালেই তিনি এই নৃশংস কাফেরদের একদম তছনছ করে ফেলতে পারতেন।

কিন্তু আফসোস! শত আফসোস, উম্মাহর দুর্বলতা ও গাদ্দারিই তার পতন ডেকে এনেছিল। তবু নিঃসঙ্গ এক লড়াকু হিসেবে তিনি যুদ্ধ করে গেছেন আমরণ।

জীবৎকালে সুলতান জালালুদ্দীনের সাথে যে অন্যায় করা হয়েছে, তার শাহাদাতের পরেও সেই ধারা অব্যাহত ছিল। তার সকল মেহনত-মুজাহাদা ও জীবনোৎসর্গের কথা চক্রান্ত করে পরবর্তীদের একরকম ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

অপরদিকে কথার ফেরিওয়ালারা একদম ঊর্ধ্বাকাশে পৌঁছে দিয়েছিল চেঙ্গিজ খানের শোহরত। চেঙ্গিজ খানের বিরুদ্ধে সুলতান জালালুদ্দীনের নেতৃত্বে মহান মর্দে মুজাহিদরা যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন, তাতে বিস্মৃতির প্রলেপ জড়িয়ে রেখেছিল তারা। উদ্দেশ্য ছিল মুসলিমদের রক্তের ভেতর যে ঘাপটি মেরে আছে অসামান্য দুঃসাহসিকতা, তা যেন মুসলিমরা নিজেরা বুঝে উঠতে না পারে।

চেঙ্গিজ খানের জুলুম-নির্যাতনের আলোচনা ভয়াবহভাবে লোকমুখে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু যেসব রণাঙ্গনে তাতাররা বরণ করেছিল পরাজয়ের গ্লানি, খুব চতুরতার সঙ্গে লোকদের তা ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। কাজটা করছিল তাতারদের ছত্রছায়ায় বেড়ে-ওঠা কিছু ঐতিহাসিক।

চেঙ্গিজ খান ও হালাকু খানের জীবনীভিত্তিক অনেক বই লেখা হয়েছে। সেসবে এমন একপেশে ভাষাভঙ্গি নিয়ে তাদের নিষ্ঠুর রক্তপাতের কথা বলা হয়েছে—পাতায় পাতায় কেবল তাতারদের দুর্দমনীয় ব্যক্তিত্বই ফুটে উঠেছে। ফলে পাঠকমনে অজান্তেই তাদের প্রতি একটা ভয় কিংবা সমীহভাব জেগে ওঠে।

অথচ বিপরীতে যে মুসলিম মর্দে মুজাহিদরা মানবতার চিরশত্রু এই নরপশুদের মোকাবেলায় মাথায় কাফন বেঁধে যুদ্ধে নেমেছিলেন, তাদের প্রকৃত ব্যক্তিত্ব ঐতিহাসিকরা লিখে যাননি। কেমন যেন পাশ কাটিয়ে গেছেন। যেন-বা এরা নিতান্ত দুর্বল ও অসহায় মানুষ, উল্লেখযোগ্য কোনো ইতিহাসই এদের নেই। আবার ইনিয়ে-বিনিয়ে সুলতান জালালুদ্দীনের প্রাণান্তকর কোরবানি-মুজাহাদার ভুল ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। কালো কালির ফেরিওয়ালারা তাকে এমন এক অবস্থানে রেখেছেন—পুরো বইজুড়ে শুধু চেঙ্গিজের আলোচনা, হঠাৎ কখনও দুয়েক কথায় টুক করে বলে দিয়েছেন, ওখানে অমুক ছিলেন চেঙ্গিজের বিরোধী! সুলতান জালালুদ্দীনের অসামান্য জীবনচরিত ও কীর্তিমালা যে বিস্তৃত পরিসরে ব্যাখ্যাসাপেক্ষ বিষয়, সে-প্রয়োজন বোধ করে ওঠেননি কেউ।

ইতিহাসে সঠিক অবস্থান না-পাওয়ার কারণ

ইতিহাসে সুলতান জালালুদ্দীন রহ. তার ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী মর্যাদার আসন লাভ করতে পারেননি। এর কারণ কী হতে পারে? এই বই লেখার সময় বারবার এই প্রশ্ন আমাকে অস্থির করে তুলেছে। ইতিহাসের নতুন-পুরোনো সব উৎসগ্রন্থে ফিরে গেছি এই প্রশ্নের উত্তরের আশায়। গভীর-বিস্তৃত কিছু নিরীক্ষা চালিয়েছি। তারপর খুঁজে পেয়েছি নিম্নবর্ণিত কয়েকটা কারণ।

এ এক ঐতিহাসিক বাস্তবতা যে, জগতে সাধারণ থেকেও সাধারণ স্তরের মহৎ কাজ করেন এমন লোকের সংখ্যা অনেক। কালের আবর্তনে তারা কিন্তু হারিয়ে যান। কেউ মনে রাখে না তাদের। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় পাকাপোক্ত স্থায়ী অধিষ্ঠান তারাই গড়ে নিতে পেরেছেন, শুভানুধ্যায়ী ও প্রশংসাকারীরা যাঁদের আলোচনা জিইয়ে রাখতে কলম তুলে নিয়েছে, চেষ্টা করেছে আপ্রাণ।

সুলতান জালালুদ্দীনের প্রকৃত মর্যাদা ও অবস্থান না-পাওয়ার কারণসমূহ এখানে উল্লেখ করা হল।

১. তার কোনো শুভানুধ্যায়ী ছিল না। ইতিহাসে তেমন কাউকেই খুঁজে পাওয়া যায় না। তাতাররা এমন ভয়ানকভাবে খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যকে দুমড়ে দিয়েছিল, ওখানকার দীনি মকতব-মাদরাসাগুলো হয়ে গেছিল পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন। ফকিহ-মুহাদ্দিস-মুফাসসির-ঐতিহাসিক ও কবি-সাহিত্যিকদের বিরাট একটি দল অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছিল। কেউ যদিও কোনোভাবে বেঁচে যেতে পেরেছিলেন, কিন্তু বাকি জীবন স্বাধীনভাবে বাঁচতে পারেননি। তাতারদের হাতে অপমানকর বন্দিজীবন কাটিয়েছিলেন। অনেকে আবার গোপনে হিজরত করে চলে গিয়েছিলেন দূরদূরান্তের বিভিন্ন এলাকায়। সেখানেও বুকভরা নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচতে পারেননি। একাকী গোপন বদ্ধ কুঠুরিতে কোনোভাবে জীবন কাটিয়ে গেছেন। এরকম নাজুক যখন পরিস্থিতি, তখন এমন কারুর দেখা মেলা ছিল দুঃসাধ্য, যিনি খুব কাছ থেকে সুলতান জালালুদ্দীনের পুরো জীবন দেখে থাকবেন। হবেন তার সুখ-দুঃখের সার্বক্ষণিক বন্ধু। কীভাবে এসেছে তার প্রতিটি ভোর, কেমন কেটেছে সব সকাল-সন্ধ্যা, দেখবেন খোলা চোখে। এবং পরবর্তীকালে এ সবকিছু বলে যাবেন ইতিহাসের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে।

শুধু তার একজন বিশ্বস্ত সহচর, মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ নাসাবি, এই দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছিলেন যৎসামান্য। তিনি 'সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন মুনকাবিরাতি' শিরোনামে একটি বই লিখেছিলেন। সেই দুর্যোগের কালে এটুকু কাজ সম্পন্ন হওয়াও বিশাল গনিমতের ব্যাপার। তিনি যদি সুলতানের জীবনকথা লিখে না যেতেন, পরবর্তীকালে এ বিষয়ে কাজ করা কঠিনই হতো না শুধু, বরং রীতিমতো অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত। ভাগ্য ভালো, তিনি একটা পথ তৈরি করে গিয়েছিলেন।



কিন্তু এই বইয়ের ভেতর সুলতানের অসামান্য ব্যক্তিত্ব, অনির্বচনীয় কৃতিত্ব সবটুকু তেমনভাবে ফোটেনি। কারণ, তাতার-আগ্রাসনের পটভূমিগুলো, সুলতানের জীবনবৃত্তান্তের গোপনীয় সব অধ্যায়ের বিস্তৃত পর্যালোচনা ও তার খানদানি হালচালের কিছুই তাতে লেখা হয়নি।

২. সুলতানের জীবনী নিয়ে যথাযথ মেহনত না-হওয়ার একটি বড় কারণ রাষ্ট্রীয় ও গোষ্ঠীভিত্তিক স্বজনপ্রীতি। ইতিপূর্বে বলেছি, সুলতানের স্বদেশি কিংবা স্বগোত্রীয় কেউ তাকে নিয়ে দু-কলম লিখবার প্রয়াসই পায়নি। অন্য সাম্রাজ্যের জীবনীকাররাও এগিয়ে আসেনি লিখতে। কারণ এই সাম্প্রদায়িক মনোভাব (আগের তুলনায় এ যুগে এই ব্যাধি আরও প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে)।

অথচ, এ শ্রেণির লেখকদের একটি দল নিজ দেশের নিতান্ত সাধারণ কোনো মহৎ লোককেও ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ আসনে নিয়ে গেছে। প্রশংসা-বচনে কালো করে ফেলেছে পাতার পর পাতা। কিন্তু সুলতান জালালুদ্দীনের অসামান্য ব্যক্তিত্বের কথা সজ্ঞানে গোপন করে গেছে তারা। স্বদেশি না হোন, মুসলিম হওয়ার সুবাদে তিনি তো তাদের কাওমি ও দীনি ভাই ছিলেন!

আরে, তিনি তো হাজার মাইল বিস্তৃত মুসলিমসাম্রাজ্যের সব সীমান্ত এলাকায় প্রহরা বসিয়েছিলেন। প্রতিরোধ করেছিলেন কুফরিশক্তির বিশ্বব্যাপী আক্রমণ।

এ বড় নির্মম বাস্তবতা যে, স্বগোত্রীয় ঐতিহাসিকরা যেসব ব্যক্তিত্বকে আপন ভেবেছে, তাদের অতি সাধারণ একটি কাজকেও বড় করে ফুটিয়ে তুলেছে তারা। তাদের চেষ্টা-মুজাহাদা ও কোরবানির প্রতি ভিন্ন লোকে নাক সিঁটকালেও গোত্রীয় লোকজন ঠিকই পরম মমতায় তা ধরে রেখেছে। প্রশংসার ফুলঝুরি ছুটিয়ে ইতিহাসে করে তুলেছে দারুণ ঈর্ষার পাত্র। সাহিত্যিকরা তাদের নিয়ে লিখতে গিয়ে পাতায় পাতায় উপুড় করে ঢেলে দিয়েছেন আবেগের ভরা কলস। কবিরা রচনা করেছেন অনন্য-অনুপম সব কাসিদা। দার্শনিকেরা তাদের প্রতিটি উক্তিকে প্রজ্ঞাময় মণিমুক্তা ভেবে আগলে রেখেছেন নিজেদের ভেতর। সাধারণেরা তাদের ভেবে নিয়েছিল পরম আপনজন। ইতিহাসে এঁদের নাম বাঁচিয়ে রাখার ব্যাপারে ভরপুর কোশেশ করেছে সবাই। নেপোলিয়ান ও হিটলারের মতো অত্যাচারী শাসকদের নাম এখনও জীবন্ত। কারণ, স্বজাতি তাদের পরম বন্ধু ও পথপ্রদর্শক ভেবে নিয়েছিল এবং ইতিহাসে তাদের নাম জাগ্রত রাখতে পূর্ণ চেষ্টাও করেছিল।

মানুষের জীবন পরিচালিত হয় মূলত স্বদেশের কীর্তিমানদের অনুকরণে। যদিও সে-রাষ্ট্রেই এমন অনেক লোক থাকে, যাদের ভেতর সম্ভাবনাময় একটি প্রোজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব প্রোথিত রয়েছে। তারা ভেতরের ঘাপটি মেরে-থাকা এই ব্যক্তিত্বটাকে নিজেরাই অবহেলা করে। শিকার হয় অন্ধভাবে অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বের মগজ-ধোলাইয়ের। ফলে একসময় তারা কালের গহীন গর্ভে হারিয়ে যায়।

সে যা হোক, সুলতান জালালুদ্দীন সেই মজলুম জননেতাদের একজন, যাঁদের কখনও কদর করেনি স্বজাতি, যারা আঞ্চলিক ও বংশভিত্তিক স্বজনপ্রীতির শিকার হয়েছেন। সুলতানের এই জীবনচিত্রের আরেকটি দৃশ্য ভারতবর্ষের লিখিত ইতিহাসেও আমরা দেখতে পাই। তিনি একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত উপমহাদেশের বিস্তৃত অঞ্চল—ঝিলাম নদীর তীর থেকে সিন্ধু উপত্যকা পর্যন্ত—রাজত্ব করেছেন। ভারতবর্ষের সে-সময়কার এক মহান প্রতিরক্ষাকারী ছিলেন তিনি। তাতার-বাহিনীকে এদিকে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ দেননি। তার ন্যায়বিচার ও প্রজাবৎসল আচরণ দৃষ্টান্তে পরিণত হয়েছিল।

তা সত্ত্বেও হিন্দুস্থানের ইতিহাসবিষয়ক গ্রন্থপঞ্জির ভেতর তাকে নিয়ে মাত্র দু-তিন লাইনের দেখা মেলে। তাও আবার সুলতান ইলতুৎমিশের জীবনেতিবৃত্তের প্রাসঙ্গিক আলোচনায়। অনেকে তো লিখেছেন, হিন্দুস্থানের বিজয় ও রাজত্বে সুলতান জালালুদ্দীনের নিজস্ব কোনো ভূমিকা ছিল না। তিনি যে কয়েক রণাঙ্গনে হিন্দু রাজাদের পরাজিত করেছিলেন, তা জিহাদ ছিল না।

এ নিতান্ত জুলুম ছাড়া কিছু নয়। ভারতবর্ষের অধিকাংশ ঐতিহাসিক তাকে একজন আওয়ারা ও পলাতক সিপাহি বলে পাঠকদের কাছে উপস্থাপন করেছেন। তিনি নাকি পালিয়ে হিন্দুস্থানে এসে, কিছুদিন এখানে অবস্থান করে ফের চলে গিয়েছিলেন।

বিপরীতে উপমহাদেশের অনেক রাজা-বাদশাহ—সুলতান জালালুদ্দীনের অসামান্য কীর্তিমালার তুলনায় যাদের শাসনকার্য উল্লেখযোগ্য কিছুই নয়—সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিপূর্ণ ঐতিহাসিকদের কলমে ইতিহাসের একটা বড় পরিসর দখল করে আছেন। এটাকে আপনি আঞ্চলিক কিংবা গোত্রীয় স্বজনপ্রীতি না-বলে আর কী বলবেন?

৩. আরেকটি কারণ হল, সুলতানের জীবনকথায় যেসব ঐতিহাসিক কমবেশি কিছু লিখেছেন, সেগুলো অসম্পূর্ণ। কারও কলমেই উঠে আসেনি অনুপুঙ্খ বর্ণনা। তার কীর্তিকথা তারা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেননি। জায়গায় জায়গায় বিভিন্ন আপত্তি জুড়ে দিয়েছেন তার উপর। যদিও যুক্তিবিবর্জিত অধিকাংশ আপত্তি।

ইতিহাসবিদদের এমন কর্মপন্থার কারণ কী, কেন এমন করেছেন, সে-কথা সামনে বলব। চলুন, আগে তখনকার ইতিহাসবিদদের দুটো প্রকার জেনে নিই।

ক. কিছু ইতিহাসবিদ ছিলেন তাতারদের মদদপুষ্ট, তাতারদের দ্বারা প্রভাবিত।

খ. আরেকদল ইতিহাসবিদ সেই সাম্রাজ্যগুলোর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, সুলতান জালালুদ্দীন ছিলেন যেসব এলাকার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী।

মনে রাখবেন, সুলতানের আলোচনা যারা লিখেছেন, তারা এই দু-প্রকারের বাইরে কেউ নন।

তাতারদের আনুকূল্যপ্রাপ্ত ইতিহাসবিদরা সুলতান জালালুদ্দীনের প্রশংসায় কিছু লিখবে না, স্পষ্টভাবে বয়ান করবে না তার কৃতিত্ব—এ তো জানা কথা। তারা ছিল তাতারদের একদম করতলের ভেতর। তাতার-শাসিত হয়েও তাদের দুশমনের প্রশংসায় যদি এরা পঞ্চমুখ হয়, তা হলে তাতাররা এদের রচনাপত্র পুড়িয়ে ফেলবে না, তাদের কল্লা উড়িয়ে দেবে না তা কেমন করে হয়?

মধ্য-এশিয়া, খোরাসান, ইরান, ইরাক প্রভৃতি অঞ্চল তখন তাতারদের বিভিন্ন শাসকের অধীনে ছিল। যদিও তাতারদের পরবর্তী প্রজন্ম মুসলমান হয়েছিল, তবু একধরনের বংশীয় ডাঁট ও আত্মগর্ব রয়ে গেছিল তাদের মধ্যেও। খানদানি রক্তপাত ও অপ্রতিরোধ্য হত্যাযজ্ঞের কথা মনে হলে গর্বে তাদের বুক ফুলে উঠত।

তাতারি বংশোদ্ভূত মুসলিম-অমুসলিম শাসকদের এহেন প্রতিপত্তি ও আত্মগরিমা পরবর্তী কয়েক প্রজন্ম পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। প্রথম প্রকার ঐতিহাসিকদের অনেক গ্রন্থই এই অবস্থার ভেতর বসে লেখা। এজন্য তারা এমন এক ভাষাভঙ্গি বেছে নিয়েছিল, যাতে সুলতান জালালুদ্দীনের জীবনকথাও এসে গেছে টুকটাক (প্রাসঙ্গিকভাবে হলেও), আবার তাতার সম্রাটদের মনেও এদের বিশ্বস্ততা কিংবা অনুগামিতার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ জাগেনি। সাপও মরল, লাঠিও ভাঙল না—অবস্থা।

আতা মালিক জুয়াইনি রচিত তারিখে জাহাঁকুশা গ্রন্থটি এর স্পষ্ট উদাহরণ। এটি মূলত চেঙ্গিজ খানের জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে লেখা। জাহাঁকুশা (বিশ্ববিজেতা) বলে চেঙ্গিজ খানকেই সম্বোধন করা হয়েছে। তবে এই বইতে প্রাসঙ্গিকভাবে সুলতান আলাউদ্দীন মুহাম্মদ ও সুলতান জালালুদ্দীন মুহাম্মদের কথাও এসে গেছে।

এরকম রচনাগুলোতে লেখকদের একটা গোপন অভিপ্রায় ছিল। তা হল, মহান মুসলিম সম্রাটদের কিছু-না-কিছু অবস্থাও যেন পৌঁছে যায় পরবর্তীদের কাছে। কারণ, তাতারদের তরবারির ছায়ায় বসে তাদের প্রতিপক্ষ সম্রাটদের নিয়ে স্বাধীনভাবে কিছু লেখা অসম্ভব ছিল। একারণে ঐতিহাসিকদের লেখায় সুলতান জালালুদ্দীন সম্পর্কিত অনুচিত কিছু কথামালাও পরিলক্ষিত হতে পারে। তবে তা এদের অপারগতা ও দুর্বলতার কারণেই ঘটেছে।

আপনি নিকট-অতীতে যদি এরকম কোনো ঘটনা দেখতে চান, মাওলানা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহির জীবনীভিত্তিক গ্রন্থ তাযকিরাতুর রশিদ হাতে নিন। গাঙ্গুহি হজরতের এক ইজাজতপ্রাপ্ত খলিফা মাওলানা আশেক ইলাহি মিরাঠি লিখেছেন সেটি। আস্তে করে পাতা ওলটান, ৭৩-৭৯ পৃষ্ঠা নাগাদ পড়ুন। সেখানে, গাঙ্গুহি হজরত ইংরেজদের বিরুদ্ধে যে জিহাদ করেছিলেন, তা এমন শব্দবন্ধে ধরা হয়েছে, যা দু-দিকের অর্থের সম্ভাবনা রাখে। নির্দিষ্টভাবে কোনো একপ্রান্তিক নয়। স্পষ্টভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধেও কিছু লেখা হয়নি, আবার সঙ্গোপনে যেন বলাও হয়েছে। এদিকেও না-ওদিকেও না।

এমন হল কেন? কারণ, এই কিতাব ইংরেজদের বর্বরোচিত রাজত্বের সময় লেখা হয়েছিল। ইংরেজরা তখন ভারতবর্ষের মানুষদের চরমভাবে নির্যাতন করছিল।

মিরাঠি সাহেব যদি স্পষ্ট ভাষায় গাঙ্গুহির দুর্দমনীয় জিহাদের কথা লিখে ফেলতেন, তা হলে হজরতের মুহিব্বিন-মুতাআল্লিকিনের তা পড়ে গোলমেলে কাণ্ড ঘটিয়ে বসার আশঙ্কা ছিল। তিনি সেটাকে ভয় করেছেন। অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করতে চাননি। কী থেকে পরে কী হয়ে যায় কে জানে! তাই এমন এক গদ্যভঙ্গি বেছে নিয়েছিলেন, যাতে গাঙ্গুহি হজরতের জীবনালেখ্যও ফুটে উঠেছে, আবার সরকারি পাকড়াও থেকেও তিনি বেঁচে গেছেন।

এ বিষয়ে পরে শায়খুল হাদিস জাকারিয়া রহ. ইদারাতুল ইসলাম, লাহোর থেকে প্রকাশিত তাযকিরাতুর রশিদের ৬১৪-৬২২ পৃষ্ঠায় খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি আলোচনা লিখেছেন। সেই আলোচনার শেষদিকে আছে, 'সন্দেহ নেই, মাওলানা মিরাঠি এমন করে না-লিখে অন্যভাবেও লিখতে পারতেন। তার বেছে নেওয়া ভাষাভঙ্গি ইংরেজপ্রশাসনের তোষামোদ করেছে। ইচ্ছে হলে এ থেকে তিনি সংযত থাকতে পারতেন। দুঃখের বিষয়, তিনি সংযত থাকেননি। ওই সময়ের অবস্থা বুঝে নিজে যেমন উপযুক্ত মনে করেছেন, লিখে দিয়েছেন।

আমি বলি, জ্বলন্ত সূর্য সবসময়ই জ্বলন্ত। মাঝখানে পর্দা টেনে দিলেও তার ঠিকরে-ছোটা আলোকধারাকে কখনও রোধ করা যায় না। চারপাশ ভাসিয়ে দেয় আলোর বন্যায়। যদি মাওলানা মিরাঠি অথবা অন্য কোনো ইতিহাসবেত্তাও একথা লেখেন, যা এই মহান মুজাহিদের অসামান্য কীর্তিমালা প্রকাশে অক্ষম; তবু তার জিহাদের একনিষ্ঠতায় এতটুকু চিড় ধরাতে পারবে না।

শায়খুল হাদিস জাকারিয়ার এই লেখা থেকে বোঝা যায়, কঠিন দুর্যোগের ভেতর কখনও-কখনও ইতিহাসবিদরা এমন ভাষা অবলম্বন করেন, যা ব্যক্তিত্ববানদের জীবনচিত্র পুরোপুরি ফোটাতে পারে না।

মাওলানা আশেকে ইলাহির জীবৎকালে ভারতবর্ষে ইংরেজদের যে প্রভাব বিরাজ করছিল, হিজরি সপ্তম ও অষ্টম শতকে মুসলিমবিশ্বে তাতারদের ক্ষমতা ও প্রভাব ছিল তার চেয়ে প্রকট। এজন্য সে-সময়ের ইতিহাসপ্রণেতাগণ, তাতারদের জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে লৌহপ্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন যেসব মুজাহিদ, তাদের অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে এমন এক গদ্যভঙ্গি নির্ধারণ করেছিলেন, উপমহাদেশের নিকট-অতীতের ইতিহাসে এইমাত্র যা আমরা দেখতে পেলাম।

দ্বিতীয় প্রকার ইতিহাসবিদগণ, যারা ছিলেন সুলতান জালালুদ্দীনের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ রাষ্ট্রসমূহের অধিবাসী, তাদের মধ্যে অনেক মান্যবর ব্যক্তিও ছিলেন। বেশিরভাগ ছিলেন সিরিয়া, মিশর, বাগদাদ, আলজেরিয়া ও তৎসম্পৃক্ত অন্যান্য অনারব রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত।

এসব এলাকার রাজা-বাদশাহরা সুলতান আলাউদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহের যুগ থেকেই খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যকে নিজেদের জন্য হুমকি বলে মনে করত।

সুলতান আলাউদ্দীন মুহাম্মদও ধীরে-ধীরে আশপাশের রাজ্যগুলো করতলে নিয়ে আসছিলেন। বিশাল-বিস্তৃত একটা অঞ্চলের লোকবল তার অধীনস্থ হয়ে পড়েছিল।

প্রতিবেশী সম্রাটদের ভয়-সংশয় ও অস্থিরতার এই ধারা সুলতান জালালুদ্দীনের জীবদ্দশাতেও অব্যাহত ছিল। আর এই সম্রাটগণ সুলতানের উত্তম আচরণগুলোও গ্রহণ করেননি। দেননি তার অসংখ্য কোরবানির স্বীকৃতি। মুসলিমবিশ্বের প্রতিরক্ষায় তিনি যে নিষ্ঠাপূর্ণ জিহাদে নেমেছিলেন, তার প্রতি আস্থা না রেখে তারা তাকে ভুল বুঝতে শুরু করেছিলেন।

الناس على دين ملوكهم (মানুষ তাদের শাসকদের অনুগামী হয়ে থাকে) এর বাস্তবতার আলোকে সাধারণ প্রজারাও তার ব্যাপারে সেই একই ধারণা লালন করতে লাগল। এখানকার আলেমরাও তাদের দৃঢ় অবস্থান, শক্তিমত্তা, দীনদারি ও ইলমি যোগ্যতা সত্ত্বেও এই বিষাক্ত অনুভূতিতে প্রতিক্রিয়াশীল না-হয়ে পারেননি।

এটা কোনো অবাস্তব কিংবা অসম্ভব ব্যাপারও না। বর্তমান যুগ নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করলে অনেক উদাহরণ পেয়ে যাব আমরা। এ যুগেও এমন অনেক মুরশিদ চোখে পড়ে, যারা বিজাতির সাথে শত্রুতা রাখেন ঠিক, কিন্তু স্বজাতির অনেক হাস্তির প্রতি পুষে রাখেন ভুল ধারণা। মন ভার করে থাকেন। এ যুগে বরং এটা আরও প্রকট। পূর্বের সেই অবস্থার তুলনায় হাল-জামানায় এমন বহুত উদাহরণ আছে, যা তখনকার কেউ হয়তো কল্পনাও করতে পারত না।

সুলতান জালালুদ্দীনের সাথেও সেকালের কলমসৈনিকদের একটা দ্বন্দ্ব ছিল। সুলতান সেই সংকটের কালে এটুকু সময় পাননি যে, তাদের ভুল ধারণাগুলো তিনি ভাঙাবেন। ফলে তাকে নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটেনি। অনেক প্রজ্ঞাবান ঐতিহাসিকও এই অবস্থার শিকার হয়েছেন।

এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তখনকার লেখকরা সুলতান জালালুদ্দীনের বিরুদ্ধে যা কিছু লিখেছেন, তা ওইসব রাষ্ট্রের ভয়ের কারণেই; অথবা তাদের কানে সুলতানের বিরুদ্ধে যেসব উড়োকথা এসেছে, তা ছিল তারই বহিঃপ্রকাশ।

ভুলে যাবেন না, অন্য সাম্রাজ্যের সাধারণ ও বিশিষ্টজনের ভেতর সুলতানকে নিয়ে যে বদ ধারণা ছড়িয়ে পড়েছিল, তা তাতারদের আগ্রাসী রাজত্ব আরও বিস্তৃত করতে সহায়ক হয়েছিল। এজন্য তাতার-বাহিনীর সূক্ষ্ম চক্রান্তের প্রতি লক্ষ করলে বোঝা যায়, সুলতান জালালুদ্দীনের ব্যাপারে যেসব ভুল কথা ছড়ানো হয়েছিল, তাতে ইসলামের শত্রুদের কুচক্রী গোয়েন্দা-বিভাগের পুরোপুরি হাত ছিল। এটা কোনো অমূলক ভাবনা নয়।

৪. সুলতান জালালুদ্দীন সঠিক অবস্থান না-পাওয়ার আরেকটি কারণ হল, তার যত চেষ্টা-মুজাহাদা, বাহ্যিকভাবে সব নিষ্ফল হয়েছে। পূর্ণ প্রচেষ্টা ও মেহনতের পরও যুদ্ধ-ময়দানের শেষসফলতা থেকেছে তাতারদের হাতেই। যদিও আল্লাহ তায়ালার

কাছে এই বাহ্যিক জয়-পরাজয়ের কোনো দাম নেই। আর সুলতান জালালুদ্দীনের মতো একজন মর্দে মুজাহিদের লক্ষ্যও সেটা ছিল না। বরং জয়-পরাজয়ের কথা না-ভেবে তিনি শুধু আল্লাহর ফরজ বিধান জিহাদ আঞ্জাম দিতে মৃত্যুমুখে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

কিন্তু বাস্তবতা হল, বিজয় দেখলেই লোকদের চোখ চকচক করে ওঠে। পরাজিতদের নাক সিঁটকে তখন নাকচ করে দেয় তারা। এজন্য আমজনতার কাছে জালালুদ্দীন নিছক নিষ্ফল, ব্যর্থ একজন মানুষ। এর বাইরে কিছু নন। মানে, ইতিহাসে এভাবেই তাকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে তিনি যদি তাতারদের গায়ে পরাজয়ের চূড়ান্ত তকমা এঁটে দিতে পারতেন, তবে ইতিহাসে তাকেও সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবি ও সুলতান মাহমুদ গজনবির সমকক্ষ ভাবা হতো নিশ্চিত।

৫. সুলতান জালালুদ্দীনের মৃত্যুর পর তার মহান মিশন সামলাবার মতো কোনো যোগ্য স্থলাভিষিক্ত ছিল না। তিনিই ছিলেন খাওয়ারিজম শাহি খানদানের সর্বশেষ সম্রাট। এমন এক অবস্থায় তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন, তার না-ছিল কোনো পুত্রসন্তান, না-ছিল কোনো বিশ্বস্ত সহচর, যিনি পরবর্তীকালে তার জিহাদি অগ্রযাত্রার নেতৃত্ব দিতে পারবেন। ফলে মৃত্যুর সাথে-সাথেই সুলতানের মহান মিশনও পুরোপুরি খতম হয়ে যায়। তার অধীনে যারা কাজ করছিল, তারাও হয়ে গেল বিক্ষিপ্ত। তার প্রতি যারা সুধারণা রাখত, মারা যাবার পর তার মিশন যখন থেমে গেল, সঙ্গে সঙ্গে তারাও তাকে ভুলে গেল পুরোপুরি। ইতিহাসের প্রকৃত আসন অলংকৃত না-করতে পারার একটি উল্লেখযোগ্য কারণ এটাও।

একটি গুরুতর ভুল ধারণার নিরসন

চিন্তা যাদের অসম্পূর্ণ, গবেষণা যাদের সীমাবদ্ধ, সুলতান জালালুদ্দীনের সঠিক অবস্থান জানতে না পেরে তারা ভাবে, তার সেই জিহাদ তাতারদের বিরুদ্ধে ব্যর্থ ও নিষ্ফল কয়েকটি যুদ্ধমাত্র। তিনি মুসলিমবিশ্বের প্রতিরক্ষায় উল্লেখযোগ্য কোনো অমরকীর্তি রচনা করে যেতে পারেননি।

সংকীর্ণ পাঠপরিধির কারণে এরা এ-ও ভাবে যে, তাতারদের বিরুদ্ধে মুসলিমবিশ্বের প্রতিরক্ষাযুদ্ধ বাস্তবিকপক্ষে শুরু হয়েছিল আরও পরে। তারা আইনজালুতের সংঘর্ষকেই প্রতিরোধযুদ্ধের প্রথম পর্ব বলে মনে করে। আর সুলতান জালালুদ্দীনের নিরুপম আত্মোৎসর্গ হতে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখে।

তাতারদের মোকাবেলায় যুদ্ধে অবতীর্ণ প্রথম সৈনিক মনে করে তাদের, যারা এই আগ্রাসনের ৪০-৫০ বছর বা তার চেয়েও পরে ময়দানে নেমেছিলেন। তবে মোঙ্গলিয়ানদের বিরুদ্ধে মুসলিম সুলতানদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে জিহাদ চালিয়ে যাওয়া নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। তাই বলে তাদের আত্মদানের

প্রশংসা করতে গিয়ে সুলতান জালালুদ্দীনের সঠিক অবস্থান ভুলে গেলে তো চলবে না। এমনটি নিঃসন্দেহে অদূরদর্শিতা ও সীমাবদ্ধতারই প্রমাণ।

সন্দেহ নেই, পরবর্তীকালের মুসলিম শাসকরা নিজস্ব অঞ্চলে সফলভাবে তাতার-আগ্রাসন ঠেকিয়ে রাখতে পেরে ইতিহাসের গর্বিত আসন অলংকৃত করেছেন। তবে নিশ্চিত সত্য, এই মহা সয়লাবের তোড়ে তাদের তেমন বিচলিত হতে হয়নি, যতটা সয়েছিলেন একা এক লৌহমানব—সুলতান জালালুদ্দীন মুনকাবিরাতি। তিনি যে নাজুক পরিস্থিতিতে তাতার-আগ্রাসনের সম্মুখে তরবারি কোষমুক্ত করেছিলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তা বিমূঢ় বিস্ময়কর এক অধ্যায়।

সময়টা ছিল এমন, চেঙ্গিজ খানের ছায়াতলে জড়ো হয়ে গিয়েছিল নরপশুদের সমস্ত গোত্রশক্তি। প্রচণ্ড সাইক্লোন হয়ে তারা মুসলিম সাম্রাজ্যগুলি ওলট-পালট করে দিচ্ছিল। যেসব এলাকা জয় করতে লাগাতার কয়েক মাস যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন, সেগুলো নিছক সপ্তাহ খানিকের ভেতর জয় করে ফেলত তারা। সে মুহূর্তে সুলতান জালালুদ্দীনই ছিলেন একমাত্র মর্দে মুজাহিদ, প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে যিনি উঠে দাঁড়িয়েছিলেন শক্ত প্রাচীর হয়ে। মানব-ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ংকর আগ্রাসনের থাবা তিনি শুধু রুখেই দেননি, কয়েক রণাঙ্গনে দুশমনদের পরিয়েছিলেন পরাজয়ের গ্লানিকর লাগাম। তাদের জমাটবদ্ধ শক্তি চুরমার করে দিয়েছিলেন। অথচ তখন তারা ছিল পুরো বিশ্বজয়ের স্বপ্নে বিভোর। চেঙ্গিজ খানের মৃত্যু নাগাদ সুলতান জালালুদ্দীনের চকচকে তরবারিই ছিল তাতারদের প্রধান বাধা। চেঙ্গিজের মৃত্যু হলে সাম্রাজ্য পরিচালনার ভার যখন তার ছেলেদের হাতে এল, তখনও চার-পাঁচ বছর পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে মুষ্টিবদ্ধ যুদ্ধে লড়ে গেছেন জালালুদ্দীন।

সুলতানের মৃত্যুর পরও তাতারদের তাণ্ডব অব্যাহত ছিল। কিন্তু, চেঙ্গিজ খানের জীবদ্দশায় যে জমাটবাঁধা শক্তি ও সর্বগ্রাসী তেজ ছিল, তাতে ভাঙন ধরে গেছিল। প্রতিটি জাতির উদ্দামতা ও দুঃসাহসিকতা তাদের অনুসৃত নেতার জীবৎকালে যেমন তুঙ্গস্পর্শী থাকে, পরবর্তীকালে ধীরে-ধীরে তা অনেকটা মিইয়ে আসে এবং একসময় চিরকালের জন্য অবলুপ্ত হয়ে পড়ে। এজন্য তাতারদের আক্রমণ যদিও দীর্ঘসময় পর্যন্ত স্থায়ী ছিল, কিন্তু পূর্বের মতো তেমন তেজোদ্দীপ্ত ছিল না।

হাফেজ যাহাবি রহ. জালালুদ্দীনের জিহাদি অগ্রগামিতার কথা খুবই সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থবহ ভাষায় লিখেছেন, সুলতান জালালুদ্দীন তাতার-আগ্রাসনের প্রারম্ভ ও প্রচণ্ডতার কালে তাদের মুখোমুখি হয়েছিলেন।

হারামাইন শরিফাইনের প্রতিরক্ষাকারী

পুরো মুসলিমবিশ্বের উপরেই সুলতান জালালুদ্দীনের সংখ্যাবিহীন অনুগ্রহ ও অনুকম্পা রয়েছে। সবচেয়ে বড় যেটি, দৃষ্টির দুর্বলতায় যদিও আমরা তা দেখে উঠি না, তিনি নরপশুদের আগ্রাসী থাবা থেকে কাবা শরিফ ও রাসুলের রওজা শরিফ রক্ষা করেছিলেন। নিঃসন্দেহে এ এক মহান কোরবানি।

তাতাররা বিরোধীদের ধর্ম-মাজহাব কিবা সভ্যতা-সংস্কৃতি—কোনো কিছুর প্রতিই সম্মান দেখাত না। তারা প্রতিপক্ষের ইবাদতখানার আদব রক্ষা করবে? এ তো ছিল তাদের কাছে নিতান্ত হাস্যকর একটি ব্যাপার!

ইতিহাসবিদগণ লেখেন, তাতাররা যেখানেই কোনো নামজাদা লোকের মাজার কিংবা কবর পেত, ভেঙে গুঁড়িয়ে দিত ধুলোয়। কবর খুঁড়ে মৃতের হাড্ডি উঠিয়ে আগুনে পুড়িয়ে ফেলত, বাতাসে উড়িয়ে দিত ছাই। এটা ছিল তাদের প্রিয় কাজগুলোর একটি। বাদশাহ হারুনুর রশিদ ও সুলতান মাহমুদ গজনবির মতো মহান ব্যক্তিদের মাকবারাও এই জুলুম থেকে রেহাই পায়নি।

খাওয়ারিজম-ইরাক-ইরান ও আফগানিস্তানের হাজারও মসজিদ-মাদরাসা-কুতুবখানা-মাজার-খানকা চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছিল তারা। এই হিংস্রগুলি যদি পবিত্রভূমি মক্কা ও মদিনা অভিমুখে অভিযান চালিয়ে বসত, কোনো মুসলমানের ক্ষমতা ছিল না কাবা ও রওজার প্রতি সম্মান দেখাতে এদেরকে বাধ্য করার।

সে-সময় আল্লাহ তায়ালা সুলতান জালালুদ্দীনের অনবদ্য সংগ্রামের মাধ্যমে এমন মহান কাজ নিয়েছিলেন—আবরাহার হস্তীবাহিনী দমন করতে যেমন খেদমত নিয়েছিলেন ছোট ছোট পাখি থেকে। স্বল্পশক্তি সত্ত্বেও বছরের পর বছর ধরে বিজয় ছিনিয়ে-নেওয়া তাতারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে গেছেন সুলতান। পবিত্রভূমি হেজাজের দিকে এক কদমও বাড়তে দেননি তাদের। এ হচ্ছে এমন এক যশোগাথা, পুরো জীবনে এ ছাড়া কিছু যদি না-ও করতে পারতেন তিনি, তবু কেয়ামত পর্যন্ত মুসলিমদের পরম শ্রদ্ধার্ঘ্য লাভের হকদার থাকতেন।

পৃথিবীর প্রতি অফুরান অনুগ্রহ যার

সুলতানের তাতার-বিরোধী জিহাদ শুধু খাওয়ারিজম রক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং মা-ওয়ারাউন-নাহার থেকে শুরু করে হিন্দুস্থান পর্যন্ত, সিন্ধুতীর থেকে কাফকাজের পাহাড়ি এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত সব অঞ্চল তার ওই প্রতিরোধযুদ্ধের ফলে রক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছিল সাময়িকের জন্য হলেও। এজন্য মুসলিমবিশ্বের আলেমগণ ছাড়াও এশিয়ার সমস্ত সাম্রাজ্যের ইতিহাসপাঠকরাই তার জীবনকাহিনির প্রতি দারুণ আগ্রহী। একটু সম্মুখে বেড়ে বাস্তবধর্মী একটি নিরীক্ষণ চালালে মনে হবে, সুলতানের সেই প্রতিরক্ষাযুদ্ধ ছিল সে-সময়কার প্রত্যেকটি মানুষের জন্য। সকলের জন্যই তিনি একজন অনুগ্রহশীল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

আরও স্পষ্ট করে বললে, সুলতানের সেই কোরবানি, সেই আত্মদান শুধু মুসলিমবিশ্বের জন্যই ছিল না, ছিল পৃথিবীর সর্বশেষ প্রান্তে বসবাসকারী অজ্ঞাত মানুষটির জন্যও। সবাই তো তখন তাতার-তাণ্ডবের ভয়ে রীতিমতো প্রকম্পিত ছিল।

মুফাক্কিরে ইসলাম সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদবি তৎপ্রণীত 'তারিখে দাওয়াত ওয়া আজিমাত' গ্রন্থে তাতার-আগ্রাসন নিয়ে লিখেছেন—শুধু মুসলিমবিশ্বই

নয়, তখনকার পুরো সভ্য পৃথিবীই তাতারদের ভয়ে ছিল কম্পমান। যে জায়গাতে তাতারদের পৌঁছার আশঙ্কা ছিল খুবই কম, সেখানেও ছড়িয়ে পড়েছিল ভয়ানক সন্ত্রস্ততা ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা। গিবন তার প্রসিদ্ধ 'তারিখে ইনহেতাত ও সুকুতে রোমাহ' গ্রন্থে বলেছেন, রাশিয়ানদের মাধ্যমে তাতার-আগ্রাসনের সংবাদ পায় সুইডেনের বাসিন্দারা। এবং তারা এতটাই ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়ে যে, তাদের প্রাত্যহিক কর্ম ছিল সমুদ্রতীরে শিকার ধরতে আসা, সংবাদটা পাওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে তা একদম বন্ধ হয়ে যায়। তখন আর ঘর থেকেই বেরোত না তারা। না জানি কখন তাতাররা এসে পড়ে—এমন একটা ভয় সর্বদা কাজ করতে থাকল তাদের ভেতর।

এই ঐতিহাসিক বাস্তবতার আলোকে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে বলা যায়—তাতারদের আগ্রাসনের প্রথমদিকেই চীন থেকে কাসপিয়ান সাগর পর্যন্ত প্রায় সব এলাকা পুরোপুরি আয়ত্তে নিয়ে এসেছিল তারা।

সুলতান জালালুদ্দীনের আকৃতিতে যে-লৌহপ্রাচীর তাদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কোনোভাবে তা যদি টপকাতে পারত তারা এবং ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকত সামনে, তা হলে দু-চার বছরের ভেতর শুধু আফ্রিকা নয়, বরং ইউরোপের সর্বশেষ সীমানা পর্যন্ত চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেত তাদের প্রলয়ঙ্করী ঝড়ে।

তখন সবে মুসলিমবিশ্বের মনীষী ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা জাহালতের অন্ধকারে ডুবে-যাওয়া ইউরোপকে ধীরে-ধীরে আলোর দিকে তুলে আনছিলেন। সভ্যতার জাগরণ সেখানে কেবল শুরু হয়েছে। মুসলিমদের জ্ঞানভান্ডার ধীরে-ধীরে পাড়ি জমাচ্ছে ইউরোপে। পরবর্তীকালের ভাবী ব্যক্তিত্ববানরা সেখানে সদ্য জন্ম নিচ্ছিলেন।

সেইসময় যদি বীভৎস হিংস্রতার মুখোশ পরে ইউরোপের জমিনে আবির্ভূত হতে পারত তাতাররা, জ্ঞানবিজ্ঞানের যে-ধারা মুসলিমদের হাত ধরে ইউরোপের যুবকদের ভেতর সবে শুরু হয়েছিল, বিকশিত হবার আগেই তা চিরকালের জন্য ঝরে পড়ে যেত।

মুখ থুবড়ে পড়ত ইউরোপের জ্ঞানবিজ্ঞানের অপূর্ব বিপ্লব। অজ্ঞতা-অসভ্যতার গহীন অন্ধকারে চিরকালের জন্য তারা হারিয়ে যেত। আর, তখন এতে আশ্চর্য হওয়ারও কিছু থাকত না।

ইতিহাসের এইসব অধ্যায় যদি নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করি, কোনো সংশয়ই আর থাকে না যে, সুলতান জালালুদ্দীনের আগমন শুধু মুসলিমবিশ্বের জন্যই ছিল না, বরং তিনি এসেছিলেন পুরো মানবতার মুক্তিদূত হিসেবে। পৃথিবীবাসীর জন্য ছিলেন এক অনন্য তোহফা।

যদিও বিশেষভাবে তার প্রতিরোধ-যুদ্ধের মূল লক্ষ্য ছিল পবিত্রভূমি হেজাজ ও মুসলিমবিশ্বের প্রতিরক্ষা, সেই যুদ্ধ যদিও তিনি পূর্বাঞ্চলেই শুরু করেছিলেন, কিন্তু ব্যাপকভাবে তা পশ্চিমাঞ্চলের জন্যও ছিল পরম আশ্রয় ও নির্ভরতার কারণ। ফলে ইউরোপের পশ্চিমাঞ্চলগুলো ছাড়িয়ে তাতার-আগ্রাসন আর সামনে বাড়তে পারেনি।

কারণ, সুলতান জালালুদ্দীন তার অপূর্ব রণকৌশল ও যুদ্ধাভিযানে এশিয়ার ময়দানগুলোতেই তাতারশক্তিকে একের-পর-এক নাকানিচোবানি খাওয়াচ্ছিলেন। সেখানেই আটকে ফেলেছিলেন তাদের। এটাকে জালালুদ্দীনের উদ্দাম বাহুর জোর না-বলে আর কী বলা যায়!

শেষকথা

অনুপুঙ্খ বর্ণনায় ইতিহাসের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দৃশ্যপট আঁকতে গিয়ে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে-যাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সামগ্রিক ইতিহাস কখনও বদলানো বা বিকৃত করা যায় না। রিওয়ায়াত ও দিরায়াতশাস্ত্রের মূলনীতি মেনে তা লিখতে হয়। বাস্তবতা, হ্যাঁ, শুধুই বাস্তবতা খুঁজে বের করতে হয়। এতক্ষণ ধরে এই পাতাগুলি আপনাকে সে-কথাই বলতে চেয়েছে। সুলতান জালালুদ্দীনের টুকরো-টুকরো জীবনপর্ব আজও ইতিহাসের প্রাচীন সব উৎসগ্রন্থে পাওয়া যায়। সেসব তার বড়ত্ব-বীরত্ব-মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের, অসামান্য মেহনত ও মুজাহাদার প্রামাণিক দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। কেউ অপবাদ চাপিয়ে বা আপত্তি উত্থাপন করেও তা এতটুকু ম্লান করতে পারেনি, পারবে না।

সুলতান জালালুদ্দীনের শ্রেষ্ঠত্ব ও অনুপম ব্যক্তিত্ব বোঝার জন্য এটুকু জানাই যথেষ্ট যে, তার অসামান্য কীর্তিমালা বিভিন্নভাবে গোপন করে ফেলতে লোকজন উঠেপড়ে লেগেছিল। তবু ইতিহাসের আবরণ ছিঁড়ে-খুঁড়ে তা প্রকাশ পেয়েই গেছে বারবার। উত্থাপিত শত অপবাদ সত্ত্বেও ইতিহাসে আজও জ্বলজ্বল করছে তার অনুপম ব্যক্তিত্ব। ইতিহাসের সমস্ত লেখক-পাঠক, তাকে ঘিরে তৈরি যাবতীয় প্রশ্ন-আপত্তির ভেতর দিয়ে যেতে যেতে যখন দেখে ওঠেন তার প্রকৃত অবস্থান, বুঝে ফেলেন বীরত্বে ও বড়ত্বে সুলতান জালালুদ্দীন হলেন আকাশ-ছোঁয়া এক আলোর মিনার।

মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান
শিক্ষক, ইসলামের ইতিহাস বিভাগ
জামিয়াতুর রশিদ, করাচি।

প্রথম অধ্যায়

খাওয়ারিজম ও খাওয়ারিজমের বাদশাহগণ

খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক অবস্থান

এই পৃথিবীর বিশাল মানচিত্রে চোখ রাখুন—পূর্ব ও উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত এশিয়া। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মহাদেশ। এর প্রাণকেন্দ্র মধ্য-এশিয়া। ইতিহাসের পাতায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে এই মধ্য-এশিয়ার অগুনতি লোমহর্ষক দাস্তান। এর বিশাল-বিস্তৃত পরিধির ভেতর অভ্যুদয় ঘটেছে হাজারও সাম্রাজ্যের। আবার সময়ের ঝড়ে হারিয়েও গেছে কতশত সাম্রাজ্য! আজও মধ্য-এশিয়া তার জীবন্ত সাক্ষী হয়ে আছে।

এখানে নেমেছিল এমন এক দুর্দিন, যা ভেবে পৃথিবী আজও আমূল কেঁপে ওঠে। সে-এক অন্ধকারাবৃত সময়ের কথা। শুরুটা হয়েছিল হিজরি সপ্তম শতকের দ্বিতীয় দশকে, বাগদাদের পতনের মধ্য দিয়ে ঘটেছে সমাপ্তি।

পুরো মধ্য-এশিয়াজুড়ে ছিল অসংখ্য সবুজ-শ্যামল চারণভূমি, শহরগুলো ঘন বসতিপূর্ণ, শত শত চওড়া বাণিজ্যপথ। এজন্য প্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীজোড়া এর পরিচিতি। এখানে বড় দুটো নদী ছিল। একটি সাইহুন-নদী, লোকে সেরেদরিয়াও বলত। অন্যটির নাম জাইহুন, লোকে একে আমুদরিয়া নামেই চিনত বেশি।

এ দুই নদীর মধ্যখানে লেপটে রয়েছে সুবিস্তৃত এক অঞ্চল, যাকে বলা হয় মা-ওয়ারাউন-নাহার বা ট্রান্স-অক্সিয়ানা। সবুজ ফসলে ভরপুর ছিল এই মা-ওয়ারাউন-নাহার। চারপাশে ছিল অনুপম সব দৃশ্য। প্রান্তরে দাঁড়ালে মনে হতো, বহুদূর পর্যন্ত কেউ যেন সবুজ গালিচা বিছিয়ে রেখেছে। চাপ-চাপ জনবসতি। লোকসংখ্যা অন্যসব এলাকা থেকে একটুখানি বেশি। এখানেই সমরকন্দের সেই প্রসিদ্ধ শহর অবস্থিত, যেখানে জন্মেছেন বিখ্যাত ফকিহ আবুল লাইস সমরকন্দি। ইমাম বোখারির সেই চিরচেনা শহর বোখারাও এখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে আজও।

জাইহুনের যে-কিনারা গিয়ে আফগানিস্তানের সীমানা ছুঁয়েছে, সেখান থেকে একটু সামনে এগোলেই দেখা যায়—সুনানুত তিরমিজির লেখক ইমাম আবু ঈসা তিরমিজির শহর তিরমিজ।

সংক্ষিপ্ত এই জার্নির পর এবার আসুন আমাদের মূল উদ্দেশ্যে ফিরে যাই। জাইহুন-নদীর তীর ধরে উত্তরদিকে হাঁটতে থাকুন। যেতে থাকুন আরও সামনে। একটুক্ষণ পরই হালের গণতান্ত্রিক শহর উজবেকিস্তান। এর উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আরেকটি শহর ছিল। সেই শহরের নাম আরগেঞ্চ। কয়েক শতাব্দী পূর্বে এই আরগেঞ্চই ছিল খাওয়ারিজমের রাজধানী। আরগেঞ্চ ছাড়াও হ্যাজোরাস্প ও খিবা শহরকেও খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ শহর মনে করা হতো।

প্রাচীনকালের খাওয়ারিজম

একদা পারসিক বাদশাহ বাহরাম ঘুরের এক নিকটাত্মীয় এসে খাওয়ারিজম এলাকা দখল করে নিয়েছিল।[১১] ইতিহাসে তখন থেকেই এটি স্বতন্ত্র এক সাম্রাজ্য। প্রাচীনকাল থেকে এখানকার শাসকদের ডাকা হতো খাওয়ারিজম শাহ। ইতিহাসে পাওয়া যায়, কিখোর নামের এক বাদশাহ রাজা সিকান্দারের (আলেকজান্ডার) ৯৮০ বছর আগে এ-রাজ্যের শাসকদের খাওয়ারিজম শাহ উপাধি প্রদান করেছিলেন।[১২]

খাওয়ারিজমের তাহজিব ও তামাদ্দুন যে কতটা প্রাচীন, এই বর্ণনা থেকে সহজেই তা অনুমান করে নেওয়া যায়। পরবর্তীকালে ধীরে-ধীরে এখানে নতুন সভ্যতার আলো জ্বলেছে। কিন্তু মজার কথা হল, ইসলামপূর্ব যুগের খাওয়ারিজম শাহ উপাধির প্রচলন এখানকার সর্বশেষ মুসলিম সম্রাট সুলতান জালালুদ্দীন খাওয়ারিজম শাহের শাসনকাল পর্যন্ত বাকি ছিল। ইসলামের ইতিহাসে এ এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত।

খাওয়ারিজমে ইসলাম

এই অঞ্চলে, খলিফা ওয়ালিদ ইবনে মালিকের খেলাফতকালে প্রথমবারের মতো মুসলিমসেনাদের আগমন ঘটে। ৯৩ হিজরি মোতাবেক ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে তুর্কিস্তান-বিজেতা কুতাইবা ইবনে মুসলিম আল-বাহিলি মরুবালিতে ঘোড়া ছুটিয়ে প্রথম এসেছিলেন এ অঞ্চলে। তখনকার যিনি খাওয়ারিজম শাহ, তিনি ছিলেন একজন নামেমাত্র শাসক। পুরো রাজ্যই ছিল তার ভাই খারজাদের আয়ত্তে। এই অবস্থা দেখে খাওয়ারিজম শাহ তখন বড়ই চিন্তিত। কী করবেন, কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলেন না। এর ভেতর একদিন সেনাপতি কুতাইবা ইবনে মুসলিমের আগমন ঘটল। ব্যাপারটাকে খাওয়ারিজম শাহ পরম সৌভাগ্য মনে করলেন। কুতাইবার সাথে সন্ধি করে ফেললেন তিনি। তবে শর্ত দিলেন—তাকে মুক্ত করতে হবে ভাই খারজাদের উপদ্রব থেকে। কুতাইবা মেনে নিলেন শর্ত। ফলে এই বিশাল সাম্রাজ্য কোনোধরনের রক্তপাত ব্যতীতই ইসলামের পতাকাতলে চলে এল।[১৩] বাসিন্দারা ঝাঁকে-ঝাঁকে কবুল করে নিল শান্তির ধর্ম ইসলাম। এভাবে, অন্ধকারাচ্ছন্ন এই এলাকাটি ইসলামের প্রদীপ্ত আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

কাস ও জুরজানিয়া

প্রাচীনকালে এই দুই এলাকা ছিল খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের রাজধানী। কাস ছিল জাইহুন-নদীর পূর্বতীরে; পশ্চিম তীরে জুরজানিয়া। জুরজানিয়াকে গুরগঞ্জ অথবা আরগেঞ্চও বলা হতো। কুতাইবা ইবনে মুসলিমের খাওয়ারিজম-বিজয়ের পর কাসের

---

[১১] বাইহাকি, আবু রাইহান আল-বিরুনি সূত্রে বর্ণিত

[১২] এরকমই বলেছেন আল-বিরুনি

[১৩] তারিখুল কামিল লি ইবনিল আসির ৩/২১৫

নাম হয়ে গেল আল-মানসুরিয়া। ধীরে-ধীরে তখন বাড়তে লাগল এ শহরের চাকচিক্য। জনবসতি হল পূর্বের চেয়েও দ্বিগুণ ঘন।

তারপর দীর্ঘ একটা সময় কেটে গেছে। একসময় আল-মানসুরিয়া নদীর প্লাবনে ডুবে গেল। নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেল বাসিন্দারা। কেউ কেউ কোনোভাবে বেঁচে গিয়ে নদীর পশ্চিম পারে আরগেঞ্চে (জুরজানিয়া) এসে নতুন বাড়ি বানাল। এতে আরগেঞ্চের জনসংখ্যা বেড়ে গেল দ্বিগুণ। রাষ্ট্রের দপ্তর ও ব্যবস্থাপনাকেন্দ্রও এখানে নিয়ে আসা হল।

তখন তুর্কিস্তানের বাণিজ্য-কাফেলাও এই আরগেঞ্চের পথেই যাওয়া-আসা করতে থাকে। সে-সূত্রে অল্পদিনের ভেতর আরগেঞ্চই হয়ে ওঠে তাদের প্রধান ব্যবসাকেন্দ্র।

তারপর ধীরে-ধীরে কীভাবে যেন আরগেঞ্চ-জুরজানিয়া শব্দদুটো লোকমুখ থেকে হারিয়ে যেতে থাকল। ও-নামে তারা আর ডাকত না। শাসকদের নামাংশ ধার করে এই এলাকাকে খাওয়ারিজম বলেই ডাকতে শুরু করেছিল। যদিও ভুলে-অবচেতনে অনেকের মুখে মাঝেমধ্যে পূর্বনামটিও চলে আসত।

ইসলাম-যুগের খাওয়ারিজমি শাসক

ইসলাম আসার পর থেকে ইতিহাসে খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য ধীরে-ধীরে গড়ে নিতে থাকে শক্ত অবস্থান। অনেক নামজাদা ফকিহ, মুহাদ্দিস, দার্শনিক ও শাসক এ মাটিরই সন্তান। গায়ে লেগেছিল তাদের খাওয়ারিজমের ধুলোবালি। বহুকাল ধরে আজও তারা ইসলামি ইতিহাসের মধ্যাকাশে জ্বলজ্বলে নক্ষত্রের মতো ফুটে রয়েছেন।

এ সাম্রাজ্য হয়ে উঠেছিল ইলম-হেকমত-তাযকিয়া-মারেফাত-তাহযিব-তামাদ্দুন ও শিল্পকারখানার প্রধানকেন্দ্র। সময়ের ঘূর্ণনে খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যে অনেক শাসকেরই আগমন ঘটেছে। কিন্তু তাদের সবাই ছিলেন খেলাফতে ইসলামের অধীনস্থ একেকজন আঞ্চলিক শাসক।

এর দীর্ঘকাল পর, আব্বাসি খেলাফতের সূর্য যখন নিভু-নিভু, খাওয়ারিজমের শাসকরা তখন বাগদাদের খেলাফত-ব্যবস্থা থেকে পৃথক হয়ে গেলেন। ৩৪০ হিজরি (৯৫১ খ্রিষ্টাব্দ) ছিল বিযুক্ত হয়ে-পড়া এই স্বাধীন শাসকদের প্রথম যুগ। তখনকার শাসক ছিলেন বাদশাহ আবু সাঈদ আহমাদ খাওয়ারিজম শাহ। প্রথম যুগের সমাপ্তি ঘটেছে ৪০৮ হিজরির (১০১৭ খ্রিষ্টাব্দ) আবুল হারিস খাওয়ারিজম শাহ পর্যন্ত গিয়ে।

দ্বিতীয় যুগ ছিল ৪০৮ হিজরির বাদশাহ আলতুনতাশ থেকে নিয়ে ৪২৯ হিজরির মাহে মুলক খাওয়ারিজম শাহ পর্যন্ত। তারপর তৃতীয় যুগে অন্য এক খানদানের হাতে চলে গেল ক্ষমতার লাগাম। সেই খানদানের সূচনা হয়েছিল আনুশতেগিন খাওয়ারিজম শাহ থেকে। খাওয়ারিজমের সর্বশেষ সম্রাট সুলতান জালালুদ্দীন মুনকাবিরাতি পর্যন্ত গিয়ে এর সমাপ্তি ঘটেছিল।

খাওয়ারিজমের প্রথম স্বাধীন মুসলিম শাসক

একদা জর্জিয়া থেকে মালিক শাহ সেলজুকি একটি তুর্কি বংশোদ্ভূত দাস কিনে এনেছিলেন। তখন কে জানত, এই দাসই একদিন এখানকার খাওয়ারিজম শাহ হয়ে উঠবে? এবং এক শতক পর এই দাসের বংশলতিকার ভেতর থেকে জেগে-ওঠা বিশ্ববিজেতারা সেলজুকি খানদানেরই দাঁড়াবার জায়গা সংকীর্ণ করে দেবে?

কে সেই দাস? ইতিহাস বলে, সেই দাসের নাম ছিল আনুশতেগিন। তিনি খুব অনুগত ছিলেন মনিবের। ছিলেন খুবই খেদমতগার, অসামান্য সাহসী, জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান। তিনি খুব দ্রুত মালিক শাহ সেলজুকির হৃদয় জয় করে নিলেন। মুগ্ধ হয়ে মালিক শাহ তার বাছাইকৃত এক হাজার সিপাহির কমান্ডার বানালেন তাকে। সে-অঙ্গনেও অপূর্ব যোগ্যতার পরিচয় দিলেন আনুশতেগিন।

ঘটনা কীভাবে ভিন্নদিকে মোড় নেয় দেখুন। ঠিক সে-সময় খাওয়ারিজমের এক আঞ্চলিক শাসকের মৃত্যু ঘটে। এখন নতুন কাউকে নিযুক্ত করতে হবে। মালিক শাহ সেলজুকি অনেক ভাবাভাবি ও খোঁজাখুঁজি করছেন। কিন্তু বারবার তার প্রবীণ অভিজ্ঞ চোখ এই পদের প্রকৃত যোগ্য হিসেবে আনুশতেগিনকেই দেখছিল। অন্য কাউকে নয়।

৪৭৫ হিজরি তখন, ঈসায়ি ১০৮২। মালিক শাহ সেলজুকির নির্দেশে খাওয়ারিজমের আঞ্চলিক শাসকের পদে নিযুক্ত হলেন আনুশতেগিন। তারপর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই দায়িত্ব তিনি যথাযথভাবে পালন করে গেছেন।

কুতুবুদ্দীন ইবনে আনুশতেগিন

আনুশতেগিনের জীবৎকালেই তার পুত্র মুহাম্মদ ওরফে কুতুবুদ্দীন পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। গ্রহণ করেন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনার ভার। একসময় আনুশতেগিন মারা যান। তারপর কুতুবুদ্দীন অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে ৩০ বছর পর্যন্ত রাজ্য পরিচালনা করেছেন। খাওয়ারিজমে তখন নতুন এক বাদশাহর আবির্ভাব ঘটে। তিনি সানজার ইবনে মালিক শাহ সেলজুকি। কুতুবুদ্দীন ৩০ বছরব্যাপী শাসনকালে পুরোপুরিভাবে সানজার ইবনে মালিক শাহ সেলজুকির অনুগত হয়ে থাকেন।[১৪]

মুজাফফর উদ্দীন আতসিয

২২ হিজরি মোতাবেক ১১২৭ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ ওরফে কুতুবুদ্দীন খাওয়ারিজম শাহ পদত্যাগ করলেন। ক্ষমতা হস্তান্তরিত হল তদীয় পুত্র মুজাফফর উদ্দীন আতসিযের হাতে। ৩২ বছর বয়সি এ যুবক ক্ষমতা হাতে পেয়েই সেলজুক সাম্রাজ্যের শেকল ভেঙে ফেলবার দৃঢ় সংকল্প করেন। গড়ে তুলতে চান সাম্রাজ্যের এক পূর্ণাঙ্গ স্বাধীন

---

[১৪] তারিখুল কামিল লি ইবনিল আসির ৩/৩৭৪; ইবনে খালদুন ৫/৮৮

অবকাঠামো। কিন্তু সুলতান সানজার সেলজুকির চিকচিকে তরবারির সামনে সেই কাজ আঞ্জাম দিয়ে উঠতে পারছিলেন না। আতসিয সুযোগ খুঁজছিলেন। তারপর হঠাৎ একদিন পেয়ে গেলেন সেই কাঙ্ক্ষিত সুযোগ।

সুলতান সানজার সেলজুকি তখন মা-ওয়ারাউন-নাহারের বিদ্রোহী হাকিম তিগাজ খানকে শায়েস্তা করতে বোখারায় বাহিনী প্রস্তুত করছিলেন। সুলতানের সহকারী হিসেবে অভিযানে আতসিযও ছিলেন।

এক দুপুরে সুলতান সানজার সেলজুকি তাঁবুর ভেতর গা ছেড়ে আরাম করে শুয়েছেন। খুব রোদ উঠেছে। এলোমেলো মরুবালি উড়িয়ে বয়ে চলেছে দমকা হাওয়া। সেই হাওয়ায় রোদের ভেতর দাঁড়ালে চিড়বিড় করে ওঠে দেহ। তাঁবুর ফাঁক-ফোকর দিয়ে গলগলিয়ে ঢুকছে বেয়াড়া বাতাস। তাঁবুতে ছায়া আছে বলে বাতাসটা ভালোই লাগছে। কেমন একটা শীতল অনুভূতি হচ্ছে।

ধীরে-ধীরে চারপাশ নীরব হয়ে আসে। মরুভূমির এই আচানক নির্জনতায় কঠিন বিপদের গন্ধ পাওয়া যায়। ভাবতে-না-ভাবতে হঠাৎ, সুলতান সানজারের কয়েকজন নিমকহারাম সেনা-অফিসার কোষমুক্ত তলোয়ার হাতে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল তাঁবুর ভেতর। তাদের চোখে-মুখে একইসাথে কুটিল চক্রান্ত, অন্ধ ক্রোধ ও অজানা উদ্বেগের ছাপ।

চকিতে শায়িত সুলতান চোখ খুলে দেখেন—তিনি কয়েকজোড়া রাক্ষুসে তরবারি ও খঞ্জরের নিচে শুয়ে। এই অবস্থা থেকে বেঁচে-ওঠা ছিল কঠিন। তার সঙ্গে কোনো দেহরক্ষী ছিল না।

কিন্তু ভাগ্যের ব্যাপার, সুলতানের রক্তে গাদ্দারদের তরবারি গোসল করে-ওঠার আগেই বিরামহীনভাবে অদূরে খটখট শব্দ শোনা গেল। পাথুরে ভূমিতে এ কীসের প্রতিধ্বনি?

এক সেনা-অফিসার বাইরে বেরোতেই দেখে, ঘোড়ার পিঠে ডানহাতে তলোয়ার উঁচিয়ে ক্রোধান্বিত অবয়বে ছুটে আসছে আতসিয। ভয়ে গাদ্দাররা সুলতানকে ফেলে রেখে দ্রুত সটকে পড়ে। সুলতান সানজার সেলজুকি কিছু বুঝে উঠতে না-পেরে বাইরে আসেন। হতভম্ব চোখে দেখতে থাকেন ছুটে-আসা আতসিযকে। আতসিয কাছে এসে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামতেই বুকের সঙ্গে তাকে জড়িয়ে ধরেন তিনি। আবেগ-কম্পিত গলায় বলেন, তুমি কীভাবে জেনেছ আমি এই অবস্থার মধ্যে পড়েছি?

আতসিয হাঁপাতে হাঁপাতে বলেন, জাহাঁপনা, আমি তাঁবুতে গা এলিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ ভয়ানক স্বপ্ন দেখে আমার ঘুমটা ভেঙে যায়। আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার মনে ইলহাম হয় যে, তোমার মনিব সানজার সেলজুকি বিপদে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে লাফ দিয়ে উঠে পড়ি আমি। দ্রুত ঘোড়া হাঁকিয়ে ছুটে আসি এখানে।[১৫]

---

[১৫] জাহাঁকুশা ২/৩

ইতিহাসে সুলতান সানজার সেলজুকির বীরত্ব, দানশীলতা ও উপকারকারীর বদলা-প্রদানের কথা প্রসিদ্ধ। তিনি আতসিযকে অনেক পুরস্কার প্রদান করলেন। তাকে বানিয়ে নিলেন নিজের একান্ত প্রিয়ভাজন। এরপর যখনই আতসিযের এই ঘটনা তার মনে হয়েছে, নিজেকে অনুগ্রহপ্রাপ্ত ভেবে দুর্বল হয়ে পড়েছেন। মাঝেমধ্যে অসন্তোষজনক কর্মকাণ্ড করেছে আতসিয। তিনি চোখ বুজে সব সহ্য করেছেন; কিছু বলেননি। কিছুদিন পর যখন আতসিয নিজেকে খাওয়ারিজমের স্বাধীন শাসক ঘোষণা করলেন, তখনও সেদিনকার অনুগ্রহের কথা ভেবে তিনি কোষমুক্ত করেননি তরবারি।

ইল আরসালান

মুজাফফর উদ্দীন আতসিয ৩১ বছরব্যাপী শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তারপর ৫৫১ হিজরি মোতাবেক ১১৫৬ খ্রিষ্টাব্দে তার মৃত্যু হয়। মুজাফফর উদ্দীনের স্থলাভিষিক্ত হন পুত্র আবুল ফাতাহ ইল আরসালান। ইল আরসালানের সাত বছরব্যাপী শাসনকার্যে খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যে তেমন প্রবৃদ্ধি ঘটেনি। তার পুরো রাজত্বকাল কেটেছে অভ্যন্তরীণ দাঙ্গা ও ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায় এবং পার্শ্ববর্তী সাম্রাজ্যগুলোর সাথে সন্ধি স্থাপনের প্রচেষ্টায়। এতেও তার বিশেষ কোনো সাফল্য দেখা যায়নি। অবশেষে তিনি ৫৫৮ হিজরি মোতাবেক ১১৬৩ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

সুলতান শাহ ও আলাউদ্দীন তাকিশ

ইল আরসালানের মৃত্যুর পর, ক্ষমতা-দখলের জন্য তার দুই ছেলে সুলতান শাহ ও আলাউদ্দীন তাকিশের ভেতর শুরু হয় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। সেই সংঘর্ষের অগ্নিশিখা থেমে থেমে কয়েক বছর পর্যন্ত প্রজ্বলিত থাকে। শেষমেশ ৫৮৯ হিজরির কোনো-এক দিনে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু ঘটে সুলতান শাহের। আলাউদ্দীন তাকিশ তখন নির্বিঘ্নে সিংহাসন দখল করে নেন।

একসময় দুই ভাইয়ের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল প্রচণ্ড গৃহযুদ্ধ। এবার ভাই মারা যাওয়াতে তিনি রাজধানী আরগেঞ্চকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এলেন। এর আগে অবশ্য কিছুদিন ভাই সুলতান শাহও এখানে কর্তৃত্ব করেছিল। কিন্তু তার সেই কর্তৃত্ব পূর্ণতা পায়নি।

প্রিয় পাঠক, মনে থাকে যেন, পুরো সাম্রাজ্যের নাম হল খাওয়ারিজম। আরগেঞ্চ তার রাজধানী। কিন্তু সব ধরনের পাঠক এবং ঐতিহাসিকদের একটা বড় অংশ এই দুটোকে গুলিয়ে ফেলেন। আরগেঞ্চ শহরকেও খাওয়ারিজম বলে ডাকতে থাকেন।

সুলতান শাহের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আলাউদ্দীন তাকিশ একটুক্ষণের জন্যও স্থির হয়ে বসতে পারেননি। ভাই মারা গেলে ভাবেন, আপদটা এবার বিদেয় হল। ফলে নিশ্চিন্তির এক গভীর নিঃশ্বাস ফেলেন তিনি। প্রথমবারের মতো নিজের নামের সঙ্গে যুক্ত করেন সুলতান উপাধি। তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার মতো কেউ ছিল না তখন। যে-

কারণে পূর্বসূরিদের নকশা-কাটা সিংহাসন নিশ্চিন্তভাবে দখল করে থেকেছেন। তার সমস্ত চিন্তা, লোভ ও ষড়যন্ত্র ছিল বহিঃসাম্রাজ্য দখলের প্রতি। কীভাবে আয়ত্ত করা যায় বিভিন্ন অঞ্চল, সর্বক্ষণ সেই ছকই শুধু আঁকতেন তিনি।[১৬]

পার্শ্ববর্তী সাম্রাজ্যের চালচিত্র

সুলতান তাকিশকে সিংহাসনে বসে থাকতে দিন। আসুন, খাওয়ারিজমের পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলো থেকে একটু ঘুরে আসি।

হিজরি ষষ্ঠ শতকের শেষদিকের সময়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটাকে আগত সপ্তম শতাব্দীর প্রথম এক-চতুর্থাংশে ঘটে-যাওয়া সমস্ত বিপ্লবের প্রারম্ভিকা বলা যায়। এজন্য খাওয়ারিজমের পার্শ্ববর্তী সাম্রাজ্যগুলোর হালচিত্র নিরিখ না-করে আমাদের ইতিহাসের এই সফর পূর্ণতা পাবে না। তাই, তখনকার খাওয়ারিজমের আশপাশের রাজ্যগুলোর চিত্র আমরা নিম্নে দেখে উঠব।

তুর্কানেখাতা

খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের পূর্বদিকে মা-ওয়ারাউন-নাহারের বিশাল-বিস্তৃত মাঠ। সেই মাঠ পূর্বে যেতে যেতে একেবারে সাইহুন-নদীর তীর ছুঁয়ে ফেলেছে। ঠিক সেখানটায়, হিজরি ষষ্ঠ শতকের শেষদিকে ছিল তুর্কানেখাতার কর্তৃত্ব। তুর্কানেখাতা এক কঠিন হৃদয়ের যুদ্ধবাজ জাতি। এরা ছিল অমুসলিম। প্রাচীনকাল থেকে এখানেই বসবাস করছিল এরা। সাইহুন-নদীর ওপারের চীনা-তুর্কিস্তানের প্রায় সব এলাকা এদের মুঠোয় ছিল।

এ অঞ্চল যখন ইসলামি হুকুমতের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তখন থেকেই মুসলিমদের একটি বড় দল এখানে বাস করে আসছিল। যখন আব্বাসি খেলাফত ও সেলজুক সাম্রাজ্য ক্রমে-ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ছিল, সুযোগ বুঝে এখানে তখন প্রভাবশালী হয়ে ওঠে তুর্কানেখাতা। মুসলিম অধ্যুষিত আরও অনেক এলাকা তারা দখল করে নেয়। এমনকি ৫৩২ হিজরির (১১৪১ খ্রিষ্টাব্দ) ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন ইসলামি শহর বোখারা ও সমরকন্দও তাদের আয়ত্তে চলে আসে।

এখানকার মুসলিমরা তখন নিতান্ত নির্যাতিত ও নিষ্পিষ্ট জীবনযাপন করছিল। তুর্কানেখাতা সর্বদা সেলজুকি ও খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের শাসকদের প্রতিপক্ষ ছিল। সানজার সেলজুকির মতো একজন মহান বিজেতাও তাদের অধীনস্থ করতে পারেননি। যুদ্ধবাজ হওয়ার পাশাপাশি তুর্কানেখাতা ছিল খুবই চালবাজ, ভীষণ হুঁশিয়ার।

ওদিকে ঘুরি, সেলজুকি ও খাওয়ারিজমি শাসকরা পরস্পরের বিরুদ্ধে সারাক্ষণ জোঁকের মতো লেগেই ছিল। এই ফাঁকে তুর্কানেখাতা দ্বিগুণ শানিয়ে নিচ্ছিল

---

[১৬] তারিখুল কামিল লি ইবনিল আসির ৭/২২৫-২৩০, ৪১১-৪১৩; জাহাঁকুশা ২; ইবনে খালদুন ৫/৯০-৯১

স্থাপিতঃ ২০২০ইং

কারণে পূর্বসূরিদের নকশা-কাটা সিংহাসন নিশ্চিন্তভাবে দখল করে থেকেছেন। তার সমস্ত চিন্তা, লোভ ও ষড়যন্ত্র ছিল বহিঃসাম্রাজ্য দখলের প্রতি। কীভাবে আয়ত্ত করা যায় বিভিন্ন অঞ্চল, সর্বক্ষণ সেই ছকই শুধু আঁকতেন তিনি।[১৬]

পার্শ্ববর্তী সাম্রাজ্যের চালচিত্র

সুলতান তাকিশকে সিংহাসনে বসে থাকতে দিন। আসুন, খাওয়ারিজমের পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলো থেকে একটু ঘুরে আসি।

হিজরি ষষ্ঠ শতকের শেষদিকের সময়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটাকে আগত সপ্তম শতাব্দীর প্রথম এক-চতুর্থাংশে ঘটে-যাওয়া সমস্ত বিপ্লবের প্রারম্ভিকা বলা যায়। এজন্য খাওয়ারিজমের পার্শ্ববর্তী সাম্রাজ্যগুলোর হালচিত্র নিরিখ না-করে আমাদের ইতিহাসের এই সফর পূর্ণতা পাবে না। তাই, তখনকার খাওয়ারিজমের আশপাশের রাজ্যগুলোর চিত্র আমরা নিম্নে দেখে উঠব।

তুর্কানেখাতা

খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের পূর্বদিকে মা-ওয়ারাউন-নাহারের বিশাল-বিস্তৃত মাঠ। সেই মাঠ পূর্বে যেতে যেতে একেবারে সাইহুন-নদীর তীর ছুঁয়ে ফেলেছে। ঠিক সেখানটায়, হিজরি ষষ্ঠ শতকের শেষদিকে ছিল তুর্কানেখাতার কর্তৃত্ব। তুর্কানেখাতা এক কঠিন হৃদয়ের যুদ্ধবাজ জাতি। এরা ছিল অমুসলিম। প্রাচীনকাল থেকে এখানেই বসবাস করছিল এরা। সাইহুন-নদীর ওপারের চীনা-তুর্কিস্তানের প্রায় সব এলাকা এদের মুঠোয় ছিল।

এ অঞ্চল যখন ইসলামি হুকুমতের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তখন থেকেই মুসলিমদের একটি বড় দল এখানে বাস করে আসছিল। যখন আব্বাসি খেলাফত ও সেলজুক সাম্রাজ্য ক্রমে-ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ছিল, সুযোগ বুঝে এখানে তখন প্রভাবশালী হয়ে ওঠে তুর্কানেখাতা। মুসলিম অধ্যুষিত আরও অনেক এলাকা তারা দখল করে নেয়। এমনকি ৫৩২ হিজরির (১১৪১ খ্রিষ্টাব্দ) ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন ইসলামি শহর বোখারা ও সমরকন্দও তাদের আয়ত্তে চলে আসে।

এখানকার মুসলিমরা তখন নিতান্ত নির্যাতিত ও নিষ্পিষ্ট জীবনযাপন করছিল। তুর্কানেখাতা সর্বদা সেলজুকি ও খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের শাসকদের প্রতিপক্ষ ছিল। সানজার সেলজুকির মতো একজন মহান বিজেতাও তাদের অধীনস্থ করতে পারেননি। যুদ্ধবাজ হওয়ার পাশাপাশি তুর্কানেখাতা ছিল খুবই চালবাজ, ভীষণ হুঁশিয়ার।

ওদিকে ঘুরি, সেলজুকি ও খাওয়ারিজমি শাসকরা পরস্পরের বিরুদ্ধে সারাক্ষণ জোঁকের মতো লেগেই ছিল। এই ফাঁকে তুর্কানেখাতা দ্বিগুণ শানিয়ে নিচ্ছিল

---

[১৬] তারিখুল কামিল লি ইবনিল আসির ৭/২২৫-২৩০, ৪১১-৪১৩; জাইলুস সিলা ২; ইবনে খালদুন ৫/৯০-৯১

মাদরাসা ও মসজিদ
স্থাপিতঃ ২০২০ইং

নিজেদের শক্তি। কখনও বিরোধীপক্ষের মুখোমুখি হয়ে গেলে তাদেরকে পুরোপুরি ধরাশায়ী করে ফেলত। সুযোগ পেয়ে তারা শক্তিপরীক্ষার জন্য মিত্রবাহিনীকেও মাঝেমধ্যে ডাক দিয়ে বসত—এসো, কাদের জোর কেমন, দেখে নেওয়া যাক!

এরা কেমন চতুর ছিল দেখুন। মুসলিম এলাকাগুলোর, যেমন বোখারা ও সমরকন্দের সাধারণ মুসলিমদের মহল্লায় মুসলিম জনসাধারণের আত্মপ্রসাদের উদ্দেশ্যে তারা কোনো মুসলিম গভর্নর নিযুক্ত করে রাখত। উদ্দেশ্য ছিল—আমজনতা যেন কোনো ইস্যুতেই তুর্কানেখাতার বিরুদ্ধে ক্ষেপে না-ওঠে। নিয়োজিত মুসলিম গভর্নর যেন দমন করে রাখতে পারে তাদের। গভর্নরেরও নিজস্ব কোনো শক্তি ছিল না। সে ছিল তুর্কানেখাতাদের হাতের পুতুল মাত্র।

আব্বাসি খেলাফতের প্রাণকেন্দ্র বাগদাদ

দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে, যেখানটায় খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের সীমানা শেষ হয়েছে, সেখান থেকে শুরু হয়েছে আব্বাসি খেলাফতের সীমানা। সীমান্ত পেরিয়ে ভেতরের দিকে গেলে একের পর এক আব্বাসি খেলাফতের করতলগত সব ভূমি।

আব্বাসি খেলাফত মূলত কয়েকটি প্রদেশ নিয়ে গড়ে উঠেছিল। তখনও মদিনাতুল উলুম (জ্ঞানের শহর) বাগদাদই ইসলামি খেলাফতের প্রধানকেন্দ্র। কিন্তু খেলাফত-ব্যবস্থার সেই পড়ন্ত বেলায় আব্বাসি খলিফাদের ভিত্তি একদম নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিল। মুসলিমবিশ্বের এই প্রাণকেন্দ্র ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে পড়েছিল।

বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলিম সুলতানদের সাথে খেলাফতের প্রাণকেন্দ্র বাগদাদের কোনো সম্পর্ক আর অবশিষ্ট ছিল না। মাঝেমধ্যে কখনও শুধু টুকটাক হাদিয়া-তোহফা আদানপ্রদান হতো। একে অন্যকে শুভকামনা জানাতে পাঠিয়ে দিত প্রতিনিধি। এ হচ্ছে সম্পূর্ণ ফাঁপা সম্পর্ক। খেলাফতের পক্ষ থেকে নতুন কোনো আঞ্চলিক শাসক নিযুক্ত হলে, খলিফার তরফ থেকে বরকতস্বরূপ তার কাছে লিখিত পরোয়ানা পাঠিয়ে দেওয়া হতো। এরপর কোনো যোগাযোগের বালাই থাকত না।

এসব তারা তখনই করত, দীর্ঘদিন পর যখন মনে হতো, সম্পর্কে কেমন ভাটা পড়ে যাচ্ছে, একজোট হওয়া দরকার। অন্তর্দ্বন্দ্ব তৈরি হলে কোনো স্বাধীনতাকামী শক্তিশালী শাসক বাগদাদের বিরুদ্ধে বাহিনী প্রেরণ করে বসত আচমকা। তেমনি খেলাফতে বাগদাদও প্রতিদ্বন্দ্বীদের ঘাড় না-মটকানো পর্যন্ত স্বস্তি পেত না।

সেই বিপন্নতার কালেও মুসলিমবিশ্বের বড় বড় শায়েখ, ফকিহ, মুহাদ্দিস, দার্শনিক ও হাকিম নিরবচ্ছিন্নভাবে ইলম ও হেকমতের অফুরন্ত আলো জ্বেলে যাচ্ছিলেন। সেই সময়েই ফারগানার শায়খুল ইসলাম বোরহানুদ্দীন মারগিনানি ফিকহে হানাফির সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ও প্রসিদ্ধ কিতাব হেদায়া রচনা করেছিলেন।

আলেমদের সম্রাট আলাউদ্দীন কামানি সেই অবক্ষয়ের মাঝে বসেই লিখেছিলেন বাদাইউস সানাই-এর মতো পৃথিবীবিখ্যাত গ্রন্থ। হেরাতে ইমাম ফখরুদ্দীন রাজি

হেকমত ও ইলমে কালামের মুক্তো ছড়াচ্ছিলেন। মুজামুল বুলদানের লেখক ইয়াকুত আল-হামাবি ও তারিখুল কামিলের লেখক ইবনুল আসির মুসিলির মতো বিখ্যাত ইতিহাসবেত্তার আবির্ভাব তখনই ঘটেছিল।

রাজনৈতিক বিবেচনায় ঠিকই অকেজো হয়ে পড়েছিল বাগদাদ; কিন্তু তা হয়ে উঠেছিল হাজারও আলেম ও সুফিসাধকের ইলম ও মারেফাতের পুণ্যভূমি। যে-জন্য আজও বাগদাদকে মুসলিমবিশ্বের প্রাণকেন্দ্র বলতে এতটুকু বাধে না। ইমাম বাহিলি ও আবদুল কাদির জিলানি দীর্ঘকাল বাগদাদে অবস্থান করে লোকদের ইসলাহের জন্য কাজ করে যাচ্ছিলেন। অধঃপতিত মুসলিমবিশ্বের প্রতিজন সদস্যকে আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলীয়ান করে তুলছিলেন। আল্লামা ইবনুল জাওযি ফিকহ-হাদিস, রিজালশাস্ত্র ও ইতিহাসবিষয়ক কয়েকশ গ্রন্থই শুধু রচনা করেননি, বাগদাদের যে রুহানি শক্তি লোপ পেয়েছিল, তা জাগিয়ে তুলবার জন্য সেখানকার লক্ষ লক্ষ বাসিন্দাকে জড়ো করে উপদেশমালা শোনাতেন। তার মুখনিসৃত প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বাক্য দারুণ প্রভাবক ছিল। তখনকার খলিফা, মন্ত্রী ও শাহজাদারা পর্যন্ত সেই অমূল্য নসিহত শুনতে মজলিশে এসে হাজির হতেন।

শায়েখ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দির মতো বুজুর্গও সে-সময় বাগদাদবাসীর সংশোধনে নিমগ্ন ছিলেন। তার থেকেই তাসাওউফের প্রসিদ্ধ সিলসিলা সোহরাওয়ার্দিয়ার উদ্ভব ও বিকাশ। কিন্তু এই পূর্ণাঙ্গ মেহনত-মুজাহাদার পরেও কেউ জেগে উঠল না। শাসক ও প্রজাদের ভেতর সেই বিভেদ ও অনৈক্য পূর্ববৎ থেকে গিয়েছিল। একটুও কমেনি; বরং বেড়ে চলছিল দিনের পর দিন।

আঞ্চলিক গভর্নরদের মধ্যে বেড়ে গিয়েছিল সুদগ্রহণের প্রবণতাসহ নানান কুকর্ম। বিভিন্ন জায়গির দখলের নেশা তাদের উন্মত্ত করে তুলেছিল। ভয়ানক ব্যাপার হল—বিভিন্ন দলের ভেতর ইখতিলাফের (শরয়ি মাসআলা-কেন্দ্রিক মতবিরোধ) রোগ তখন প্রকট হয়ে উঠেছিল। মাজহাব নিয়ে এমনকি পথেঘাটে পর্যন্ত চলত অনর্থক তর্কালাপ। খেলাফত ও শাসকশ্রেণির ভেতরেও এই মতবিরোধের ফলে গোপনে-গোপনে পৃথক পৃথক দল গড়ে উঠছিল। এই মতভিন্নতাই ছিল বাগদাদ সাম্রাজ্যের ধ্বংস ও আব্বাসি খেলাফতের পতনের মূল কারণ।

আলাউদ্দীন তাকিশ খাওয়ারিজম শাহের ক্ষমতাগ্রহণের সময় বাগদাদের খলিফা ছিলেন আবুল আব্বাস নাসির। তিনি ৫৭৫ হিজরিতে (১১৭৯ খ্রিষ্টাব্দ) ২২ বছর বয়সে খেলাফতের পদ লাভ করেছিলেন। তখন বাগদাদে খেলাফত-ব্যবস্থা ছিল ঠিকই; কিন্তু ইসলামি খেলাফতের সঠিক নিয়মকানুনের অনুসরণ ছিল না। দুর্বল হয়ে পড়েছিল সার্বিক কাঠামো। শাসকরা এড়িয়ে যেতেন খেলাফতের দায়বদ্ধতা। প্রজারা এড়িয়ে চলত খোদ শাসকদের। আমির ও আঞ্চলিক শাসকরাও ছিলেন পুরোপুরি স্বাধীন। খেলাফতের কোনো বাগডোর ছিল না তাদের গ্রীবায়। আপন ইচ্ছা অনুযায়ী পরিচালনা করতেন রাজ্য। সেক্ষেত্রে খুব বেশি সীমালঙ্ঘনও করতেন। খলিফা নাসির

ক্ষমতাগ্রহণ করতেই খেলাফতের বাচ্চাকাচ্চারা (আঞ্চলিক শাসকরা) বুকটান করে নিজেদের স্বাধীন অস্তিত্বের জানান দিতে লাগল। ফলে বাগদাদের পূর্ব রূপ ফিরিয়ে আনাই হয়ে ওঠে খলিফা নাসিরের প্রধান লক্ষ্য। বাইরের কোনো মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রতি নজর দেবার ফুরসত তার ছিলই না।

অন্যান্য মুসলিম সাম্রাজ্যে বাগদাদের খেলাফত-বিরুদ্ধ যেসব কর্মকাণ্ড ঘটত, তার সংবাদ ঠিকই খলিফার কাছে চলে আসত। কিন্তু সে-ব্যাপারে তিনি আক্রমণাত্মক কোনো সিদ্ধান্ত নেননি কখনও। শুধু সংবাদটুকু পাওয়া পর্যন্তই সীমিত ছিল; আর কিছু না। তবে দ্রুত বার্তা-সংগ্রহের কাজে তিনি নিঃসন্দেহে সর্বদা সফল ছিলেন। তার গুপ্তচর নিয়োগের পদ্ধতি পৃথিবীর ইতিহাসে সত্যিই বিরল। বাগদাদে বসেই দিল্লির রাজপ্রাসাদের ভেতর কী ঘটেছে, কী আলাপ-আলোচনা হয়েছে, জেনে যেতেন অল্পক্ষণে। তার আমলারা নিজেদের ভেতরকার কোনো গোপন বৈঠকেও খলিফার বিরুদ্ধে কিছু বলার সাহস পেত না। তাদের ভয় ছিল—কে জানে গোপনে কে খলিফার পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করছে!

দূরদেশ থেকে কাফেলা ফিরে আসবার আগেই সে-অঞ্চলে কী কী ঘটেছে, আঙুলে গুনে গুনে সব বলে দিতে পারতেন তিনি। এতই সূক্ষ্মভাবে তিনি সক্রিয় গোয়েন্দা নিযুক্ত করে রাখতেন। গোয়েন্দা-নিয়োগের এই অসামান্য সফলতার কারণে দূরদূরান্তের সব এলাকা তাকে ভয়ও পেত প্রচণ্ড। এতে সবার উপর একপ্রকার প্রতিপত্তি গড়ে উঠেছিল তার। এ কারণে তিনি ভেতর-বাইরের সব ষড়যন্ত্র থেকে বেঁচে যেতে পেরেছিলেন।

খলিফা নাসির যদি এই দূরদর্শিতা, বুদ্ধিমত্তা ও পরিকল্পিত গুপ্তচরবৃত্তি উম্মাহর উপকারিতায় কাজে লাগাতেন, মুসলিমবিশ্বের জন্য বড়ই সৌভাগ্যের ব্যাপার হতো! দুঃখজনক বাস্তবতা হল, প্রতিবেশী মুসলিম সাম্রাজ্যগুলোতে কাফেরদের আক্রমণকালে তিনি শুধু উদাসীনই থাকেননি, বরং খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের বরবাদির পেছনে ছিল তারই হাত।[১৭]

সিরিয়া ও মিশর সাম্রাজ্য

বাগদাদের পশ্চিমে অবস্থিত ছিল সিরিয়া ও মিশর সাম্রাজ্য। সেই সাম্রাজ্যে ছিল মহান মর্দে মুজাহিদ সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবির কর্তৃত্ব। সুলতান আইয়ুবি ছিলেন মজলুম উম্মাহর শত বছরব্যাপী দোয়া ও কান্নার এক সমৃদ্ধ ফসল। বিগত এক শতাব্দীকাল ধরে ক্রুসেডারদের উপর্যুপরি আক্রমণে মুসলিমবিশ্ব ক্রমাগত লন্ডভন্ড হচ্ছিল। সম্মুখসমরে খ্রিষ্টানদের যে দাঁতভাঙা জবাব দিতে নামবে, আব্বাসি খেলাফতের সেই শক্তিটুকু ছিল না।

---

[১৭] খলিফা নাসিরের খেলাফতের সময়কাল ছিল ৪৭ বছর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। উমাইয়া ও আব্বাসি খলিফাদের মধ্যে কেউ-ই এতো দীর্ঘ সময় রাজত্ব করতে পারেননি।

একসময়কার মানসুর, হারুনুর রশিদ, মামুনুর রশিদ ও মুতাসিম বিল্লাহর মতো মহান খলিফাদের যুগ পৌরাণিক উপকথায় পরিণত হয়েছিল। খেলাফতের মূলকেন্দ্র থেকে সকল প্রদেশ হয়ে গিয়েছিল বিচ্ছিন্ন। বিশেষত, মিশরের ফাতেমি শিয়াদের শাসন ইসলামি খেলাফতের মূলকেন্দ্র বাগদাদকে চুরমার করে দিতে এতটুকু কার্পণ্য করেনি।

এই অবস্থাতেও মালিক শাহ সেলজুকির মতো সাহসী এক মুজাহিদ ইসলামি সীমান্ত রক্ষার গুরুদায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছিলেন। যতক্ষণ ময়দানে তিনি সক্রিয় থেকেছেন, ক্রুসেডাররা সামনে এগোবার সাহস করে ওঠেনি।

পঞ্চম শতকে মালিক শাহের মৃত্যু হয়ে গেল। সিংহমুক্ত সাম্রাজ্য পেয়ে ক্রুসেডাররাও দৈত্যের মতো এসে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল মুসলিমবিশ্বের দোরগোড়ায়।

৪৯২ হিজরি (১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দ)। রজব মাস। ক্রুসেডীয় সাম্রাজ্যের ঐক্যবদ্ধ শক্তি অবরুদ্ধ করে ফেলল পুরো বাইতুল মুকাদ্দাস। সেই অবরোধ বলবৎ রইল ৪২ দিন। শহরবাসীর জন্য বাইরের কোনো মুসলিম সাম্রাজ্য থেকে সাহায্য আসছিল না। এমনকি খ্রিষ্টানরা শাবান মাসে শহরের ভেতর ঢুকে পড়েছিল। কয়েক সপ্তাহ ধরে মুসলিম এলাকাগুলোতে গণহত্যা চালাল তারা। শুধু মসজিদে আকসাতেই শহিদ হয়েছিল ৭০ হাজারেরও অধিক লোক। চারপাশে তখন বয়ে চলছিল রক্তস্রোত। ক্রুসেডারদের শত শত ঘোড়ার খুর ডুবে যাচ্ছিল সেই রক্তের বন্যায়। এরপর প্রায় এক শতাব্দী ধরে প্রথম কেবলা হারাবার বেদনায় ছটফট করেছে মুসলমান। শেষমেশ আল্লাহ তায়ালা খ্রিষ্টানদের কবল থেকে মসজিদে আকসাকে পুনরুদ্ধারের জন্য দুর্বিনীত সাহসিকতা দিয়ে সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবিকে পাঠালেন।

৫২৭ হিজরি, ১১৭২ খ্রিষ্টাব্দ। সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবি চূর্ণবিচূর্ণ করে দিলেন ফাতেমি শিয়া-সাম্রাজ্য। মিশরে পাকাপোক্ত করে ফেললেন অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা। অভ্যন্তরীণ শত্রুদের কুটিল চক্রান্ত নস্যাৎ করে ৫৬৯ হিজরিতে (১১৭৪ খ্রিষ্টাব্দ) আক্রমণ চালান ক্রুসেডারদের এলাকায়। ১৪ বছর ধরে জিহাদ চালিয়ে মুক্ত করেন বাইতুল মুকাদ্দাস। দীর্ঘ ৯১ বছর বেহাত থাকার পর ৫৮৩ হিজরির রজব মাসে (১১৮৭ খ্রিষ্টাব্দ) মুসলিমদের সিজদায় পুনরায় আবাদ হয়ে ওঠে প্রথম কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাস।

বাগদাদ ও খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য তখন অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত। যখন সুলতান সালাহুদ্দীনের বাহিনী ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে শেষযুদ্ধ হিসেবে বাইতুল মুকাদ্দাস আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন বাগদাদের খলিফা নাসির উজিরে আজম মাজদুদ্দীনের সঙ্গে স্নায়বিক যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। এবং ৫৮৯ হিজরির রজব মাসে (১১৯৩ খ্রিষ্টাব্দ) ২০ বছরব্যাপী জিহাদি খেদমত আঞ্জাম দিয়ে সালাহুদ্দীন আইয়ুবি যখন রবের সান্নিধ্যে নিজেকে সোপর্দ করছিলেন, খাওয়ারিজমে তখন সুলতান আলাউদ্দীন তাকিশ আপন ভাইয়ের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে ফারেগ হচ্ছিলেন ২০ বছরের গৃহযুদ্ধ থেকে। কী আজব বাস্তবতা!

সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবির মৃত্যুর পর তার ছেলেদের ও তার ভাই আল-মালিকুল আদিলের ভেতর ক্ষমতা-দখলের যুদ্ধ বেধে গিয়েছিল। শেষে আল-মালিকুল আদিল পুরো সিরিয়া ও মিশরে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে ফেলেন।

৬১৫ হিজরি সনে (১২১৮ খ্রিষ্টাব্দ) আল-মালিকুল আদিলের মৃত্যু ঘটে। তার সন্তানেরা তখন নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয় সাম্রাজ্য। দুঃসাহসী পুত্র আলমালিকুল কামিল হয়ে যায় মিশরের গভর্নর। দ্বিতীয় পুত্র আলমালিকুল মোয়াজ্জম ঈসা আল-কুদস এলাকা সামলাতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। তৃতীয় পুত্র আল-মালিকুল আশরাফ মুসা নিয়ে নেয় খিলাত ও আলজেরিয়ার ক্ষমতা। চতুর্থ ছেলে আল-মালিকুল মুজাফফর শিহাবুদ্দীন লাভ করে রুহা ও মায়াফারকিনের কর্তৃত্ব। মোটকথা, সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবির মৃত্যুর দু-বছরের ভেতর তার গড়া বিশাল সাম্রাজ্য তার ভাই ও পুত্রদের হাতে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে পড়ে।[১৮]

ঘুর সাম্রাজ্য

সুলতান তাকিশ সবেমাত্র রাজত্ব লাভ করেছেন, এমন সময় খাওয়ারিজমের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল (বর্তমান আফগানিস্তান) থেকে উঠে আসছিল ঘুর সাম্রাজ্যের অপ্রতিরোধ্য কালো ঝড়। সেই সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল ফিরোজেকুহ। সেখানকার শাসনকর্তা ছিলেন সুলতান গিয়াসুদ্দীন ঘুরি। গিয়াসুদ্দীন তার ছোটভাই শিহাবুদ্দীনকে গজনির সিংহাসনে বসিয়ে সুলতান মাজদুদ্দীন উপাধি প্রদান করেন। সে আলোচনা অবশ্য ভিন্ন। তবে ইতিহাসে তাকে শিহাবুদ্দীন ঘুরি নামেই স্মরণ করা হয়। এই দুই ভাই পৃথক পৃথক অঞ্চলের সুলতান হয়ে উঠেছিলেন।

শিহাবুদ্দীন ঘুরি তবু নিজেকে সবসময় ছোটভাই-ই মনে করেছেন। সুলতান হয়ে যাওয়াতে বড়ভাইয়ের সামনে কোনোদিন কোনো-প্রকার ডাঁট কিংবা অহমিকা প্রদর্শন করেননি। বড়ভাই গিয়াসুদ্দীনের অধীনস্থ হয়ে থেকেছেন জীবনভর। তারা দুজন খুব মিলেমিশে রাজত্ব করে যাচ্ছিলেন। ইতিহাসে সত্যিই এমন ঘটনার দেখা পাওয়া ভার।

হিন্দুস্থানের মূর্তিপূজকদের বিরুদ্ধে শিহাবুদ্দীন ঘুরির তরবারি সর্বদা খাপমুক্ত ছিল। ওদিকে গিয়াসুদ্দীনের ভয়ে উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব এলাকাগুলো (খাওয়ারিজমি শাসকরা ও তুর্কানেখাতা) কাঁপছিল রীতিমতো। তবে এই দুই ভাই কখনও তাদের যোগ্যতা ও শক্তিমত্তা নিজেদের বিরুদ্ধে ব্যয় করেননি। সবসময় একজোট হয়ে বহিঃশক্তির মোকাবেলা করে গেছেন।

৫৮৭ হিজরিতে তুরাউড়ির ঐতিহাসিক ময়দানে শিহাবুদ্দীন ঘুরি ও দিল্লির হিন্দু রাজা পৃথ্বীরাজের মধ্যে সংঘটিত হয় যুদ্ধ। সেদিন পৃথ্বীরাজের ১৫০ আমলা নিজেদের অধীনস্থ পৃথক পৃথক সৈন্যদল নিয়ে ময়দানে নেমে এসেছিল। হাতির সংখ্যাই ছিল ৩ হাজারের অধিক। অশ্বারোহী ছিল ৩ লাখ। পদাতিক অসংখ্য। তারা মৌমাছির মাতাল ঝাঁকের মতো এগিয়ে আসছিল।

---

[১৮] আল-বিদায়া ৭/৯৩-৯৬; তারিখুল কামিল ৭/২২৫-২৩০; ৪১১-৪১৩, ইবনে খালদুন ৫/৯১

শিহাবুদ্দীন ঘুরির জানবাজ মুজাহিদরা তাদের তুলনায় উল্লেখযোগ্য কোনো সংখ্যাই ছিল না; কিন্তু তাদের সাথে আল্লাহর সাহায্য ছিল। হিন্দুরা সেদিন নির্মম পরাজয় বরণ করেছিল। প্রাণভয়ে পালাতে চেয়েছিল রাজা পৃথ্বীরাজ। কিন্তু সে মারা পড়ে। এবং ভারতবর্ষের জমিনে ঘুরি রাজবংশের হাতে প্রবল বাতাসে পতপত করে ওঠে ইসলামি হুকুমতের ঝান্ডা।

এই সফলতার পর, সুলতান শিহাবুদ্দীন ঘুরি লাগাতার কয়েক বছর ধরে অভ্যন্তরীণ আরও অনেক বিজয় অর্জন করেছিলেন। নবজাগ্রত ঘুর সাম্রাজ্যের জোয়ার বিস্তৃত করেছিলেন গজনি থেকে বাঙ্গাল মুলুক পর্যন্ত।

ঘুর বংশের এই আচমকা উন্নতি খাওয়ারিজমি সুলতানদের জ্বলন-পোড়নের কারণ হয়ে ওঠে। মূলত এ ছিল কুদরতে ইলাহিরই ফরমান ও ফয়সালা। কারণ, ওদিকে ঘুরি শাসকরাও নিজেদেরকে গজনির শাসকদের অধীনস্থ করে রেখেছিলেন; কিন্তু গোপনে-গোপনে চালাচ্ছিলেন গজনি সাম্রাজ্যের সকল অঞ্চলে ক্ষমতা-বিস্তারের পাঁয়তারা। দক্ষিণে তারা যুদ্ধাভিযান আঞ্জাম দিয়ে উঠেছিলেন ঠিকই; কিন্তু তখনও বাকি রয়ে গেছে উত্তরাঞ্চলের ঋণ।[১৯]

শিরাজের আতাবেগ

খাওয়ারিজমের পশ্চিমদিকে শিরাজ এলাকায় আতাবেগদের ছোটখাটো এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেখানকার শাসনকর্তা ছিলেন আতাবেগ সাআদ ইবনে জঙ্গি। শিরাজ ছিল খুবই নির্বিরোধ ও সন্ধিপ্রিয় সাম্রাজ্য। কারুর সাথে তর্কে জড়াতে চাইত না। 'চলো তুমি সেদিকে, বাতাস ছোটে যেদিকে'র মতো অবস্থা ছিল তাদের। খাওয়ারিজমি শাসকদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও শক্তিমত্তা একটু বেড়ে গেলেই আতাবেগরা তাদের 'জো হুকুম' ঠুকত। কিন্তু কখনও দুর্বল পেলে দুম করে বিদ্রোহও করে উঠত।

এই শিরাজ এলাকাই বিশ্ববিখ্যাত কবি শেখ সাদি শিরাজির জন্মভূমি। শেখ সাদির বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ বোস্তাঁয় শিরাজের আতাবেগদের প্রশংসা-সংবলিত কিছু কবিতা রয়েছে। সাদ বিন জঙ্গির নামের সাথে মিল রেখেই শেখ সাদি তার কবি-নাম রেখেছিলেন সাদি। খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের অবলুপ্তির পর থেকে এই রাজ্য তাতার-জাতিকে নিয়মিত ট্যাক্স প্রদান করে বসবাস করত।

ইরাকের সেলজুকগণ

সেলজুক সাম্রাজ্য কয়েক টুকরো হয়ে অধঃপতনের দোরগোড়ায় গিয়ে ঠেকেছিল। রায়, হামাদান ও ইরাকে শাসন করছিল তাদেরই একটি দল। তারা ইরাকি সেলজুক নামে প্রসিদ্ধ ছিল। দ্বিতীয় তুগরুল ছিলেন তাদের শেষসম্রাট। তিনি সুলতান তাকিশের সমকালীন শাসক। অসীম সাহসী ও দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ছিলেন তিনি। দৈহিক শক্তি ছিল অপরিমেয়। তার যুদ্ধপ্রিয় স্বভাব যেকোনো মুহূর্তে, যেকোনো ইস্যুতে খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের জন্য বিপদের কারণ হয়ে ওঠার মতো ছিল।

---

[১৯] তারিখুল কামিল লি ইবনিল আসির ৭/৪০০; ইবনে খালদুন ৫/৯৪; তারিখে মিল্লাত ৩

রোমের সেলজুকগণ

সেলজুক খানদানের আরেকটি দল রোম সাম্রাজ্য (বর্তমান তুরস্ক) দখল করে নিয়েছিল। তারা বহিরাগত ফিরিঙ্গিদের সাথেও যুদ্ধ করত, আবার খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের সাথেও ছিল তাদের দ্বন্দ্ব। কারণ, সেলজুকদের অভ্যন্তর থেকেই খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। সেলজুকদের পতনের সাথে-সাথেই যুগপৎভাবে ঘটেছিল খাওয়ারিজমিদের উত্থান। সেজন্য একটা রেষারেষি ছিল তাদের ভেতর। সেলজুকদের সবক'টি শাখা খাওয়ারিজমিদের আজন্ম প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবত। রোমের সেলজুকদের শাসনকার্য হিজরি সপ্তম শতকের শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। তাদের রাজধানী ছিল কাওনিয়া। সেখানকার শাসক ছিলেন প্রথম খসরু। তারপর তার ছেলে আলাউদ্দীন কায়কোবাদ। তিনি সুলতান তাকিশের উত্তরসূরিদের সমকালীন ছিলেন।

আজারবাইজানের আতাবেগগণ

আজারবাইজানের আতাবেগরা সেলজুক শাসকদের প্রতিপালিত গোষ্ঠী। এরাও মাঝেমধ্যে শক্তিশালী হয়ে উঠলে নিজেদের স্বাধীন শাসনকার্য কায়েম করে ফেলত। হিজরি সপ্তম শতকে সুলতান তাকিশের পৌত্র জালালুদ্দীন খাওয়ারিজম শাহের হাতে এই রাজ্যের পতন ঘটেছিল। আজারবাইজান সম্পূর্ণভাবে চলে এসেছিল খাওয়ারিজম শাহি সাম্রাজ্যের করতলে। কিন্তু কয়েক বছর পর পতন ঘটে গিয়েছিল স্বয়ং খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যেরও।

আলামুত

কাজবিন শহরের শেষ-সীমানায় রয়েছে সুউচ্চ পর্বতসারি। সীমান্তের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আছে সমুন্নত পর্বতমালা। পাহাড়ের চূড়াগুলি এতই উঁচু, মনে হয় বুঝি মেঘেদের সাথে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে আছে। উপরদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে ঘাড় পুরোপুরি ব্যথা হয়ে যায়। এই পর্বতসারির ভেতর বিশাল একটি দুর্গ ছিল। সেখানকার কাফেররা এর ঠিকাদারি করত। তাদের দোর্দণ্ড প্রতাপে শুধু খাওয়ারিজমই নয়, আশপাশের সব রাজ্যই গুটিয়ে থাকত নিজেদের ভেতর। দুর্গটি প্রতিষ্ঠা করেছিল হাসান ইবনে সাব্বাহ। এখানকার সর্বশেষ সম্রাট রোকনুদ্দীন ঘুরশাহ। বাগদাদ পতনের সঙ্গে-সঙ্গে হালাকু খানের হাতে এই হুকুমতেরও অবসান ঘটে।

ইরবিল

ইরাকের উপকণ্ঠে অবস্থিত একটি এলাকার নাম। এটি ছিল মুজাফফর উদ্দীনের স্বাধীন সাম্রাজ্য। বাগদাদের বহু নিয়ম-নীতি এখানে প্রচলিত ছিল।[২০]

---

[২০] তারিখে ইসলাম আকবর শাহ নজিবাবাদী ৩

উল্লিখিত সাম্রাজ্যগুলি ছাড়াও ছোট-ছোট অনেক স্বাধীন সাম্রাজ্য ছিল। খুব ত্বরিতগতিতে ঘটেছিল সেসবের উত্থান ও পতন। একই রকম পরিস্থিতি সিরিয়া, ইরাক ও বর্তমান তুরস্কের এলাকাগুলোতেও অনেক বেশি দেখা গেছে।

সুলতান আলাউদ্দীন তাকিশের শাসনকাল

সুলতান তাকিশের ছিল গুপ্তচরসুলভ মেজাজ। প্রখর অনুসন্ধানী দৃষ্টি ছিল তার। ৫৮৯ হিজরিতে ভ্রাতা সুলতান শাহের মৃত্যুর পর খাওয়ারিজমের পূর্ণ ব্যবস্থাপনার ভার গ্রহণ করেন তিনি। ক্ষমতালাভের সঙ্গে-সঙ্গে রাজ্যের চৌহদ্দি বাড়ানোর প্রতি মনোযোগ দেন। খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের শক্তি যখন সর্বোচ্চে, সেলজুক সাম্রাজ্য তখন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। অধঃপতনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন। ইরাকে, সেলজুক সাম্রাজ্যের সর্বশেষ স্থলাভিষিক্ত ছিলেন দ্বিতীয় তুগরুল।

সুলতান আলাউদ্দীন তাকিশ উপর্যুপরি কয়েকদিন আক্রমণ করে তুগরুলের সাম্রাজ্য কবজা করে ফেলেন। রায় ও হামাদানের মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরও তার আয়ত্তে চলে আসে। ধীরে-ধীরে খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের পরিধি বাড়তে বাড়তে ছুঁয়ে ফেলে বাগদাদের সীমানা।

খলিফা নাসিরের অস্থিরতা

খলিফা নাসির এই অবস্থা সহ্য করতে পারলেন না। তিনি খাওয়ারিজম শাহের কাছে দাবি জানালেন—তিনি যেন ইরাকের কিছু অঞ্চল খেলাফতে বাগদাদের অধীন করে দেন। সুলতান তাকিশ গ্রহণ করলেন না সেই দাবি। ফলে, এ দুই সাম্রাজ্যের ভেতরকার অবস্থা দিন-দিন খারাপ হতে থাকল। ৫৯২ হিজরিতে হামাদানে তাদের ভেতর বেধে উঠল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। অত্যন্ত নাজুকভাবে পরাজয় বরণ করল বাগদাদের সেনাবাহিনী। এর পূর্বেও তাকিশ ও বাগদাদের খলিফার মধ্যে দু-দুবার ছোটখাটো সংঘর্ষ হয়েছিল। কিন্তু এবারকার সংঘর্ষে বাগদাদের সৈনিকদের কোমর এমনভাবে দুমড়ে গেল, দ্বিতীয়বার তারা খাওয়ারিজম আক্রমণের হিম্মতই করে উঠতে পারেনি।

তুর্কানেখাতার দুঃখের দিন

খলিফা নাসিরকে শায়েস্তা করা শেষে সুলতান আলাউদ্দীন তাকিশ আঘাত হানতে চাইলেন তুর্কানেখাতার উপর। তুর্কানেখাতা নিঃসন্দেহে শক্ত এক যোদ্ধাজাতি ছিল। কিন্তু সুলতান তাকিশের শক্তি-সাহসেরও কোনো কমতি ছিল না। খাওয়ারিজম ও ঘুরি শাসকদের মধ্যকার সম্পর্ক খুবই খারাপ ছিল। তুর্কানেখাতার মতো একটি সংঘবদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়লাভ করে ওঠা কঠিন। এজন্য প্রয়োজন ছিল আরেকটি সংঘবদ্ধ শক্তির। সুলতান তাকিশ কী করবেন ভাবতে লাগলেন। হঠাৎ একদিন সুলতান গিয়াসুদ্দীন ঘুরির সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করে ফেললেন।

গিয়াসুদ্দীন ঘুরির পরামর্শে সুলতান তাকিশ বাগদাদের খলিফা নাসিরের সাথেও সম্পর্কটা ভালো করবার চেষ্টা শুরু করে দিলেন। খলিফাও রাজি হয়ে গেলেন তাতে। এভাবে সুলতান তাকিশ সর্বদিক থেকে আঁটঘাট বেঁধে, চারদিক থেকে স্থির-নিষ্কম্প-নিশ্চিন্ত হয়ে, তুর্কানেখাতার মোকাবেলায় জমিয়ে তুললেন দুর্দমনীয় শক্তি।

তুর্কানেখাতাও পূর্ব থেকে এমন একটি মুহূর্তের অপেক্ষাতেই যেন ছিল। তারপর একদিন, তুর্কানেখাতারাই স্বপ্রণোদিত হয়ে এসে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলল গুরগঞ্জ শহর। তাকিশের বাহিনী সারিবদ্ধ প্রাচীর হয়ে এই দুঃসাহসী যোদ্ধাদের সাথে লড়ে গেল। এতে তুর্কানেখাতার একটা বড় দল মারা পড়ল। পিছপা হয়ে পালিয়ে গেল অবশিষ্টরা।[২১]

হাসান ইবনে সাব্বাহর অনুসারীদের সাথে লড়াই

তুর্কানেখাতার যে নাজেহাল অবস্থা হয়েছিল, তার ক্ষত তখনও শুকোয়নি। এমনই একদিন সুলতান তাকিশ আরও একটি অভিযানে নামলেন। খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য দখল করে নিয়েছিল বর্তমান ইরানের অধিকাংশ এলাকা। ইরানের উত্তর-পশ্চিমে ঐতিহ্যবাহী এক প্রাচীন শহর ছিল কাজবিন। এই কাজবিন-সংলগ্ন অনতিক্রম্য পর্বতসারিতে একটি পাহাড় ছিল অনেক উঁচু। কারুর পক্ষে ডিঙোনো সম্ভব ছিল না। সেই পাহাড়ের চূড়ায় ছিল এক মজবুত দুর্গ। দুর্গের ভেতরে ছিল হাসান ইবনে সাব্বাহর বাহিনীর আস্তানা। দুর্গটির নাম আলামুত।

হাসান ইবনে সাব্বাহর সম্পর্ক ছিল ইসমাইলি ফেরকার সাথে। ইসমাইলিরা হিজরি ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝিতে এসে মিশর দখল করে নিয়েছিল। তারপর সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবি এসে তাদের গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন। হাসান ইবনে সাব্বাহ নিজেই তার মতাদর্শের মুজতাহিদ ছিল। ইসমাইলি আকিদা-বিশ্বাসে অনেকটাই পরিবর্তন ঘটিয়েছিল সে। সেখান থেকে কিছু রেখে কিছু বাদ দিয়ে গড়ে তুলেছিল এক নতুন মাজহাব।

তার মতাবলম্বীরা পুরো ইরান ও তুর্কিস্তানে ছড়িয়ে পড়েছিল। আলামুত ছিল তাদের সুরক্ষিত দুর্গ। এখানে বসেই তারা মিশন বাস্তবায়নের নিখুঁত পরিকল্পনা সাজাত। এটা ছিল তাদের অনেক নিরাপদ দুর্গ। দুর্গের আশপাশের পাহাড়ি এলাকাগুলোতে একক রাজত্ব করে বেড়াত তারা। পাহাড়-চূড়ার এই দুর্গে দাঁড়ালে নিচে বহুদূর পর্যন্ত চোখে ভাসত সবুজের মিছিল, ঝকঝকে রোদ, সবুজ-স্নিগ্ধ সব এলাকা। এই পরিবেশের ভেতর হাসান ইবনে সাব্বাহ যেন দুনিয়াতেই তার বেহেশত বানিয়ে নিয়েছিল। খুবই আরামপূর্ণ দুর্গ ছিল সেটি। আবার চাহিদা মেটাবার সব উপকরণও সেখানে ছিল। হাসান ইবনে সাব্বাহ তার এই স্বর্গে বসে অনুগতদের

---

[২১] রওজাতুস সফা ৪/৮১৫; ইবনে খালদুন ৫/৯৫

দীক্ষা দিত। নতুন যারা আসত, তাদের ফ্রিতে কিছুকাল থাকবার সুযোগ দিত। এবং এমনভাবে মগজ-ধোলাই করে ছাড়ত—যেকোনো সময় হাসানের আঙুলের ইশারায় জীবন বিকিয়ে দিতে পর্যন্ত প্রস্তুত থাকত তারা।

এজন্য তাদের ফেদাই বলে ডাকা হতো। হাসান ইবনে সাব্বাহ তাদের বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে বিভিন্ন সাম্রাজ্যে গোয়েন্দা হিসেবে নিয়োগ করত। হাসানের পক্ষ থেকে ইশারা পেতেই সেখানকার শাসকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত তারা। হাসান ইবনে সাব্বাহর এই কূটচালে পৃথিবীর প্রায় সব সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল আতঙ্ক। এজন্য সে কোনো দাবিদাওয়া করে বসলে বহির্বিশ্বের শাসকরা প্রয়োজনে সবকিছু মেনে নিত।

৫১৮ হিজরিতে হাসান ইবনে সাব্বাহ মারা গেল। কিন্তু তার স্থলাভিষিক্তরা দুর্গের ভেতরে থেকেই নিজেদের কর্মপদ্ধতি জারি রেখেছিল। তাদের রক্তপাতের ভয়ে, বলা যায়, মুসলিমবিশ্ব তখন গুটিয়ে গিয়েছিল। নেজামুল মুলক ও শিহাবুদ্দীন ঘুরির মতো দুঃসাহসী শাসকদেরও রক্ত ঝরিয়েছে এদের নির্দয় খঞ্জর। সুলতান সানজার, সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবি ও ইমাম রাজির মতো মহান ব্যক্তিরাও এদের রোষানলে পড়েছিলেন।[২২]

সুলতান আলাউদ্দীন তাকিশ ফেদাইদের এই ফেতনা একদম নির্মূল করে দিতে চাইলেন। এক বিশাল বাহিনী নিয়ে রওনা দিলেন আলামুত অভিমুখে। দীর্ঘ সময় ধরে অবরোধ করে রাখলেন দুর্গ। কিন্তু তবু ভেতরে প্রবেশ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তবে সুলতান তাকিশ তার তলোয়ারের জোরে এদের অন্য একটি দুর্গ জয় করে নিলেন। কিছুদিন পর ফেদাইরা তিরজিশ অঞ্চলে তাদের নতুন ঘাঁটি স্থাপন করে। পূর্বের মতো পুরোদমে মিশন আঞ্জামের কাজ শুরু করে দেয়।

এভাবেই দিন কাটছিল। হঠাৎ একদিন সুযোগ পেয়ে এক ফেদাই সেনা সুলতান তাকিশের মন্ত্রী নেজামুল মুলককে শহিদ করে ফেলল। সুলতান তাকিশ এই ঘটনায় অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গে শাহজাদা কুতুবুদ্দীন মুহাম্মদকে একটি শক্তিশালী বাহিনী-সমেত তিরজিশ আক্রমণের জন্য পাঠালেন। শাহজাদা এসেই ঘেরাও করে ফেলে পুরো তিরজিশ অঞ্চল। তারপর একসময় দুই দলের মাঝে বেধে ওঠে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। একটানা চার মাস এভাবেই কেটে যায়। শেষ পর্যন্ত প্রাচীর টপকে শহরের ভেতর প্রবেশ করা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি।

ওদিকে অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে ছিলেন সুলতান তাকিশ। তখন অবশ্য খানিকটা সুস্থ বোধ করছিলেন। তিনি যখন জানলেন তিরজিশের এই অবস্থা, সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন বাহিনী নিয়ে জোরদার আক্রমণের জন্য নিজেই রওনা হয়ে গেলেন।

---

[২২] হাসান ইবনে সাব্বাহ, আবদুল হালিম শরর প্রণীত ৫৬-৬০

রাজচিকিৎসকরা তাকে অসুস্থ শরীরে এই দীর্ঘ সফর করা থেকে বাধা দিয়েছিলেন বটে; কিন্তু তিনি নিবৃত হননি।

সফরকালে, সদ্য সুস্থ হয়ে-ওঠা সুলতানের দেহের অবস্থা পথিমধ্যে আগের চেয়ে গুরুতর হয়ে যায়। খুবই গুরুতর, কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিল না বেঁচে ওঠার। মাঝপথে তাই তাঁবু খাটিয়ে খানিক বিশ্রাম নিতে থামলেন। প্রজারা খুব করে দু-চারদিন সেবাযত্ন করলে কিছুটা সুস্থ হয়ে ওঠেন তিনি। সবকিছু গোছগাছ করে ফের তিরজিশের পথ ধরেন। কিন্তু তিরজিশ শহরে পৌঁছার আগেই ১৯ রমজান ৫৯৬ হিজরিতে (৩ জুলাই ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ) ২৪ বছর ধরে খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যে রাজত্ব-করা এই সম্রাটের মৃত্যু ঘটে।

এই দীর্ঘ ২৪ বছরের ভেতর খাওয়ারিজমের প্রধান ক্ষমতাকেন্দ্র সুলতান তাকিশের আয়ত্তেই ছিল। কেউ সেখানে হাত দেওয়ার সাহস করে ওঠেনি কখনও। এজন্য খাওয়ারিজমের প্রকৃত বীর শাসক তাকেই বলা যায়। ছোটভাই সুলতান শাহ অবশ্য ২০ বছর ধরে তার সঙ্গে লিপ্ত ছিল নিষ্ফল যুদ্ধে। কোনো সফলতা সে পায়নি শেষ পর্যন্ত। বলি, সুলতান তাকিশ যদি এই অনর্থক গৃহযুদ্ধে লিপ্ত না হতেন, উম্মাহর জান-মালের এমন ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হতো না।

সুলতান তাকিশের জীবন নিয়ে পর্যবেক্ষণ

সুলতান আলাউদ্দীন তাকিশ আলেমদের খুব শ্রদ্ধা করতেন। দীনি মাদরাসার সাথে তার খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। এমনকি তাকে দাফনও করা হয়েছিল সেই মাদরাসায়, যেটি তিনি নিজে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গৃহযুদ্ধ থেকে মুক্ত হয়ে তিনি খাওয়ারিজমের সিংহাসনে মাত্র ছয় বছর অধিষ্ঠিত থাকতে পেরেছিলেন। এই স্বল্পসময়েও অর্জন করেছেন কিছু বিস্ময়কর সাফল্য। তার মৃত্যুকালে সেলজুক সাম্রাজ্যের অভ্যন্তর থেকে গড়ে-ওঠা খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের সীমানা অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এশিয়ার সেলজুক সাম্রাজ্য এবং পূর্বাঞ্চলের ঘুরি খানদানের নতুন যুদ্ধবাজ শক্তি—এই দুই সম্প্রদায় ছাড়া তুর্কিস্তান ও ইরানের প্রায় সব এলাকা খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের অধীনে চলে এসেছিল। তাকিশের সফলতায় সবচেয়ে বড় ভূমিকা ছিল তার স্ত্রী সম্রাজ্ঞী তুর্কান খাতুনের। তুর্কান খাতুন ছিলেন তুর্কিদের জবরদস্ত যোদ্ধা জাতি কিপচাক গোত্রীয়। এই গোত্রের সরদারের একমাত্র কন্যা ছিলেন তিনি। সুলতান তাকিশ যখন তাকে বিয়ে করেন, কিপচাক তুর্কিদের একটি শক্তিশালী দল তার সহযোগী হয়ে ওঠে। এরপর প্রায় প্রতি রণাঙ্গনে তিনি খুব সফলভাবে তাদের ব্যবহার করেছেন।

রাষ্ট্রীয় অনেক বিষয়ে তুর্কান খাতুনের অপরিসীম অভিজ্ঞতা ছিল। সুলতান তাকিশ তাই প্রতিটি যুদ্ধে স্ত্রীর সব পরামর্শের প্রতি অত্যন্ত যত্নবান ও মনোযোগী থাকতেন।

তাকিশের যুদ্ধজয়ের সেই কৌশল, সেই ধারা তার সন্তান সুলতান আলাউদ্দীন মুহাম্মদ ও জালালুদ্দীন মুনকাবিরাতির মাঝেও যথেষ্ট পরিমাণে দেখা গেছে।[২৩]

আল্লামা ইবনে কাসির, ৫৯৬ হিজরিতে মৃত্যবরণকারী পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের তালিকায় সুলতান তাকিশের নাম প্রথমদিকে এনেছেন। তার ব্যাপারে তিনি লিখেছেন, 'সুলতান আলাউদ্দীন খাওয়ারিজম শাহ তাকিশ ইবনে আরসালান ছিলেন তাহের ইবনে হুসাইনের বংশধর। তিনি খাওয়ারিজম, খোরাসান, রায়নগরীসহ বিপুল-বিস্তৃত অঞ্চলের শাসক ছিলেন। তিনিই সেলজুকি শক্তিকে দ্বিখণ্ডিত করেছিলেন। ছিলেন ন্যায়বিচারক ও চরিত্রবান। সুর ও গীতিশাস্ত্রের প্রতি ঝোঁক ছিল তার। লোকদের সাথে ভালো ব্যবহার করতেন। ইমাম আবু হানিফার মাজহাব অনুসরণ করতেন। ফিকহশাস্ত্র খুব ভালো বুঝতেন। খাওয়ারিজমে হানাফিদের জন্য এক বিশাল মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি। সেই মাদরাসাতেই তাকে দাফন করা হয়।'[২৪]

তাকিশের ক্ষমাশীলতা ও সদাচারের একটি ঘটনা

একবার সুলতান তাকিশ এক প্রাচীর-বেষ্টিত শহর অবরোধ করলেন। শহরবাসী ভেতরে ক্রোধান্ধ হয়ে নিষ্ফল লম্ফঝম্পে মেতে ওঠে। তাদের কয়েকজন মিলে একটি কানা কুকুর ধরে আনে। কুকুরটার মাথায় পরিয়ে দেয় টুপি। এবং সেটার নাম রাখে খাওয়ারিজম শাহ। কারণ, সুলতান তাকিশের এক চোখ ছিল দৃষ্টিশক্তিহীন।

তারপর এই কুকুরটাকে নৃশংসভাবে কামানের ভেতর ঢুকিয়ে শহরের বাইরে টহলরত খাওয়ারিজমি সেনাদের সামনে গোলার মতো প্রবল শব্দে নিক্ষেপ করে। আচমকা আঁতকে ওঠে খাওয়ারিজম সেনারা। তারা লাফিয়ে উঠে শুনতে পায় ভেতর থেকে সমস্বরে শহরবাসীরা বলছে—'এই নে তোদের কানা বাদশাহ!'

তাকিশ দীর্ঘসময় অবরোধের পর শহর ঠিকই জয় করে নিলেন। কিন্তু, বিজয়ের পর শহরবাসীর এই ধৃষ্ঠতাপূর্ণ আচরণের কারণে তিনি তাদের কিছুই বলেননি। সম্পূর্ণ ক্ষমা করে দিলেন।[২৫]

---

[২৩] তারিখুল কামিল ৭/৪৪৩-৪৪৪; নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৬২; ইবনে খালদুন ৫/৯৫

[২৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৭/২৮

[২৫] তারিখুল কামিল লি ইবনিল আসির ৭/৪৩১

দ্বিতীয় অধ্যায়
সুলতান আলাউদ্দীন মুহাম্মদের ক্ষমতাগ্রহণ

পূর্বোক্ত তুর্কানেখাতার উপর আক্রমণ করতে এসে, অসুস্থ সুলতান আলাউদ্দীন তাকিশের মৃত্যুর পরেও তার অসাধারণ সাহসী শাহজাদা কুতুবুদ্দীন মুহাম্মদ তিরজিশ-অবরোধ অব্যাহত রেখেছিল। এমনকি শেষমেশ সন্ধি করতে বাধ্য হল শহরবাসী। চুক্তিপত্রও তৈরি করা হল। কুতুবুদ্দীন মুহাম্মদ উঠিয়ে নিলেন অবরোধ। তারপর দ্রুত রওনা দিলেন রাজধানীর পথে, আরগেঞ্চে।

৫৯২ হিজরি। শাওয়াল মাসের বিশ তারিখ। তুর্কানেখাতা থেকে আরগেঞ্চে পৌঁছলেন কুতুবুদ্দীন মুহাম্মদ। পৌঁছেই পিতার উপাধি গ্রহণ করে তিনি হয়ে গেলেন আলাউদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহ। আরোহণ করলেন খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের সিংহাসনে।[২৬] তার আসল নাম ছিল মুহাম্মদ। এজন্য অনেক ইতিহাসবিদ তাকে মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহ বলেও উল্লেখ করেছেন। সর্বদিক থেকেই পিতার যোগ্য উত্তরসূরি ছিলেন তিনি। সাহসিকতা ও বাদশাহিতে সে-যুগের বাদশাহ সিকান্দার বলা হতো তাকে। আরব ঐতিহাসিকরা খুব প্রশংসাভরে ইতিহাসে তার নাম ফুটিয়ে তুলেছেন।

পিতার মতো তিনিও ছিলেন ফিকহে হানাফির অনুসারী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের নিবেদিতপ্রাণ কর্মী; উত্তম আকিদাসম্পন্ন, দীনদার-বুজুর্গ ব্যক্তি। তার বীরত্ব ও আত্মমর্যাদাবোধ ছিল প্রচণ্ড, সুতীক্ষ্ণ।

এতসব ভালো দিক সত্ত্বেও তার কিছু গুরুতর ভুল ঘটেছিল, যা তার উজ্জ্বল কীর্তিমালাকে পুরোপুরি ম্লান করে দিয়েছিল। মুসলিমবিশ্বের পূর্বাঞ্চল থেকে আরম্ভ করে পশ্চিমাঞ্চল পর্যন্ত সমস্ত এলাকা পরিণত হয়েছিল ধ্বংসস্তূপে।

ঘুরিদের সাথে লড়াই

আলাউদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহ সিংহাসনে সবে জুত করে বসেছেন। প্রতিবেশী সাম্রাজ্যগুলোর কান তখন সজাগ হয়ে ওঠে। সবাই তাকে অবহেলার চোখে দেখতে লাগল। ভাবছিল তিনি বোধহয় অনভিজ্ঞ। গোপনে পাঁয়তারাও করছিল তার রাজ্যে আক্রমণের। হঠাৎ একদিন আফগানিস্তানের শাসক সুলতান গিয়াসুদ্দীন ঘুরি খাওয়ারিজম আক্রমণ করে বসেন। অথচ তার সাথে খাওয়ারিজম শাহের পিতা সুলতান আলাউদ্দীন তাকিশের সন্ধি হয়েছিল একসময়। গিয়াসুদ্দীন ভুলে গেলেন সেই চুক্তির কথা। জোরদার আক্রমণ চালিয়ে খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের নাসা, মার্ভ,

---

[২৬] জাহাঁকুশা ২/৪৮

সারখিস প্রভৃতি শহর কবজা করে নিলেন। এরপর আক্রমণাত্মক হস্ত প্রসারিত করেন তুস ও নিশাপুরে। অত্যন্ত সফলভাবে সে দুটো এলাকাও তিনি ঘুর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেন।

সিংহাসনে বসতেই আলাউদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহকে এমন ভয়ানক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হল। তিনি ভীষণ পেরেশান হয়ে গেলেন। ভেবে থই পাচ্ছিলেন না কী করবেন। শেষে ঘুরি শাসকের কাছে চিঠি লিখলেন—'আমি ভেবেছিলাম আমার পিতা মারা যাবার পর তুর্কানেখাতা যদি খাওয়ারিজমে আক্রমণ করতে আসে, আপনি আমার পাশে থাকবেন। কারণ পিতাজির সাথে আপনার চুক্তি হয়েছিল। এখন দেখি ঘটেছে উলটো ঘটনা। এটা কিন্তু বীরত্বের নিদর্শন নয়। শুনুন, আমার রাজ্য থেকে আপনার সেনাদের যদি উঠিয়ে না-নেন, আপনার বিরুদ্ধে তুর্কানেখাতার সাহায্য নিতে বাধ্য হবো আমি।'

সুলতান গিয়াসুদ্দীন ঘুরি চিঠির কোনো সন্তোষজনক জবাব দিলেন না। বাধ্য হয়ে ক্রুদ্ধ আলাউদ্দীন তরবারি হাতে রণাঙ্গনে নেমে এলেন। দুই দলে শুরু হয়ে গেল ঝনঝন যুদ্ধ।[২৭] দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকল ধাওয়া-পালটা-ধাওয়া। ফ্রন্ট লাইনে থেকে ঘুরি সৈনিকদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন সুলতান গিয়াসুদ্দীন ঘুরি। ওদিকে সুলতান শিহাবুদ্দীন ঘুরি হিন্দুস্থানের মাটিতে বিজয়ের অমরগাথা রচনায় ব্যস্ত। শিহাবুদ্দীনের দুর্দান্ত জিহাদ-যাত্রায় পেশোয়ার থেকে নিয়ে দিল্লি, তারপর সুদূর বাঙ্গাল পর্যন্ত সব এলাকা ইসলামি শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল।

একসময় হিন্দুস্থান থেকে তিনি বিজয়ীবেশে ভাইয়ের কাছে ফিরে যান। ফলে ঘুরিদের শক্তি আরও বেড়ে যায়। যুদ্ধ হয়ে ওঠে আরও জমজমাট। এর ভেতর একদিন গিয়াসুদ্দীন ঘুরি মারা যান। ফলে সুলতান শিহাবুদ্দীন ঘুরি নিজেই এই যুদ্ধের নেতৃত্ব দিতে থাকেন। আহ, উম্মাহর পারস্পরিক এই যুদ্ধ পুরো মুসলিমবিশ্বের জন্যই ছিল ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির কারণ। লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

একদিন চূড়ান্ত ফয়সালার জন্য সুলতান শিহাবুদ্দীন ঘুরি যুদ্ধে একদল হাতি ও বিরাট সেনাশক্তি নিয়ে খাওয়ারিজমের রাজধানীতে হামলা করতে বেরোলেন। খাওয়ারিজমি সৈনিকরা শক্ত করে এঁটে দিল শহরের প্রধান ফটক। এবং শহরের পেছন থেকে বেরিয়ে জাইহুন-নদীর বাঁধ কেটে দিল। সেই বাঁধের আশপাশেই ঘুরিদের তাঁবু টাঙানো ছিল। ছাড়া পেয়ে ভকভক করে বেরোতে লাগল নদীর উত্তাল স্রোতধারা। এই স্রোতধারায় ভেসে গেল ঘুরি সৈনিকদের ক্যাম্পের চারপাশ। তারা পড়ে গেল মরণদশায়। সেখান থেকে কোনোমতে বেঁচে বেরোতেই তাদের পুরো ৪০ দিন লেগেছিল।

---

[২৭] রওজাতুস সফা ৪/৮১৭; ইবনে খালদুন ৫/৯৫

এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় সৈনিকদের নিয়ে ব্যর্থ মনোরথে ফেরার পথ ধরলেন শিহাবুদ্দীন ঘুরি। পথে-পথে আবার ঝোপ বুঝে কোপ মারতে লাগল খাওয়ারিজমি সিপাহিরা। জায়গায় জায়গায় তারা ওত পেতে ছিল। ঘুরিদের উপর মাঝেমধ্যেই নেমে আসছিল খাওয়ারিজমি সৈনিকদের অতর্কিত আক্রমণের ধারালো খড়্গ। ওদিকে সুযোগ-মতো তুর্কানেখাতারাও আক্রমণ করে বসছিল। ফলে ঘুরিদের খুব কমসংখ্যক লোকই জীবিত ফিরতে পেরেছিল সেবার।

৬০১ হিজরি। কিছুদিন হল শাওয়াল মাস পড়েছে। শিহাবুদ্দীন ঘুরি এবার নতুন করে হিন্দুস্থান আক্রমণের জন্য বেরোলেন। পথিমধ্যে ঝিলাম নদীর কিনারায় তাঁবু খাটিয়ে সামান্য আরাম করছিলেন। হঠাৎ কোত্থেকে এক ফেদাই সেনা এসে চড়াও হয় তার উপর। দুজনের ভেতর অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তি চলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফেদাই সেনা খঞ্জর দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তাকে শহিদ করে ফেলে সেখানেই।

ইবনুল আসির বলেন, তার শাহাদাত বরণের তারিখ ১ শাবান, ৬০২ হিজরি।[২৮] সুলতান শিহাবুদ্দীন ঘুরির শাহাদাত ছিল ঘুর সাম্রাজ্যের পতনের প্রারম্ভিকা। ৬০৫ হিজরিতে এসে আলাউদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহ ঘুরিদের সবচেয়ে শক্তিশালী এলাকা হেরাত দখল করে ফেললেন। সে-বছরই তিনি ঘুরিদের সর্বশেষ সম্রাট গিয়াসুদ্দীন মাহমুদকে হত্যা করেছিলেন। এবং দখল করে নিয়েছিলেন ঘুর ও ফিরোজেকুহ। এভাবে খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্বের সীমানা বর্তমান আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চল পেরিয়ে ছুঁয়ে ফেলেছিল সিন্ধুনদের পার। আর ঘুর সাম্রাজ্যের উত্তরসূরিরা পাঞ্জাব সীমান্তে আত্মগোপন করে থাকতে বাধ্য হয়েছিল। কারণ, তখন তাদের কিছুই করার ছিল না।[২৯]

তুর্কানেখাতার সাথে লড়াই

ঘুরিদের সাথে টানা ১০ বছর যুদ্ধ করে একটু ফারেগ হলেন সুলতান আলাউদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহ। কিন্তু এই অবসরকেও তিনি অখণ্ডতা পেতে দেননি। পিতা সুলতান আলাউদ্দীন তাকিশ তুর্কানেখাতার বিরুদ্ধে যে-মিশন শুরু করেছিলেন, সেই মিশন পূরণে হঠাৎ করেই সংকল্পবদ্ধ হয়ে ওঠেন তিনি। পূর্বে, ঘুরিদের সাথে যুদ্ধ চলাকালে চালাকি করে তুর্কানেখাতার সঙ্গে তিনি সন্ধি করে ফেলেছিলেন। তাদের নিয়মিত ট্যাক্সও প্রদান করতেন। সে-ছিল মূলত একপ্রকার রাজনৈতিক চাল। তিনি ভাবলেন—এইবার যুগান্তকারী যুদ্ধের সময় এসে গেছে। হাত গুটিয়ে আর বসে থাকা যায় না। ফলে সৈন্য প্রস্তুত করে তিনি পূর্বাঞ্চলে বোখারা অভিমুখে রওনা হলেন। সেখানকার মুসলামনরা তুর্কানেখাতার অত্যাচারে নির্মমভাবে নিষ্পিষ্ট ছিল। শহরবাসী

---

[২৮] ইবনুল আসির ৭/৪৪৮

[২৯] রওজাতুস সফা ৪/৮১৯; ইবনুল আসির ৭/৫১২

সুলতান আলাউদ্দীনের এই আগমনকে আল্লাহর তরফ থেকে আসা নেয়ামত ভেবে নিল। তার সামনে তারা প্রকাশ করল আনুগত্য। ফলে কোনোপ্রকার রক্তপাত ছাড়াই বিজিত হয়ে গেল পুরো শহর।

তারপর সেখান থেকে খাওয়ারিজমি সৈন্যরা পথ ধরে সমরকন্দের। তুর্কানেখাতা কর্তৃক নিযুক্ত সমরকন্দের গভর্নর ছিল উসমান খান। তাকে খানে খানানও ডাকা হতো। মূলত তার হাতে কোনো ক্ষমতাই ছিল না। একপ্রকার কাঠের পুতুল হয়ে থেকেছিল বলা যায়। তুর্কানেখাতা নামেমাত্র তাকে সিংহাসনে বসিয়ে রেখেছিল। উসমান কোনোরকমের বাধ না সেধে খাওয়ারিজম শাহের হাতে শহর হাওয়ালা করে দিল।[৩০] সুলতানের এই দুর্দান্ত বিজয়ে তুর্কানেখাতা যেন ক্রোধে অন্ধ হয়ে গেল। উত্তেজনায় গলার শিরা তাদের নীল হয়ে উঠতে লাগল অবস্থা।

ঐতিহাসিক ইবনে খালদুনের বর্ণনা মোতাবেক—তুর্কানেখাতার সে-সময়কার বাদশাহ ছিল তানেকুতেরায নামের এক মারদাঙ্গা বৃদ্ধ। বয়স শয়ের কোঠা ছাড়িয়ে গেছিল। অত্যন্ত সাহসী, তেজী ও অভিজ্ঞ শাসক ছিল সে। কোনো যুদ্ধ থেকেই বিজয় না-নিয়ে ফেরার অভ্যাস ছিল না তার। সুলতান সানজার সেলজুকি ও শিহাবুদ্দীন ঘুরির মতো বিজেতাদেরও সে পরাজয়ের তিক্ততা আস্বাদন করিয়েছে। একদা কঠিন-হৃদয় সৈনিকদের নিয়ে খাওয়ারিজমি বাহিনীর উপর আক্রমণ করতে অগ্রসর হল সে। সুলতান আলাউদ্দীন মুহাম্মদও জাইহুন-নদী পেরিয়ে মুখোমুখি যুদ্ধের জন্য এগোচ্ছিলেন।

৬০৬ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে মরুভূমির ভেতর সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হয় দুই দল। দিনটি ছিল জুমাবার। সুলতান আলাউদ্দীন তার বাহিনীকে আদেশ দিলেন—মসজিদগুলোতে জুমার খুতবায় খতিব সাহেবরা যতক্ষণ اللّٰهم انصر جيوش المسلمين (হে আল্লাহ, মুসলিমদের সৈন্যদলকে সাহায্য করুন) না বলবেন, ততক্ষণ তিরন্দাজ ও খড়্গধারীদের কেউ আক্রমণোদ্যত হবে না।

আদেশ-মোতাবেক, সেই সময়টি যখন এসে উপনীত হয়েছে বলে ধারণা হল, সুলতানের চোখের ইশারায় মুসলিমবাহিনী একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ল তুর্কানেখাতার উপর। সেদিন সুলতান আলাউদ্দীনের সঙ্গে আল্লাহর সাহায্য ছিল। বজ্রের মতো ফেটে-পড়া মুসলিমবাহিনীর আঘাতে তুর্কানেখাতাদের শক্তি একেবারে মচকে গেল। ব্যাপক প্রাণহানি ঘটল তাদের। বৃদ্ধ বাদশাহ তানেকুতেরাযের শরীর থেকে রক্ত ঝরছিল। বহু বছরের পুরোনো টকটকে লাল সে রক্ত। তানেকু আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে ধপাস করে মরুবালিতে পড়ে গেল। দেহের ঝটকায় পতনস্থল থেকে এলোমেলো উড়ে গেল একগুচ্ছ বালু। তখন ছুটে এসে এক মুসলিম মুজাহিদ দু-হাতে তরবারির বাঁট উঁচিয়ে উপুড় হয়ে-থাকা বৃদ্ধের পিঠের ভেতর চোখা ফলা গেঁথে দিতে যাচ্ছিল,

---

[৩০] ইবনে খালদুন ৫/১০২

এমন সময় পাশ থেকে এক খাতাই দাসী আতঙ্কিত গলায় বলে ওঠে, মেরো না এঁকে! ইনি আমাদের বাদশাহ তানেকু! মেরো না!

মুসলিম সিপাহিটি আচমকা থেমে গেল। তরবারির বাঁট যেভাবে উঁচিয়ে ধরেছিল, ঠিক সেইভাবে ধরে রেখেই অপাঙ্গে তাকাল মেয়েটির দিকে। একমুহূর্ত পর তানেকুতেরাযের ঘাড়ে থাবড়া মেরে তাকে টেনে তুলল। নেতিয়ে-পড়া তানেকুকে বালুতে টেনে-হিঁচড়ে সুলতান আলাউদ্দীনের সামনে নিয়ে এল সে। সুলতান তাকে বন্দি করে পাঠিয়ে দিলেন খাওয়ারিজমের কয়েদখানায়। এটা ছিল সুলতান আলাউদ্দীনের জীবনেতিহাসের এক অনন্য বিজয়, যা তুর্কানেখাতাদের প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল।

খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যে তখন শুরু হল বিজয়ের মহোৎসব। দরবারি মুনশিরা খুব ঘটা করে লিখতে বসে গেলেন বিজয়গাথা। তাতে তারা সুলতান আলাউদ্দীনকে দ্বিতীয় সিকান্দার উপাধিও দিয়ে দিলেন। সুলতান যখন জানলেন সে-কথা, বললেন, সিকান্দারের রাজত্বকালের চেয়ে অনেক দীর্ঘ ছিল সুলতান সানজারের দাপুটে রাজত্ব। উত্তম হল, সিকান্দার উপাধির সঙ্গে সানজার উপাধিটিও লাগিয়ে দাও।

সেদিন থেকে লোকজন তাকে দ্বিতীয় সানজার ও দ্বিতীয় সিকান্দার বলে ডাকতে থাকে। ফখরুল মুলক নেজামুদ্দীন ফরিদ জামি ও জিয়াউদ্দীন ফারেসি বিজয়োৎসবে তার শানে কবিতা আবৃত্তি করে শোনান।[৩১]

'তাবাকাতে নাসিরি' গ্রন্থে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের সূত্রে বলা হয়েছে, খাতাই বাদশাহ তানেকুতেরায পরবর্তীকালে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর থেকে খাওয়ারিজম শাহ তাকে খুব সম্মান করতেন। রাজপ্রাসাদে নিজ আসনের পাশেই তাকে বসতে দিতেন।

তানেকু গোটা জীবনে বড় বড় ৪৫টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। অবসরে খাওয়ারিজম শাহ খুব আগ্রহ নিয়ে তানেকুর মুখে সেই সব যুদ্ধের গল্প শুনতেন। একবার খাওয়ারিজম শাহ জিজ্ঞাসু গলায় বললেন, আচ্ছা, জীবনভর এত-এত যুদ্ধে গিয়েছেন, এত পরিমাণ রাজা-বাদশাহদের পরাজয় খাইয়েছেন আপনি, তাদের ভেতর সবচেয়ে শক্তিশালী ও সাহসী কাকে পেয়েছেন?

তানেকু মুচকি হাসলেন। একটু কেশে গলা সাফ করে নিয়ে উদাস ভঙ্গিতে বললেন—কতজনকেই তো পরাজিত করেছি। কিন্তু শিহাবুদ্দীন ঘুরির মতো অসীম সাহসী ও শক্তিশালী কাউকে পাইনি আমি। তার বাহিনী যদি আরও তাজাপ্রাণ হতো, সে পরাজিত হতো না। তার উপর ওর সৈন্যসংখ্যা ছিল কম। ঘোড়াগুলোও ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছিল। এজন্য মূলত আমি জিতে গেছিলাম। নাহয় জিততে পারতাম না।

খাওয়ারিজম শাহ গম্ভীর মুখে মাথা ঝাঁকালেন—হুম, আপনি ঠিকই বলেছেন।[৩২]

---

[৩১] রওজাতুস সফা ৪/৮২০; ইবনুল আসির ৭/৫১২; ইবনে খালদুন ৫/১০০

সাইয়েদ মুরতাজার অন্তর্দৃষ্টি

তুর্কানেখাতার পরাজয়ে খাওয়ারিজমে চলছিল আনন্দোৎসব। প্রজাদের হই-হুল্লোড়ে প্রকম্পিত যেন সারা রাজ্য। নারী-পুরুষ-বৃদ্ধ-শিশু—সবার মুখেই বিজয়ের মিষ্টি হাসির ঝিলিক। কিন্তু এতসব রঙচঙের ভেতরেও একজনের আজ মন ভালো নেই। খাওয়ারিজমিদের এই বিজয়োৎসব দেখে নীরবে গম্ভীর মুখে বসে আছেন তিনি। তিনি শাদইয়াখের অনন্য বুজুর্গ সাইয়েদ মুরতাজা। সহসা হতভম্ব চোখে কয়েকজন দেখে—সাইয়েদ মুরতাজার চোখ বেয়ে পানির চিকন দুটো ধারা নামছে। তারা খুব অবাক গলায় বলল, আজ আমাদের আনন্দের দিন। আপনি এভাবে বসে বসে কাঁদছেন কেন?

সাইয়েদ মুরতাজা নিজেকে সামলাতে পারলেন না। এই জিজ্ঞাসার পর জারজার হয়ে অঝোরধারায় কাঁদতে লাগলেন তিনি। কান্নার গমকে দুলতে লাগল তার সারা দেহ। কান্নাবিজড়িত বাষ্পাকুল গলায় তিনি বললেন, তুর্কানেখাতাদের ওপারে আছে ধ্বংসদূত মোঙ্গলিয়া জাতি। নিরাপত্তার জন্য তুর্কানেখাতাকে এখন আমাদের হাতে রাখা জরুরি। এই মারকুটে জাতিটি মোঙ্গলিয়া ও আমাদের মাঝে শক্ত প্রাচীর হয়ে দাঁড়াতে পারবে। সে-প্রাচীর ভেঙে গেলে শিগগির হুড়মুড় করে আমাদের রাজ্যে ঢুকে পড়বে মোঙ্গলিয়ানদের অপ্রতিরোধ্য বন্যা। আমাদের প্রবলভাবে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

বলে তিনি বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে একদিকে তাকিয়ে রইলেন। তার এই কথাকে শহরবাসী একটুও পাত্তা দিল না। 'কী আজগুবি বকছেন শায়েখ' বলে একদম তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিল।

তাদের এমন করে বলার কারণ হল—মোঙ্গলিয়ান বলে যে কিছু আছে, নামেমাত্র তারা জানত! মোঙ্গলিয়ানদের শক্তিমত্তা সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না। কিন্তু বেশিদিন কাটেনি। খুব শিগগির বদলে গেল অবস্থা। শহরবাসী তখন অবাক হয়ে দেখল সাইয়েদ মুরতাজার এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে-অক্ষরে মিলে যাচ্ছে।[৩৩]

দুশমনের বন্দিশালায়

তুর্কানেখাতার দম্ভের চেরাগ তবু পুরোপুরি নেভেনি। টিমটিম করে খানিক জ্বলছিল। হঠাৎ একসময় এক অপ্রত্যাশিত সফলতায় ফের তারা ঘুরে দাঁড়িয়েছিল।

ঘটনা হল—তুর্কানেখাতার এক সরদার এসে (গুরখান) আচমকা সমরকন্দে আক্রমণ করে বসেছিল। আলাউদ্দীন খাওয়ারিজম শাহও তখন সমরকন্দে অবস্থান করছিলেন। আলাউদ্দীনের বাহিনীও সচকিত হয়ে ওঠে। দুই দলে জমে ওঠে প্রচণ্ড সংঘর্ষ। কিন্তু খাওয়ারিজম শাহের বাহিনী তখন কুলিয়ে উঠতে পারছিল না। তাই ধীরে-ধীরে তারা পিছপা হতে লাগল। আলাউদ্দীনের রক্ষীদলের সংখ্যা কম ছিল বলে

---

[৩২] তাবাকাতে নাসিরি ১/৩৬৪

[৩৩] জাহাঁকুশা ২/১৭৮; খাওয়ারিজম শাহি ৮০

খাতাইদের সামনে বজ্রশক্তিতে লড়ে যেতে পারছিল না। যারাও লড়ছিল, একটুক্ষণ পেরোতেই একে-একে ময়দান ত্যাগ করতে লাগল। দুশমনের হাতে গ্রেফতার হয়ে পড়ল অনেক খাওয়ারিজমি আমলা।

খাওয়ারিজমি বাহিনী পিছু হটতে হটতে যখন একদম নিজেদের এলাকায় এসে ঠেকে, তখন হঠাৎ সবার মনে পড়ে, তাদের সঙ্গে খাওয়ারিজম শাহ নেই। হয়রান হয়ে পড়ে সবাই। আতিপাতি করে খুঁজতে থাকে সুলতানকে। মুহূর্তে পুরো রাজ্যে হুলস্থুল পড়ে যায়। কোথাও খাওয়ারিজম শাহকে পাওয়া যাচ্ছে না। অস্থিরতায় তারা ছোটাছুটি করতে লাগল এদিক-ওদিক। কেউ কেউ কসম খেয়ে বলতে লাগল—শাহকে নিশ্চয় খাতাইরা হত্যা করে দিয়েছে।

মূলত খাওয়ারিজম শাহ বন্দি হয়ে পড়েছিলেন। গ্রেফতারকৃত সেই আমলাদের ভেতর তিনি নিজেও ছিলেন। সে-ছিল ভয়াবহ নাজুক পরিস্থিতি। পলকের ভেতর তছনছ হয়ে গিয়েছিল খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য।

তবে ভাগ্য সামনে প্রসন্ন হতে চলেছিল। খাওয়ারিজম শাহ ও তার এক আমির ইবনে শিহাবুদ্দীন মাসউদ, এমন এক খাতাই সেনার হাতে বন্দি হলেন, হাতের বন্দি লোকটিই যে খাওয়ারিজম শাহ, সেই খাতাই তা জানত না। এর আগে খাওয়ারিজম শাহের সাথে কখনও দেখা-সাক্ষাৎ ঘটেনি তার।

ব্যাপারটাতে খাওয়ারিজম শাহ ও আমির মাসউদ ফায়দা ওঠাতে চাইলেন। আশ্চর্য এক নাটক রচনা করলেন তারা। মূলত বুদ্ধিটা এঁটেছিল আমির মাসউদ। সুলতানের কানের কাছে ফিসফিসিয়ে সে বলল—আলামপনা, এ মুহূর্তে আমি এতেই কল্যাণ দেখছি যে, আপনি যে আমাদের বাদশাহ এ কথা কাউকে বলার দরকার নেই। আপনি বরং আমার দাস হয়ে যান। তেমন ভাব করবেন আর কি!

খাওয়ারিজম শাহ সে-কথা মানলেন। খুব খেদমত করা আরম্ভ করলেন আমির মাসউদের। এমনকি, শাহ তাকে নিজ হাতে কাপড় পরাতেন, পান করাতেন পানি, পরিবেশন করতেন খাবার। মোজা-জুতাও নিজ হাতে পরিয়ে দিতেন, খুলতেন। মোটকথা, এমন খেদমত শুরু করেছিলেন, যেন আমির মাসউদের প্রকৃত গোলাম বনে গেছেন তিনি।

যে খাতাই সিপাহি তাদের পাহারা দিচ্ছিল, ক'দিন ধরে খুব আগ্রহ নিয়ে হতভম্ব চোখে এই দৃশ্য দেখছিল সে। কৌতূহল চাপতে না-পেরে একদিন মাসউদকে সে জিজ্ঞেস করে বসল—তোমার এই সাথি সবসময় তোমার এত খেদমত করে কেন?

আমির মাসউদ গম্ভীর গলায় বলল, কারণ সে আমার ক্রীতদাস।

খাতাই সিপাহির মনে হল—তার এই কয়েদি তা হলে যেনতেন কোনো লোক না। সে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর অস্থির ভঙ্গিতে বলে উঠল—আচ্ছা, তুমি আসলে কে?

আমার পরিচয় বলে আর কী হবে! আমি মূলত আমির মাসউদ। খাওয়ারিজম শাহের দরবারি লোক।

একথা শুনে খাতাই সিপাহি মাসউদের সম্মানে চট করে দাঁড়িয়ে গেল। হড়বড় করে বলতে লাগল, আমার সম্প্রদায় যদি না-জানত তোমরা আমার কাছে বন্দি আছ, তোমার মতো সম্মানিত ব্যক্তিকে আমি নিশ্চিত মুক্ত করে দিতাম।

কিছুদিন পর প্রহরীকে মাসউদ বলল—শোনো, আমার খুব সন্দেহ হচ্ছে, আমাদের যে সৈনিকরা পালিয়ে নিজেদের রাজ্যে ফিরে গেছে, তাদের ভেতর আমার পরিবার আমাকে না-পেয়ে হয়তো বিশ্বাস করে বসে আছে আমি মরে গেছি। এখন হয়তোবা এ নিয়ে তারা মাতমও করছে। আমার সমস্ত সম্পত্তি খুব শিগগির ভাগ করে নিয়ে নেবে তারা। এদিকে আমি নিঃস্ব হয়ে মারা যাব। আমার খেয়াল হল—তুমি আমার মুক্তির জন্য আমার সম্পত্তি থেকে কিছু ফিদিয়ার ব্যবস্থা করতে পারো কি-না দেখো। হুঁশিয়ার কাউকে আমার বাড়িতে পাঠাও। যেন পরিবারের কাছে আমার এই বেহালদশার কথা উত্থাপন করে মুক্তিপণ আদায় করে নিয়ে আসতে পারে।

খাতাই-প্রহরী আগে থেকেই চাচ্ছিল এই ধনবান কয়েদির মুক্তিপণ হিসেবে কোনোভাবে তার থেকে মোটা অঙ্কের অর্থ হাতাবে। তাই সানন্দে রাজি হয়ে গেল খাতাই। সঙ্গে-সঙ্গে একজনকে ডেকে আনল এ কাজের জন্য।

মাসউদ অস্বীকৃতি জানিয়ে বলল—না না, এই লোক দিয়ে হবে না। এ আমার পরিবারকে চিনবে না। যদি উপযুক্ত মনে করো, আমার এই গোলামকেও সঙ্গে পাঠিয়ে দাও। এ বড় বিশ্বস্ত গোলাম। আমার পরিবারও তাকে চেনে। তার সঙ্গে তোমার প্রতিনিধিদল থাকবে। তাদের কথামতোই আমার পরিবারের সাথে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করবে সে। আমি যে এখনও বেঁচে আছি, প্রথমে এই সংবাদটা পরিবারকে জানাবে। এবং মুক্তিপণের পুঁজি সংগ্রহের জন্য তাদের সাথে দৌড়-ঝাঁপও করতে পারবে।

খাতাই-প্রহরী একথাও মেনে নিল খুশিমনে। তার প্রতিনিধিদের সাথে খাওয়ারিজম শাহকেও যেতে অনুমতি দিল। এবং সঙ্গে বিশেষ কিছু লোক পাঠাল, যাতে এই গোলাম (খাওয়ারিজম শাহ) নিরাপদে পৌঁছতে পারে।

প্রতিনিধিদল যখন খাওয়ারিজম শহরের (আরগেঞ্চ) কাছাকাছি এসে পৌঁছে, গোলাম (খাওয়ারিজম শাহ) তখন দ্রুত পা চালিয়ে একটু সামনে বেড়ে গেলেন। তারপর হঠাৎ সুযোগ মতো ঢুকে পড়লেন শহরের ভেতর।

এদিকে খাওয়ারিজম শাহ দীর্ঘসময় গোপন থাকার দরুন প্রজারা মনে করে নিয়েছিল তিনি বোধহয় মারা গেছেন। অবশ্য রাষ্ট্রের হাকিমরা ও সাধারণ প্রজাকুল পেরেশান ছিল কিছুদিন। তবে সুযোগ বুঝে খাওয়ারিজম শাহের ভাই তাজুদ্দীন আলি শাহ খাওয়ারিজমের সিংহাসন দখলের ঘোষণা করে বসেছিল।

খাওয়ারিজম শাহের এই আচানক প্রত্যাবর্তনে হতভম্ব হয়ে গেল সে। ভয়ে তখনই পালিয়ে গেল রাজ্য ছেড়ে। এবং সুলতানের এই প্রত্যাবর্তনে সাম্রাজ্যে শুরু হল ধামাকা উৎসব।

এদিকে খাতাই-প্রহরী ছিল মুক্তিপণের অপেক্ষায়। একদিন সে মাসউদকে, যে এখনও তার হাতে বন্দি, বলল—আচ্ছা, শুনেছিলাম তোমাদের খাওয়ারিজম শাহ নাকি মারা গেছে। কথাটা সঠিক কিনা, জানো?

মাসউদ না-সূচক মাথা ঝাঁকায়। বলে, তুমি আসলে ভুল শুনেছ। তোমার এই কয়েদখানায় আমার সাথে যিনি ছিলেন, তিনিই খাওয়ারিজম শাহ।

প্রহরী দারুণ চমকে ওঠে। হতভম্ব গলায় সে বলে, তুমি আমাকে তখন কেন বলোনি? আমি সসম্মানে তাকে ফেরত পাঠাতাম।

'বলিনি; কারণ- তার ব্যাপারে তোমাদের নিয়ে আমি শঙ্কিত ছিলাম। তাই বলাটা সমীচীন মনে করিনি।'

প্রহরী বলে, আচ্ছা ঠিক আছে। এখন চলো, তুমি আমাকে এখনই তার ওখানে নিয়ে চলো।

আমির মাসউদ প্রহরীকে নিয়ে খাওয়ারিজম শাহের কাছে পৌঁছে গেল। খাওয়ারিজম শাহ দুজনকেই মন থেকে খুব শ্রদ্ধা জানালেন এবং ভূষিত করলেন বড় বড় পুরস্কারে।[৩৪]

ভেতর-বাইরের যুদ্ধ

কিছুদিন খাওয়ারিজম শাহ অভ্যন্তরীণ কূটচক্রান্ত-বিনাশে নিমগ্ন রইলেন। এবং অত্যন্ত সফলভাবে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এলেন রাজ্যের পরিস্থিতি। তাজুদ্দীন আলি শাহকে গ্রেফতার করিয়ে বিদ্রোহের অপরাধে তাকে হত্যা করলেন। তারপর আলাউদ্দীনের সেপাইরা ক্রমান্বয়ে পারস্য, দক্ষিণ ইরান, খোরাসান ও ইরাকের পাহাড়ি অঞ্চলগুলো জয় করতে লাগল। হামাদান, ইস্পাহান, শিরাজ, কুম এবং প্রায় সব পার্বত্য এলাকা খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল, স্রেফ অল্পকালের ভেতর।[৩৫]

তুর্কানেখাতার শেষপরাজয়

পূর্বদিকে চীনা-তুর্কিস্তান ছিল খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের সীমান্ত-সংলগ্ন একটি এলাকা। সেখানকার রাজধানী ছিল কাশগর। কাশগরে বহু মুসলিম অধ্যুষিত মহল্লা যদিও ছিল, কিন্তু পুরো রাজ্যের ক্ষমতা ছিল চীনা-তুর্কিদের হাতে।

---

[৩৪] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৭/৫৬; ইবনুল আসির ৭/৫১১

[৩৫] জাহাঁকুশা, রওজাতুস সফা, তারিখু ইবনু খালদুন ও তারিখু ইবনুল আসির গ্রন্থসমূহে এই যুদ্ধগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আগ্রহী পাঠকরা পিপাসা মেটাতে এই উৎসগুলোতে ফিরে যেতে পারেন।

সে-সময় কিশলুক খান নামের এক যুদ্ধবাজ সরদার অসামান্য শক্তি যুগিয়ে ফেলল। খাওয়ারিজম শাহের হাতে পরাজিত তুর্কানেখাতার অবশিষ্ট এলাকাগুলোতে আক্রমণ করে বসল সে। তুর্কানেখাতা খাওয়ারিজম শাহের সাথে এক হয়ে যেতে চাচ্ছিল তখন। তারা আবেদন করেছিল, খাওয়ারিজম শাহ যেন লোকবল নিয়ে খাতাইদের শত্রু কিশলুক খানের উপর আক্রমণ করেন।

এদিকে তুর্কানেখাতার বিরুদ্ধে সম্মিলিত যুদ্ধের জন্য কিশলুক খানও খাওয়ারিজম শাহের কাছে আবদার পাঠায়। অবশ্য দুই দলই তুর্কানেখাতার উপদ্রবে অস্থির হয়ে গিয়েছিল এবং গোপনে-গোপনে তুর্কানেখাতাকে ধ্বংস করতে চাচ্ছিল।

খাওয়ারিজম শাহ কিশলুক ও তুর্কানেখাতা, পৃথক পৃথকভাবে উভয়কেই ইতিবাচক জবাব পাঠালেন। পরিকল্পনা-মাফিক কিশলুক তার বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হল তুর্কানেখাতার এলাকায়। তুর্কানেখাতাও তাদের সমস্ত শক্তি একত্র করে গুরখানের নেতৃত্বে কাতারবন্দি হয়ে দাঁড়িয়ে গেল যুদ্ধের মাঠে।

ওদিকে খাওয়ারিজম শাহি সিপাহিরা আসছিল কিশলুক খানের পেছন-পেছন। প্রথমেই তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চায়নি। খাওয়ারিজম শাহ মূলত দুটো চাল চেলেছিলেন। তার সূক্ষ্ম পরিকল্পনা ছিল—যুদ্ধ বেধে যাবার পর যদি ভারী হয়ে ওঠে কিশলুকের দল, তবে তার সঙ্গে যোগ দেবেন। কিন্তু লক্ষণ উলটো মনে হলে তুর্কানেখাতার দলে গিয়ে মিশবেন। খাওয়ারিজম শাহের এই চালাকি এতটাই সফল হল যে, তুর্কানেখাতা ও কিশলুক খান, যুদ্ধরত দু-দলই ভাবছিল খাওয়ারিজম শাহ আমাদের সাথেই আছেন।

যুদ্ধ তখন তুঙ্গে। কিশলুকের বাহিনীর সামনে তুর্কানেখাতা বেশিক্ষণ টিকতে পারল না। ক্রমে পিছু হটতে থাকল। সে-দৃশ্য দেখে কিশলুকের হয়ে খাওয়ারিজমিরাও বজ্রের মতো ফেটে পড়ল তুর্কানেখাতার উপর। ফলে প্রায় সকল খাতাই সৈনিকের মস্তকই ছিটকে পড়ে মৃত্যুঘাটে। নিঃশেষ হয়ে যায় তাদের সমস্ত শক্তি। এরপর দ্বিতীয়বার খাতাইরা কখনোই মাথা ওঠাবার সাহস পায়নি।

মুসলিমবিশ্ব সেদিন নিকৃষ্ট এক দুশমন থেকে মুক্ত হল। বলা যায়, এই কৃতিত্ব শুধু সুলতান আলাউদ্দীন মুহাম্মদের।[৩৬] তুর্কানেখাতার অবশিষ্ট লোকেরা পাহাড়ে-পর্বতে গিয়ে আত্মগোপন করল। তারপর তাদের একটি দল এসে খাওয়ারিজম শাহের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়ে যোগ দিল খাওয়ারিজমি বাহিনীতে।[৩৭]

---

[৩৬] ইবনু খালদুন ৫/১০৪-১০৫; ইবনুল আসির ৭/৫১৪

[৩৭] ইবনুল আসির ৭/৫১৫; নিহায়াতুল আরাব ৭/৭৫৬

কিশলুক খানের সাথে যুদ্ধ

কিশলুকের এ বিজয়লাভের পর খাওয়ারিজম শাহ তাকে বললেন, বিজিত এলাকাগুলোর কিছু অংশ আমাকেও দিতে হবে। পেছন থেকে আমার সিপাহিরা এসে যদি আক্রমণে যোগ না-দিত, তা হলে কিন্তু তুমি সফল হতে না।

কিশলুক খাওয়ারিজম শাহের অনুগ্রহের কথা স্বীকার করল বটে; কিন্তু সে বলল, বিজিত এলাকার ভাগ আমি আপনাকে দিতে পারব না।

খাওয়ারিজম শাহের ভীষণ রাগ হল। তবু সেটা প্রকাশ না-করে দ্বিতীয়বারের মতো বললেন, যেভাবে একসঙ্গে মিলে খাতাইদের আমরা ধ্বংস করেছি, এক্ষেত্রে যেমন আমরা বরাবর, তেমনই বিজিত অঞ্চলগুলোতেও সমান অংশীদারত্ব রয়েছে আমাদের।

কিশলুক খানের নিয়ত হয়তো বদলে গিয়েছিল। অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে সে ধরে ফেলেছিল খাওয়ারিজম শাহের ফেরেববাজি। সে দম্ভভরে জবাব দিল—আমি তোমার জন্য শুধু তলোয়ার তুলে রেখেছি। আর কিছু না। তোমাদের শক্তিমত্তা খাতাইদের চাইতে খুব বেশি না। তোমার সাম্রাজ্যও তেমন বিশাল কিছু না। আমি তোমাকে সাম্রাজ্যের ভাগ দিতে পারব না। যদি এতে রাজি না-থাকো, শিগগির আমার বাহিনী নিয়ে তোমার রাজ্যে আগমন করছি। তোমাদের অবস্থা খাতাইদের চেয়ে গুরুতর করে ছাড়ব।

রাগে কিশলুক খানের গলার শিরা যেন নীল হয়ে ওঠে। ক্রোধে কাঁপতে লাগলেন খাওয়ারিজম শাহও।

খাওয়ারিজম শাহের বাহিনী তখন যুদ্ধের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল না। এজন্য মুখোমুখি যুদ্ধ থেকে তারা বিরত ছিল। একবার সৈন্যদল নিয়ে খাওয়ারিজম শাহ সাম্রাজ্য-সীমান্তে বেরিয়েও এসেছিলেন। তবে যেদিক থেকে আসছিল কিশলুকের বাহিনী, সেদিকটা এড়িয়ে বের হয়ে গেছিলেন অন্যদিক থেকে। কিশলুকের রাজ্যে অনুপ্রবেশ করে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছিলেন তাদের সমস্ত ধনভান্ডার। বস্তিগুলো ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিলেন। পরপর কয়েকবার ঘটেছিল এমন ঘটনা।

রাজ্য থেকে বের হয়ে কিশলুকের কোনো সিপাহি একটু এদিক-ওদিক গেলে, তাকে ধরে খাওয়ারিজমি সেনারা আচ্ছামতো ধোলাই করে দিত। বলা যায়, একধরনের গেরিলাযুদ্ধ চলছিল দুই সাম্রাজ্যের ভেতর। এই যুদ্ধ নড়বড়ে করে দিয়েছিল কিশলুকের অবস্থা। খাওয়ারিজম শাহকে ময়দানে নামিয়ে আনতে বহু চেষ্টা করেছিল কিশলুক। তাকে জেদি করে তুলতে চেয়েছিল; কিন্তু পারেনি।

খাওয়ারিজম শাহকে একবার সে বলল—শোনো, তোমরা যা করছ, রাজা-বাদশাহদের যুদ্ধের নিয়ম কিন্তু এটা না। এ হচ্ছে চোরদের কাজ। তুমি যদি প্রকৃত বাদশাহ হয়ে থাকো, মাঠে নেমে যুদ্ধ করো দেখি! জিতলে আমার রাজ্য নিয়ে নাও। হেরে গেলে তোমার রাজ্য কবজা করে ফেলব আমি।

খাওয়ারিজম শাহ অবশ্য অতটা বোকা ছিলেন না যে, কিশলুকের কথায় আবেগতাড়িত হয়ে নিজের হেকমতপূর্ণ কর্মপদ্ধতি বদলে ফেলবেন। তিনি কিশলুকের কথার পিঠে ঘোরানো-প্যাঁচানো এক জবাব পাঠালেন। কিশলুক তাতে দ্বিগুণ ক্ষেপে ওঠে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত খোলা ময়দানে যুদ্ধ করার মতো ভুল খাওয়ারিজম শাহ করেননি।

তার মনে এই শঙ্কা ছিল—ইসলামি শহরগুলোতে না-আবার সিংহাসন গেড়ে ফেলে কিশলুক! এজন্য তিনি সীমান্তবর্তী শহর, ফারগানা, শাশ, ইসতিজাব ও কাশানের বাসিন্দাদের বিভিন্ন সুরক্ষিত শহরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।[৩৮]

গজনি দখল

৬১২ হিজরি। ঘুরিদের সর্বশেষ শহর গজনিও খাওয়ারিজম শাহের কবজায় এসে গেল। ওখানকার হাকিম কুতলুগতেগিন সরদার তাজুদ্দীন এলদাজের সাথে গাদ্দারি করে খাওয়ারিজম শাহের হাতে গজনি শহর তুলে দিলো। সরদার এলদাজ পালিয়ে লাহোর চলে গেল। খাওয়ারিজম শাহ পুত্র জালালুদ্দীন মুহাম্মদকে গজনির গভর্নর নিযুক্ত করতে চাইলেন। একবার কী ভেবে যেন কুতলুগতেগিনকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা, তোমাদের সরদার এলদাজের আচরণ কেমন ছিল?

কুতলুগতেগিন হাত কচলে কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে বলল, সরদার এলদাজ সবসময় পুরো শহরের ব্যবস্থাপনার ভার এবং শহরের ধনভান্ডার আমার হাতে দিয়ে রাখতেন।

শুনে সুলতান আলাউদ্দীনের চেহারায় গাম্ভীর্যের একটা গাঢ় ছায়া নেমে আসে। একটুক্ষণ চুপ করে থাকেন তিনি। তারপর বলেন—যে-লোক সবকিছুর মালিক বানিয়ে রেখেছিল তোমাদের, আবার তোমাদের স্বগোত্রীয়ও ছিল, তার সাথেই তোমরা গাদ্দারি করে বসেছ। এখন আমি কীভাবে বিশ্বাস করতে পারি যে, আমার ছেলেকে এখানকার গভর্নর বানিয়ে গেলে তার পূর্ণ আনুগত্য করবে তোমরা?

গজনিতে খাওয়ারিজম শাহ বিপুল ধনভান্ডার, ৩০টি পশু ও ৪০০ শ্রমিক রেখে রাজধানীতে ফিরে গেলেন। কুতলুগতেগিনকে হত্যা করিয়ে দিলেন যাবার সময়। শাহজাদা জালালুদ্দীনকে ছেড়ে গেলেন কিছু আমির ও সিপাহিসহ।[৩৯]

সম্রাজ্ঞী তুর্কান খাতুন : রাজ-ব্যবস্থাপনায় ভাঙন

শাসন ও সাম্রাজ্যের পরিপূর্ণ শক্তি এবং শান-শওকতে আলাউদ্দীন খাওয়ারিজম শাহ বিশ্বজুড়ে একটা ত্রাস সৃষ্টি করে ফেলেছিলেন। তাকে ভয় পেত সবাই। কিন্তু তারই রাজ্য-পরিচালনায় দেখা দিয়েছিল এক বড়সড় ভাঙন, যা রোধ করার মতো শক্তি তার ছিল না। সেই ভাঙনের আসল কারণ তার মা তুর্কান খাতুন।

---

[৩৮] নিহায়াতুল আরাব ৭/৭৫৬

[৩৯] নিহায়াতুল আরাব ৭/৭৫৭

স্বামী সুলতান আলাউদ্দীন তাকিশের জীবদ্দশায় তুর্কান খাতুন রাজ্যের ব্যবস্থাপনায় যতটা প্রভাব খাটাতেন, পুত্র আলাউদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহের শাসনকালে তা দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছিল। সাম্রাজ্যের সকল কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ করছিলেন তিনি। তিনি রাজধানী আরগেঞ্চে সুলতান আলাউদ্দীনের দরবার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এক দরবার গড়ে নিয়েছিলেন। যুদ্ধবাজ কিপচাক গোত্রের কন্যা তিনি। তার এমন প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল যে, সিংহাসনের দুপাশজুড়ে কিপচাক তুর্কি আমিররা মাথা ঝুঁকিয়ে কাতার বেঁধে বসে থাকত। তিনি আলাদা রাষ্ট্রীয় পরোয়ানাও লেখাতেন। সেই পরোয়ানার ফিরিস্তি এত দীর্ঘ হতো যে, সাতজন আলেম-মুনশি সবসময় লেখালেখিতে ব্যস্ত থাকতেন। তুর্কান খাতুন নিজেও একজন দক্ষ লিপিকর ছিলেন। তার হস্তলিখিত পরোয়ানা এতই নিপুণ ও চমৎকার হতো যে, অক্ষর নকল করা কিংবা জাল করে ফেলা ছিল দুঃসাধ্য।

তার পক্ষ থেকে লিখিত ফরমানগুলি খাওয়ারিজম শাহের জন্য অত্যন্ত পেরেশানির কারণ ছিল। কখনও এমনও হতো—রাজ্যের কোনো আমলার নিকট সবেমাত্র খাওয়ারিজম শাহের একটা পরোয়ানা এসে পৌঁছেছে। আমলা তা বাস্তবায়ন করার আগেই দেখে তুর্কান খাতুনের বার্তাবাহক নতুন আরেক ফরমান নিয়ে হাজির।

আমলা এবার কোন ফরমান বাস্তবায়ন করবে, শাহের নাকি তুর্কান খাতুনের—পড়ে যেত সেই দ্বিধায়, সেই দোলাচলে। তারপর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থেকে বাঁচতে সে একটা নিয়ম তৈরি করে নিল। যে আদেশনামা পরে আসবে, সেটির উপরেই সে আমল করবে।[৪০] সুলতান ও তার মায়ের এই অগোছালো কর্মকাণ্ডে আমলারাই শুধু পেরেশান ছিল তা নয়, মা-ছেলের মধ্যেও দ্বন্দ্ব ও মনোমালিন্যের একটা ব্যাপার ঘটতে আরম্ভ করেছিল।

আরব ইতিহাসবিদরা খুব ফলাও করে তুর্কান খাতুনের মাহাত্ম্যের কথা বয়ান করেছেন। কিন্তু বাস্তবতা অস্বীকার করার উপায় নেই—একই রাজ্যে দুই শাসকের হস্তক্ষেপ চরম ফেতনা ও অরাজকতা সৃষ্টির কারণ।

অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিকগুলো নিয়ে পর্যালোচনা

সুলতান আলাউদ্দীন খাওয়ারিজম শাহের শাসনামলে খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের অবস্থান ছিল বেশ শক্তিশালী। প্রজাদের জীবনযাপনের উন্নত পদ্ধতি যেন পাহাড়ের উচ্চতাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। বিখ্যাত ভূগোলবিদ ইয়াকুত আল-হামাবি বিত্ত-বৈভবে ভরপুর এ রাজ্যের রাজধানীর কথা লিখতে গিয়ে বলেছেন—আমি খাওয়ারিজমের চেয়ে ঐশ্বর্যময়ী শহর দ্বিতীয়টি দেখিনি।[৪১]

---

[৪০] নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৬২

[৪১] ইয়াকুত আল-হামাবির এই বর্ণনায় খাওয়ারিজম দ্বারা উদ্দেশ্য রাজধানী আরগেঞ্জ।

সদ্য বিজিত সব এলাকার ধনভান্ডার, বাগিচার ফলমূল, ক্ষেতের সোনালি ফসল—সব এনে জমা করা হতো খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যে। এভাবে ধীরে-ধীরে এখানে বিজিত অঞ্চলগুলির গনিমতের একটা স্তূপ জমে উঠছিল। পৃথিবীর নানান প্রান্ত থেকে অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়াররা একে-একে খাওয়ারিজমে পাড়ি জমাচ্ছিলেন। এখানে এসে যেন জাদুর কাঠির মতো প্রকাশ পেতে আরম্ভ করত তাদের কারিগরির গোপন সব কারিশমা। যাপিত জীবনে বিভিন্ন কাজে প্রয়োজন পড়ে, এমন-সব নব আবিষ্কারে খাওয়ারিজমবাসীর জীবনযাপনের ধরন হয়ে উঠেছিল আকাশচুম্বী।

নতুন নতুন যুদ্ধাস্ত্র তৈরিতে প্রকাশ পেয়েছিল কারিগরদের হাতের গোপন সব কৌশল। খুবই মেধাবী ছিল তারা। তাদের বানানো তলোয়ারগুলি খুব সহজে মুড়িয়ে ভাঁজ করে রাখা যেত। চিকন হালকা জিঞ্জির দিয়ে নিখুঁতভাবে বানাত লোহার পোশাক। সেই পোশাক পরে দেহের সমস্ত অঙ্গ খুব স্বাভাবিকভাবে সঞ্চালন করা যেত। হালকা ওজনের ঢাল বানাতে পারত। খুব সহজেই তাতে রোধ করা যেত তির-তলোয়ারের শক্ত আঘাত। ঢালের উপর আবার অঙ্কিত ছিল সোনা-রুপার কুচিকুচি অনেক ফুল-পাতা।

হিজরি ষষ্ঠ শতকে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবি অত্যন্ত সফলভাবে অগ্নি-তির ও মেটে তৈলের ব্যবহার করেছিলেন। সেক্ষেত্রে সপ্তম শতকে এসে আরও কয়েক ধাপ উঁচুতে উঠে গিয়েছিল খাওয়ারিজমি প্রকৌশলীরা।

সব শহরেই, প্রতিরক্ষার জন্য উঁচু প্রাচীরের একটা প্রলম্বিত ঘেরাও দিয়ে রাখা হয়েছিল। গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলো ছিল দু-দুটো প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। সাধারণভাবে এসব নগর-প্রাচীরের ঘেরাও কয়েক মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

অনিবার্যভাবে প্রত্যেকটি শহরের ঠিক মধ্যখানে থাকত একটি করে সুরক্ষিত শক্ত দুর্গ। দুর্গটি গড়ে তোলা হতো শহরের কোনো উঁচু টিলা কিংবা পাহাড়ের উপর। শত্রুবাহিনী কোনোভাবে শহরের দেয়াল টপকে ভেতরে ঢুকে গেলে, অভ্যন্তরীণ দুর্গই ছিল প্রতিরক্ষার শেষকেন্দ্র।

নগরপ্রাচীরের ফটক ছিল একাধিক, বিভিন্ন দিক থেকে। ফটকগুলো শক্ত লোহা দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। নগরপ্রাচীর ও দুর্গ-নির্মাণে আলাউদ্দীন খাওয়ারিজম শাহ খুব মনোযোগ দিয়েছিলেন। আশপাশের দুশমনদের মোকাবেলায় গড়ে তুলেছিলেন শক্ত প্রতিরোধ। সাম্রাজ্যের প্রতিটি শহর-নগর এমন শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে, বড় বড় যুদ্ধবাজ শত্রুদল কয়েক মাস পর্যন্ত মাথা কুটে মরলেও ঢুকতে পারবে না ভেতরে। পাশাপাশি দুর্গগুলির ভেতর সুলতান আলাউদ্দীন খাদ্য, রসদপত্র ও অস্ত্রপাতিও জমিয়ে নিচ্ছিলেন। যেকোনো সময় যেকোনো কাজে লাগতে পারে—জোগাড় করছিলেন তেমন সব রসদও।

খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের এই প্রতিরোধমূলক শহরগুলো দুই ধারায় বিভক্ত ছিল। কিছু শহর ছিল জাইহুন-নদীর কিনারায় আর কিছু সাইহুনের। বানাকাত, তাশখন্দ,

জান্দ ও কুকন্দ ছিল সাইহুনের পারে দাঁড়ানো। আর জাইহুন-নদীর কিনারে ছিল সমরকন্দ, বোখারা, আরগেঞ্চ, বলখ ও তিরমিজ শহর। এ শহরগুলোতে এমন সব মজবুত প্রতিরোধ-প্রাচীর গড়ে তোলা হয়েছিল, যা টপকানো পূর্ব-পশ্চিমের সব আক্রমণকারীর পক্ষেই ছিল কঠিন। অবরোধের ভেতর তাৎক্ষণিকভাবে এক শহর থেকে অন্য শহর সাহায্য লাভ করতে পারার গোপন পথও তৈরি করা ছিল।

এইসব বাহ্যিক উপকরণ দেখে বোঝা যায়—হিজরি সপ্তম শতকের শুরুর ভাগে মুসলিমবিশ্বে খাওয়ারিজমিদের সমরশক্তি ছিল প্রচণ্ড। তখনকার শক্তিশালী তুর্কানেখাতাসহ সকল বিরোধীপক্ষকে তা হার মানিয়েছিল। খাওয়ারিজমিদের উপর কোনো বহিঃসাম্রাজ্যের চড়াও হবার আশঙ্কাই ছিল না।

ফসলের প্রাচুর্য

সাম্রাজ্যের ভেতর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল দুটো নদী এবং অসংখ্য নালা-নহর। এজন্য এ রাজ্যের মানুষের জীবনযাত্রার কোনো তুলনা মিলত না সত্যিই। সাম্রাজ্যের বড় একটা অংশ কৃষিকাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত। কৃষির মূল উৎস ছিল ওই নদী-দুটোর পানি। খুব সহজেই পাওয়া যেত সেই পানি। জাইহুন-নদীর দু-দিকের পার কেটে বড় বড় নালা বের করা হয়েছিল। নৌকাও চলতে পারত নালাগুলোতে। আশপাশের সব শহর ও জনপদ এইসব নালার পানিতে সিক্ত থাকত। স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটাত লোকজন। সার্বিক ব্যবস্থাপনা ছিল বড় চমৎকার। এই শহরগুলিতে বাস করত লক্ষ লক্ষ মানুষ। কিন্তু কখনোই পানির সংকট দেখা দেয়নি। বছরভর উর্বর থাকত এ অঞ্চলের সমস্ত ভূমি। ফলে প্রচুর আনাজ-ডাল-কাপাস ও নানান কিসিমের ফল উৎপন্ন হতো।

চারণভূমিগুলো ছিল সবুজ ঘাসে ভরা। হাঁটলে টাখনু-সমেত পা ডুবে যেত অবস্থা। ভেড়া, বকরি ও সব ধরনের মহিষ সারা বছর ধরে ঘাস খেতে পারত। বলখ শহরে খুব বেশি উৎপন্ন হতো আনাজপাতি। তা থেকে খোরাসানের সব প্রদেশ সমানভাবে উপকৃত হতো। সীমান্ত এলাকাগুলি ছিল পাহাড়বেষ্টিত। সেসব এলাকাতেও ছিল ফলমূলের প্রাচুর্য। কুকন্দের তরমুজ ছিল খুব রসালো। অনেক বড় ও ভারী। একসঙ্গে দুটো তরমুজ ওঠাতে গিয়ে শক্তিশালী একটি গাধাও হাঁপিয়ে উঠত। পার্বত্য এলাকায় বেশি উৎপন্ন হতো কিশমিশ, আখরোট, বাদাম ও পেস্তা জাতীয় ফল। কুকন্দে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল আনারের শত-শত প্রলম্বিত বাগান। সেই আনার ছিল খুবই সুস্বাদু। একবার খেলে মুখে স্বাদ লেগে থাকত বহুক্ষণ। পুরো সাম্রাজ্যজুড়েই এই ফলের বিরাট কাটতি ছিল।

আনারের রস নিংড়ে বড়-বড় পেয়ালাতে করে বিশেষ পানীয় হিসেবে তা পরিবেশন করা হতো। আঙুরের ফলনও ছিল দারুণ। বিশেষত, খাওয়ারিজম প্রদেশের চারপাশে কয়েক মাইলজুড়ে শুধু আঙুরেরই বাগান ছিল। দামেগানের আপেল ছিল অন্যরকম স্বাদু। ওদিকে শাশ-নগরীতেও খুব কাপাস উৎপন্ন হতো।

কারিগরি ও ব্যবসা-বাণিজ্য

রাজধানী আরগেঞ্চ শিল্পকারখানার বৈশ্বিক কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। প্রতিদিন সেখানে লক্ষ-কোটি বাজেটের লেনদেন হতো। সেখানকার কারিগররা তির, লোহার বর্ম, কামান, তলোয়ার, তালা, রেশমি কাপড়, রঙিন জামা, কম্বল ও গালিচা বানাবার কাজে খুব পারদর্শী ছিল। ঘোড়ার চামড়া রাঙানোর কারখানা ছিল। খরগোশের চামড়া; উদবিড়ালের চামড়ার টুপি, পাহাড়ি খেঁকশিয়ালের চামড়া দিয়ে বানানো পোশাক, উট এবং কাঠবিড়ালের মূল্যবান চামড়া ইত্যাদিকে এখানকার লোকজন বিশেষ উপঢৌকন মনে করত।

বাজপাখি শিকার করে সেগুলোকে প্রশিক্ষণ দিত। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাজপাখি চড়া দামে বিক্রি হতো। দেদারসে কেনাবেচা হতো ভেড়া, বকরি আর এসবের চর্বি। এ ছাড়াও, আম্বর, পেস্তা, বাদাম, আঙুর, কিশমিশ, মধু এবং আখরোট প্রচুর পাওয়া যেত। নদী থেকে ধরে আনা মাছ খুব আগ্রহ নিয়ে খেত লোকজন। সেগুলো দূরদূরান্তের এলাকায় রপ্তানিও করা হতো। বোখারার গালিচা, তেল, জায়নামাজ, রেশমি কাপড় এবং ভেড়া ও বকরির চামড়ার খুব সমাদর ছিল। সমরকন্দে ঘোড়ার জিন, রেকাবি ও লাগাম বানাবার অসংখ্য কারখানা ছিল। কারিগররা তামা দিয়ে চমৎকার ডেকচিও বানাতে পারত।

সফরকালে বিশ্রামের জন্য বাজারে বিক্রি হতো দামি দামি মজবুত তাঁবু। পুরো মুসলিমবিশ্বেই প্রসিদ্ধ ছিল সমরকন্দের তৈরি কাগজ। আলেমগণ সেসব খুব কিনতেন। সমরকন্দের প্রকৌশলীরা চীনের কারিগরদের কাছে এর উৎপাদন-পদ্ধতি শিখে এসেছিল।

আরগেঞ্চ, বোখারা ও সমরকন্দ ছিল খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের বিশেষ বাণিজ্য-কেন্দ্র। আতরার, বলখ ও নিশাপুরের সব রাজপথ দিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বাণিজ্য-কাফেলা আসত এখানে। হালবের শিশা, রোমের রেশমি কাপড়, ইয়েমেনের কোমল মসৃণ চাদর, চীনের পাত্র এবং হিন্দুস্থানের লৌহবর্ম ইত্যাদি পণ্যে এই বাণিজ্যিক এলাকাগুলো ভীষণ রমরমা হয়ে উঠত।

খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের অন্য শহরগুলির মধ্যে চামড়া-উৎপাদনে প্রসিদ্ধ ছিল শাশ। পাতলা চামড়ার টুপি, চামড়ায় তৈরি ঘোড়ার মূল্যবান জিন উৎপাদিত হতো এখানে। তাঁবু, জায়নামাজ এবং কামানও পাওয়া যেত। কাশানে উৎপাদিত মখমলের কোনো তুলনাই ছিল না। বানাকাতের সুতি কাপড় ছিল প্রসিদ্ধ। ফারগানাতেও তৈরি হতো মূল্যবান কাপড়। তলোয়ার ও অন্যসমস্ত অস্ত্রের জন্যও এই শহর প্রসিদ্ধ ছিল। তিরমিজে তৈরি হতো সাবান। ওদিকে তুর্কিস্তানের ধারালো খঞ্জর ও দ্রুতগামী শক্তিশালী ঘোড়া ছিল পৃথিবীজোড়া বিখ্যাত।

খনিজ সম্পদ

মা-ওয়ারাউন-নাহার প্রদেশটি ছিল খনিজ সম্পদে ভরপুর। এ যুগেও সেখানে খুব সোনা-রুপা, ইস্পাত ও লোহা পাওয়া যায়। ফারগানায় অনেক বেশি তামা পাওয়া যেত। লোহাও কম ছিল না।

শহরগুলোর চালচিত্র

অধিকসংখ্যক শহর ছিল প্রাচীর-বেষ্টিত। কয়েক ক্রোশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এইসব প্রাচীরের ঘেরাও। অপেক্ষাকৃত অধিক গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে দু-দুটো প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছিল। শক্ত পাথর গেঁথে গেঁথে সে-সমস্ত প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছিল। প্রাচীরগুলো ছিল কয়েক গজ চওড়া। সাধারণত, বহিঃশত্রুর পক্ষে কোনোভাবেই তা টপকাবার আশঙ্কা ছিল না।

প্রাচীরের কয়েক দিকে শক্ত কিছু লৌহকপাট ছিল। প্রাচীরের একদম উপরে ছোট গম্বুজের মতো ঘর বানানো থাকত। সেখানে তির হাতে পাহারাদার সারাক্ষণ পজিশন নিয়ে বসে থাকত। তীক্ষ্ণ চোখে পর্যবেক্ষণ করত চারপাশ। কেউ কেউ থাকত কামান প্রস্তুত করে। কাছে কিংবা দূরে, শত্রুর আভাস পেতেই গোলা নিক্ষেপ করে দেবে—ভাবখানা এমন।

শহরগুলোর প্রধানতম বসতি ছিল প্রাচীরের একদম অভ্যন্তরে। যেন-বা সুশান্ত সুনিশ্চিত নিরাপদ এক নগর-জীবন। নগরপ্রাচীরের বাইরে থাকত বিশাল-বিস্তৃত ময়দান। সেই ময়দানে, ঘাসেদের গায়ে এবং গাছগাছালিতে বয়ে যেত বেয়াড়া বাতাসের লুটোপুটি। ময়দানের পাশজুড়ে মাঝেমাঝে দাঁড়িয়ে থাকত ছোট-ছোট ঝুপড়ি। ঝুপড়িগুলির ভেতর বাস করত নির্দিষ্টসংখ্যক লোক। বাইরে থেকে বিপদের গন্ধ পেলে ছুটে গিয়ে তারাও ফটক দিয়ে ঢুকে পড়ত নগর-প্রাচীরের ভেতর।

মসজিদ

মসজিদ বিনির্মাণের কাজে রাজা-বাদশাহরা সাধারণত মন খুলে খরচ করে থাকেন। খাওয়ারিজমের মসজিদগুলির অভ্রভেদী মিনার ও গম্বুজ দূর থেকেই আগুয়ান কাফেলার চোখে পড়ে যেত। ফলে তারা বুঝে নিত—ওদিকে কোনো জনবসতি রয়েছে। রাজ্যের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মসজিদগুলির মিনারার কারুকাজ ও নির্মাণশৈলী ছিল অনুপম।[৪২] বোখারার জামে মসজিদের, লোকে যাকে জামিউল কাবির বলত, গঠনশৈলী ছিল অপূর্ব মনোহর।[৪৩] পর্যটকরা এর অনুপম স্থাপত্যশৈলী দেখে মুগ্ধ বিস্ময়ে ভাবত—এটা বোধহয় খাওয়ারিজম শাহের রাজমহল।

---

[৪২] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় : ১৪, পৃষ্ঠা : ১০৯

[৪৩] ইসলামি এনসাইক্লোপিডিয়া, কাসেম মাহমুদ ৭১৬

অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা

সব শহরের ভেতরকার দৃশ্য হুবহু এক রকমই ছিল বলা যায়। মাঝেমধ্যে বিছিয়ে-থাকা প্রশস্ত সড়ক। কখনও সরু সরু গলি, যেগুলো পাথর ও ইট গেঁথে বানানো। সড়কের দুপাশজুড়ে ছিল গাছগাছালির দীর্ঘ সারি। সেসবের পত্রপল্লবে পুরো ঢেকে গিয়েছিল চারপাশ। বিশেষত, সড়কের দুইপাশ কেমন অন্ধকার হয়ে থাকত সারা দিন। যে-কারণে এদিক থেকে সহজে ওপাশের জনবসতি চোখে পড়ত না। আবছা-আবছা লাগত খানিক।

বাসস্থান গড়ে তোলা হয়েছিল পাথর, কাঠ এবং ইটের খোয়া গেঁথে। সুউচ্চ বালাখানা বিনির্মাণে এখানকার লোকদের প্রবল ঝোঁক ছিল। আরগেঞ্চ, সমরকন্দ ও বোখারায় পুরোপুরি কাঠ দিয়ে বানানো বাড়িঘরও ছিল। পানি খুব সহজলভ্য ছিল এসব এলাকায়। প্রতিটি অঞ্চলে ছিল আলাদা আলাদা স্বচ্ছ পানির নহর।

জ্ঞানচর্চা

শহরগুলির প্রায় প্রতিটি মহল্লাতেই দু-তিনটি করে মসজিদ ছিল। এবং সবখানে মসজিদ-সংলগ্ন একটি মকতব ও দীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও ছিল—বাচ্চাদের যেখানে পড়তে পাঠানো ছিল সবার জন্য বাধ্যতামূলক।

মকতব ছাড়াও পুরো শহরে ছিল বড় বড় অনেক দীনি মাদরাসা। সেখানে সারফ, নাহব, ফারসি ও আরবি সাহিত্য, ফিকহ, তাফসির এবং অন্যান্য ইলমে-দীন শেখানো হতো। মাদরাসাগুলোর সাথে অবধারিতভাবে একটি করে কুতুবখানাও থাকত। আলেমদের সার্বক্ষণিক পদচারণায় মুখরিত থাকত সেগুলো।

খাওয়ারিজমের সব শাসক ছিলেন ধর্মপ্রিয়। মালিক শাহ সেলজুকির মন্ত্রী নেজামুল মুলক মাদরাসার প্রাথমিক যে ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, খাওয়ারিজমের পরবর্তী রাজা-বাদশাহরা এসে ধীরে-ধীরে তার বিপুল উন্নতি সাধন করেন। খুব আগ্রহ নিয়ে তারা প্রতিষ্ঠা করেন নতুন-নতুন মাদরাসা। দীনি প্রতিষ্ঠানের সাথে সুলতান আলাউদ্দীন তাকিশেরও খুব গভীর সম্পর্ক ছিল। তাকে দাফনও করা হয়েছিল তার প্রতিষ্ঠিত মাদরাসার মাকবারায়। রাজ্যের সমস্ত গ্রাম-শহর সেই মাদরাসার প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট ছিল।

মাদরাসাগুলোতে সরকারিভাবে সম্পূর্ণ বিনাখরচে শিক্ষাপ্রদান করা হতো। ছাত্রদের অবস্থান ও খাদ্যসংস্থানের ব্যবস্থা মাদরাসার জিম্মাদার হজরতরা করতেন। মাদরাসাগুলোর জন্য বড় বড় জায়গির ওয়াকফ করে দিয়েছিল সরকার। সেখান থেকে ভালো অর্থ উঠে আসত। তাই দিয়ে চমৎকারভাবে প্রতিষ্ঠানের সব ব্যবস্থাপনার কাজ সম্পন্ন করা যেত। এইসব দীনি প্রতিষ্ঠানে নামজাদা বিখ্যাত আলেমগণ এসে ইলমের মুক্তো ছড়াতেন। ইলমের বিপুল পিপাসা মেটাতে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ঝাঁকবদ্ধভাবে ছুটে আসত তালিবানে ইলম।

রাজধানী আরগেঞ্চের জামিয়া ছিল সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। সেখানকার প্রধানশিক্ষক ছিলেন তাফসিরে কাবির গ্রন্থের লেখক আল্লামা ফখরুদ্দীন রাজি।

মাদরাসাগুলি ছাড়াও স্থানে-স্থানে ফকিহ ও মুহাদ্দিসদের জ্ঞানচর্চার বড় বড় মজলিশ বসত। সেখানেও ইলমপিপাসু ছাত্রদের পদচারণা ছিল দেখার মতো।[৪৪]

অপার মায়াবী কুদরতি দৃশ্য

শাশ, ফারগানা ও কাশানের মহল্লাগুলোর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছিল বড় চমৎকার। সবুজের সমরোহে যেন চকচক করছে চারপাশ। উপরের নীল আকাশে ঝুলছে ঝকঝকে রোদ। ওদিকে তাকালে যেন পিছলে যায় দৃষ্টি। মৃদুভাবে সারাক্ষণ গাছগাছালি দুলিয়ে বয়ে চলে মনোরম বাতাস। এজন্য এই মহল্লাগুলোর আলাদা একটা নামডাক ছিল। মাঝেমাঝে ছিল দিগন্ত ছুঁয়ে-যাওয়া ফসলের মাঠ। কখনও ঘন জঙ্গল। ফলে-ফুলে ঢেকে ছিল সব উপত্যকা। অবিরল মিষ্টি গুঞ্জরণ তুলে বয়ে চলত ঠান্ডা ও মিঠা পানির ঝরনাধারা। ঝাঁক বেঁধে নেমে আসত পাখিদের দল। এঁকে-বেঁকে বয়ে গিয়েছিল অসংখ্য পাহাড়ি পথ। এ যেন ধুলোর পৃথিবীতে নেমে-আসা স্বর্গীয় রূপৈশ্বর্য। আল্লাহর অপার কুদরতের লীলাভূমি।

আল্লামা ইবনে খালদুন বলেছেন, আল্লাহর এই বিপুল পৃথিবীতে এ এলাকার চেয়ে পবিত্র ও শুদ্ধতম কোনো এলাকা নেই। এখানকার প্রাসাদের চেয়ে সুউচ্চ ও চমৎকার কোনো প্রাসাদ নেই।

এই মনোরম ভূমির ঝলক যে একবার দেখেছে, এখান থেকে সে কখনোই ফিরে যেতে চায়নি। মা-ওয়ারাউন-নাহার, বিশেষত বোখারা ও সমরকন্দের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বিখ্যাত পর্যটক ইবনে হাওকাল প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন—আপনি ওখানে গেলে প্রথমে বোখারার দুর্গের ছাদে উঠে যান। সেখান থেকে চোখ মেলে দিন বহুদূরে—সামনে ভাসবে শুধু ঝলমলে সবুজের মিছিল। চারপাশে প্রগাঢ় শ্যামল ছায়া। এই স্নিগ্ধ আভার প্রতিফলনে আকাশটাও যেন সবুজাভ হয়ে উঠেছে।

কাব্যিক মন নিয়ে তখন ভাবতে ইচ্ছে করবে—কেউ কি মাথার উপর একটা সবুজ শামিয়ানা টাঙিয়ে দিয়ে গেছে?

ওখানে কোনো চড়াই-উৎরাই নেই। সার ধরে দাঁড়িয়ে থাকা শহুরে প্রাসাদগুলোকে দেখে মনে হবে—যেন একসঙ্গে জ্বলজ্বল করছে অজস্র নক্ষত্র। আয়নার মতো কোমল মসৃণ আকাশের ছাদ।

তারপর আরও কিছু বিষয় তিনি উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, এইবার বোখারা থেকে সুগদনদীর উপত্যকার দিকে যান। ডানে-বায়ে, কুহেমুবতাম পর্যন্ত

---

[৪৪] মুজামুল বুলদান, তারিখে খাওয়ারিজম শাহি, চেঙ্গিজ খান, ইসলামি এনসাইক্লোপিডিয়া, কাসেম মাহমুদ, তারিখে দাওয়াত ওয়া আজিমাত খণ্ড : ১

স্থাপিতঃ ২০২০ইং

ধারাবাহিকভাবে ঘনবসতিপূর্ণ সব এলাকা দেখতে পাবেন। চারদিকে দেখবেন শুধু সবুজ আর সবুজ। শেষনাগাদ যেতে আটদিনের পথ মাড়াতে হবে আপনাকে। মাঝেমধ্যে দেখবেন, জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে গাছপালা। নয়নাভিরাম বাগবাগিচা। আদিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমি। সেগুলোকে ঘিরে দিনমান বয়ে চলেছে স্বচ্ছ জলের নহর। মাঝেমধ্যে বিশাল বড় বড় পুকুর। কুলকুল করছে পানি।

এরপর বিস্তৃত খেত-খামার। বাতাসের মৃদু তালে দুলে চলেছে ফসলের শিষ। খেত-খামারগুলো সুগদনদীর দু'পারজুড়ে বিস্তৃত হয়ে আছে। কখনও চোখে পড়ে বিশাল কোনো চারণভূমি। কখনও উঁচু কোনো প্রাসাদ কিংবা দুর্গ। প্রতিটি শহর ও গ্রামের ভেতরে এই একই রকম দৃশ্য ফুটে আছে।

এজন্য এলাকাগুলোর সৌন্দর্য বহুগুণ বেড়ে গেছে। বাসিন্দাদের ঘরবাড়ি কিংবা বাগান ঘিরেও বয়ে গেছে নদী। কোনো সড়ক, বাজার কিংবা কোনো এলাকা এমন নেই—যেখানে এই নদীগুলোর পানি পৌঁছে না। ফারগানা, শাশ, আশারুসনা ও পুরো মা-ওয়ারাউন-নাহারের একই হালচিত্র—ঘন গাছপালায় চারপাশ ভরতি। রং-বেরঙের ফুল ও ফল। তুর্কিস্তানের পর্বতশ্রেণি পর্যন্ত এই একই দৃশ্য চোখে পড়ে।

আঙ্গুর, আখরোট ও অন্যান্য ফলমূলও রয়েছে। ডালে ডালে ঝুলে আছে গোলাপসহ বিভিন্ন জাতের সুগন্ধি ফুল। মজার ব্যাপার হচ্ছে, আধিক্যের দরুন এখানকার মানুষদের কাছে এসবের যেন কোনো মূল্যই নেই। যে চায় খেতে পারে, ছিঁড়তে পারে। বাধা দেওয়ার কেউ নেই। গালিগালাজ করার তো প্রশ্নই ওঠে না।

মা-ওয়ারাউন-নাহারের পাহাড়গুলোতে দেখলাম পেস্তাগাছের অভাব নেই! যার যতটুকু প্রয়োজন তুলে নিচ্ছে। ওখানে গোলাপেরও বিভিন্ন প্রকার দেখেছি আমি। সেগুলো গ্রীষ্মের শেষ-পর্যন্ত ফোটে। ফুলগাছগুলো বাইরে থেকে দেখতে একরকম, আবার ভেতরকার দৃশ্য অন্যরকম। উপরের রং যদি হয় লাল, ভেতরের দিকে হলুদ কিংবা ধূসর। আশ্চর্য দৃশ্য![৪৫]

বিভিন্ন মৌসুম

খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য বর্তমান উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান এবং পাকিস্তান ও বেলুচিস্তানের কিছু এলাকা নিয়ে গড়ে উঠেছিল। বিপুল-বিস্তৃত অঞ্চল নিয়ে গড়ে-ওঠা এই সাম্রাজ্যে একই সময়ে ছিল হরেক মৌসুমের আনাগোনা। সাম্রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে খুব বেশি ঠান্ডা পড়ত। বাতাসে এলোমেলো বরফ পড়ে-পড়ে শুভ্র হয়ে যেত পুরো পাহাড়। নদী ও ঝরনাগুলো ঠান্ডায় একেবারে জমাট বেঁধে যেত। সাইহুন-নদীর পানিও জমে গিয়ে কোমল-মসৃণ

---

[৪৫] ইবনু হাওকালের এই বর্ণনা মাওলানা মানাজির আহসান গিলানি প্রণীত 'হাজার সাল পেহলে' (পৃষ্ঠা : ১৫৮-১৬০) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

মাঠের মতো হয়ে যেত। মানুষ মটকায় খাওয়ার যে পানি জমিয়ে রাখত, ঠান্ডায় তা-ও বরফ হয়ে যেত। পরবর্তীতে আগুনের আঁচে তা গলিয়ে ব্যবহার করতে হতো। খাওয়ারিজম এলাকাটিতেও খুব শীত পড়ত। ঠান্ডা বাতাসে পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মতো অবশ হয়ে যেত হাত-পা।

অপরদিকে, সে-সময়কার দক্ষিণের সমুদ্রতীর ও বেলুচিস্তানের মরু-এলাকা ছিল পুরো পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তপ্ত অঞ্চল। পশ্চিমে ইরানের দক্ষিণাঞ্চল ছিল মরীচিকাময়। ধিকধিক করে সারাক্ষণ সেখানে অগ্নি জ্বলত যেন।[৪৬]

ভৌগোলিক পর্যালোচনা

ঘুর সাম্রাজ্যের পতন ও তুর্কানেখাতার পরাজয়ের পর খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের সীমানা একদিকে খায়বার ও পেশোয়ার পেরিয়ে সিন্ধুনদের ঢেউয়ের সঙ্গে গিয়ে আলিঙ্গন করছিল, অন্যদিকে পূর্ব ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সাইহুন-নদী পেরিয়ে ছুঁয়ে ফেলেছিল চীনের সীমান্ত। সাইহুন ও জাইহুন-নদী ছিল খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের কৃষিব্যবস্থা ও স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনের উৎস। এ-কথা আগেও পড়েছেন।

বিশাল হিমবাহ থেকে বেরিয়ে নদীদুটো বয়ে চলছিল উত্তর-পশ্চিমদিকে। তারপর দীর্ঘ পথ মাড়িয়ে অরাল সাগরে গিয়ে মিশেছিল। অরাল সাগরকে জান্দ, খাওয়ারিজম ও সারদারও বলা হতো। দুই নদী একদিকেই বয়ে গিয়েছিল। তবে দুটোর মাঝখানে ছিল আড়াই হাজার কিলোমিটার চওড়া এক মাঠের ব্যবধান। সেই মাঠের উত্তরাংশে কোনো ঘাস-পানি ছিল না। ওদিকটা গিয়ে লেগেছিল অরাল সাগরের সাথে। বহুদূর পর্যন্ত চোখে পড়ত শুধু লালরঙা মাটি। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে কয়েকশ মাইল লম্বা এই বিরানভূমিতে মানুষ তো দূরের কথা, বন্যপশুর দেখা মেলাও ছিল অসম্ভবপ্রায়। এই বিশাল মরুভূমিকে বলা হতো আকজালকুম কিংবা সাহারায়ে জান্দ।

এর পশ্চিমে ছিল আরগেঞ্চ, দক্ষিণে বোখারা ও সমরকন্দ। মূলত, সাইহুন ও জাইহুন-নদীর মধ্যবর্তী মাঠের উত্তরাংশ যেমন অনাবাদ ও শূন্য খাঁ-খাঁ ছিল, দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চল ছিল ঠিক ততটাই জনবসতিপূর্ণ; চারদিক সবুজাভ।

একটা বিষয় মনে রাখবেন—জাইহুন-নদীর দৈর্ঘ্য ২৫০০ কিলোমিটার। সাইহুনের দৈর্ঘ্য ২১২০ কিলোমিটার। সাইহুন-নদী পূর্ব ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলেরই নয় শুধু, ছিল খাওয়ারিজম, এমনকি বলা যায় পুরো মুসলিমবিশ্বের সর্বশেষ সীমানা। এর চওড়া প্রস্থদেশ দিয়ে বয়ে-যাওয়া পাহাড়সম ঢেউ এবং পারের অনতিক্রম্য পর্বতশ্রেণি ছিল পুরো মুসলিমবিশ্বের প্রতিরক্ষার এক কুদরতি প্রাচীর, যা পার হবার ক্ষমতা কোনো শত্রুবাহিনীর ছিল না।

---

[৪৬] মুজামুল বুলদান, তারিখে খাওয়ারিজম শাহি, চেঙ্গিজ খান, তারিখে দাওয়াত ওয়া আজিমাত, খণ্ড : ১, ইসলামি এনসাইক্লোপিডিয়া, কাসেম মাহমুদ

অধিকাংশ অঞ্চলে, শুধু এই পর্বতশ্রেণির চড়াই ভেঙে নামতেই এক হাজার মাইলেরও অধিক জায়গা ভ্রমণ করা লাগত। ইস্পাত-কঠিন সেসব পর্বতে মুসলিম-কাফেলার পথচলার জন্য ছিল কিছু গোপন কুদরতি পথ। তবে বেশিরভাগ সময় তুলোর মতো সে-পথে বরফ ওড়াউড়ি করত।

এই পর্বতসারির দুর্ভেদ্য দেয়াল কয়েক হাজার মাইল পর্যন্ত এশিয়া মহাদেশকে দু-ভাগ করে দিয়েছিল। দক্ষিণে তিব্বত থেকে শুরু করে সেই সারি বাঁক নিয়েছিল উত্তরে। মানব-ইতিহাসের শুরু থেকে আজও একইভাবে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এই পর্বতসারি। এর ওপারেই চীন ও মোঙ্গলিয়া।

মোঙ্গলিয়ার বাসিন্দাদের এই দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করে এপারে আসতে-পারার সম্ভাবনা ছিল খুবই ক্ষীণ। তেমনি এপারের লোকজনও ছিল ওপার থেকে পুরোপুরি সম্পর্কহীন। মাঝেমধ্যে কোনো পর্যটক অথবা বাণিজ্য-কাফেলা শুধু আসা-যাওয়া করত এপার-ওপার।

আলাউদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহের সাম্রাজ্যের সীমানা যখন এই পর্বতসারি পর্যন্ত এসে ঠেকল, তখনই তিনি প্রথম জানতে পারলেন—ওপারেও বিশাল এক সাম্রাজ্য রয়েছে। সেই সাম্রাজ্যের অধিপতি চেঙ্গিজ খান।

তৃতীয় অধ্যায়

চেঙ্গিজ খান

মানব-ইতিহাসে পাশবিকতা ও নৃশংসতার অসংখ্য দাস্তান সংরক্ষিত রয়েছে। জুলুম, নিপীড়ন ও হত্যাযজ্ঞের এমন বহু ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে, যার সীমাহীন কাঠিন্য ও কঠোরতার কথা ভেবে আজও আতঙ্কে ও বিস্ময়ে কুঞ্চিত হয়ে ওঠে বনি আদমের কপাল।

ইয়েমেনের একত্ববাদীদের উপর যু-নাওয়াসের অকথ্য নিপীড়ন, মিশরের মুমিনদের উপর ফেরাউনের শক্ত ধরপাকড় এবং ১ লক্ষ নিরপরাধ নারী-পুরুষকে ভেড়া-বকরির পালের মতো হাঁকিয়ে হাঁকিয়ে ব্যবিলন নিয়ে-যাওয়া নরপশু নেবুচাদনেজারের লোমহর্ষক রক্তযজ্ঞ কেয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির অভিশাপ কুড়াতে থাকবে।

ক্রুসেডাররা বাইতুল মুকাদ্দাস কবজা করে মসজিদুল আকসায় নির্বিঘ্নে-নির্বিচারে মুমিনদের রক্ত ঝরিয়েছিল। সেই নির্মমতা কল্পনা করতে গেলে চোখে আজও গাঢ় রক্তাশ্রু জমে ওঠে। স্পেনে মুসলিমদের উপর যে গণহত্যা চালানো হয়েছিল, আজও তা ইতিহাসপাঠকের হৃদয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্তক্ষরণ ঘটায়।

উপমহাদেশে, ১৮৫৭ সালে আজাদি আন্দোলন গড়ে তোলার কারণে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কী অবর্ণনীয় জুলুম-নিপীড়ন শুরু করেছিল, তা কখনোই ভুলবার নয়।

হিন্দুস্থানের মুসলিমদের উপর ১৯৪৭ সালে শিখ ও হিন্দুরা যে ভয়ানক প্রলয়কাণ্ড ঘটিয়েছিল, মনে হলে আজও সর্বাঙ্গ কেঁপে ওঠে।

হিটলার, মসুলিনি ও স্টালিনের মতো বর্বরেরা মানুষ হত্যার যে নিষ্ঠুর উৎসব শুরু করেছিল, তজ্জন্য মহাপ্রলয় পর্যন্ত বিশ্বমানবতার বিরামহীন অভিশাপে তারা জর্জরিত হতে থাকবে।

এদের ধ্বংস-কাহিনির পাতা ওলটাতে গেলে হৃদয়ের গভীর থেকে প্রচণ্ডভাবে ঝাঁকুনি খেয়ে উঠতে হয়। প্রত্যেকটি কাহিনিতেই লুকিয়ে রয়েছে রক্তাক্ত বিধ্বস্ততার হাজারও বেদনাপূর্ণ গল্প।

কালের ইতিহাসবেত্তাগণ পরম মমতায় বেদনাকাতর সেই গল্পগুলো কালির আঁচড়ে লিপিবদ্ধ করে গেছেন, তাতে যদিও তাদের মস্তিষ্ক কখনও সম্পূর্ণ অকেজো ও ভারী হয়ে গেছে, রক্তস্রোতের সেইসব দৃশ্য কল্পনা করতে গিয়ে তীব্র ব্যথায় যদিও কাতর হয়ে উঠেছে তাদের দেমাগ—যেন মগজের ঈষদুষ্ণ কোমল মাংসে কেউ এসে গেঁথে দিয়েছে একটা সূক্ষ্ম আলপিন।

মন না চাইলেও ইতিহাসপ্রণেতা তবু নিজের পরম দায়িত্ব ভেবে বিস্তারিত সেসব লিখে গেছেন। তার মনে ছিল একটাই আশা, 'আগত প্রজন্ম আমার এই রচনা পড়বে, সত্য বলে স্বীকার করবে, এবং নিজেদের অতীত হতে সবক গ্রহণ করবে, সেই আলোকে নির্ধারণ করবে ভবিষ্যৎকর্মপন্থা।'

কিন্তু আরও অনেক পূর্বে, একদা রচিত হয়েছিল উল্লিখিত ধ্বংসকাহিনির চেয়েও বহুগুণ বিস্ময়কর এক অধ্যায়। আল্লাহর এই ভূপৃষ্ঠে এমন ভয়ংকর হত্যাকাণ্ড ঘটে গিয়েছিল, যা লিখতে গিয়ে তখনকার ঐতিহাসিকদের মনে প্রবল সংশয় ছিল যে, ভবিষ্যৎপ্রজন্মের ভেতর যুদ্ধের এই মহাকাব্য সঠিক ও সম্ভব বলে স্বীকার করবার মতো কেউ থাকবে তো!

ঐতিহাসিকদের চরম হতবুদ্ধি ও নির্জীব করে-দেওয়া সেই ধ্বংসনামাটি যার হাতে সম্পন্ন হয়েছিল, তার নাম চেঙ্গিজ খান। পুরো ভূপৃষ্ঠের অর্ধেকাংশ আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন তিনি। রক্তসমুদ্রে ঘোড়া ছুটিয়ে পূর্ব-পশ্চিমের সমস্ত এলাকায় সৃষ্টি করেছিলেন প্রবল আতঙ্ক ও ত্রাস। জলদগম্ভীর ঘনকৃষ্ণ মেঘপুঞ্জের মতো গোবি মরুভূমির ভেতর থেকে উঠে এসে প্রচণ্ড বজ্রপাতের মতো ফেটে পড়েছিলেন মুসলিমবিশ্বে। ভূপৃষ্ঠের সমস্ত কিছু একেবারে ঝলসে দিয়েছিলেন।

চেঙ্গিজ খানের আসল নাম ছিল তেমুজিন (আরব ঐতিহাসিকরা তাকে তামুর্জিন বলেন)। বাহ্যত তিনি ছিলেন গোবি মরুভূমিতে (মোঙ্গলিয়া) জন্ম-নেওয়া অপরাপর লোকের মতোই একজন মানুষ। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ছিলেন পৃথিবীর তাবৎ গোত্রকে ঝলসে-দেওয়া এক ধকধকে অগ্নিকুণ্ড।

গোবি মরুভূমির ভূত

চীনের উত্তরাংশে গোবির (মোঙ্গলিয়া) এক বিশাল মরুভূমি উপস্থিত। গরমকালে সেখানে প্রচণ্ড বালিঝড় ওঠে। সেই ঝড়ে ঢাকা পড়ে যায় সমস্ত ঊর্ধ্বাকাশ। ঝড়োহাওয়ার সাথে সাথে জায়গা বদল করে উঁচু উঁচু সব টিলা। শীতকালে উত্তরদিকে বইতে থাকে প্রচণ্ড শীতল বাতাস। প্রতিটি বস্তুকে তা পুরোপুরি শুষ্ক ও বিবর্ণ বানিয়ে ফেলে। প্রাচীনকাল থেকে যাযাবর গোত্রগুলোর আবাসভূমি সেখানে। যাযাবরদের সময় কাটত শিকার করে ও পশুপাল চরিয়ে। হরিণ, ভল্লুক, উদবিড়াল, খেঁকশিয়ালসহ বিভিন্ন প্রজাতির বন্যপশু ছিল তাদের আহার।

তাদের মালিকানায় ছিল গাভি, ঘোড়া ও ভেড়া-বকরির বড় বড় পাল। গরমকালে সহজলভ্য ছিল সেসবের দুধ। তবে শীতের সময় তুষারপাতের ফলে ঘাস পাওয়া যেত না। শুকিয়ে মরে যেত সব। পশুদের ওলানের দুধও শুকিয়ে যেত। বাধ্য হয়ে গরমকালের জমানো শুকনো গোশত খেয়েই দিন কাটাত তারা।

খাওয়াদাওয়ার নিয়ম ছিল—প্রথমে যুবক ও শক্তিশালী লোকেরা সামনে যা পেত, চেটেপুটে খেয়ে নিত তৃপ্তিমতো। তারপর বাচ্চাকাচ্চাদের ফেলে রেখে নারী ও

বৃদ্ধরা খেতে বসত। একেবারে শেষদিকে যখন আসত বাচ্চাদের পালা, হাড্ডি চুষে চুষেই পেটের খানিক আগুন নেভাত তারা, নাহয় ইঁদুর কিংবা কাঠবিড়ালি শিকার করে সেসবের মাংস খেত।

ঝড়োহাওয়া থেকে আত্মরক্ষার জন্য গোলাকার গম্বুজের মতো বড় বড় তাঁবু ছিল তাদের বাসস্থান। তাঁবুগুলোকে ওরা বলত ইউরিত। সেই ইউরিতগুলোকে এদিক-সেদিক স্থানান্তর করতে সামানাপত্র বহনের বড় বড় গাড়ির মতো বাহন ছিল। সেগুলোকে টেনে নিয়ে যেতে সামনের দিকে জোড়া হতো বন্য ষাঁড়।

মরুভূমিতে যেখানেই পানি ও ঘাসকুটো সহজলভ্য হতো, সেখানেই তারা গড়ে তুলত ডেরা। খাদ্য-পানি শেষ হয়ে গেলে ইউরিত গুটিয়ে অন্য কোনো চারণভূমির দিকে রওনা হয়ে যেত। প্রত্যেক গোত্রের লোকজন নিজেদের সুরক্ষার জন্য একজন চতুর ও বাহাদুর লোককে সরদার নির্বাচন করত। ঘাস-পানির তালাশে পছন্দসই জায়গা কবজা করতে গিয়ে অধিকাংশ সময় তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি ও রক্তপাতে মেতে উঠত।

সেই পরিস্থিতিতে সরদারের বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতাই পারত নিজ গোত্রকে দুশমনের কবল থেকে রক্ষা করতে। গোত্রগুলো পরম্পরাগতভাবে কষ্টসাধ্য কাজের অস্বাভাবিক সহনশীলতা নিয়ে জন্মেছিল। লাগাতার কয়েক দিন অভুক্ত থাকতে পারা ছিল তাদের কাছে নিতান্ত মামুলি ব্যাপার। গোত্রের পুরুষেরা লাগাতার কয়েক দিন পর্যন্ত ঘোড়সওয়ারি করতে পারত, এবং আচানক গিয়ে দুশমনের উপর হামলে পড়ত।

মরুভূমিতে বসবাসকারী এই লোকগুলোর চেহারা ছিল লালবর্ণের। লালের মধ্যে খানিকটা পানসে নীলের মতো আভা মেশানো ছিল। অর্থাৎ, রক্তিম চেহারায় পাতলা চামড়ার নিচ দিয়ে বয়ে-যাওয়া রক্তকণিকা দেখা যেত বলে খানিকটা নীলাভ লাগত।

চেহারা ছিল ঢালের মতো চওড়া, প্রশস্ত এবং ভরাট। নাক চ্যাপটা, ছোট ছোট। দাড়ি ছিল ঝরঝরে, অসংলগ্ন। শরীরের গাঁথুনি ছিল মজবুত। দেহ ছিল অনেক লম্বা। তাদের গঠনপ্রকৃতি ছিল অন্যসব সম্প্রদায় থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ভিন গোত্রের কোনো লোক তাদের ভেতর ঢুকে গেলে সহজেই তাকে চিনে ফেলা যেত। একারণে তাদের মধ্যে কোনো গোয়েন্দা ঢুকতে পারত না। ধোঁকাবাজি ছিল তাদের প্রাত্যহিকের প্রিয় কর্ম।

গায়ে পশুর চামড়ায় তৈরি বড় বড় পোশাক ও পায়ে লোমের জুতো-পরা গোবি মরুভূমির এই বাসিন্দাদের আক্ষরিক অর্থেই মনে হতো ভয়ংকর জংলি ভূত।

মোগল

এই যাযাবর গোত্রগুলোর ভেতর একটি বড় গোত্র ছিল মোগল। বৈকাল লেকের আশপাশের চারণভূমিতে ছিল এদের কর্তৃত্ব। সবুজ-শ্যামল এই চারণভূমি ছিল বৈকাল লেক থেকে মানসুরিয়ার সীমান্তবর্তী পর্বতসারি পর্যন্ত বিস্তৃত। এর ভেতর

দিয়ে বয়ে গেছে দুটো নদী। নদী-দুটির পারজুড়ে দেবদারু-জাতীয় অসংখ্য গাছপালা। বলা যায়, বিস্তৃত গোবি মরুভূমির উত্তরাঞ্চলের এই ভূখণ্ড ছিল যাযাবর গোত্রগুলোর জন্য পরম শান্তির স্বর্গ। এসব এলাকা দখল করতে বিভিন্ন গোত্র অতর্কিতে আক্রমণ করে বসত। তবে তাতে সফল হতে পারত না। কারণ, উত্তর গোবির কর্তৃত্বশীল মোগল কবিলা প্রচণ্ড শক্তিমত্তায় মিসমার করে দিত সবধরনের অভিযান।

তেমুজিন

৫৪৯ হিজরি, ঈসায়ি ১১৫৪। গোবি মরুভূমির এই মোগল গোত্রের সরদার ইয়ুসেগেইয়ের ঔরসে এক পুত্রসন্তান জন্ম নিল। নাম রাখা হল তেমুজিন।

তেমুজিনের বয়স যখন ১৩, হঠাৎ একদিন দুশমনের তলোয়ারে মারা পড়ল তার বাবা, সরদার ইয়ুসেগেই। গোত্রের লোকজন দিশে হারিয়ে ফেলল। সরদারপুত্র তেমুজিন এটুকুন বয়সে এখন তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবে না ভেবে তারা সম্পূর্ণ হতাশ। ফলে একে-একে তারা ছড়িয়ে পড়ে এদিক-ওদিক, স্বীকার করে নেয় ভিন্ন কোনো সরদারের অধীনতা। এদিকে মা হুয়েলোন, ভাই কাসার ও কিছু বিশ্বস্ত সহচর নিয়ে গোবি মরুভূমির ভেতরেই থেকে গেল তেমুজিন। বড় দুঃখ-যন্ত্রণাময় দিন কাটাতে লাগল সে।

শত্রু কবিলাগুলো তখনও দ্বিতীয় দফা আক্রমণের জন্য ওত পেতে ছিল। একদিন তারা সুযোগ পেয়ে তেমুজিনকেও কয়েদ করে ফেলল। গ্রামে গ্রামে জ্বালিয়ে দিল আগুন। তেমুজিনের বংশের লোকদের দখলীকৃত এলাকাগুলো চলে গেল তাদের কবজায়।

স্পষ্টতই পুরো কাহিনি সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তেমুজিনের ভাগ্যে ছিল অন্যকিছু লেখা। সবাইকে চমকে দিয়ে সে দুশমনের কয়েদখানা থেকে পালাতে সক্ষম হল। ফিরে এল নিজ গ্রামে। কিন্তু এসে তখন আগের চেয়েও বেহাল অবস্থা দেখতে পেল সে।

তবু তেমুজিন তার মা, ভাই, সহচর এবং বংশের কিছু লোক নিয়ে নতুন করে উঠে দাঁড়াতে চাইল। খুঁজতে লাগল দুশমনের ঘাড়ে আঘাত হানবার নতুন মওকা। এই দিনগুলি পাহাড়ের বড় বড় পাথরের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে সে কাটাচ্ছিল। ভাবছিল বাপ-দাদার এলাকা না-ছেড়ে এখানে থেকেই দুশমনের উপর আক্রমণ করার কথা।

দুশমনও তখন শিকারি কুকুরের মতো চারদিকে তেমুজিনের গন্ধ শুঁকে ফিরছে। মুঠোর ভেতর পেলেই ঘাড় মটকাবে তার। কিন্তু তেমুজিনকে তারা ধরতে পারেনি। একদিন আচমকা শত্রুবাহিনীর মুখোমুখি হয়ে গেল তেমুজিন। সঙ্গে সঙ্গে বেধে উঠল সংঘাত। এই সংঘাতে সফল হল তেমুজিন। এ খবর শুনে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা স্বগোত্রীয়দের বিশ্বাস জন্মাল যে, এবার নিশ্চয় তেমুজিন গোত্রের

রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবে। ফলে একে-একে ফিরে এসে তারা তেমুজিনের নেতৃত্বে জমায়েত হতে লাগল। তেমুজিনেরও প্রাণপণ চেষ্টা ছিল—যেকোনোভাবে গোত্রের লোকদের একত্র করতে হবে।

তেমুজিনের বয়স যখন ১৭ বছরে গড়াল, বিয়ে করে ফেলল কুরতাই নামের এক সুন্দরী মেয়েকে। বিয়ের পর কিছুদিন মাত্র কেটেছে, এর ভেতর একদিন আচানক আবার আক্রমণ করে বসল সেই পুরোনো দুশমন। তারা তেমুজিনের সুন্দরী নববধূকে নিয়ে পালিয়ে গেল। পিতৃহত্যার পর থেকেই প্রতিশোধের অনলে জ্বলছিল তেমুজিন। সেই ক্রোধাগ্নি এবার দ্বিগুণ তেজে প্রজ্বলিত হয়ে উঠল।

এক অন্ধকার রাতে দুশমনের ঘাঁটিতে আক্রমণ করে তেমুজিন তার স্ত্রীকে উদ্ধার করে ফেলল। উদ্ধার ঠিকই করেছিল; কিন্তু এই ঘটনার পর থেকে সবসময়ই স্ত্রীর সতীত্ব নিয়ে সে সন্দিগ্ধ ছিল।

কিছুদিন পর কুরতাইয়ের কোল আলোকিত করে জন্মগ্রহণ করে তেমুজিনের প্রথম পুত্র জোচি। কিন্তু তেমুজিন সারা জীবন এই জোচির প্রকৃত বংশধারা নিয়ে সংশয়ের ভেতর থাকে।

চতুরতা, ফেরেববাজি, নির্ভয়তা ও ক্রোধ ছেলেবেলা থেকেই তেমুজিনের রক্তে মিশে আছে। কয়েকবার সে পরাজিতও হয়েছে এবং মৃত্যু খুব কাছ দিয়ে গেছে তার। তবু সে যুদ্ধ-ময়দান ছাড়েনি। গোত্রের লোকেরা একে-একে ফিরে এসেছে সবাই। তবে নিজেদের ভেতর তারা কখনও দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জড়ায় না। কেউ হয়ে ওঠে না স্বগোত্রীয়দের প্রাণনাশের কারণ। খুব মিলেমিশে থাকে। কিন্তু ভিন্ন সম্প্রদায়ের ক্ষতির ভাবনায় অস্থির থাকে সবসময়। মুহূর্তে একাট্টা হয়ে যায় নিজেরা। আর হবেই-বা না কেন, সে সময়কার সব কবিলাই তো মোগল গোত্রকে শায়েস্তা করতে চাচ্ছিল। এদিকে আবার তেমুজিনের হাতে হাত রেখেছিল যেসব মোগল, তাদের সংখ্যা নিতান্তই কম। তবে তেমুজিনের জন্য সবাই জীবন বিকিয়ে দিতে পর্যন্ত সর্বদা প্রস্তুত থাকত।

একবার এক আক্রমণে তেমুজিন নিদারুণ আহত হল। দুশমনের একেবারে নাগালে চলে গিয়েছিল সে। তীব্র গতিতে একটি তির উড়ে এসে খচ করে বিঁধে গেছিল তার গলায়। সে ধপ করে পড়ে গেল শুভ্র বরফের উপর। দীর্ঘ সময় ধরে নিস্তরঙ্গভাবে পড়েই থাকল; একটুও নড়াচড়া নেই।

গোত্রের লোকজন আশাহত হয়ে গেল। মনে করল তেমুজিন মরে গেছে। সেদিন তাকে বরফের উপর ফেলেই ওরা চলে এসেছিল। তবে দুশমনের চোখ ফাঁকি দিয়ে দুই সহচর দ্রুত গিয়ে পৌঁছল তেমুজিনের লাশের কাছে। গলার জখমে ঠোঁট লাগিয়ে চুষে চুষে বের করল বিষরক্ত। অপরজন গিয়ে একটি পাত্র জোগাড় করে আনল। পাত্রে বরফ-গলা শীতল পানি জমা করে তা দিয়ে তেমুজিনের জখম ধুয়ে সাফ করল।

হঠাৎ মুখভরতি নিঃশ্বাস ছেড়ে হিক্কা খেয়ে ওঠে তেমুজিন। একটিবারের জন্য কেঁপে ওঠে তার সারা দেহ। এভাবে প্রায় মরতে মরতে সেদিন বেঁচে গিয়েছিল সে।

এই রকম মর্মান্তিক পরিস্থিতির পরেও তেমুজিন সবসময় স্বজাতির ভাবনায় মশগুল ছিল। ধীরে-ধীরে তার পাশে এসে দাঁড়াল ১৩ হাজার যুদ্ধবাজ সিপাহি। মোটামুটি একটা শক্তি গড়ে উঠেছে তেমুজিনের। কিন্তু তখনও তার স্থায়ী কোনো আবাসন তৈরি হয়নি। অভূতপূর্ব যাযাবর জীবন কাটাচ্ছিল সে। খোরাকি খুঁজতে কিংবা দুশমনের তলোয়ার থেকে বাঁচতে কিছুদিন পরপর প্রায়ই তাকে স্বগোত্রীয়দের নিয়ে জায়গা বদল করতে হতো।

তেমুজিনের প্রথম বিজয়

খাদ্যের সন্ধানে একেক জায়গায় ছোটাছুটি করছে তেমুজিন। হঠাৎ পুরোনো শত্রু তাইজুত গোত্রের লোকজন তারগাতাই নামের এক নেতার নেতৃত্বে পথ রোধ করে দাঁড়ায় তার। তাইজুতরা সাকুল্যে ছিল অস্ত্রসজ্জিত ৩০ হাজার সিপাহি। তেমুজিনও খুব দক্ষতার সাথে যুদ্ধের জন্য গোত্রীয়দের তৎক্ষণাৎ সারিবদ্ধ করে ফেলল।

বেধে উঠল প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী সংঘাত। যুদ্ধ চলতে থাকল সারা দিন ধরে। হঠাৎ করেই বিপুল শক্তিতে তেমুজিনের বাহিনী শত্রুর উপর চড়াও হয়ে ওঠে। তাইজুতদের ৬ হাজার সৈন্য নিহত হয়। বাকিরা রণাঙ্গন ছেড়ে পালিয়ে যায় দিগ্বিদিক।

ইতিপূর্বে তেমুজিনকে এই তাইজুত গোত্রই বন্দি করে নিয়ে গিয়েছিল। জ্বালিয়ে দিয়েছিল গ্রামের পর গ্রাম। তবে এবারকার নাজুক পরাজয়ে এদের যুদ্ধ-শক্তি পুরোপুরি খর্ব হয়ে গেল।

তেমুজিনের ক্ষমতার দম্ভ এতে হঠাৎ করেই দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। সে যথারীতি সরদার-সরদার ভাব নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। জীবনের প্রথম যুদ্ধেই কিনা বিজয়! তেমন ভাব আসা তাই স্বাভাবিক। পতপত শব্দে উড়ে চলেছে তেমুজিনের বিজয়-পতাকা। ধীরে-ধীরে অনেক লোক এসে তার দলে যোগ দিচ্ছে। বাড়ছে সহচর। বাগুর্চি নামের এক লোক তার খুব কাছের বন্ধু। ছোটভাই কাসার তার যুদ্ধের ডানহাত। তেমুজিনের জন্য সে জীবন পর্যন্ত বিকোতে পারে। তেমুজিনের যুদ্ধ-জয়ের মূল চালিকাশক্তি ছিল তিন নওজোয়ান যোদ্ধা—জুবি নৈয়ান, সুবেদাই বাহাদুর ও মাকুলি বাহাদুর।

উঁগ খান

পিতা ইয়েসুগেইয়ের এক প্রিয় মিত্র ছিল উঁগ খান। তেমুজিন তার সাহায্য তলব করল। সামনে এক নতুন সাফল্য লাভ করতে যাচ্ছে সে। গোপনে-গোপনে বেঁধে চলেছে সব আঁটঘাট। একদিন আচমকা তাতারদের এক গোত্রের উপর আক্রমণ করে বসল তেমুজিন এবং চুরমার করে দিল তাদের শক্তি।

তুগরুল উঁগ খান ছিল কেরায়েত গোত্রের নেতা। তেমুজিনের পিতা ইয়েসুগেইয়ের সাথে তার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তেমুজিনকে সে খুবই স্নেহ করত। লাই দিয়ে মাথায় তুলে ফেলা পর্যায়ের স্নেহ। তবে তেমুজিনও তাকে পিতাজি বলে সম্বোধন করত।

কেরায়েত সম্প্রদায় মোগলদের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল। বিশাল-বিস্তৃত এলাকা ছিল তাদের আয়ত্তে। সভ্যতা-সংস্কৃতিতেও তারা অন্যসব বেদুইন জাতি থেকে ছিল খানিক এগিয়ে।

কুরুলতাই

তেমুজিন হারানো রাজ্য যদিও উদ্ধার করে নিয়েছিল; কিন্তু নীরব থাকেনি সে। ক্ষমতার লিপ্সা ও রক্তোন্মত্ততা আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গিয়েছিল তার। রক্তের ভেতর তখন নতুন সাম্রাজ্য দখলের চঞ্চলা স্রোত। তার সমস্ত দিবস-রজনী কাটছিল চরম অস্থিরতায়।

তেমুজিনের বয়স তেইশে পড়েছে। উন্মত্ত যৌবন যাপন করছে সে। সে থেমে থাকল না। প্রচণ্ড শক্তিতে সাম্রাজ্যের গণ্ডি বহুদূর বিস্তৃত করে ফেলল। সাম্রাজ্যদখল আর লুটপাটের লোভে দূরদূরান্তের বিভিন্ন যুদ্ধবাজ জাতিগোষ্ঠী এসে তেমুজিনের ছত্রছায়ায় জড়ো হতে লাগল।

তেমুজিন গোপনে আবারও প্রতিবেশী সাম্রাজ্যগুলোতে আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। কেরায়েত গোত্রের সরদার উঁগ খান তাকে যারপরনাই স্নেহ করেন তখনও। তেমুজিনের তিনি খুবই ভালো মিত্রশক্তি। কিন্তু কিছুদিন যেতেই অতর্কিত আক্রমণে উঁগ খানের রাজ্যও কবজা করে ফেলে তেমুজিন। সেই আক্রমণে মারা পড়ে উঁগ খান। উঁগ খানের আবাসভূমি কারাকোরাম ছিল খুবই মনোরম এলাকা। চারপাশে মায়াবী শীতল আবহাওয়া। তেমুজিনের ভারী পছন্দ হয়ে গেল জায়গাটি। ফলে কারাকোরামকে সে স্থায়ী আবাসভূমি বানিয়ে নিল।

এ বিজয়ের পর পরামর্শের জন্য অধীনস্থ সরদারদের একত্র করল সে। পরামর্শসভায় সকলের সামনে দৃঢ় শপথ করে বলল—আমি পুরো এশিয়া কবজা করতে চাই। তারপর উপস্থিত সবার থেকেই সে তার নেতৃত্ব মেনে নেওয়ার শপথ গ্রহণ করে। আর সেদিনই প্রথমবারের মতো ধারণ করে চেঙ্গিজ খান উপাধি। তার সংকল্পবদ্ধ মনে তখন জেগে ওঠে—এবার নতুন মিশন বাস্তবায়নের পালা। এবার আমার বিজয়ের পালা।

এই ঘটনা ৬০২ হিজরি মোতাবেক ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দের। মোঙ্গলিয়া ও তিয়ান-শিয়ান পাহাড়ের আশপাশে বসবাসরত যত স্বাধীন নেতৃবৃন্দ ছিল, চেঙ্গিজ খানের নেতৃত্বের ছায়াতলে এসে গেল। ফলে তার বাহিনীর সদস্যসংখ্যা পৌঁছাল আড়াই লাখের কোঠায়। পুরো এক লক্ষ মাইল পর্যন্ত ছিল তাদের বিস্তার। এগওয়ার,

কেরায়েত, তাতার, মিবকিত ও অন্যান্য শত্রুবংশ চেঙ্গিজ খানের সামনে ঝুঁকিয়ে দিল আনুগত্যের মস্তক। চেঙ্গিজের খেদমতে সবাই নিজেদের উজাড় করে দিল। এই বিধ্বংসী বাহিনীর পতাকা এবার আগের চেয়ে দ্বিগুণ জোরে উড়তে লাগল।

খাতা (চীন) হামলার ফন্দি

এতদিন চেঙ্গিজ খানের প্রধান লক্ষ্য ছিল তার মতো সংস্কৃতিবিবর্জিত অসভ্য যাযাবর গোত্রগুলির সাম্রাজ্যদখল। বেছে বেছে তাদের উপরেই তিনি হামলে পড়েছিলেন। কিন্তু এবার মোঙ্গলিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত চীনের বিশাল খাতাই সাম্রাজ্য বিজয়ের স্বপ্ন দেখতে লাগলেন তিনি।

এই সাম্রাজ্যের ছিল ৫ হাজার বছরের প্রাচীন সংস্কৃতি। এখানকার লোকজন চাল দিয়ে মদ বানিয়ে খেতে পছন্দ করত। মহিলাদের হাতের চুড়ি-বালার ঝনঝনানি শুনে মনে হতো এক অপূর্ব গীতালি। বাসিন্দারা খুব ভদ্রোচিত লেফাফাদুরস্ত রেশমি পোশাক পরে ঘোরাফেরা করত। সবসময় তাদের চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকত—কীভাবে আরেকজনের কাছে নিজের স্বভাব-চরিত্র দ্বিগুণীকৃত ভদ্রভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়।

একেকটি শহরে বাস করত কয়েক লক্ষ মানুষ। মোঙ্গলিয়ার মরুভূমি এলাকায় যাদের বসতভিটা ছিল, চীনের বাদশাহ তাদের আওয়ারা প্রজা বলে ভাবতেন। তিনি জানতেন, যেকোনো সময় এরা বিদ্রোহী হয়ে উঠবে। এজন্য তাদের অনাকাঙ্ক্ষিত অঘটন থেকে বাঁচতে চীনের মহাপ্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন তিনি। শতাব্দীকাল ধরে সেই প্রাচীর ঠিক একইভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। উত্তরাঞ্চলের আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য এটাকে রক্ষা-প্রাচীর ভাবত বাসিন্দারা। পাশাপাশিভাবে একসঙ্গে ছয়টি ঘোড়া ছুটে যেতে পারবে—প্রস্থে এই মহাপ্রাচীরের এই পরিমাণ পুরুত্ব ছিল।

চেঙ্গিজ খান যেসব বিক্ষিপ্ত ও পরস্পর-বিরোধী গোত্রকে এক পতাকাতলে নিয়ে এসেছিলেন, তাদের জমাটবদ্ধ রাখার ছিল একটাই উপায়—সর্বক্ষণ অন্য সম্প্রদায়কে নাস্তানাবুদ করার চিন্তায় তাদের নিমগ্ন রাখা। না-হয় নিজেদের মধ্যে যেকোনো সময় ঝগড়া-বিবাদ লেগে যেতে পারত। এমনকি কাটাকাটি এবং খুনোখুনিতে পর্যন্ত মেতে উঠতে পারত তারা।

পূর্বপ্রস্তুতি ও গুপ্তচরবৃত্তি

সুবিস্তৃত খাতা সাম্রাজ্যে আক্রমণের পূর্বে আশপাশের সব বিরোধী গোত্রের ঘাড় মটকে দেওয়া জরুরি মনে করেছিলেন চেঙ্গিজ খান—যাতে মাঝপথে এরা ঢাল হয়ে দাঁড়াতে না পারে। তাই প্রথমে তিনি হিয়া সাম্রাজ্যে আক্রমণের জন্য নিজেই অগ্রসর হলেন। অল্পতেই সেখানকার লোকদের অনুগত করে ফেললেন। ওদিকে কারাখতাই ও কিরগিজদের শায়েস্তা করতে অবশ্য নিজে অগ্রসর হননি, কিছু দক্ষ সরদারকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

এই দুই অভিযান সম্পন্ন করে চেঙ্গিজ খান খাতা আক্রমণের ব্যাপারে সংকল্পবদ্ধ হন। তবে সরাসরি তিনি নামতে চাচ্ছিলেন না আক্রমণে। প্রথমে হামলা করার মতো সঙ্গত কোনো উসিলা খুঁজছিলেন—একটা কিছু ঘটলেই সেই উসিলায় ঝাঁপিয়ে পড়বেন তিনি। এজন্য অবশ্য খুব বেশিদিন অপেক্ষাও করতে হল না তাকে। হঠাৎ একদিন খাতার শাসকের মৃত্যু ঘটে গেল। এবং তার পুত্র 'দায়েদঙ্গ' উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করল।

তখন পর্যন্ত মোঙ্গলিয়ার সমস্ত গোত্রকে ভাবা হতো চীন সরকারকে করপ্রদানকারী জাতি। স্বয়ং চেঙ্গিজ খানও চীনের সাবেক বাদশাহর কাছে নিজের পূর্ণ বিশ্বস্ততা প্রমাণ করেছিলেন। বাদশাহর কাছ থেকে তিনি 'বিদ্রোহ-দমনকারী নেতা' উপাধি লাভ করেছিলেন। ঘটনা হল—একবার চেঙ্গিজ খানের সহায়তা চেয়ে বাদশাহ তাকে চীনদেশে দাওয়াত করলেন। রাষ্ট্রীয় শত্রুদের দমন করতে চেঙ্গিজের শক্তির প্রয়োজন পড়েছিল তার। চেঙ্গিজ খান চীনে গিয়ে শত্রুদের মূলোচ্ছেদ করে দিয়ে আসেন। তবে, এই অভিযানে তলে-তলে তিনি চীন সাম্রাজ্যের সব ব্যবস্থাপনা, সবলতা ও দুর্বলতার সমস্ত দিক এবং ভবিষ্যৎ-আক্রমণের নিখুঁত নকশা এঁকে হৃষ্টচিত্তে ফিরে এসেছিলেন। ফলে চীনের সব রাজপথ, পাহাড়-পর্বত ও শহর-নগরের পূর্ণ নকশা ছিল তার নখদর্পণে।

যুদ্ধের বাহানা

নতুন বাদশাহ দায়েদঙ্গ ক্ষমতায় বসেছে কিছুদিন হল। দু-চারদিন তখনও পেরোয়নি। এর ভেতর চেঙ্গিজ খানের কাছেও কর চেয়ে বসল সে—যেমন চেয়েছিল অন্য করদাতাদের নিকট।

চেঙ্গিজ খান এইবার সুযোগ পেয়ে গেলেন। সুবর্ণ সুযোগ! একটুখানি অপেক্ষাও আর করলেন না তিনি। জবাবে দায়েদঙ্গের কাছে এমন কিছু আক্রমণাত্মক কথা লিখে পাঠালেন—যেগুলোর দরুন অনিবার্য হয়ে উঠতে পারে যুদ্ধ।

বার্তাবাহকের মুখে দায়েদঙ্গের চিঠির বাক্য শুনে চেঙ্গিজ খান সেটা ছোঁ মেরে নিয়ে প্রচণ্ড ঘৃণাভরে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। উত্তেজিত গলায় বলে উঠেছিলেন—দায়েদঙ্গের মতো গর্দভকে ট্যাক্স দেব আমি? তা করে নিজেকে লাঞ্ছিত করতে চাই না। ওর ইচ্ছে হলে আমার অনুগত থেকে রাজ্য পরিচালনা করে যাক। নাহয় শিগগির সমুদ্রের বিশাল ঢেউয়ের মতো সৈন্যবহর নিয়ে অগ্রসর হচ্ছি আমি। ওর শক্তি একদম গুঁড়িয়ে দেব।

কিছুদিন পরে চেঙ্গিজ খান এক শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে চীন-অভিমুখে রওনা হলেন। বাহিনীর মধ্যে বাছাইকৃত সিপাহি ছিল ৩০ হাজার। সৈন্যদলের মাঝখানের ও দুইপাশের সব মিলিয়ে ছিল পুরো ৩ লক্ষ সেপাই।

চীনের অনতিক্রম্য মহাপ্রাচীর ডিঙোতে চেঙ্গিজ খানের গুপ্তচরেরা বড় ভূমিকা রেখেছিল। তাতার-বাহিনী একদম খোলা ফটকের ভেতর দিয়ে ঢুকে পড়ল খাতা

সাম্রাজ্যের ভেতর। শুরু হল এক ধৈর্যপরীক্ষাকারী সুদীর্ঘ যুদ্ধ। এই যুদ্ধ কয়েক বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

প্রতি বসন্তকালে নতুন উদ্যমে এসে আক্রমণ চালাত তাতাররা। হেমন্তে তল্পিতল্পা গুটিয়ে ফের চলে যেত। সাময়িকের জন্য থেমে থাকত যুদ্ধ। কিন্তু চীনাদের প্রতিরক্ষা-শক্তি ধীরে-ধীরে দুর্বল হয়ে যাচ্ছিল।

তারপর দায়েদঙ্গই চীনা-খানদানের সর্বশেষ হতভাগ্য বাদশাহ প্রমাণিত। মূলত সে হীনম্মন্যতার কবলে পড়ে গিয়েছিল। ফলে সময়ের পূর্বেই হিম্মত হারিয়ে বসল। রাজধানী পিকঙ্গ ছেড়ে ভেগে গেল দায়েদঙ্গ। কিছুকাল অবরোধ করে রাখার পর তাতার-বাহিনী জয় করে ফেলল পিকঙ্গ। কোরিয়া পর্যন্ত সুবিস্তৃত সমস্ত অঞ্চল তাদের আয়ত্তে চলে এল।

চেঙ্গিজ খান চীনে মাকুলি বাহাদুরকে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে বাপ-দাদার সেই পুরোনো ভিটেবাড়ি গোবি মরুভূমিতে ফিরে যাচ্ছেন। তার বয়স তখন পেরিয়ে গেছে ৫৫-এর সীমানা। কয়েক বছর ধরে চলমান এই যুদ্ধে মোটামুটি নাকাল হয়ে গেছিলেন তিনি। ভাবলেন—নতুন কোনো রাজ্যে আক্রমণ চালাবার আগে কিছুকাল বিশ্রামের প্রয়োজন।

কারাকোরামে বিশ্রামগ্রহণ

বিস্তৃত গোবি মরুভূমির ভেতর এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল যাযাবরদের ছোট ছোট ঝুপড়ি। কারাকোরামেও চোখে পড়ত ঘাস-খড়কুটো ও মাটি দিয়ে গড়া অনেক অস্থায়ী আবাসন। পুরো অঞ্চলজুড়ে ছিল অজস্র বসতি। মরুবাসীরা তাদের একটু বেশিই সভ্য মনে করত অন্যদের তুলনায়। কারাকোরামের বাসিন্দাদের মূলত কেরায়েত বলে ডাকা হতো।

চেঙ্গিজ খান এই অঞ্চলকেও বাপ-দাদার জমিজমা বলে মনে করতেন। এজন্যই, কয়েক বছর আগে তিনি এখানকার সরদার তুগরুল উঁগ খানকে হত্যা করে এখানেই প্রধান আবাসন গড়ে নিয়েছিলেন। এখানকার সভ্যতা-সংস্কৃতি অন্যান্য সাম্রাজ্য থেকে খুব একটা ভালো ছিল না অবশ্য। কিন্তু গোবি মরুভূমির মতো বিরান অঞ্চলের লোকদের কাছে এটা খুব উন্নত শহর বলে বিবেচিত হতো।

চীন-যুদ্ধ থেকে তখন সবে ফিরেছেন চেঙ্গিজ খান। খুবই ক্লান্ত তিনি। তাই, নির্দিষ্ট একটা সময় এই নির্জন গোবির (কারাকোরাম) ভেতরেই বিশ্রামে থাকতে চাচ্ছিলেন। এখানে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এই এলাকাকে রাজধানী বলে ঘোষণাও করে ফেললেন। গোবিতে বিশ্রামে থেকেই সাম্রাজ্য-বিস্তারের সমস্ত কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবেন—এই ছিল তার মনস্কামনা।

এখানকার খড়কুটোর ছাদবিশিষ্ট ও কাঁচা মাটির প্রলেপযুক্ত ঝুপড়িগুলো পুরো পৃথিবী থেকে লুটপাট করে-আনা ধনদৌলতে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত ভরপুর হয়ে

উঠেছিল। চেঙ্গিজ খান যেখানে দরবার গেড়েছিলেন, উঁচু করে সেখানে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিল শামিয়ানা। শামিয়ানাগুলোর পাড় ছিল রেশমের তৈরি। চওড়া জমিন দেওয়া হয়েছিল পশুর শুভ্র চামড়ায়।

দরবারে, চেঙ্গিজ খানের সামনে সারাক্ষণ বসে থাকত কয়েকজন আমলা এবং চার ছেলে—জোচি, চোগতাই, উকতাই ও তুলি খান। জোচি খান ছিল শিকারি দলের আমির। সবার খাদ্য-সংস্থানের দায়িত্ব পালন করত সে। চোগতাই ছিল সরকারপ্রধান ও আইনপ্রণেতা, উকতাই প্রধান উপদেষ্টা; এবং ছোট ছেলে তুলি খান প্রধান সেনাপতি।

তাতারদের সাংস্কৃতিক অগ্রগতি

পরপর কয়েকটি বিজয়ের ফলে তাতার-জাতির সংস্কৃতিতে লেগেছিল খানিকটা উন্নতির ছোঁয়া। সেই অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে আতা মালিক জুয়াইনি বলেছেন—চেঙ্গিজ খান গোবির জনবিরল এলাকাগুলি লোক-লশকরে জমজমাট করে তুলেছিলেন মাত্র ক'বছরের ভেতর। বলা হয়—তাতাররা জিন্দানখানা থেকে মনোরম বাগিচায়, এবং বিশুষ্ক মরুবিয়াবান থেকে পরম আনন্দদায়ক অবস্থানে পৌঁছে গিয়েছিল তখন।

দূরান্তের এলাকাগুলিতে উৎপাদিত যত রকমের আসবাবপত্র ছিল, গোবিতে সব সহজলভ্য হয়ে উঠেছিল। বেড়ে গিয়েছিল উন্নত দামি খাবারের পরিমাণ। শস্যাদিতে চারপাশ হয়ে উঠেছিল ঘন সবুজ।[৪৭]

ইয়াসার নিয়ম-নীতি

অধীনস্থ সমস্ত গোত্রকে কাবু করে রাখতে সরকারি নিয়মকানুনের একটি দস্তাবেজ বা সংবিধান তৈরি করিয়েছিলেন চেঙ্গিজ খান। এই দস্তাবেজের নাম দিয়েছিলেন ইয়াসা। ইয়াসার নিয়মকানুন মেনে-চলা সবার জন্য অপরিহার্য ছিল। সেটাতে আকিদা ও তালিম প্রদানের আলোচনাও ছিল। কিন্তু হুকুমনামাই ছিল অধিক।

আবার, আসমান-জমিনের একক স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস-স্থাপনের কথাও ছিল। কিন্তু ইয়াসায় উপস্থিত ছিল না বিশ্বাসের সমস্ত শাখা-প্রশাখা।

ইয়াসার আরেকটা নিয়ম ছিল—সবাই আলাদাভাবে ব্যক্তিগত মাজহাব পালন করতে পারবে। কিন্তু তা-ও করতে হবে চেঙ্গিজ খানের অনুমতিক্রমে।

শত্রুপক্ষীয় গুপ্তচরবৃত্তি, মিথ্যা সাক্ষ্য, কালোজাদু, চুরি, ব্যভিচার ও পুরুষের গুহ্যদ্বারে উপগত হওয়ার শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। মাসে তিনবার নেশা করবার সুযোগ

---

[৪৭] তারিখে জাহাঁকুশা, পৃষ্ঠা ১৫-২০

মহিলা মাদরাসা ও মসজিদ কমপ্লেক্স
স্থাপিতঃ ২০২০ইং

ছিল। বজ্রপাত কিংবা মেঘ-চেরা বিদ্যুচ্চমকের সময় পানি ব্যবহার ছিল নিষিদ্ধ। ভিন গোত্রের সাথে প্রতারণাপূর্ণ আচরণের অনুমতি ছিল। তাদের ভেতর গণহত্যা চালানোও ছিল একটি বৈধ কাজ। ভিন্ন গোত্রের নারীদের বস্ত্রহীন করে তাদের সাথে রঙ্গ-তামাশায় মেতে-ওঠা ছিল অত্যন্ত মহৎ কর্ম।

এমনই এক আজগুবি কিসিমের সংবিধান চেঙ্গিজ খান প্রণীত ইয়াসা, যা ছিল একজন নষ্ট ও ভ্রষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের একরৈখিক চিন্তার ফসল। তার এই ইয়াসা নিঃসন্দেহে অগুনতি আহাম্মকি কথাবার্তায় ভরপুর। ইলমে ওহির নির্দেশনা-বর্জিত কোনো সংবিধান কোনোকালেই সফল হতে পারে না।

যা হোক, রাজত্ব টিকিয়ে রাখতে—যেমনই হোক—চেঙ্গিজ খানের জন্য জরুরি ছিল একটি সংবিধান প্রস্তুত করা। এই প্রয়োজনবোধেই তিনি বিন্যস্ত করিয়েছিলেন ইয়াসা। এর উপর আমলও করিয়েছিলেন প্রজাদের।

সূক্ষ্ম পন্থায় আক্রমণ

চেঙ্গিজ খানের লাগাতার বিজয়লাভের প্রধান কারণ ছিল—শত্রুপক্ষের উপর আচানক জোরদার হামলা করে বসা। তাতার বেদুইনদের প্রত্যেকটি পরিবারে কয়েকটি করে ঘোড়া থাকত সবসময়। যুদ্ধের সফরে এক ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে পড়লে সেটি পালটে দ্রুত আরেকটি নিয়ে নিত। এভাবে তারা জারি রাখতে পারত সার্বক্ষণিক সফর।

কোথাও আক্রমণের ইচ্ছে হলে চেঙ্গিজ খান সেখানকার অধিবাসীদের তা আগেভাগে কিছুতেই বুঝতে দিতেন না। সপ্তাহের সফর তিনি শেষ করে উঠতেন মাত্র একদিনের ভেতর এবং অতর্কিতে গিয়ে বজ্রের মতো ফেটে পড়তেন দুশমনের উপর।

চেঙ্গিজ খানের আরেকটি সূক্ষ্ম চাল হল—শত্রুপক্ষের উপর তিনি চতুর্দিক থেকে আক্রমণ চালাতেন। ক'বার এমনও হয়েছে যে, শত্রুবাহিনী তাতারদের অপেক্ষায় নির্দিষ্ট কোনো সীমান্তে দিনের পর দিন পাহারা দিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন সংবাদ শুনে, নানান অবস্থা দেখে, তাদের বিশ্বাস জন্মে গেছে যে, এইদিক থেকেই ধেয়ে আসছে তাতাররা। কিন্তু কী আশ্চর্য—তাতাররা কয়েকশ মাইল ঘুরে এসে, পেছন থেকে সীমান্ত টপকিয়ে, ঢুকে পড়েছে সেই শহরের ভেতর এবং চালিয়েছে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড।

আবার এমনও হয়েছে—যুদ্ধক্ষেত্রে তাতাররা যখন পরাজিত হতে শুরু করেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে তড়িঘড়ি করে বাহিনীর একাংশকে ময়দান থেকে সরিয়ে ফেলেছে তারা। তারপর সাময়িকের জন্য অপসৃত এই বাহিনীটি পূর্ণপ্রস্তুতি নিয়ে পেছন থেকে এসে আক্রমণ করে বসেছে শত্রুদলের উপর।

চেঙ্গিজের এসব সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র-জালে দুশমনকে প্রায়ই ফাঁসতে হয়েছে। যুদ্ধে জিতে যাবে এমন মুহূর্তেও তাতারদের এই দু-তরফা আক্রমণে শেষমেশ হেরে গেছে শত্রুবাহিনী।

ভয়াবহ জুলুম-নির্যাতন

চেঙ্গিজ খানের কথা ছিল—বিজিত অঞ্চলের লোকদের প্রতি কোনোরূপ দয়ামায়া দেখানো যাবে না। ভয় পেয়ে যে অঞ্চলের সাধারণ জনগণ নতি স্বীকার করে নিত চেঙ্গিজ খানের কাছে, সেখানেও ধুমধাম লুটপাট চালাত তাতার-বাহিনী। ঘরের ভেতর প্রবেশ করে লুট করে নিয়ে যেত সব। প্রকাশ্যে নারীদের শ্লীলতাহানি করত। অবশ্য এই রকম এলাকাগুলো গণহত্যা থেকে বেঁচে যেত।

কবজাকৃত শহরগুলো পুরোপুরি লুটেপুটে, তাতাররা অবশেষে সমস্ত বাড়িঘর তছনছ করে চলে আসত। চারদিকে গড়ে উঠত মরা লাশের পাহাড়। মাথার অসংখ্য খুলি কেটে-কেটে স্তূপীকৃত করে-করে উঁচু মিনার বানিয়ে ফেলত তারা। শেষমেশ সারা শহরে জ্বালিয়ে দিত আগুন। কোনো প্রাণীই আর জীবিত থাকত না।

যুদ্ধে যাদের বন্দি করে আনা হতো, তাদেরকে দিয়ে বিভিন্ন কষ্টকর কাজ, যেমন : ব্রিজ নির্মাণ, খন্দক খনন ইত্যাদি সম্পাদন করাত তাতাররা।

তারপর সুদূর কোনো অঞ্চলে যেতে হলে বন্দিদের এই বোঝা থেকে মুক্ত হতে তাদের মেরে ফেলে যেত। কিন্তু, দক্ষ কোনো কারিগর বা ইঞ্জিনিয়ার পেয়ে গেলে হত্যা না-করে তার থেকে বিভিন্ন ফায়দা ওঠাত। সুশ্রী-সুন্দরী নারীদেরও তারা হত্যা করত না। চেঙ্গিজ খান ও তার সরদারদের জন্য ভাগবাঁটোয়ারা করে নিয়ে নেওয়া হতো তাদের।

হাড্ডির পাহাড়

তারিখে নেগারিস্তানে লেখা হয়েছে—একবার একটি মুসলিম-কাফেলা চেঙ্গিজ খানের সাম্রাজ্যে ঢুকে পড়েছিল। দূর থেকে হঠাৎ তাদের চোখে পড়ে—সামনে দুধসাদা একটি পাহাড়। কাফেলা তখন ভাবল, হয়তো বরফ পড়ে ঢেকে গেছে পাহাড়ের গা। কিন্তু একটু কাছে আসতেই গভীর বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ে তারা। পিটপিট করে সন্ত্রস্ত দৃষ্টি মেলে দেখে—বরফটরফ কিছুই নয়; এ হচ্ছে চেঙ্গিজ খানের হাতে নিহত অসংখ্য লাশের শুভ্র কংকালের পাহাড়।

তাতারদের ধর্ম

তাতার-জাতির ধর্মের ব্যাপারে এটুকু শুধু জানা যায় যে, তারা নিরঙ্কুশভাবে একজন স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস রাখত বটে; কিন্তু শিরকেও লিপ্ত ছিল। তাদের উপাসনার ধরনে অনেকটা হিন্দুস্থানের আদিবাসীদের পূজা-অর্চনার সঙ্গে মিল ছিল।

কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী—এই সম্প্রদায়ের মাঝেও নিশ্চয় কোনো নবী প্রেরিত হয়েছিলেন। কিন্তু, যুগের আবর্তনে, শয়তানের প্ররোচনায় নবীদের প্রদানকৃত সব শিক্ষা তারা ভুলে বসেছিল। তাদের মধ্যে নক্ষত্রপূজার প্রচলনও ছিল। পূর্বাকাশে রক্তিম কিরণ ছড়িয়ে ভোরবেলা যখন সূর্য উঠত, এরা নত হয়ে সেই সূর্যের উদ্দেশে

সেজদা জানাত। তবে বিদ্যুৎ চমকালে বা বজ্রপাত হলে প্রচণ্ডভাবে ভীত হয়ে উঠত তাদের আত্মা। এবং তারা বলত—মাথার উপরের এই আকাশটা অনন্তকালীন। কখনও নিশ্চিহ্ন হবে না।

কখনও মাঝ-আকাশে ভেসে-ওঠা বিভিন্ন দৃশ্য দেখে তারা ভাবত, হয়তো আসমানি গজব নেমে আসছে। আকাশের এই পরিবর্তিত মানচিত্রকে ভাবত গজবের আলামত। বলত—বাতাসে হরদম কিছু অশরীরী আত্মা ভেসে বেড়ায়; ঝড়-তুফান, বজ্রপাত, বিদ্যুচ্চমক প্রভৃতি আসমানি কার্যক্রমের জন্য এই আত্মারাই নিযুক্ত। তাতাররা তাদের তেংরি বলে ডাকত।

চেঙ্গিজ খান প্রতিদিন একটি পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে উঠতেন। একা। কেউ তার সঙ্গে থাকত না। তার বিশ্বাস ছিল—এই পাহাড়ই হচ্ছে সেই তেংরিদের ঠিকানা। চূড়ায় উঠে তিনি চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে চারপাশ দিয়ে বয়ে-যাওয়া হু-হু বাতাস ও সুবিস্তৃত আকাশকে সম্বোধন করে প্রার্থনায় নিমগ্ন হতেন। ঠোঁট নেড়ে নেড়ে কামনা করতেন কল্পিত তেংরিদের সাহায্য।

কিশলুক খানকে শায়েস্তা

তিব্বত থেকে চীনা-তুর্কিস্তানের শেষসীমান্ত পর্যন্ত পুরো এলাকা ছিল কিশলুক খান নামের এক তুর্কি সরদারের করতলে। একদিকে তা ছিল খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের শাসনাধীন এলাকা-লাগোয়া, অন্যদিকে ছুঁয়ে দিয়েছিল চেঙ্গিজ খানের রাজ্য-সীমা।

আপনারা পড়েছেন—কিছুকাল পূর্বেই কিশলুক খান খাওয়ারিজম শাহের সাথে একজোট হয়ে তুর্কানেখাতাকে পরাজিত করেছে। তখন থেকেই কিশলুকের শক্তি বরাবর বেড়ে চলছিল। চেঙ্গিজ খানের অনুগত হয়ে সে থাকতে চায়নি কখনও। স্বাধীনভাবে সাম্রাজ্য পরিচালনা ছিল তার ব্যক্তিগত পছন্দ।

চেঙ্গিজ খান তখন খাতাই সম্রাটকে পরাজিত করে কারাকোরামে এসে বিশ্রাম নিচ্ছেন। একদিন জুবি নৈয়ানকে এক দুর্ধর্ষ বাহিনী দিয়ে কিশলুক খানকে শায়েস্তা করতে পাঠালেন তিনি। জুবি নৈয়ান পামির মালভূমিতে দীর্ঘ যুদ্ধের পর কিশলুক খানের সমস্ত শক্তি খর্ব করে ফেলল। কিশলুকের মুণ্ডু কেটে চেঙ্গিজ খানের পায়ের কাছে এনে ফেলল।

এই বিজয়ের পর চীনা-তুর্কিস্তানের মুসলমান ও তিব্বতের বৌদ্ধ কবিলাগুলো চেঙ্গিজ খানের নতুন টার্গেটে পরিণত হয়। চেঙ্গিজীয় সাম্রাজ্যের সীমানা তখন ১২০০ মাইল চওড়া পার্বত্য এলাকা পেরিয়ে মুসলিমবিশ্বের সীমান্তে গিয়ে ঠেকেছে।

ফলে আরম্ভ হয় দুই সাম্রাজ্যে (মুসলিম ও তাতার সাম্রাজ্য) বাণিজ্য-কাফেলার আসা-যাওয়া। এতে পরস্পরের সংস্কৃতির সাথে তারা পরিচিত হয়ে উঠতে থাকে। যখন চেঙ্গিজ খান মুসলিম বণিকদের কাছে খাওয়ারিজম, বাগদাদ, মিশর ও হিন্দুস্থানের অবস্থা জানতে পারেন আন্দাজ করে ফেলেন যে, আমার অগ্রাভিযানের জন্য এখনও সুবিস্তৃত ময়দান বাকি রয়ে গেছে।

চীনা মুসলমান

চীনের পশ্চিমাঞ্চলে বাস করত মুসলিমদের একটি বড় দল। একদা তাদের পূর্বপুরুষেরা আরবভূমি ও মা-ওয়ারাউন-নাহার থেকে আগত বণিকদের উত্তম আচরণে মুগ্ধ হয়েছিল। এবং গ্রহণ করেছিল শাশ্বত সত্য ধর্ম ইসলাম। চীনদেশে যখন চেঙ্গিজ খান প্রভাব বিস্তার করে ফেললেন, এই মুসলমানরাও তার প্রজায় পরিণত হল। বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে তাদের অনেকে তখনও বিভিন্ন মুসলিম সাম্রাজ্যে সফর করছিল। আরবি, ফারসি ও তুর্কি ভাষা খুব ভালো জানত তারা। চেঙ্গিজ খান বিজিত অঞ্চলের মেধাবী লোকদের থেকে ফায়দাগ্রহণে ছিলেন মহা ওস্তাদ। এ কথা অবশ্য আগেও বলে এসেছি। এই সূত্র ধরে এখানকার কিছু মুসলমানকেও তিনি তার দরবারে দোভাষীর দায়িত্বে নিযুক্ত করলেন।

কিছু মুসলমানকে প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বহিঃসাম্রাজ্যে পাঠাতেন। অনেককে উদ্বুদ্ধ করতেন ব্যবসার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সাম্রাজ্যে যাবার জন্য। খুব সতর্ক গলায় তাদের বলে দিতেন—ওখানে গিয়ে সর্বক্ষণ চোখ-কান খোলা রাখতে হবে। প্রতিনিয়ত ওখানকার অবস্থা আমাদের জানাতে হবে।

এসব লোক মূলত বণিকের বেশে গুপ্তচরবৃত্তি করে বেড়াত। চেঙ্গিজ খানের তরবারির ভয়ে এই মুসলমানরা কাবু হয়ে পড়েছিল। তাদের পরিবার-পরিজন টিকে ছিল তাতারদের দয়ায়। নিজেদের অপারগ ভেবে, কারাকোরাম দরবার থেকে আসা সমস্ত আদেশ তারা মুহূর্তেই বাস্তবায়ন করে ফেলত। তাদের ভাববার ফুরসত ছিল না—মুসলিমবিশ্বের জন্য তাদের এই হুকুম-তামিল কত বড় হুমকির সৃষ্টি করছে!

জরুরি জ্ঞাতব্য

চেঙ্গিজ খানের আসল গোত্র-পরিচয় (এ অধ্যায়ের শুরুতে পড়ে এসেছেন) হল মোগল। কিন্তু, সেক্ষেত্রে অধিকাংশ মুসলিম ঐতিহাসিক 'আত-তাতার' শব্দটিও উল্লেখ করেছেন। এজন্য বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের প্রায় জায়গাতেই তাদেরকে তাতার বলে উল্লেখ করেছি আমি।[৪৮]

---

[৪৮] উৎস : চেঙ্গিজ খান, হ্যারল্ড ল্যাম্ব। আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড ৭। রওজাতুস সফা ৫। সিরাতু সুলতান জালালুদ্দিন। তারিখে ইসলাম, আকবর শাহ নজিবাবাদী। তারিখে [illegible]। উর্দু দায়েরায়ে মাআরিফে ইসলামিয়া পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি।

স্থাপিতঃ ২০২০ইং

চতুর্থ অধ্যায়

শাহজাদা জালালুদ্দীন মুনকাবিরাতি

জন্ম

এশিয়ার সাম্রাজ্যগুলোতে চেঙ্গিজ খান যখন একের পর এক ক্ষমতার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করছিলেন, ঠিক সেই সময়টাতেই আকাশের মালিক এই মহান মর্দে মুজাহিদকে খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যে প্রেরণের বন্দোবস্ত করছিলেন। ভবিষ্যতে এই মুনকাবিরাতিই হবেন বিশ্ববিজেতা চেঙ্গিজ খানের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী।

সুলতান আলাউদ্দীনের কাকুতি-ঝরা দোয়া কবুল হয়ে গেল। আল্লাহ তাকে এক যোগ্য পুত্রসন্তান দান করলেন, যাকে 'জালালুদ্দীন মুনকাবিরাতি' নামে আগলে রাখবে ইতিহাসের পাতা। কোথাও তার জন্মতারিখের উল্লেখ নেই। তবে কিছু কিছু অবস্থাদৃষ্টে বোঝা যায়—খাওয়ারিজমের এই দুর্ধর্ষ নেতা হিজরি ষষ্ঠ শতকের শেষদশকে (অথবা এর কয়েক বছর পূর্বে) পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন।[৪৯]

সুলতান জালালুদ্দীন মুনকাবিরাতি

আলাউদ্দীন মুহাম্মদের স্ত্রী ছিল একাধিক। তাদের মধ্যে যে ভাগ্যবতীর গর্ভে সুলতান জালালুদ্দীনের জন্ম, তিনি ছিলেন হিন্দুস্থানি বংশোদ্ভূত।[৫০] জালালুদ্দীনের পূর্বে অন্য কোনো পুত্রসন্তান ছিল না আলাউদ্দীন মুহাম্মদের। জালালের পরে আরও তিন স্ত্রীর গর্ভে চার সন্তানের জন্ম হয়, ইতিহাসে যারা রোকনুদ্দীন ঘুরশাহ, কুতুবুদ্দীন আযলাক সুলতান, গিয়াসুদ্দীন পীরশাহ ও আক সুলতান নামে প্রসিদ্ধ।

জালালুদ্দীনের দাদির কাছে খুব বেশি প্রিয় ছিল কুতুবুদ্দীন আযলাক। দাদি তাকে অত্যধিক আদর-যত্ন করতেন। গিয়াসুদ্দীন ছিল খুবই সুদর্শন। তবে জ্ঞানবুদ্ধিতে সাধারণ পর্যায়ের এবং প্রচণ্ড উদ্ধত ছিল সে। তার মধ্যে ভদ্রতা বলতে কিছু ছিল না।[৫১] কিন্তু রোকনুদ্দীন ঘুরশাহ সুদর্শন হওয়ার পাশাপাশি দক্ষ বাহাদুরও ছিল। দ্রবীভূত একটি মন ছিল তার। ভাইবোনদের সবার সাথে শাহজাদা জালালুদ্দীনের খুবই বন্ধুত্ব ও ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। বিশেষ করে সৎবোন (বৈমাত্রেয়) শাহজাদি খান সুলতানের সাথে খাতির ছিল একটু বেশি। ভাইয়ের উন্নত চরিত্রের জন্য শাহজাদি খান সুলতানও তার প্রতি আকৃষ্ট ছিল।

---

[৪৯] জামিয়ে তারিখে হিন্দ এর ৮৪ পৃষ্ঠায় ৬১৬ হিজরি সনে জালালুদ্দীনের বয়স ৩০ এর কম ছিল বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এ থেকে আমাদের অনুমানের সমর্থন পাওয়া যায়।

[৫০] সিয়ারু আলামিন নুবালা ২২/৩২৮

[৫১] সিয়ারু আলামিন নুবালা ২২/৩২৮

শিক্ষানবিশি

শাহজাদা জালালুদ্দীন ভাই-বোনদের একজন দরদি ভাই হিসেবে যেমন প্রমাণ দিয়ে গেছেন, ঠিক সেভাবে পিতারও অনুগত হয়ে থেকেছেন সর্বদা। জালালুদ্দীনের মা ছিলেন অত্যন্ত দয়াশীল এবং ভীষণ সাহসী নারী। পুত্রের আনুগত্য এবং উত্তম চরিত্র নিয়ে গর্ব করতেন তিনি। সৎমায়েদের সাথেও সবসময় আদব রক্ষা করে চলতেন জালালুদ্দীন। তাদের কখনও কোনো অনুযোগ-অভিযোগ করার সুযোগ দিতেন না।

আলাউদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহ সন্তানদের তরবিয়তের ব্যাপারে ছিলেন খুবই কঠোর। পিতার যেসব আদেশ অন্য শাহজাদারা কষ্টের কারণ বলে মনে করত, জালালুদ্দীন সেসব সানন্দে বাস্তবায়ন করতেন। পিতার সাথে জালালুদ্দীনের বিশ্বস্ততাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল অনুপম।

খাওয়ারিজম শাহও তার বড় পুত্রের যোগ্যতা ও উন্নত চরিত্র সম্পর্কে অবগত ছিলেন। ছেলেদের যোদ্ধা হিসেবে গড়ে তুলতে নিজে তিনি সে-যুগের দক্ষ যুদ্ধ-প্রশিক্ষকের দীক্ষা লাভ করেছিলেন। পাশাপাশি সন্তানদের শিক্ষাদানের ব্যাপারেও গাফেল ছিলেন না। যুগের মান্যবর আলেমদের নিযুক্ত করেছিলেন শাহজাদাদের পাঠদানের জন্য।

ইমাম রাজির শিষ্যত্বগ্রহণ

৬০৩ হিজরি, খ্রিষ্টীয় ১২০৭। কালের বিখ্যাত মুফাসসির ও দার্শনিক আল্লামা ফখরুদ্দীন রাজি খাওয়ারিজমে এলেন। আরগেঞ্চের জামিয়াপ্রধানের দায়িত্বপালন ছাড়াও শাহজাদাদের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হলেন তিনি।[৫২] ইতিপূর্বে সুলতান শিহাবুদ্দীন ঘুরির রাজ্যে বিশিষ্ট ও সাধারণ শ্রেণির সবাইকেই শিক্ষা প্রদান করতেন।

হিন্দুস্থানে সর্বশেষ আক্রমণকালে তিনি ঘুর বাহিনীর নামাজের ইমামতিও করেন। তাদেরকে শেখাতেন পবিত্র কুরআন। তার দরসে সৈন্য ছাড়াও প্রায় সব অঞ্চলের বাসিন্দাদের এক বিরাট জামাত অংশগ্রহণ করত।

এক সময় সাধারণ মুসলমানের বেশ ধরে হাসান ইবনে সাব্বাহর ফেদাই বাহিনীর সদস্যরা ইমাম রাজির এই মজলিশে আসা-যাওয়া করতে থাকে। ইমাম রাজির খুব কাছাকাছি ঘুরঘুর করতে দেখা যায় তাদের।

সুযোগ পেয়ে এক রাত্রে দরসে অংশগ্রহণকারী ১০ ফেদাই সুলতান শিহাবুদ্দীন ঘুরির উপর আক্রমণ করে বসে। নির্মমভাবে তাকে শহীদ করে ফেলে। কয়েকজন আক্রমণকারীকে ঘটনাস্থলে গ্রেফতারও করে ফেলে শিহাবুদ্দীনের সৈনিকরা। তারা চিনতে পারে—এরা ইমাম রাজির ছাত্র। ফলে তাদের ধারণা প্রবল হয়ে ওঠে—ইমাম সাহেবের ইশারাতেই এরা হামলা করেছে!

---

[৫২] তারিখে খাওয়ারিজম শাহি ২৬১

অথচ এ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না ইমাম। কিন্তু সৈনিকেরা কোনো কিছুই শুনতে প্রস্তুত না তখন। তাদের সে একই কথা—আপনিই আমাদের শাসকের উপর ফেদাইদের দিয়ে আক্রমণ করিয়েছেন।

শেষ পর্যন্ত বহু কষ্টে ইমাম রাজি নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ করতে পেরেছিলেন।

তারপর, হিন্দুস্থান থেকে ফিরে এসে হেরাতে অবস্থিত নিজের মাদরাসায় এসে পৌঁছেছিলেন তিনি। কিন্তু সেখানে একই দশা বরণ করতে হল তার। হেরাতের এক আক্রমণকারী দুর্বৃত্ত বাহিনী সারা মাদরাসায় আগুন জ্বালিয়ে দিল। শহরের নেতৃস্থানীয় লোকজন খুব কষ্টে তাকে বাঁচাতে পেরেছিলেন সেদিন।[৫৩] কিন্তু শেষনাগাদ ওখানেও থাকতে পারলেন না। পরিস্থিতি নাজুক দেখে সফরের আসবাবপত্র গুছিয়ে খাওয়ারিজমের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলেন।

বহু আগ থেকেই আলাউদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহ ইমাম রাজির চিন্তা-দর্শন দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন। তার একান্ত ভক্ত ছিলেন তিনি। তিনি চাইতেন—ইমাম সাহেব এসে যেন উনার সোহবতে তাকে ধন্য করেন। ফলে ইমাম রাজির এবারকার আগমনে যারপরনাই খুশি হলেন আলাউদ্দীন। তার সৌভাগ্য হল পছন্দনীয় প্রিয় এক ব্যক্তিত্বের মজলিশে বসবার।

সাধারণ লোকেরাও একজন দরদি ও সত্যবাদী আলেমের অনুপম নসিহতে উপকৃত হতে লাগল। শাহজাদারাও আনন্দিত ছিল যে, তারা বিখ্যাত এক শায়েখের শিষ্যত্বগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করছে।

ইবনে খাল্লিকানের বর্ণনায় পাওয়া যায়—সুলতান তাকিশের যুগেও একবার ইমাম রাজি খাওয়ারিজমে এসেছিলেন। সেবার আলাউদ্দীন মুহাম্মদের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন তিনি। সুলতান আলাউদ্দীন তখন একজন শাহজাদা।

এজন্যই, রাজত্বকালে আলাউদ্দীন খাওয়ারিজম শাহ ইমাম রাজিকে মর্যাদার এমন আসনে সমাসীন করেছিলেন, যা অন্য কেউ লাভ করতে পারেনি কখনও। মাঝেমধ্যে ইমাম সাহেব সুলতান আলাউদ্দীন মুহাম্মদকেও ধমক মেরে বসতেন। আলাউদ্দীন তা বরণ করে নিতেন স্মিতহাস্যে।[৫৪]

মহান ইমামের সংশ্রবের দিনগুলো ছিল শাহজাদা জালালুদ্দীনের জীবনের এক চমৎকার অধ্যায়। শাহজাদা সদ্য যৌবনে পা দিয়েছেন তখন।[৫৫] ওই বয়সে সাধারণত বিভিন্ন অনর্থক বিষয়ে তীব্র আকর্ষণ থাকে মানুষের। আমিরজাদা ও শাহজাদা শ্রেণির লোকেরা মেতে ওঠে রঙ্গ-তামাশায়। তখনকার সময়টা ছিল বড় উন্মাতাল।

কিন্তু শাহজাদা জালালুদ্দীন মনজিলে মাকসুদে পৌঁছতে সর্বদা কর্মমুখর সময় পার করছিলেন। ইমাম রাজির নিবিড় সংশ্রব তার সম্মুখে খুলে দিয়েছিল জীবনের গূঢ়

---

[৫৩] আয়নায়ে হাকিকতনাম; তারিখে খাওয়ারিজম শাহি ২৬০

[৫৪] ইমাম রাজি (মাওলানা আবদুস সালাম নদবি প্রণীত) ১৪-২৮

[৫৫] তারিখে খাওয়ারিজম শাহি ২৬১

রহস্যজট। এমনসব বাস্তবতা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল—যা স্রেফ মগজের বুদ্ধিতে ধরা যায় না; বরং, সম্পূর্ণভাবে অবগাহন করতে হয় ওহিয়ে ইলাহির ঝলমলে আলোয়।

৬০৬ হিজরির শাওয়াল মাসে ৬৩ বছর বয়সে (১২১০ খ্রিষ্টাব্দ) ইমাম রাজি ইনতেকাল করেন। সাধারণ্যের ধারণা ছিল—তার খাদ্যে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল বাতেনিরা।[৫৬] শাহজাদা জালালুদ্দীনের জীবনের সংক্ষিপ্ত অথচ গুরুত্বপূর্ণ এক অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে গেল। সাধারণ মানুষ হারালো একজন দরদি পথপ্রদর্শক। ছাত্ররা হারালো একজন মহান শিক্ষক। শাহজাদারা তখন থেকে অন্য বুজুর্গের অধীনে পরিচালিত হতে লাগল। কিন্তু ইমাম রাজির মতো ওস্তাদ আর পাওয়া যায়নি।

সেনাদলের দীক্ষা ও দায়িত্ববোধ

দেশ ও জাতির সকল অবস্থা শাহজাদা জালালুদ্দীনের চোখের সামনেই ছিল। আল্লাহপ্রদত্ত ধীশক্তি, ইলমের গভীরতা ও পূর্ববর্তী ইমামদের জীবনেতিহাসের গভীর পর্যবেক্ষণে তার ভেতরে প্রোথিত হয়ে গিয়েছিল যে, অধিকাংশ সময় উম্মাহর ভবিষ্যৎ-কর্ণধারের নিছক একটি ভুলের কারণেই ধ্বংস হয়ে যায় পুরো জাতি।

সুলতান আলাউদ্দীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র হওয়ার দরুন সাম্রাজ্যের ভাবী অভিভাবক মনে করা হতো তাকে। শাহজাদা জালালুদ্দীনের ভেতরেও কাজ করত দায়িত্বের সেই অনুভূতি। তাই নিজের উপর তিনি আবশ্যক করে নিয়েছিলেন কঠিন সৈনিক-জীবন।

তার মধ্যে যথাযথরূপে ছিল নেতৃত্বের গুণ। পিতার সম্মতিতে প্রাথমিকভাবে নির্দিষ্ট কিছু সরকারি কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। সিপাহি-বেশেই কাটাচ্ছিলেন তখনকার দিনগুলো। যুদ্ধের কলাকৌশল শেখার প্রতি তার ভারি আগ্রহ ছিল। তার অপূর্ব কান্তিময় গোধুমবর্ণ দেহে চমৎকার মানাত সিপাহিসুলভ পোশাক।[৫৭] চেহারার গঠনপ্রকৃতি, হিম্মত, বীরত্ব, মুমিনসুলভ গাম্ভীর্য এবং গভীর চিন্তামগ্নতায় তার মধ্যে ফুটেছিল অনন্য ব্যক্তিত্বের ছাপ। কয়েক বছরের প্রশিক্ষণে যুদ্ধবিষয়ক এমন বিপুল ঈর্ষণীয় অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, যেগুলোতে অন্য সহপাঠীরা ছিল সম্পূর্ণ অক্ষম।

খুব খাটো ছিলেন না তিনি এবং খুব লম্বাও না। সাধারণ পর্যায়ের সুগঠিত দেহের অধিকারী ছিলেন। মোকাবেলার সময় তার পেটানো বাহু এবং ইস্পাতকঠিন দেহ দেখে লোকে বলত—যত বড় পাহলোয়ানই আসুক, শাহজাদার সামনে একমুহূর্তও টিকবে না।

---

[৫৬] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৩৮৪; নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৭৯; ইবনু খালদুন ৫/১৪০

[৫৭] সুলতান জালালুদ্দীন গুধুম রঙের এবং সাধারণ গঠনপ্রকৃতির হওয়ার মধ্যে তার সম্মানিত মায়ের প্রভাব ছিল বলে বোঝা যায়। তার মা ছিলেন হিন্দুস্থানি নারী। দেখুন : তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবি ৬৩/৬২৮ হিজরি। সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন পৃষ্ঠা : ৯৬ থেকে জানা যায় যে, এই নারীর নাম ছিল 'আই জিজাক'।

তিনি ঘোড়ায় চড়ে লাগাতার কয়েক মনজিল সফর করতেন। একটুও ক্লান্তি পেত না তার। প্রাসাদের কোমল মখমল বিছানার চেয়ে আরাম পেতেন বেশি অশ্বারোহণে। দামি দামি নতুন নতুন পোশাকের বদলে ছেঁড়াখোঁড়া জামা পরতে ভালোবাসতেন।

এমন নেতাদের ঘৃণা করতেন, যারা স্বজাতিকে যুদ্ধের কবলে ফেলে নিজেরা বাজায় আরামের বাঁশি। রাজনীতি ও নেতৃত্বকে সেইসব মহান লোকের উত্তরাধিকার ভাবতেন—সর্বকালে সত্যপথে আত্মোৎসর্গ করতে যারা বুক ফুলিয়ে যুদ্ধের প্রথম কাতারে থাকেন।

জনসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা

জালালুদ্দীন তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বে স্বজাতির চোখের মণিতে পরিণত হয়েছিলেন। সাধারণ থেকে বিশিষ্টজন—তাকে নিয়ে গর্ব করত সবাই। বড় বড় সেনা-অফিসার তাদের এই ভাবী অভিভাবকের গুণ গাইত। খাওয়ারিজম শাহের এলাকায় বসবাসকারী সেলজুক, ঘুরি এবং অন্যান্য বাদশাহ ও শাহজাদাও জালালুদ্দীনের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে সর্বদা প্রস্তুত ছিল। এটি নিশ্চয় জালালুদ্দীনের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ। ভিন্ন শহরের আমির ও সেনাপতিরা যখন আরগেঞ্চে আসত, খাওয়ারিজম শাহের পরেই তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হতো সুলতান জালালুদ্দীনের ব্যক্তিত্বের উপর।

জালালুদ্দীনের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী

এত বিপুল গ্রহণযোগ্যতা সত্ত্বেও জালালুদ্দীনের প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা কম ছিল না। কিপচাক তুর্কিদের সকল গোত্র, যারা ছিল মুসলিমবাহিনীর একটি শক্তিশালী অংশ, জালালুদ্দীনের পরিবর্তে শাহজাদা কুতুবুদ্দীন আযলাকের দলে যোগ দিয়েছিল। তারা কুতুবুদ্দীনকেই খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের প্রকৃত উত্তরসূরি বলে প্রচার করত।

যেহেতু অধিকাংশ সময় রাজ্যের ব্যবস্থাপনায় খাওয়ারিজম শাহ ও মাতা তুর্কান খাতুনের মধ্যে মতপার্থক্য ঘটে যেত, এবং তুর্কান খাতুন কিপচাক তুর্কিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, এজন্য এই গোত্রের আমির ও সেনাপতিরা খাওয়ারিজম শাহকে অপছন্দ করত, সঙ্গে জালালুদ্দীনকেও।

সারাক্ষণ তার বিরুদ্ধে চক্রান্তে মেতে থাকত তারা। খাওয়ারিজম শাহও তাদের সব কর্মকাণ্ড ও মনোভাব সম্পর্কে সজাগ ছিলেন। কয়েকবার ভেবেছিলেন পুরোপুরিভাবে এদের ঘাড় মটকে দেবেন। কিন্তু প্রতিবার তারা জালালুদ্দীনের সুপারিশের কারণেই বেঁচে যেত।[৫৮] গৃহযুদ্ধের আতঙ্ক, ভয়ংকর পরিণতি ও বিধ্বস্ততা হতে পিতাজিকে সতর্ক করে জালালুদ্দীন অসংখ্য মুসলমানকে শাহি তলোয়ার থেকে বাঁচিয়ে রাখতেন। দেশ ও জাতির ব্যাপক উপকারার্থে বিরোধীপক্ষের সাথেও উত্তম আচরণে সদাপ্রস্তুত থাকতেন তিনি।

---

[৫৮] জাহাঁকুশা ২/১৭৩; সিবাতু সুলতান জালালুদ্দীন ১৪৮; তারিখে খাওয়ারিজম শাহি ১৭৭

পঞ্চম অধ্যায়

বিপদের ঘনঘটা

শাহজাদা জালালুদ্দীন সেই বিশাল সাম্রাজ্যের অলি আহাদ[৫৯] ছিলেন, যে সাম্রাজ্যের সীমানা কাসপিয়ান সাগর থেকে আরম্ভ করে সিন্ধুতীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সাম্রাজ্যের ছিল এক অপরাজেয় দুর্ধর্ষ বাহিনী। আসবাব-উপকরণও ছিল প্রচুর। এই অবস্থায় সাম্রাজ্যের এই মহান উত্তরসূরি যদি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতেন, মজে যেতেন বিলাসিতায়, আগত দিনগুলোকে ভাবতেন ব্যক্তিগত জাগতিক সৌভাগ্যের প্রথম সোপান—তাতে আশ্চর্যের কিছুই থাকত না। কিন্তু জালালুদ্দীন তার অসামান্য দূরদর্শিতায় বুঝে উঠতে পারছিলেন—ভবিষ্যতের দিনগুলো আসলে কোন দিকে মোড় নিতে যাচ্ছে। অবস্থার আশু পরিবর্তনের ভেতর উম্মাহর ভয়ানক অধোগতির গন্ধ পাচ্ছিলেন তিনি।

হিজরি সপ্তম শতক তখন শুরু হয়ে গেছে। ছয়শ বছর পূর্বে ইসলামের যে আলোক-মশাল আরব উপদ্বীপে জ্বলে উঠেছিল, আলোকিত করেছিল পৃথিবীর অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রতিটি কোণ, সেই আলো তখন মিথ্যের প্রবল ঝড়ে দপদপ করে নিভতে চলেছে। চারপাশ থেকে ঘিরে ধরেছে ঘনঘোর অন্ধকার। শুরু হয়েছে ভেতর-বাইরের ভয়ানক সব চক্রান্ত। ছয়শ বছর আগে 'চির অচেনা' এক বস্তু হিসেবে আরবের পাহাড়ে নেমে এসেছিল ইসলাম। মক্কার কাফেররা ব্যাপকভাবে নাক সিঁটকেছিল তখন। হঠাৎ কোত্থেকে কী-এক আজগুবি জিনিস এসে পড়েছে—এমন একটা ভাব বিরাজ করছিল তাদের ভেতর।

কিন্তু, স্রেফ অল্প-কালের ভেতর এই 'চির আজগুবি' ইসলামই ঘোর বিরোধীদের পর্যন্ত প্রিয়তম বন্ধুতে পরিণত করেছিল। ঐশী আলোকে স্নাত হয়ে মক্কার নব্য মুসলিমগণ তখন গর্ব-দৃপ্ত ভঙ্গিতে সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। জীবৎকালে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাশ্বত সত্যের যে আহ্বান করেছিলেন, তার সুমিষ্ট আওয়াজ আরব উপদ্বীপ ছাড়িয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল বহুদূর পর্যন্ত। খেলাফতে রাশেদার সোনালি যুগে পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চলে বিপুলভাবে চর্চিত হচ্ছিল আরব-ভূমি হতে উঠে আসা সেই ইসলাম; যেন-বা চারপাশে এক অভূতপূর্ব স্বর্গীয় আলোক-বন্যা।

---

[৫৯] শাসনকর্তার পক্ষ হতে শাসক-পরিবারের কাউকে ভাবী শাসক মনোনীত করা হলে তাকে অলি আহাদ বলা হয়। শাসনকর্তার মৃত্যু, মারাত্মক অসুস্থতা বা বরখাস্তের ঘটনা ঘটলে অলি আহাদ তার স্থলাভিষিক্ত হন। —মোগল পরিবারের শেষদিনগুলি, পৃষ্ঠা ৯৩।

কুরুনে উলা (ইসলামের প্রথমকাল) মুসলিমজাতির এক স্বর্ণালি অধ্যায়। সে-সময়কার মুসলমানরা প্রকৃতই মুসলমান ছিলেন। হৃদয়ের গভীরে পরম মমতায় ধারণ করেছিলেন রাসুলের দাওয়াতের বাণী। তাদের ধমনীতে বইছিল ইসলামের পবিত্র রক্ত। তাদের ঈমানের দৃঢ়তা পাহাড়ের অটলতাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। দিনেরবেলাতে ছিলেন দুর্ধর্ষ অশ্বারোহী, রাত্রিকালে প্রভুর ভয়ে প্রকম্পিত ইবাদতকারী। তাদের দেহ-মন, ধ্যান-জ্ঞান—সর্বসত্তাই ছিল ইসলামের জন্য পুরোপুরিভাবে সমর্পিত। এই ইসলামই মরুভূমি-পুত্রদের (আরবজাতি) পৃথিবীজুড়ে রাজত্ব করবার ক্ষমতা এনে দিয়েছিল।

কিন্তু বেলা যত গড়িয়েছে, শাশ্বত ইসলামের চর্চা কমে গেছে ধীরে-ধীরে। উম্মাহর ভেতরে ঢুকে পড়েছে পর্বতপ্রমাণ গাফলতি। নতুন-নতুন ভয়ানক ফেতনা গ্রাস করেছে পুরো মুসলিমবিশ্বকে। সবখানে মুসলিমদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-কলহ ইসলামের বিজয়ের সেই অব্যাহত ধারা চরমভাবে রুখে দিয়েছে। মুসলিম শাসকদের ভেতর থেকে পুরোপুরিভাবে উঠে গেছে আল্লাহর ভয় ও পরকালীন জবাবদিহিতার চিন্তা। একই খাতে বয়ে গেছে সাধারণ মানুষের জীবনধারাও। নামাজ রোজা হজ এবং দৈনন্দিনকার বাকিসব ফরজ বিধান তারা পালন করত অবশ্য; কিন্তু প্রবলভাবে বেড়ে গিয়েছিল গুনাহের মাত্রা। পাপমুক্ত হওয়ার কোনো গুরুত্বই কারুর মধ্যে থাকেনি। কোনো রাজ্যের শাসকের মধ্যে কখনও যদি ঢিলেমি দেখা দিত, সেখানে বেড়ে যেত প্রকাশ্যে গুনাহে লিপ্তের সংখ্যা।

উম্মাহর সামষ্টিক অধঃপতনের প্রধান পাঁচ কারণ

(হিজরি সপ্তম শতকের প্রাক্কালে) চারিত্রিকভাবে দিন-দিন মুসলিম সমাজের অবনতি ঘটছিল। তখনকার অধঃপতিত মুসলিমবিশ্বকে তুলনা করা যায় মৃত্যুঘাটে নিপতিত এমন এক লোকের সাথে, আরোগ্যাতীত ব্যাধি যাকে ক্রমান্বয়ে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছে।

উম্মাহর এই ধ্বংস ও বরবাদির বহু কারণ রয়েছে। সেসবের রয়েছে অনেক শাখাপ্রশাখা। তার মধ্য থেকে প্রধান পাঁচটি কারণ নিয়ে আলোচনা করব—যেগুলো উম্মাহর সামষ্টিক অধঃপতনের ভিত্তি।

১. দুনিয়ার মোহ
২. জিহাদ ত্যাগ
৩. আল্লাহর দীনের দাওয়াত-প্রচারে অনাগ্রহ
৪. আকিদাগত ভ্রান্তি ও দুর্বলতা এবং
৫. মুসলমানদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহ।

এই পাঁচটি বিষয় নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক :

দুনিয়ার মোহ

মুসলিমবিশ্বকে বিপন্ন করে-দেওয়া এক ভয়ংকর জীবাণুর নাম দুনিয়ার মহব্বত, যা পুরো মুসলিমজাহানকে তখন বোগলদাবা করে নিয়েছিল। বেড়ে গিয়েছিল আয়েশি জীবনযাপনের উপকরণ। চক্রবৃদ্ধিহারে বাড়ছিল আরামপ্রিয়তা। ইসলামের সোনালি সময় তো কেটে গেছিল বহু আগেই। কিন্তু তখন (সপ্তম শতকের প্রাক্কালে) ক্ষমতার আসনে বসেছিল খেয়ানতকারী এমন কিছু ঘুষখোর শাসক, যারা স্রেফ কয়েক দিরহামের বিনিময়ে দীন ও উম্মাহর সওদা করে বেড়িয়েছে।

সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে তখনও দীন-রক্ষার পুরোনো সেই স্পৃহা খানিকটা বাকি ছিল। সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবির নেতৃত্বে বাইতুল মুকাদ্দাসের আজাদির জন্য যারা ক্রুসেডযুদ্ধে নেমেছিলেন, সেই মুজাহিদরাও তখন বেঁচে ছিলেন। হিন্দুস্থানের জমিনে যে ঘুরি সিপাহিরা কালিমার পতাকা ওড়াতে বেরিয়েছিলেন বহু আগে, তারাও ছিলেন বিদ্যমান। খাওয়ারিজমের পতাকাতলে জড়ো হয়ে চিরশত্রু তুর্কানেখাতাকে যারা পরাজয় খাইয়েছিলেন, বেঁচে ছিলেন তারাও। কিন্তু সেসব তখন শুধু অতীত-দিনের গল্প। ইসলামের চেরাগ তখন টিমটিমে হয়ে পড়েছিল। অপেক্ষায় ছিল দুশমনের এক ফুঁৎকারে নিভে যাওয়ার।

পেশিবহুল নওজোয়ানের দল, উম্মাহর অগ্রগামিতার ভার যাদের কাঁধে—আমল ও ইখলাস থেকে তারা বহু ক্রোশ দূরে সরে গিয়েছিল। প্রবৃত্তিপূজা ও আরামপ্রিয়তা মিশে গিয়েছিল লোকদের রক্তে। বেড়ে গিয়েছিল পদের লোভ।

দুনিয়াপ্রীতির দুটো শাখাই—হুব্বে জাহ ও হুব্বে মাল[৬০]—সবার ভেতর স্থায়ীভাবে বসত গড়ে নিয়েছিল।[৬১] সবচেয়ে জঘন্য ছিল শাসকদের অবস্থা। সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ কোন্দল বিদূরিত করবার চিন্তা কখনোই উদিত হয়নি তাদের মনে। স্বয়ং শাসকদের মহলের ভেতরকার অবস্থাও ছিল এমন। দু-চারজন সরদার একজোট হয়ে আঁটঘাট বেঁধে কোনো শাসকের জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াত। তা মূলত হুব্বে জাহ ও হুব্বে মালের কারণেই জন্ম নিয়েছিল। এই রোগটা উম্মাহর ব্যাপক অবনতি ডেকে এনেছিল। তাদেরকে পরিণত করেছিল সম্পূর্ণ জড়বস্তুতে। তবু আল্লাহর কিছু নেক বান্দা একনিষ্ঠভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তবে অন্যদের উপর তাদের প্রভাব তেমন পড়েনি। শাসকশ্রেণি, সাধারণ্য ও বিশিষ্ট প্রজাকুল—সবাই ছিল পার্থিব জীবনের শোভাবর্ধনে নিমগ্ন।

বাদ্যযন্ত্র হয়ে উঠেছিল শাসকদের খুব প্রিয় ও অপরিহার্য বস্তু। উঁচুশ্রেণির সমস্ত লোকই আসক্ত ছিল গান-বাজনায়। তারা পারস্য ও তুর্কিস্তানের সুরেলাকণ্ঠী সুশ্রী বাঁদিদের দিয়ে মজলিশে নৃত্য করাত। নিম্নশ্রেণির লোকদের মধ্যে গান-বাজনার প্রতি

---

[৬০] সম্পদ ও খ্যাতির মোহ

[৬১] আল-কামিল ফিত তারিখ ৭/৬২১; ইবনু খালদুন ৩/৫৩৫ (মাকতাবায়ে শামেলা)

যাদের আসক্তি ছিল, তারাও মজলিশে এসে নিরীহের মতো একপাশে বসে থাকত। দরবেশ নামের কিছু ভণ্ডও ছিল, গণ্ডমূর্খদের সেই মজলিশে যাদের শ্রোতার আসনে বসে থাকতে দেখা যেত। মূলত প্রকৃত তাসাওউফের বদনাম করেছিল এরা।

জিহাদ ত্যাগ

আরেকটি ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড হল—মিল্লাত তখন জিহাদের ফরজ বিধান পালন থেকে দূর সরে গিয়েছিল। জিহাদকে শরয়ি বিধান বলে গণ্য করত বটে; তবে তা শুধু ইসলামি সাম্রাজ্যের সীমান্ত রক্ষার ক্ষেত্রে পেশাদার প্রহরীর দায়িত্ব পালন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। এর বাইরে কখনও শত্রুর মোকাবেলায় তারা নামেনি। সাধারণ মানুষেরাও জিহাদ থেকে প্রতিনিয়ত দূরে সরে যাচ্ছিল। حب الدنيا وكراهية الموت (দুনিয়ার মহব্বত ও মৃত্যুর ভয়) এর ব্যাধি মহামারির মতো ব্যাপৃত হয়ে পড়েছিল। জিহাদের প্রশিক্ষণ—যেমন : শরীরচর্চা, ছোটাছুটি ইত্যাদিকে ভাবা হতো পূর্বযুগের মুসলিমদের কাজ। তবে এসব তখন তাদের জন্য শুধু সাময়িক এক আনন্দ-বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। মাঝেমধ্যে ছোটাছুটি, শরীরচর্চা করে একধরনের আনন্দ পেত তারা। ওদিকে খেল-তামাশা ও প্রবৃত্তিপূজায় মেতে উঠেছিলেন বাগদাদের খলিফা নাসির লি-দীনিল্লাহ। অথচ কথা ছিল—সেই নাজুক সময়ে জিহাদের ফরজ বিধান বাস্তবায়নের জন্য তিনি নিজেই নেতৃত্ব দেবেন। ভাঙাবেন মুসলিমবিশ্বের গভীর অলসতার ঘুম। কিন্তু তার মওজ-মাস্তিপূর্ণ জীবনযাপনের প্রভাবে জনসাধারণের ভেতর থেকে জিহাদের জজবাই শুধু মরে যায়নি; বরং রক্তের ভেতর বাসা বেঁধেছিল ভয়ানক রকমের দুনিয়াপ্রেম। পরবর্তীকালে তাদের মধ্য থেকে যা নষ্ট করে দিয়েছিল দুশমনের আক্রমণের পালটা-জবাব দেওয়ার ক্ষমতা।

আল্লামা ইবনুল আসির খলিফার এই জঘন্য কর্মের শক্ত সমালোচনা করেছেন। ইবনে খালদুন স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন—খলিফা নাসিরের এই কর্মব্যস্ততা বাগদাদের পতন ও ধ্বংসের কারণ।

খলিফা নাসির জিহাদের পরিবর্তে নিশানাবাজি ও কবুতরের খেলাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। নিশানাবাজি তার কাছে এতটাই গুরুত্ব রাখত যে, এজন্য তিনি 'আল-ফুতুওয়্যাহ' (তারুণ্য) নামে একটি দল গঠন করেন। এই দলের সদস্যদের জন্য বিশেষ ধরনের পোশাক বরাদ্দ করা হয়। সেই পোশাককে বলা হতো লিবাসুল ফুতুওয়্যাহ। এই পোশাক যারা পরত, শুধু তারাই নিশানাবাজিতে অংশ নিতে পারত। খলিফার নৈকট্য অর্জনের জন্য আঞ্চলিক শাসকদের অনেকেই এই দলের সদস্যপদ গ্রহণ করেছিল। খেলাফতের পক্ষ থেকে তাদের লিবাসুল ফুতুওয়্যাহ দেওয়া হয়েছিল। খলিফার এই কর্মের প্রভাব জনগণের উপরেও পড়েছিল প্রকটভাবে।

সেনাবাহিনীতে যোগদানের চেয়ে রাজদরবারে কোনো পদ অর্জন করাকে সাফল্য মনে করা হতো। সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকজনের প্রিয় ব্যস্ততা ছিল নাচগান ও

কাব্যচর্চা। এভাবেই জিহাদের চেতনা ও চর্চা অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল তখন। তাদের নিকট গুরুত্ব পেতে লাগল আনন্দ-উল্লাসের বিভিন্ন বিষয়। ফলে ইরাকের জমিন থেকে বীরত্ব, পৌরুষ ও সমরশাস্ত্র পুরোপুরি মুছে গেল।

মানুষ তখন জিহাদের প্রতি ছিল চরম উদাসীন। ভদ্র ঘরের ছেলেরা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর পরিবর্তে কাব্য ও গীতিচর্চায় মগ্ন হয়ে পড়েছিল। একেকজন হয়ে উঠেছিল কল্পজগতের বিলাসী ভাবুক। ইসলামি সাম্রাজ্যগুলোর সৈনিকরা শুধু প্রতিরোধকর্মই আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছিল; কখনও ইকদামি[৬২] জিহাদে নামেনি। কিন্তু এই প্রতিরোধমূলক জিহাদও ছিল অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত। কাফেররা প্রায় প্রতিদিন মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমান্তে এসে উল্লম্ফনে মেতে উঠত এবং কোনো-না-কোনো শহর অথবা দুর্গ হাতছাড়া হয়ে যেত মুসলিমদের।

আল্লাহর দীনপ্রচারে অলসতা

ইসলামের প্রথমযুগে, মুসলিহ ও দীনপ্রচারে নিবেদিত বুজুর্গ ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও দাওয়াত তথা দীনপ্রচারে ইসলামের খলিফাদেরও প্রবল আগ্রহ ছিল। একদিকে তারা পুরো রাজ্য সামলেছেন, পাশাপাশি আল্লাহর দাওয়াত প্রচারেও নিমগ্ন থেকেছেন। সুলতানি আমলে আমরা এর কিছু ঝলক ফুটতে দেখি। তখন ব্যক্তির দাওয়াত শুধু তার মুখের কথাতেই সীমিত ছিল না; জাতিগতভাবে, উম্মাহর প্রত্যেক সদস্য তাদের অসামান্য ব্যক্তিত্ব, উন্নত জীবনাদর্শ ও সর্বোত্তম চালচলনের ভেতর দিয়ে নিজেরাই হয়ে উঠেছিলেন আপাদমস্তক একেকটি দাওয়াত। তাদের কথাবার্তা, ওঠাবসা ও চালচলনে মুগ্ধ হয়ে বহু মানুষ সত্যধর্মের ছায়ায় এসেছে। তাদের সদ্যবিজিত অমুসলিম এলাকাগুলো অল্পদিনের ভেতর হয়ে উঠত একেকটি মুসলিম মহল্লা। নিছক তলোয়ারের জোরে নয়; মুসলিমদের সর্বোত্তম চরিত্রের জোরে এভাবেই বদলে যেত প্রতিটি সাম্রাজ্যের দৃশ্যপট।

তবে পরবর্তীকালে এই দীন-প্রচারে মুসলিমদের বড্ড অবহেলা দেখা গেছে। অবশ্য আলেম, শায়েখ ও সুফিগণ তখনও সাধ্যানুপাতে তাবলিগে দীনের কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু মুসলিম শাসকরা এই গুরুদায়িত্ব পুরোপুরি এড়িয়ে যেতে লাগলেন। তাদের প্রবল আলস্যের দরুন বিশ্বব্যাপী দাওয়াতের সিলসিলাটি আটকা পড়ে যায় একটি সংকীর্ণ গণ্ডির ভেতর। ধীরে-ধীরে গুটিয়ে আসতে থাকে দীন-প্রচারের বিস্তৃতি। ফলে ইসলামের আলোয় ঝলমলিয়ে উঠতে পারেনি এ বিশাল সৃষ্টিজগত।

---

[৬২] অগ্রাভিযান

কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই এই অপরাধের কঠিন সাজা মুসলিমদের ভোগ করতে হয়েছিল। মুসলমান-অমুসলমানের মধ্যখানে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল ঘৃণা-নফরতের শক্ত এক দেয়াল। সেই দেয়াল ভেদ করে অমুসলিমদের মধ্যে ইসলামের আলো ছড়াবার কোনো অবকাশই ছিল না।

মুসলিমবিশ্বের চারপাশের সীমান্ত এলাকাগুলো হরদম গা-ছমছমে আতঙ্কের ভেতর থাকত তখন। মুসলিমদের হাতে কোনো অঞ্চল বিজিত হলেও সেখানকার অমুসলিমদের মধ্যে ইসলামগ্রহণের সম্ভাবনা দেখা যেত না। পরবর্তী সময়ে এই অমুসলিম প্রতিবেশী এবং মুসলিম সাম্রাজ্যের সাধারণ অমুসলিমরা উম্মাহর জন্য ক্ষতিকর হয়ে উঠত।

মধ্য-এশিয়ার খাওয়ারিজমি সুলতানগণ, স্পেনের আরব শাসকগণ ও হিন্দুস্থানের মুসলিম রাজা-বাদশাহরা অহর্নিশ সেই একই ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে গেছেন। আখেরে খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য তো অমুসলিম প্রতিবেশী তাতার-জাতির হাতেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হল!

স্পেনের স্থায়ী খ্রিষ্টান বাসিন্দারা কবজা করে নিয়েছিল পুরো স্পেন। সেখানে একত্ববাদীদের নাম-নিশানা পর্যন্ত মুছে ফেলেছিল তারা। হিন্দুস্থানেও আমরা এই একই চিত্র দেখতে পাই। মুসলিমজাতি এখানে একাধারে আটশ বছর শাসন করেছে; কিন্তু মানুষের দ্বারে দ্বারে দীন ইসলামের যথাযথ দাওয়াত পৌঁছানো হয়নি বলে একে-একে হাতছাড়া হয়ে গেছে সমস্ত অঞ্চল।

খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদবি লিখেছেন—খাওয়ারিজমের সুলতানরাও সেই একই ভুল করলেন, যে ভুলটা করেছিলেন স্পেনের আরব শাসকরা। এই ভুল আল্লাহ ক্ষমা করেননি। তারা নিজেদের সকল শক্তি ব্যয় করেছিলেন সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও প্রতিপক্ষকে দমন করার কাজে। যে-সমস্ত মানব-বসতি তাদের সীমান্তের কাছাকাছি ছিল, সেখানে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে তারা কোনো ফিকিরই করেননি। ধর্মীয় আবেগ ও প্রেরণার কথা বাদই দিলাম, রাজনৈতিক কারণেও তো এই বিস্তৃত মানব-বসতিকে তারা নিজেদের সমমনা ও একই বিশ্বাসে বিশ্বাসী করে তুলতে পারতেন। এই কাজ করলে সেই বিপদ থেকে তারা রক্ষা পেতে পারতেন, পরবর্তীকালে যা দৈত্যের মতো তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। এটা শুধু তখনকার শাসকদেরই কর্তব্য ছিল তা নয়; বরং ছিল উম্মাহর প্রতিটি সদস্যেরও দায়িত্ব।[৬৩]

---

[৬৩] তারিখে দাওয়াত ওয়া আজিমাত ১/৩১২

আকিদাগত ভ্রান্তি ও দুর্বলতা

হিজরি ষষ্ঠ শতকে সাধারণ মুসলিমদের আকিদাগত ভ্রান্তি তাদেরকে ভুল পথে নিয়ে যেতে বিরাট ভূমিকা রেখেছিল। প্রতিনিয়ত ভ্রান্ত ফেরকাগুলোর বিভিন্ন শাখা গজিয়ে উঠে পুরো উম্মাহকে শতধা বিভক্ত করে ফেলছিল। অনেকের যদিও পতন ঘটে গেছিল; কিন্তু তাদের সেই ভুল আদর্শের প্রভাব পরবর্তীকালেও কোনো-না-কোনোভাবে রয়ে গেছিল।

মিশরে পৌনে তিনশ বছর ফাতেমি সাম্রাজ্য রাজত্ব করেছে। এই দীর্ঘ রাজত্বকালে তারা ভুল আকিদা-বিস্তারের ক্ষেত্রে কোনো কমতি রাখেনি। অনেক মুসলিম শাসক তখন রাজ্যের মাজহাবভিত্তিক দ্বন্দ্ব-কলহের ব্যাপারে চরম উদাসীন থেকেছেন। এই ফেতনা ফুলে-ফেঁপে বিশাল হয়ে-ওঠার সুযোগ করে দিয়েছে স্বয়ং বাগদাদের শিয়া-মতাদর্শী খলিফা নাসির লি-দীনিল্লাহ ও তার কিছু মন্ত্রী। শিয়া-সুন্নি দ্বন্দ্বটা এতদিন ছিল আমজনতার ভেতর, এবার ঢুকে পড়ল হুকুমতের প্রাণকেন্দ্রে।[৬৪] এদিকে কাজবিনের নিকটে হাসান ইবনে সাব্বাহর আলামুতের ফেদাইরা মুসলিমবিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছিল গোমরাহির বিশাল ঢেউ। ওদিকে একদল মূর্খ দরবেশ (যারা মূলত উল্লিখিত ভ্রান্ত আকিদার কবলে পড়েছিল) সাদাসিধে মুসলিমদের এক বিরাট জামাতের মগজ ধোলাই করে চলছিল। وحدة الوجود و وحدة الشهود এর মতো ভয়ংকর বিষয় নিয়ে ছিল ব্যস্ত এবং তারা নিজেদের অজান্তেই বেরিয়ে যাচ্ছিল তাওহিদের গণ্ডি ছেড়ে। আশ্চর্য হলেও সত্য যে, তারা হারাম বাদ্যযন্ত্র, নাচগান, মদ ও আফিমের নেশাতেও মত্ত ছিল।

কবর-মাজারগুলোতে অতিভক্তি দেখাতে গিয়ে জমকালো শামিয়ানা টাঙানো হয়েছিল। সেখানে জমে উঠেছিল বিদআদ-শিরকের জঘন্য আড্ডা। সাধারণ মানুষেরা প্রয়োজন পূরণার্থে মসজিদে না-গিয়ে বরং মাজারের দিকে ছুটতে লাগল। গণ্ডমূর্খরা মহান আল্লাহর সামনে না-ঝুঁকে প্রতিযোগিতামূলকভাবে মাজারগুলোতে গিয়ে সেজদা করতে লাগল। এমনকি তা হয়ে উঠল তাদের নিত্যদিনের প্রিয় কর্ম।

মোটকথা, বস্তুপূজার খপ্পরে পড়ে মুসলিমবিশ্ব পুরোপুরি ভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। সে-অবস্থায় আল্লাহর পক্ষ থেকে শক্ত চপেটাঘাত হিসেবে বড়সড় কোনো বিপর্যয় ঘটে যাওয়া ছিল স্বাভাবিক; মানুষ যাতে নিজেদের ভুল উপলব্ধি করতে পারে এবং পুনরায় তাওবা করে আল্লাহর কাছে ফিরে আসার কথা ভাবে।

পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহ

হিজরি সপ্তম শতাব্দীর শুরুর দিকে মুসলিমদের শক্তিশালী কোনো কেন্দ্রই আর প্রতিষ্ঠিত থাকেনি। সর্বত্র গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল। এ শতাব্দীর প্রতিদিনকার সূর্য একের পর এক অশুভ পরিণতির কিছু দৃশ্য দেখে উঠছিল। মধ্য-এশিয়ায় শুরু হয়েছিল ঘুরি ও খাওয়ারিজমিদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘাত।

---

[৬৪] দেখুন : আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৭/১১৬-১১৭

হেজাজে কাতাদা হুসাইনি ও সালেম হুসাইনি নামের দুই আমির নিজেদের ক্ষমতার দ্বন্দ্বে ব্যস্ত ছিলেন। মিশর ও সিরিয়ায় সালাহুদ্দীন আইয়ুবির বংশধররা ব্যস্ত ছিলেন নিজেদের মধ্যকার সংঘর্ষে। তাদের পারস্পরিক সেই দ্বন্দ্ব ক্রুসেডারদের ফের মুসলিম ভূখণ্ডে এসে আক্রমণের সাহস যোগাচ্ছিল। শোনা যাচ্ছিল তাদের উল্লাসধ্বনি। আল-মালিকুল আদিল ও আল-মালিকুল আফজাল ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে মিশর ও সিরিয়া তছনছ করে দিয়েছিল।

ইতিপূর্বে মধ্য-এশিয়ায় সুলতান আলাউদ্দীন তাকিশ ও সুলতান শাহের ২০ বছরব্যাপী গৃহযুদ্ধেও উম্মাহর এক বিরাট জনসংখ্যা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও গোত্রীয় দাঙ্গা। শুরু হয়েছিল ধর্মবহির্ভূত অনর্থক কঠোরতা; বিভিন্ন বিষয়ে মাত্রাতিরিক্ত ঢিলেমি। মুসলিমবিশ্বকে একজোট করতে খেলাফতে বাগদাদের তখন উচিত ছিল সহমর্মী হয়ে মাঠে নামা। উলটো তা ইসলামি হুকুমতকেই চূর্ণবিচূর্ণ করে দিচ্ছিল। বাগদাদ হয়ে উঠেছিল তাবৎ ষড়যন্ত্রের প্রধানকেন্দ্র। ফলে, সতর্কীকরণ হিসেবে আল্লাহর পক্ষ থেকে লাগাতার নেমে আসছিল বিভিন্ন প্রকার শাস্তি।

অমোঘ বাস্তবতা

উল্লিখিত পাঁচটি বিষয় তখনকার মুসলিমবিশ্বের জন্য ভয়াবহ বিপদের কারণ হয়ে ওঠে। হিজরি পঞ্চম শতকেই এ বিষয়গুলো প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাব্য গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। ক্রুসেডাররা তখন বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করে ফেলল। কিন্তু সে নিয়ে মুসলিম শাসকদের কোনো ভাবনাই ছিল না। তাদের চরম উদাসীনতা দেখে নির্দ্বিধায় বলে দেওয়া যেত, কোনো ভয়াবহ বিপর্যয় অত্যাসন্ন। ফলে কিছুদিনের মধ্যে ক্রুসেডারদের আকৃতিতেই নেমে এসেছিল সেই বিপর্যয়।

আল্লাহ তায়ালার তবু অনুগ্রহ হয়েছিল। মুসলিমদের অপরাধের কাফফারা হিসাবে অসামান্য শক্তি দিয়ে তিনি সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবিকে প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু উচিত তো ছিল—পরবর্তী মুসলিমরা তা হতে শিক্ষাগ্রহণ করবে। সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবির দেখানো পথেই তাদের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছতে চাইবে। কিন্তু আফসোস, সে অনুপাতে তারা কোনো ফায়দাই ওঠায়নি। সামষ্টিক বিপদ থেকে বাঁচতে সবাই মিলে একসঙ্গে জেগে ওঠেনি।

ক্রুসেডযুদ্ধের পূর্বেও তিন-চার শতাব্দীতে মুসলিমদের কিছু কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। ঘুমন্ত মুসলিমজাতিকে কয়েকবারই জাগিয়ে তুলেছে সময়ের কঠিন থাবা। কিন্তু প্রতিবারই জাগরণের পর তারা ফের ডুবে গেছে আরও গহীনে। ফলে শত্রুর হাতে মুসলিমবিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল একেবারে দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তবু বারবার তাদের আত্মশুদ্ধি ও প্রায়শ্চিত্তের সুযোগ দিচ্ছিলেন।

শেষমেশ যখন তারা আর ফিরে এলোই না, বোঝা গেল, এক প্রচণ্ড চপেটাঘাত না পড়লে এরা আসলে জাগবে না।

কালের ইতিহাস-রচয়িতাগণ তখন কলম হাতে অপেক্ষমাণ ছিলেন—দেখা যাক সামনে কী ঘটতে যাচ্ছে, কেমন ভয়ানক আকৃতিতে নেমে আসছে দুর্যোগ। জ্ঞানীরা ঠিকই বুঝে নিয়েছিলেন যে, কোনো বড় বিপদ অত্যাসন্ন, হালের কর্মকাণ্ড দেখে তা-ই বোঝা যাচ্ছে।

ওদিকে গোবি মরুভূমির উড়নচণ্ডী লোকগুলো জমিয়ে নিয়েছিল নিজেদের সর্বশক্তি। তখন মুসলিমবিশ্বের উপর বজ্রের মতো বিকট শব্দে তাদের কেবল ফেটে পড়বার অপেক্ষা। শেষ-ওয়ার্নিং হিসেবে আল্লাহ তায়ালা মুসলিমদের জাগিয়ে তুলতে ক্রমাগত আসমানি বালা-মুসিবত পাঠাচ্ছিলেন (এর আগের শতাব্দীগুলোতে অবশ্য এমন উদাহরণ একটিও নেই)। ব্যাপকহারে নেমে আসছিল প্রাকৃতিক বিপর্যয়—ঝড়-তুফান, যা মুসলিমদের সমগ্র অস্তিত্ব নড়বড়ে করে দিয়েছিল।

গায়েবি বিপদ

নিম্নে গায়েবি বিপদের কিছু উদাহরণ উল্লেখ করছি। এই গায়েবি বালা-মুসিবতগুলো ছিল তখনকার পৃথিবীর ভয়াবহ রকম পটপরিবর্তনের শিক্ষণীয় পটভূমি।

১. হিজরি ৫৯২; ১১৯৬ খ্রিষ্টাব্দ। একদিন হঠাৎ করেই সারা ইরাক আচ্ছন্ন করে ফেলল এক ঘোর অমানিশা। সঙ্গে উঠল লালবর্ণের প্রচণ্ড বালিঝড়। সেই ঝড়ে মুহূর্তে ঢেকে গেল চারপাশ। ধুলোর আবর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল আকাশের ঝাঁ ঝাঁ রোদ ছড়ানো সূর্য। দিনেরবেলাতেই নেমে এল রাত্রির প্রগাঢ় অন্ধকার। দিবাবেলায় বাতি জ্বালিয়ে হুড়োহুড়ি ও ছুটোছুটি করতে লাগল লোকজন।

২. হিজরি ৫৯৩; ১১৯৭ খ্রিষ্টাব্দ। জুমাদাল উলার ৯ তারিখ শুক্রবার রাতে ভয়ানক ঝড়-তুফান শুরু হল। প্রচণ্ড বাতাসে খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের শক্ত দেয়ালগুলো অবলীলায় ডানে-বায়ে দুলতে লাগল, কালবোশেখি ঝড়ে যেভাবে ছন্দতালে হেলতে-দুলতে থাকে গাছগাছালি।

কাজি ফাযিল বলেন, 'ইরাক যেন মুহূর্তে হয়ে উঠেছিল জাহান্নামের এক অন্ধ উপত্যকা।'

নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-জোয়ান, ছেলে-শিশু—প্রাণভয়ে সবাই ঘর ছেড়ে ছুটে পালাচ্ছিল। মসজিদের ভেতর আশ্রয় নিয়ে তাওবা ও রোনাজারিতে শুরু করেছিল ঊর্ধ্বাকাশ কাঁপিয়ে-তোলা সকরুণ বিলাপ। সমুদ্রে বড় বড় যত নৌকা ছিল, সব ডুবিয়ে দিয়েছিল সেই তুফান। সাম্রাজ্যের সমস্ত গাছপালা সমূলে উপড়ে নিয়ে বহুদূরে ছুড়ে ফেলেছিল। ঝড়ে প্রাণহানি ঘটেছিল বিপুলসংখ্যক মানুষের।

৩. হিজরি ৫৯৭; ১২০১ খ্রিষ্টাব্দ। ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ নেমে এসেছিল মিশরে। খেতে না-পেয়ে পথে-ঘাটে মরে পড়ে থাকত মানুষ। খাদ্য না-থাকায় ক্ষুধিত মানুষেরা মৃত পশু এমনকি মানুষের মৃত লাশ পর্যন্ত গপাগপ খেয়ে ফেলছিল। ধীরে-ধীরে ঘনিয়ে আসছিল আরও কঠিন সময়। প্রচণ্ড ক্ষুধায় নাক-মুখ কুঁচকে মানুষ কেমন হিংস্র হয়ে উঠছিল। সুযোগমতো জীবিত মানুষকেও জবাই করে তার রক্তভেজা কাঁচা মাংস খেয়ে ফেলত তারা। কোথাও কোনো মৃত লাশ পড়ে থাকতে দেখলে শকুনের মতো একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ত।

মাত্র একমাসের মধ্যে মিশরের বাদশাহ আল-মালিকুল আদিলকে নিজ খরচে ২ লক্ষ ২০ হাজার মৃতের দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। তারা সবাই মারা পড়েছিল দুর্ভিক্ষে।

৪. সে বছরই হেজাজ ও ইয়েমেনের মধ্যবর্তী আনাজা এলাকায় মহামারি নেমে এসেছিল। সম্পূর্ণ বিরানভূমিতে পরিণত হয়েছিল ১৮টি বস্তি। সেখানকার একজনও জীবিত বাঁচতে পারেনি।

৫. ইয়েমেনে, আবদুল্লাহ ইবনে হামজা নামের এক সরদারের ভ্রমণরত ১২ হাজার অশ্বারোহী এবং অসংখ্য পদাতিকের উপর আচমকা বজ্রপাত ঘটে। এটা ছিল মূলত আসমানি মুসিবত। এতে দু-চারজন সৈনিক ছাড়া কেউ বাঁচেনি।

৬. সে-বছরই, সিরিয়া, আলজেরিয়া, ইরাক ও রোমে শক্ত ভূমিকম্প হল। সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা গিয়ে লাগল সিরিয়ায়। বিধ্বস্ত হল অসংখ্য মানব-বসতি। বসরার একটি ঘন বসতিও জমিনে ধসে পড়ল। সিরিয়ার সামুদ্রিক এলাকা—ত্রিপলি, সুর, আকা ও নাবলুস—আচমকা শক্ত ঝাঁকুনি খেয়ে উঠেছিল। শুধু নাবলুসের ধ্বংসপ্রাপ্তদের সংখ্যাই ৩০ হাজারের কম ছিল না। সেই ভূমিকম্পে বালাবাকের মজবুত দুর্গে একসঙ্গে অসংখ্য চিড় ধরে গিয়েছিল। লোকজন হুড়োহুড়ি করে বস্তি ছেড়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে এসে আশ্রয় নিচ্ছিল। মিরআতুয যামান গ্রন্থের লেখকের ভাষ্যমতে—এই গজবে একসঙ্গে ধ্বংস হয়েছিল ১১ লক্ষ মানুষ।

৭. ৫৯৯ হিজরি, ১২০২ খ্রিষ্টাব্দ। মহররম মাসের শেষসপ্তাহ তখন। এক রাতে আকাশে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেল। ঝকঝক করে ঝুলতে লাগল অসংখ্য তারকা, বাতাসে যেভাবে ডানে-বায়ে দোলে গাছের ফল। হঠাৎ করেই বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মতো এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়তে লাগল সেগুলো। পূর্ব থেকে পশ্চিমে, পশ্চিম থেকে পূর্বে চক্রাকারে ঘোরাঘুরি শুরু করল। দেখে মনে হচ্ছিল—এগুলো নিশ্চিত ঝাঁকবদ্ধ অজস্র পতঙ্গ।

আল্লামা ইবনে কাসির লিখেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের কিছুকাল আগেও আকাশে এমন বিস্ময়কর দৃশ্য দেখা গিয়েছিল।

৮. ৬০০ হিজরি সনে মিশর, সিরিয়া, আলজেরিয়া ও সাইপ্রাসের কয়েকটি রাজ্যে আঘাত হেনেছিল ভূমিকম্প।[৬৫]

৯. ৬০৫ হিজরির (১২০৮ খ্রিষ্টাব্দ) ভয়াবহ এক ভূমিকম্পে নিশাপুরের সমস্ত কিছু লন্ডভন্ড হয়ে গেল। তারপর এ বিপর্যয়ের ৪ বছর তখনও কাটেনি, ৬০৯ হিজরিতে ফের (১২১২ খ্রিষ্টাব্দ) ভূমিকম্প হল। নিশাপুরের একটা বড় অংশ ভূগর্ভে ধসে গেল।[৬৬] প্রাণ হারালো হাজারও মানুষ, লক্ষ লক্ষ লোক হারালো ঘরবাড়ি।

---

[৬৫] এইসব ঘটনার আলোচনা আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (৭/১৬-৪৫) গ্রন্থে আছে।

[৬৬] তারিখে গুযিদাহ ১/৪৯৪

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভীতিকর ভবিষ্যদ্বাণী ও তাতার-আগ্রাসনের কারণ

كَانَ ذَالِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوْراً

সে-কথা তো লাওহে মাহফুজে লেখা হয়ে গেছে।

'এই স্বর্ণ-রৌপ্য ও হিরা-জহরতের বিপুল ভান্ডার মাজদুদ্দীনের রক্তের দিয়ত নয়; বরং পরিশোধ্য প্রকৃত রক্তঋণ হচ্ছে তোমার এই বিশাল সাম্রাজ্য এবং তোমার মস্তক। কেটে ফেলা হবে আমার মস্তকও। আল্লাহর অসংখ্য বান্দার মুণ্ডুও কাটা যাবে।' (শায়েখ নাজমুদ্দীন কোবরা)

একের পর এক আসতে-থাকা আসমানি মুসবিতের শক্ত আঘাতেও যখন মুসলমান জাগল না, আল্লাহর কুদরতি হস্ত তখন প্রবলভাবে বাহ্যিক সব কার্যকারণের সেই শেকল নাড়িয়ে দিল, যে-শেকলের শেষপ্রান্তে জ্বলছিল ধ্বংস ও বিধ্বস্ততার লকলকে অগ্নিশিখা।

৬১৩ হিজরির (১২১৬ খ্রিষ্টাব্দ) পর বিস্ময়জাগানিয়া বিরাট কিছু ঘটনা একদম লাগাতারভাবেই ঘটে গেল। সেগুলোকে মূলত বলা যায় একটি কাহিনিরই ধারাবাহিক বিভিন্ন পর্ব। এই পর্বগুলোকে একসঙ্গে জোড়া দিতে গেলে বোঝা যায়—'বড় কোনো বিপর্যয় নেমে আসার বাহ্যিক যত কার্যকারণ থাকতে পারে, বোধকরি তার সমস্ত কিছুই প্রকাশ পেয়ে গেছে, এবং জগতের অকাট্য বিধান হিসেবে শিগগির ঘটিতব্য বিরাট কোনো বিধ্বস্ততার প্রতি ইঙ্গিত করছে।'

সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে বিস্তারিতভাবে সেই ঘটনাগুলোরই বিবরণ দেওয়া হবে। তবে পড়বার সময় ভুলে গেলে চলবে না—স্রেফ একজন শাসকের অপরাধের জন্যই আল্লাহ তায়ালা পুরো জাতিকে ধ্বংস করে দিতে পারেন না। তেমনটা বরং তার জন্য ইনসাফবহির্ভূত কাজ (নাউজুবিল্লাহ)। তবে এতেও কোনো সন্দেহ নেই যে, মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহের গাফলতি, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতাও এই বিপর্যয়ের একটি বড় কারণ। এমনিভাবে তাতারদের অসামান্য সামরিক শক্তি, খাওয়ারিজমি মুসলিমদের নিকট বহিরাগত কোনো সাহায্য না-আসা ও বাগদাদের খলিফার বিভিন্ন অপরাধকেও গুরুত্বপূর্ণ কারণ গণ্য করা যায়।

কিন্তু মনে রাখতে হবে, সমস্তই ছিল তাৎক্ষণিকভাবে সংঘটিত কার্যকারণ। মৌলিক কারণ এসবের অনেক আগেই প্রকাশ পেয়ে গিয়েছিল। তা হল—উম্মাহর সেসব সামষ্টিক অপরাধ ও পাপাচার, যেসবে লিপ্ত হলে কোনো জাতিকেই কুদরতে ইলাহি ক্ষমা করে না।

আল্লাহওয়ালাদের ভবিষ্যদ্বাণী : গায়েবি ইশারা

এই অধ্যায়ে সেসব বিস্ময়কর ঘটনা এবং ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত কার্যকারণের দেখা পাবেন, যেগুলো মুসলিমবিশ্বে নেমে-আসা তাতার-আগ্রাসনের প্রাথমিক পটভূমি ও ভিত্তি ছিল।

কিন্তু ধারাবাহিকভাবে আবর্তিত সেই কারণগুলোতে নজর দেবার আগে পাঠকদের সামনে তাতার-আগ্রাসনের ব্যাপারে বর্ণিত গায়েবি ইশারা ও আল্লাহওয়ালাদের ইলহামি ভবিষ্যদ্বাণীর একটি নমুনা তুলে ধরা সমীচীন মনে করছি। বিস্ময়করভাবে এগুলো এই ধ্বংসকাহিনির একদম প্রারম্ভেই প্রকাশ পেয়েছিল এবং মুসলিমজাতিকে আশু ভবিষ্যকর্মপন্থা নির্ধারণের প্রতি তাগিদ করছিল।

শায়েখ নাজমুদ্দীন কোবরার ভবিষ্যদ্বাণী

খাওয়ারিজমের একজন প্রসিদ্ধ বুজুর্গ ছিলেন শায়েখ নাজমুদ্দীন কোবরা। সুফিদের ভেতর তার মাকাম ছিল অনন্য; মর্যাদা সমুন্নত। তার তারবিয়াতধন্য শিষ্যরা তাকওয়া ও ইসলাহ, সাধনা ও মুজাহাদা এবং ভেতর-বাইরের পবিত্রতায় হেদায়েত ও মারেফাতের পথে স্ব-স্ব যুগের অনন্য ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছিলেন। ইমাম ফখরুদ্দীন রাজি, শায়েখ বাখারজি ও বাহাউদ্দীন ওলাদ রহিমাহুমুল্লাহর মতো চির উজ্জ্বল সব নক্ষত্র শায়েখ নাজমুদ্দীনেরই শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

তার খলিফাদের মধ্যে শায়েখ মাজদুদ্দীন লোকজনকে খুবই প্রভাবক-শক্তিসম্পন্ন ওয়াজ-নসিহত করতেন। খাওয়ারিজমের রাজধানী আরগেঞ্চে তার ওয়াজের মজলিশ বসত। তখন যেন সেখানে বয়ে যেত ঈমান ও মারেফাতের ঐশী নুরের ঝরনাধারা। দূরদূরান্ত থেকে লোকজন এসে সেই মজলিশে শরিক হতো, নিজেদের গুনাহের জন্য তাওবা করত, নফসের ইসলাহ করত। সুলতান আলাউদ্দীন মুহাম্মদের মাতা সম্রাজ্ঞী তুর্কান খাতুনও এই মজলিশে অংশগ্রহণ করতেন। শায়েখ মাজদুদ্দীনের ধর্মীয় শিক্ষা ও অনুভূতিতে তিনি খুবই আকৃষ্ট ছিলেন। তার বাতলানো সমস্ত নসিহত যথাযথভাবে পালনের চেষ্টা করতেন তিনি।

একদিন কিছু কৃচক্রী এসে সুলতান আলাউদ্দীনের কাছে অভিযোগ তুলল—জাহাঁপনা, শায়েখ মাজদুদ্দীনের ওখানে আপনার মায়ের খুব ঘনঘন যাওয়া-আসা হচ্ছে। ব্যাপারটা কিন্তু সন্দেহমুক্ত নয়। শায়েখ মাজদুদ্দীন হয়তো আপনার আম্মিজানকে বিয়ে করতে চাচ্ছেন।

সঙ্গে সঙ্গে এই অপবাদ বিশ্বাস করে বসলেন সুলতান। ক্রোধে রুদ্রমূর্তি ধারণ করে মাজদুদ্দীনকে তিনি নদীতে ডুবিয়ে মারার আদেশ দিলেন।

চূড়ান্ত রাগের ভেতর জারি-করা এই আদেশ বাস্তবায়নও করা হল তৎক্ষণাৎ—শায়েখ মাজদুদ্দীনকে নদীতে ডুবিয়ে দেওয়া হল। কয়েক ঘণ্টা পর

সুলতানের ক্রোধ খানিকটা স্তিমিত হয়ে এলে তড়িঘড়ির মধ্যে গৃহীত এই সিদ্ধান্তে তিনি খুব পেরেশান হয়ে পড়েন। আর তখনই জহরত-মণিমুক্তায় ভর্তি একটি রেকাবি হাতে নেন। সেই রেকাবিতে মণিমুক্তার উপরে ভাঁজ করে একটি ধবধবে সাদা কাফনের কাপড়ও রাখলেন। কাফনের উপর আড়াআড়িভাবে শুইয়ে দিলেন চকচকে একটি তলোয়ার।

খাওয়ারিজম শাহ রেকাবি হাতে শায়েখ নাজমুদ্দীন কোবরার (মাজদুদ্দীনের শায়েখ) খানকায় গিয়ে হাজির হলেন। বিগলিত ভঙ্গিতে আবেদন করলেন—শায়েখ, মাজদুদ্দীনের রক্তপণ হিসেবে আমার এ সম্পত্তি গ্রহণ করুন। আমাকে এ মহাপাপ থেকে উদ্ধার করুন। নয়তো কিসাস হিসেবে এই তলোয়ার দিয়ে গর্দান উড়িয়ে দিন আমার। আমি আর নিজের সঙ্গে পেরে উঠছি না। আমি খুবই লজ্জিত ও অনুতপ্ত।

শায়েখ নাজমুদ্দীন কোবরার মেজাজ খানিকটা তিরিক্ষি হয়ে ওঠে। তিনি রাগান্বিত গলায় বলে ওঠেন—ব্যাপারটা লাওহে মাহফুজেই লেখা হয়ে গেছে। মাজদুদ্দীনের রক্তপণ সোনা-দানা কিংবা হিরে-জহরত নয়, এই পুরো সাম্রাজ্য ও তোমার মস্তকই হচ্ছে তার প্রকৃত রক্তপণ। তোমার মুণ্ডু তো কাটা হবেই, পাশাপাশি অসংখ্য লোকের মস্তকও ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হবে। অপেক্ষা করো।[৬৭]

ইতিহাস আমাদের জানায়—একথা বলে তিনি তাতার হামলার দিকেই ইঙ্গিত করেছিলেন। তার এই ইলহামি ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে-অক্ষরে প্রতিফলিত হয়েছিল।

(আমাদের দেশের [পাকিস্তানের] জামিয়া হাফসার নিষ্পাপ ছাত্রীদেরকে নরপশুরা কী নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল, কী নির্মমভাবে আলেমদের শহিদ করেছিল—তাতে দৃষ্টি বোলানো উচিত! শায়েখ মাজদুদ্দীনের হত্যার চেয়ে এই অপরাধ কোনো অংশে কম নয়। খাওয়ারিজম শাহ তো অনুতপ্ত হয়েছিলেন, রক্তপণও আদায় করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু আমাদের দেশে পাশবিক জুলুম-নির্যাতন করেও গর্ব-দৃপ্ত মুখচ্ছবি নিয়ে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ-বিষয়ে সবার ভেতর বিরাজ করছে একধরনের নীরবতা। এ নিয়ে কারও যেন কোনো মাথাব্যথা নেই। জালেমদের বিরুদ্ধে মজলুমদের জন্য ইনসাফের কোনো পথ খোলা নেই।)

সাইয়েদ মুরতাজা শাদইয়াখির বাণী

শাদইয়াখের বুজুর্গ সাইয়েদ মুরতাজার কথা পেছনে পড়ে এসেছেন। তুর্কানেখাতার পরাজয়ের পর তিনি কিন্তু বলেছিলেন, 'আমাদের নিরাপত্তার জন্য তুর্কানেখাতাকে টিকিয়ে রাখা জরুরি। এই মারদাঙ্গা জাতিটি আমাদের ও হিংস্র মোঙ্গলিয়ানদের

---

[৬৭] রওজাতুস সফা ৫/২৫; নাফহাতুল উনস ৬৬৩

মাঝখানে এক দুর্লঙ্ঘ প্রাচীর। এই প্রাচীর ভেঙে গেলে মোঙ্গলিয়ার হিংস্র পশুগুলো বানের স্রোতের মতো হুড়মুড় করে ধেয়ে আসবে আমাদের দিকে।'[৬৮]

তার এই কথাও অক্ষরে-অক্ষরে প্রতিফলিত হয়েছিল। চেঙ্গিজ খানের নেতৃত্বে কিছুকালের মধ্যেই মোঙ্গলিয়ানরা এসে মুসলিমবিশ্বে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বৈকাল লেক থেকে সাইহুন-নদীর তীর পর্যন্ত তাদের সামনে কেউ-ই তখন বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি।

পাখির ডাক

শামসুদ্দীন জাযারি তার ইতিহাসগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, এক প্রত্যক্ষদর্শী ব্যবসায়ী আমাকে বলেছে—ব্যবসাসূত্রে প্রায়ই আমাকে বিভিন্ন অনারব সাম্রাজ্যে সফর করতে হতো। আমি যখন অনারব অঞ্চলে যেতাম, তখন আরবের শাসক আমার মাধ্যমে আলাউদ্দীন খাওয়ারিজম শাহের জন্য অনেক উপঢৌকন পাঠাতেন। একবার কোনো কারণে খাওয়ারিজম শাহের সৈনিকদের ভেতর আমি থেকে গিয়েছিলাম। সেদিন তার বাহিনীতে অশ্বারোহীর সংখ্যা ছিল ছয় লাখ, আর ঠিক সেই পরিমাণ পদাতিক। সমুদ্রের ঢেউ যেভাবে ওঠানামা করে এগোতে থাকে, খাওয়ারিজম শাহের বাহিনীও ঠিক সে-রকমভাবেই সামনে এগোচ্ছিল।

একরাতে মরুভূমির ভেতর তাঁবু টাঙিয়ে ঘুমাতে গেল সেনারা। চারপাশে ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। তবে আশার কথা, মৃদুভাবে হালকা বাতাস বইছে। সারাদিন সূর্যের প্রখর আলোয় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল মরুবালি। তখন, রাতের এই নির্জনতায় তাতে লেপটে রয়েছে খুব আরামদায়ক শীতলতা। আমরা তাঁবুর ভেতর সবে শুয়েছি। তখনও ধরে আসেনি চোখ। হঠাৎ শুনতে পেলাম, একসঙ্গে কারা যেন গমগমে গলায় বলে উঠছে, 'হে কাফের সম্প্রদায়, এই পাপীদের তোমরা হত্যা করে ফেলো। আসো, পাপীদের হত্যা করো।'

আমরা সবাই হতভম্ব। তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে সন্ত্রস্ত চোখে আহ্বানকারীকে এদিক-ওদিক খুঁজতে লাগলাম। কাছেধারে কিছুই চোখে পড়ল না। তবে মশালের হলুদ আলোয় দেখতে পেলাম, খানিক দূরে, মাঠের ভেতর ঝাঁক বেধে বৃত্ত বানিয়ে এক ঝাঁক পাখি ওড়াউড়ি করছে। এই গভীর রাতে ওদের এমন অস্থির ছোটাছুটির কোনো কারণ খুঁজে পেলাম না।

পরদিন রাতেরবেলা একই সময়ে ঠিক সেই একই আওয়াজ শুনতে পেলাম। বাইরে বেরিয়ে দেখলাম, গতকালের মতোই বৃত্ত বানিয়ে উড়ে চলেছে পাখির ঝাঁক। তৃতীয় রাতেও একই ঘটনা ঘটল। আমাদের তখন বিশ্বাস জন্মে গেল, এ নিশ্চয়

---

[৬৮] তারিখে জাহাঁকুশা ২/৭৮

তাতার-আগ্রাসনের কিছু কারণ

প্রথম কারণ : খাওয়ারিজম শাহ ও বাগদাদের খলিফার বৈরী সম্পর্ক

বাগদাদের খলিফার সাথে খাওয়ারিজমের সুলতানদের সম্পর্ক সুলতান তাকিশের আমল থেকেই খারাপ ছিল। তারপর যখন বর্ধিত হল সুলতান আলাউদ্দীন খাওয়ারিজম শাহের সাম্রাজ্যের সীমানা, খলিফা নাসিরের মন বড় উশখুশ করতে লাগল। তিনি ভাবলেন, অচিরেই হয়তো এই খাওয়ারিজমি গোত্র বাগদাদের ফটকের মুখে আঘাত হানতে আসবে।

কত ভালো হতো, যদি খলিফা নাসির ও খাওয়ারিজম শাহ নিজেদের ভেতরকার পুরোনো দ্বন্দ্ব মুছে ফেলতেন, একজোট হয়ে ভাবতেন মুসলিমবিশ্বের একতা, উন্নতি ও সফলতার কথা! কত ভালো হতো, যদি দুশমনের শক্তি খর্ব করে দিতে জিহাদের মহান ব্রত নিয়ে সামনে এগোতেন তারা! দুঃখজনক বাস্তবতা হল, দুজনই পারস্পরিক ঘৃণা-বিদ্বেষের আগুনে আরও বেশি করে ঘি ঢেলে যাচ্ছিলেন। চাইলে, এই দুই বিশাল সাম্রাজ্য তাদের প্রচণ্ড শক্তিমত্তা ও বিপুল উপকরণ দিয়ে পুরো মুসলিমবিশ্বে বিজয়ের ঢাক বাজাতে পারত। তা না-করে দুজন হলেন একে অন্যের চরম শত্রু। দিন-রাত শুধু পরস্পরের দোষ খুঁজতে ব্যস্ত রইলেন। খাওয়ারিজম শাহের সাম্রাজ্যের পরিধি যেন বাগদাদ সাম্রাজ্য থেকে অধিকতর বিস্তৃত হয়ে না-পড়ে, খলিফা নাসিরের এই ছিল সার্বক্ষণিক পেরেশানি।

আলাউদ্দীনের ক্ষমতাগ্রহণের পরপরই এই দ্বন্দ্বের শুরু। তখন প্রতিটি নতুন স্বাধীন সম্রাট ক্ষমতায় আসতেই দরবারে খেলাফত থেকে তার কাছে লিখিত পরোয়ানা পাঠানো হতো। খলিফার পক্ষ থেকে ছোট-ছোট প্রদেশের শাসকদের কাছে পাঠানো হতো এই পরোয়ানা। এটা ছিল একপ্রকার সম্মাননা-সনদ। খাওয়ারিজম শাহের সাথে মনোমালিন্যের কারণে খলিফা এই সম্মানপ্রদর্শন থেকে তাকে বঞ্চিত রেখেছিলেন। অথচ মুসলিমবিশ্বের এক বিশাল সাম্রাজ্যের হাল ধরেছিলেন খাওয়ারিজম শাহ। খলিফার এহেন পদক্ষেপ স্পষ্টতই অন্যায় ছিল।

কিছুকাল পর যখন খাওয়ারিজম শাহ ঘুরদের পরাজিত করে তাদের রাজ্য দখল করে নিলেন, খলিফা নাসির তখন খাওয়ারিজম আক্রমণের জন্য ঘুরি সুলতানদের ইন্ধন যোগাতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। এতে খাওয়ারিজম শাহের রক্ত জ্বলে ওঠে। তিনি সুযোগের অপেক্ষায় থাকলেন। তারপর ধীরে-ধীরে যখন পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্ময়কর বিজয় অর্জন করে উঠলেন তিনি, বুঝলেন—'আমার শক্তি এবার বহুগুণ

বেড়ে গেছে। শিগগির বাগদাদকে আমার পদতলে লুটিয়ে পড়তে বাধ্য করব।' এমন একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন তিনি।

খলিফা নাসিরের কাছে ইসলামি খেলাফতের পক্ষ থেকে প্রদেয় সেই সম্মাননা ফের তলব করলেন খাওয়ারিজম শাহ। পূর্বে সেলজুকি সুলতানরাও এই সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন। বিগত শতাব্দীতে সেলজুকরা বাগদাদের খলিফার অনুগত ও বিশ্বস্ত সহযোগী ছিলেন। বাগদাদ সাম্রাজ্যের সমন্বয়কও ছিলেন তারা। জুমার খুতবায় খলিফার নামের সঙ্গে তাদের নামও পাঠ করা হতো।

সেলজুকদের সেই সাম্রাজ্য তখন কবজা করে ফেলেছিলেন আলাউদ্দীন খাওয়ারিজম শাহ। তাই খেলাফতের সম্মাননাপ্রাপ্তিকেও নিজের অধিকার ভাবতে শুরু করেছিলেন তিনি। অন্তত এই বাহানায় তিনি বাগদাদ সাম্রাজ্যে কর্তৃত্ব খাটাতে চাচ্ছিলেন।

এই উদ্দেশ্যে ৬১৪ হিজরিতে কাজি মুজিরুদ্দীন উমর আল-খাওয়ারিজমিকে তিনি দূত বানিয়ে বাগদাদে পাঠালেন। কিন্তু এই চেষ্টা ব্যর্থ হল তার। শাহকে সম্মাননা প্রদান করবেন না বলে সাফ সাফ জানিয়ে দিলেন খলিফা। অত্যন্ত গম্ভীর কণ্ঠে দূতকে তিনি জবাব দিলেন, 'কালের আবর্তনে, ক্ষমতার হাতবদলের কারণে, একদা আমার বাপ-দাদারা সেলজুক সাম্রাজ্যের স্থপতি তুগরুলের সাহায্য নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু সেই যুগ এখন বদলে গেছে। এখন আর বাগদাদের ঘাড়ে বসে কেউ কর্তৃত্ব করতে পারবে না। আল্লাহ তায়ালা খাওয়ারিজম শাহকে তো সুবিশাল সাম্রাজ্য দান করেছেন। তাকে বলো গিয়ে ওটা নিয়েই পড়ে থাকতে, এ-মুখো যেন না-হয় কখনও। তার, খেলাফতে বাগদাদের অধীনে থাকবার কোনো প্রয়োজন নেই।'

খলিফার এই বক্তব্যে খুবই ব্যথিত হলেন খাওয়ারিজম শাহ। পরপর আরও কয়েকবার কাজি মুজিরুদ্দীনকে বাগদাদে পাঠালেন; কিন্তু কোনো লাভ হয়নি।

শায়েখ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দির আগমন

কাজি মুজিরুদ্দীন বাগদাদ থেকে শেষবারের মতো ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাচ্ছিলেন। বাগদাদে তখন বাস করতেন বিখ্যাত সুফি শায়েখ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দি। খলিফা নাসির দূত হিসেবে তাকে কাজি মুজিরুদ্দীনের সঙ্গে খাওয়ারিজমে পাঠালেন। খলিফা এতে আশা করেছিলেন—সোহরাওয়ার্দি হজরত গিয়ে খাওয়ারিজম শাহকে দু-চার কথা বলে বোঝালে সে হয়তো মানতে পারে! মহান শায়েখ সোহরাওয়ার্দি খাওয়ারিজম শাহের নিকটও একজন শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। এজন্য তিনি কিছু বললে খাওয়ারিজম শাহ অবশ্যই শুনবে।

শায়েখ সোহরাওয়ার্দি পৃথিবীবিখ্যাত শায়েখ আবদুল কাদির জিলানির রুহানি ফয়েজ লাভ করেছিলেন। আর শেখ সাদি শিরাজি, শেখ বাহাউদ্দীন ও জাকারিয়া মুলতানির মতো মহান ব্যক্তিদের তিনি মুসলিহ ও মুরুব্বি ছিলেন। তখনকার যুগে

আরব-অনারবের প্রায় সমস্ত সম্প্রদায় তাকে রুহানি পিতা ভাবত। আল্লাহর স্মরণে তার চেহারায় সর্বদা ফুটে থাকত এক স্বর্গীয় আলোকবিভা। বড়ই মায়াবী তার সেই চেহারা। তিনি উম্মাহর চির কল্যাণকামী ছিলেন। সমস্ত অবয়ব থেকে হরদম ঠিকরে পড়ত তার অনুপম ব্যক্তিত্বের ঝলক।

তার চোখে খাওয়ারিজম-বাগদাদ দুটোই ছিল সমান। এই সফরে যেতে তিনি সম্মত হয়েছিলেন শুধু দু-দলের ভেতরকার দ্বন্দ্ব মেটাতে। কারণ, দু-দিকের জন্যই এই রকম দ্বন্দ্ব-সংঘাত ছিল অত্যন্ত ক্ষতিকর।

আলাউদ্দীন খাওয়ারিজম শাহ তার দূত মুজিরুদ্দীনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সোহরাওয়ার্দি হজরত খাওয়ারিজমে পৌঁছতেই সাক্ষাতের জন্য তাকে শাহের তাঁবুতে নিয়ে যাওয়া হল।[৭০] পরবর্তীকালে সেই তাঁবুর বর্ণনা দিতে গিয়ে শায়েখ বলেছিলেন, 'সে এক বিরাট তাঁবু। সেটির দহলিজের মতো প্রশস্ত ও লম্বা দহলিজ আমি আর দেখিনি। তাঁবুর চাদর ও রশিগুলো ছিল রেশমের তৈরি। দহলিজে ইস্পাহান ও হামাদানের আঞ্চলিক শাসকরা নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। সেখান থেকে বেরিয়ে আমরা পাশের আরেকটি তাঁবুতে ঢুকলাম। দেখলাম, মা-ওয়ারাউন-নাহারের শাসকরা সেখানে বসা। সেই তাঁবুতেই খাওয়ারিজম শাহের সাথে আমরা সাক্ষাৎ করেছিলাম।'[৭১]

কুশল-পর্ব শেষ হল। শায়েখ সোহরাওয়ার্দি আরবি ভাষায় কথা বলা শুরু করলেন। খেলাফতের পক্ষ থেকে প্রেরিত দূতের সাধারণ নিয়ম ছিল, খলিফার পয়গাম পৌঁছাবার আগে তিনি একটি হাদিসে নববির বর্ণনা দেবেন।

খাওয়ারিজম শাহ সোহরাওয়ার্দি হজরতকে হাদিস বর্ণনার অনুমতি তো দিলেনই, খুব আদব-লেহাজের সাথে শশব্যস্ত ভঙ্গিতে তিনি সিংহাসন ছেড়ে নিচে নেমে গেলেন। দোজানু হয়ে মেঝেতে পাতানো রাজকীয় বিছানায় বসে গেলেন।

তারপর শায়েখ সোহরাওয়ার্দি একটি হাদিস পড়ে শোনালেন। এই হাদিসে ছিল বনু আব্বাসকে কষ্ট দেওয়ার নিষেধাজ্ঞাসংবলিত বর্ণনা। হাদিসপাঠের পর এ নিয়ে আলোচনা করলেন খানিক। তাতে খেলাফতের গুরুত্ব, বনু আব্বাসের মর্যাদা, রাসুলের সঙ্গে তাদের আত্মীয়তা ও রাসুলের আত্মীয়দের সম্মানপ্রদর্শনের কথা ফুটে ওঠে।

তারপর উল্লেখ করেন বনু আব্বাসের কীর্তিমালার কথাও—বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে উম্মাহর ইসলাহ ও সফলতার জন্য তারা যে গুরুদায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে আসছেন, সে-কথা।

---

[৭০] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৪৯; নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৫৮; তারিখে কাবির যাহাবি ৬২/৬১৪; ইবনে খালদুন ৫/১০৭; কিন্তু হাফেজ ইবনে কাসির ও মিরখান্দের মতানুযায়ী খাওয়ারিজম শাহ শায়েখের সাথে অভদ্র আচরণ করেন এবং তার সালামের জবাব পর্যন্ত দেননি। দেখুন : আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৭/৮৩ ও রওজাতুস সফা ৪/৮২২

[৭১] তারিখে কাবির যাহাবি ৬২/৬১৪ হিজরি।

সোহরাওয়ার্দি হজরতের বক্তব্য খাওয়ারিজম শাহ খুব আদবের সাথে মন দিয়ে শুনছিলেন। যখন বনু আব্বাসকে কষ্ট দেওয়ার প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপকারী হাদিসটি পঠিত হল, খাওয়ারিজম শাহ চুপ থাকলেন না। মাঝপথে ভদ্রোচিত ভঙ্গিতে বলে উঠলেন, হজরত, আমি একজন তুর্কি বাসিন্দা। তবু আপনার আরবি আলোচনা পুরোপুরি বুঝতে পারছি। শায়েখ, আল্লাহ না-করুক, আমি তো কখনও বনু আব্বাসকে কষ্ট দিইনি! বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পেরেছি, উলটো খলিফা নাসিরই বনু আব্বাসের কিছু সম্মানিত ব্যক্তিকে বন্দি করে রেখেছেন। বহুকাল ধরে অবর্ণনীয় বিভিন্ন কষ্টে জর্জরিত হচ্ছেন তারা। তাদের নতুন প্রজন্মের জন্মও ঘটছে কয়েদখানার ভেতর, আজন্ম বন্দিত্ব নিয়ে। খুব ভালো হবে, আপনার এই অমূল্য কথাগুলো খলিফা নাসির যদি ভালোভাবে শোনেন!

শায়েখ পূর্বের অবিচলিত ভঙ্গি ধরে রেখে বলে চলেন, 'খলিফাতুল মুসলিমিনকে খেলাফতের পদ দেওয়া হয় সমাজের ইসলাহের জন্য। তিনি যদি কাউকে সংশোধনের উদ্দেশ্যে বন্দি করে রাখেন, সে অধিকার তার আছে। এ কারণে তাকে অভিযুক্ত করা চলে না।' বলেই শায়েখ খলিফা নাসিরের উত্তম গুণাবলি বর্ণনা করতে আরম্ভ করেন।

খাওয়ারিজম শাহ বলে ওঠেন, 'আপনি যে চরিত্রের কথা বলছেন, মানি, একজন খলিফার মধ্যে এই সব গুণই থাকা উচিত। কিন্তু দুঃখের কথা হল, খলিফা নাসিরের ভেতর এর একটিও খুঁজে পাওয়া যাবে না। বাধ্য হয়ে খলিফা নাসিরকে বরখাস্ত করে আমি তার স্থলে নতুন একজনকে নির্বাচন করেছি। সর্বদিক থেকে মহোত্তম চরিত্রের অধিকারী তিনি। তার নাম আলাউল মুলক আত-তিরমিযি। আলাবিদের (আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর বংশধর) মর্যাদা বনু আব্বাসের তুলনায় অনেক বেশি। আলাবিরাই খেলাফতের আসল হকদার।'

খাওয়ারিজম শাহ শায়েখ সোহরাওয়ার্দির বাহ্যিক সম্মানপ্রদর্শনে অবশ্য কোনো ত্রুটি করেননি। কিন্তু যে-উদ্দেশ্য নিয়ে শায়েখ এখানে এসেছিলেন, তা পূর্ণ হল না। খাওয়ারিজম শাহ শক্ত জেদ ধরে বসেছিলেন। ফলে সন্ধি করবার কোনো প্রশ্নই আর ওঠেনি।

এই ঘটনা শুনে খলিফা নাসির অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। এতে তিনি আঁচ করে উঠতে পেরেছিলেন খাওয়ারিজম শাহের সাহসের উচ্চতা। অগত্যা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে লাগলেন তিনি। এ আপদ থেকে মুক্তির জন্য তিনি হাসান ইবনে সাব্বাহর ফেদাই বাহিনীর সহায়তা লাভ করেন। ইতিপূর্বে সুলতান আলাউদ্দীন তাকিশ ও সুলতান আলাউদ্দীন মুহাম্মদ চুরমার করে দিয়েছিলেন ফেদাইদের সমস্ত শক্তি। এজন্য খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের প্রতি ফেদাইদের প্রচণ্ড ঘৃণা ছিল। এই সুযোগ কাজে লাগাতে চাইলেন খলিফা নাসির। বাতেনিদের নতুন ইমাম আলামুতের হাকিম জালালুদ্দীন হাসানের সাথে অল্পদিনের মধ্যে তিনি সুসম্পর্ক গড়ে তুললেন।

ফকিহদের মতে, নাস্তিক্যবাদী আকিদার কারণে বাতেনিরা ইসলামবহির্ভূত। তবে হাকিম জালালুদ্দীন অপরাপর মুসলিমের আকিদা মোতাবেক ইসলামগ্রহণের ঘোষণা দিয়ে বসেছিলেন।[৭২] তার এই নতুন ধর্মবিশ্বাস পাকাপোক্ত করতে স্বীয় মাকে নিয়ে হজও করতে গিয়েছিলেন তিনি।

তখন মুসলিমবিশ্বের সমস্ত কাফেলা এসে পবিত্রভূমি হেজাজে জড়ো হয়েছে। খলিফা নাসিরের কথামতো সেখানে জালালুদ্দীন হাসানের পতাকা খাওয়ারিজম শাহের পতাকা থেকে একটু অগ্রে পোঁতা হল। তাতে খলিফা নাসিরের সম্ভবত একজন নওমুসলিমের মন জয় করাই উদ্দেশ্য ছিল। এদিকে খাওয়ারিজম শাহ খলিফার প্রতিটি পদক্ষেপ সন্দেহের দৃষ্টিতে লক্ষ রাখছিলেন।

তারপর হেজাজ থেকে ফিরবার পথে খাওয়ারিজমি কাফেলার সরদার গিয়ে সুলতানের কানে-কানে জানালো বিষয়টা। এতে শাহের ধারণা আরও পোক্ত হয়ে উঠল যে, এমনটি করে খলিফা মূলত আমাদের খাওয়ারিজমি পতাকাকে তুচ্ছ করতে চেয়েছেন।

খলিফা নাসির বাতেনিদের ইমামের বিশ্বস্ত বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন অল্পকালের ভেতর। তার কাছে তিনি কিছু ফেদাই সৈনিক চাইলেন। জালালুদ্দীন হাসান একদল ফেদাই পাঠানোর সময় আবেগমথিত গলায় বললেন—দেখবেন, আপনার আঙুলের ইশারায় একদম জীবন বিকিয়ে দেবে এরা।

খলিফা নাসির তাদের খাওয়ারিজম শাহের আমির আতাবেগ আলতামাশের উপর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত করে ফেললেন। আলতামাশ খাওয়ারিজম শাহ কর্তৃক নিযুক্ত ইরাকের সদ্যবিজিত এলাকাগুলোর হাকিম ছিলেন। হাজিদের কাফেলাকে সংবর্ধনা জানাতে তিনি যখন বেরোলেন, ঠিক তখনই তার উপর হামলে পড়তে চাইল ফেদাইরা। তারাও হাজিদের মতো পোশাক পরে এসেছিল। এজন্য হাকিম তাদের চিনে উঠতে পারেননি। তারা আস্তিনের নিচে লুকিয়ে রেখেছিল ধারালো খঞ্জর। এগোচ্ছিল ভয়-জড়িত গুটি গুটি পায়ে। হঠাৎ আতাবেগ আলতামাশকে বাগে পেয়ে তারা খঞ্জরের উপর্যুপরি আঘাতে শহিদ করে ফেলল। আতাবেগের মৃত্যুতে

---

[৭২] জালালুদ্দীন ছিল হাসান ইবনে সাব্বাহর স্থলাভিষিক্তদের একজন। সে তার বড়দের আকিদা থেকে তাওবা করে ইসলামগ্রহণের ঘোষণা করে দিয়েছিল। তার সময়ে ফেদাইদের ঔদ্ধত্য খানিকটা স্তিমিত হয়ে এসেছিল; কিন্তু তারা তাদের এই নতুন ইমামের তালিম দিল থেকে গ্রহণ করেনি। ফলে, তারপরে আগত আলামুতের হাকিম পূর্ববৎ সেই কাফেরই ছিল। জালালুদ্দীন হাসানকে মুসলিমবিশ্বে 'জালালুদ্দীন নওমুসলিম' উপাধিতে স্মরণ করা হতো। কিন্তু কিছু ঐতিহাসিক বলেন—সে এই ইসলাম প্রকাশ করেছিল রাজনৈতিক ফায়দা লোটার জন্য। একারণেই হাফেজ যাহাবি রহ. তাকে দলালুদ্দীন নামে ডাকতেন। (সিয়ারু আলামিন নুবালা ২২/১৯৮)
৬১৮ হিজরি সনে তার মৃত্যু ঘটেছিল। তার পরে সিংহাসনে বসেছিল বাতেনিদের শেষ ইমাম আলাউদ্দীন খোরশাহ। (হাসান ইবনে সাব্বাহ ৬৮)

খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য থেকে হাতছাড়া হয়ে গেল ইরাকের কিছু অঞ্চল। সে-সমস্ত এলাকা পুনরুদ্ধারের জন্য পরবর্তীকালে সুলতানকে দু-দুবার যুদ্ধে নামতে হয়েছিল।

ফেদাইদের পরবর্তী টার্গেট ছিল স্বয়ং খাওয়ারিজম শাহ। তার উপর হামলার বহু পাঁয়তারা চালাল তারা। পারল না। আল্লাহর কলমে খাওয়ারিজম শাহের পৃথিবী-জীবনের আরও কিছুদিন লেখা ছিল। তারপর ফেদাইদের নিয়ে নতুন ফন্দি আঁটতে লাগলেন খলিফা নাসির। খলিফার এই কাপুরুষোচিত আচরণে সুলতান আলাউদ্দীন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তবে খেলাফতের পবিত্র দায়িত্বের কথা ভেবে তাৎক্ষণিক কোনো আক্রমণে যাননি তিনি।[৭৩]

মিরআতুল জিনান গ্রন্থে সিবত ইবনুল জাওযি খেলাফতে বাগদাদ নিয়ে লিখেছেন, 'সুলতান আলাউদ্দীন তখন হামাদানে অবস্থান করছিলেন। খলিফা নাসিরের মন্ত্রী মুয়াইয়িদুদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহের কিছু সৈনিকের কাছে গোপনে চিঠি পাঠাল। তাদের ক্ষমতার লোভ দেখাল সে। ফলে, এই খাওয়ারিজমি সিপাহিরা খাতাই সৈনিকদের (যেসব খাতাই নিজেদের শেষপরাজয়ের পর খাওয়ারিজমি বাহিনীতে এসে যোগ দিয়েছিল) সাথে একজোট হয়ে সুলতান আলাউদ্দীনকে হত্যার পরিকল্পনা আঁটল। পুরস্কারস্বরূপ খলিফার মন্ত্রী তাদের জন্য আগেভাগেই কিছু সোনাদানা ও ঘোড়ার একটি পাল পাঠিয়ে দিয়েছিল।

এই সূক্ষ্ম কূটচাল এক অর্থে সুলতানকে অনেকটা দুর্বল করে দিয়েছিল। কারণ, বাহিনীর ভেতর দেখা দিয়েছিল বিচ্ছিন্নতা। এই চক্রান্তের ফাঁদে সুলতান প্রায় পড়েই গিয়েছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের ব্যাপার, তৎক্ষণাৎ হামাদান থেকে তিনি খোরাসান চলে গেলেন। যাবার পথে মার্ভ শহরে কোনোভাবে রাতটা কাটিয়েছিলেন। খলিফার মন্ত্রী বিদ্রোহী খাতাইদের জন্য যে তোহফা, ঘোড়া, সোনাদানা পাঠিয়েছিল, খাওয়ারিজম শাহ তা ধরে ফেলেছিলেন রাস্তায়।

তখন তার সঙ্গেও ছিল ৭০ হাজার খাতাই সৈনিক। অবস্থা বড্ড গোলমেলে হয়ে গিয়েছিল। খাতাইরা এখন কী করবে, সুলতানের পক্ষে লড়বে, নাকি স্বজাতীয় গাদ্দারদের সাথে একাত্ম হয়ে খাওয়ারিজম শাহের বিপক্ষেই অবস্থান নেবে, বিরাজ করছিল এরকম একটা শঙ্কা। অপ্রীতিকর কিছু-একটা ঘটতে যাচ্ছিল। এই গোলমেলে পরিস্থিতি থেকে নিরাপদে বেঁচে ফিরতে পারাই তখন খাওয়ারিজম শাহের জন্য সর্বপ্রধান কাজ হয়ে উঠেছিল। খাতাই আমিরদের ভেতর নিজের মামাকেও দেখতে পাচ্ছিলেন তিনি।

ষড়যন্ত্রকারীরা তার মামাকে পূর্বেই কসম খাইয়ে নিয়েছিল—সাবধান, এ ব্যাপারে সুলতানকে তুমি কিছু যেন না-বলো! কিন্তু সে-রাতে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে মামা চুপি চুপি খাওয়ারিজম শাহের আস্তানায় উঠে এসেছিলেন। একটা চিরকুটে দু-চার

---

[৭৩] জাহাঁকুশা ২/১২০-১২১; নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৫৭-৩৫৮

শব্দে বর্তমান ষড়যন্ত্রের কথা লিখে ভাগ্নের হাতে দিতে দিতে সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে বললেন, 'দ্রুত নিজেকে বাঁচাও। এবার তোমাকে মেরে ফেলতে চাইছে।' বলেই পেছন ঘুরে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন তাঁবুর ভেতর থেকে।

খাওয়ারিজম শাহের সাথে তার দুই ছেলেও ছিল। একজন সুলতান জালালুদ্দীন, অন্যজনের নাম উল্লেখ নেই ইতিহাসে।

তক্ষুনি ঘোড়া প্রস্তুত করে দুই ছেলেকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন সুলতান। তাদের বেরোবার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে বিদ্রোহী খাওয়ারিজমি ও খাতাই সিপাহিরা এসে হামলে পড়ল তার তাঁবুর ভেতর। খানিক সময়ের ব্যবধানে বড় বাঁচা বেঁচে গেলেন খাওয়ারিজম শাহ। আরেকটু বিলম্ব হলেই হয়তো অপ্রীতিকর কিছু ঘটে যেত সেদিন। বিদ্রোহীরা তাঁবুতে কাউকে না-পেয়ে সবকিছু লুটপাট করে নিয়ে চলে গেল।

এই ঘটনা থেকে আন্দাজ করা যায়, খাওয়ারিজম শাহের পতন দেখার জন্য কী-রকম জঘন্য কর্মকাণ্ড শুরু করেছিলেন খলিফা নাসির। সে-সময়কার মুসলিমবিশ্বের অনৈক্য ও বিভেদের এটাই হচ্ছে সুস্পষ্ট প্রমাণ। খলিফার এইসব উৎপাতে শেষমেশ খাওয়ারিজম শাহ সিদ্ধান্ত নিয়ে বসলেন, তার এ নিকৃষ্ট দুশমনকে তিনি পৃথিবী থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন।

খাওয়ারিজম শাহের খলিফা নাসিরের খেলাফত অস্বীকার

সুলতান আলাউদ্দীন বাগদাদ আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। তবে, এর আগে তিনি ভাবলেন—সাধারণ প্রজাদের মন-মগজ আগে ঠিক করে নিতে হবে। বর্তমানে লোকজন যদিও জানে, খেলাফতে আব্বাসিয়ার অজস্র দুর্বলতা রয়েছে; তবু তারা খেলাফতের প্রতি একটা টান কিংবা সম্মান পোষণ করে ভেতরে-ভেতরে। খাওয়ারিজমের মুসলমানরা বাগদাদের বিরুদ্ধে কিছু করার পক্ষে না। তাদের নিকট খেলাফত একটি পবিত্র বিষয়, যা সর্বদা শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য।

শাহ কোনোভাবেই তাদের বোঝাতে পারছিলেন না। বাধ্য হয়ে তিনি সারা রাজ্যে প্রচার করিয়ে দিলেন—মূলত বনু আব্বাসের তুলনায় হুসাইন ইবনে আলির সন্তানেরা খেলাফতের অধিক হকদার। বনু আব্বাসের খেলাফত গ্রহণের কোনো অধিকারই নেই।

আতা মালিক জুয়াইনি বর্ণনা করেন—এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সুলতান আলাউদ্দীন যথারীতি রাষ্ট্রীয় একটি ফতোয়াই লিখিয়ে ফেলেছিলেন। ফতোয়াটি ছিল এমন—'বনু আব্বাসের খলিফারা রবের পথে জিহাদ করা থেকে বিরত থাকছে। কাফেরদের হাত থেকে ইসলামি সাম্রাজ্যের সীমান্ত রক্ষার ব্যাপারে চরম উদাসীন। তারা অমুসলিমদের ভেতর ইসলামের দাওয়াত প্রচার করে না। ইসলামের শ্রেষ্ঠ রোকনগুলো তারা পরিত্যাগ করেছে। এই অবস্থায় শরিয়তের কী হুকুম দাঁড়াতে পারে?'

উত্তরে লেখা হয়েছিল—খলিফা যদি এমন কোনো বাদশাহকে হত্যা করতে চান, যিনি আল্লাহর পথে জিহাদ করছেন, ইসলামের সাহায্য করছেন, এমনকি পুরো জীবন কাটিয়ে দিচ্ছেন যুদ্ধের ময়দানে, তা হলে সে বাদশাহর অধিকার রয়েছে খলিফাকে বরখাস্ত করে দেওয়ার, এবং তার স্থলে অন্য কাউকে নিযুক্ত করার।

খাওয়ারিজম শাহের এরূপ কর্মকাণ্ডের আরেকটি কারণ ছিল—তিনি মনে করতেন, খেলাফত হুসাইনি সরদারদের অধিকার, বনু আব্বাস তা ছিনিয়ে নিয়েছে।

খাওয়ারিজম শাহের যুদ্ধযাত্রা

রাষ্ট্রীয় ফতোয়া শুনে জনসাধারণের অবস্থা বদলে গেল। ফতোয়ার বিষয়টা দৃঢ়ভাবে গেঁথে গেল তাদের মাথায়। তখন ৬১৪ হিজরি (১২১৭ খ্রিষ্টাব্দ)। আলাউদ্দীন খাওয়ারিজম শাহ সাইয়েদ আলাউল মুলক আত-তিরমিজির জন্য খেলাফত-পদের ঘোষণা করে বসলেন। আলাউল মুলক ছিলেন সে-সময়কার হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর বংশলতিকার অন্যতম বুজুর্গ। খেলাফত ঘোষণার পর থেকে জুমার খুতবায় খলিফা নাসিরের পরিবর্তে সাইয়েদ আলাউল মুলকের নাম উচ্চারিত হতে আরম্ভ করল। খাওয়ারিজম শাহের পক্ষে আমজনতাকে বোঝানো সহজ হয়ে গেল যে, খলিফা নাসির খেলাফতি মসনদের ওয়ারিস নয়; গাসিব (ছিনতাইকারী)। শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে সৈন্যদল নিয়ে এখন তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতরণ করা জায়েজ; বরং তা জরুরি হয়ে গেছে।[৭৪] খাওয়ারিজমি বাহিনীকে যুদ্ধযাত্রার আদেশ দিয়ে দিলেন সুলতান আলাউদ্দীন। ৩ লক্ষ সৈনিক নিয়ে মহাপ্লাবনের মতো ধেয়ে যেতে লাগলেন তিনি বাগদাদের দিকে। তার এই অগ্রযাত্রার সংবাদ পেয়ে খলিফা নাসিরের সর্বাঙ্গে ভয়ানক কাঁপুনি ধরে গেল।[৭৫]

তুষার ঝড়ের কবলে

খাওয়ারিজমি বাহিনী ইতোমধ্যে হামাদান পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। কিছুক্ষণ বিশ্রামের জন্য খাওয়ারিজম শাহ সেখানে যাত্রাবিরতি দিলেন। অসংখ্য অস্থায়ী তাঁবুতে মুহূর্তে ছেয়ে গেল শহরের আশপাশের সব উপত্যকা। এত বিশাল বাহিনী দেখে হামাদানের অধিবাসীরা পুরোপুরি বিমূঢ় হয়ে গেল। তারা ধারণা করছিল, 'যুদ্ধ বেধে উঠলে নিশ্চিত বাগদাদের পতন ঘটবে। তবে স্পষ্টত বোঝা যাচ্ছে—উভয় দিকেরই তাতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হবে। অজস্র নিরপরাধ মানুষ মারা পড়বে পাশাপাশি। এ হবে মুসলিম উম্মাহর জন্য এক ভয়ানক বিপর্যয়।'

অবশ্য আকাশের সিদ্ধান্ত ছিল ভিন্ন কিছু। খাওয়ারিজম শাহের ক্রোধ খুব বেড়ে গিয়েছিল। তার ভেতর ধিকধিক করে জ্বলছিল আগুন। সৈনিকদের প্রথম সারিতে যারা ছিল, তাদের তিনি প্রচণ্ড আক্রমণের নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু কী

---

[৭৪] জাহাঁকুশা ২/১২১

[৭৫] রওজাতুস সফা ৪/৮২২; নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৬০

আশ্চর্য, চারপাশের সমস্ত আবহাওয়া নিমেষে বদলে গেল। আকাশ হয়ে উঠল ঘনঘোর কালো। মরুর বালু উড়িয়ে পাক দিয়ে ছুটতে লাগল এলোমেলো বাতাস। প্রথম সারির ১৫ হাজার সৈনিক হামাদান থেকে আসাদাবাদের কাছাকাছি চলে গেল। সেখানে হালওয়ান নামক স্থানে পৌঁছে তারা তাঁবু খাটাল।

আচমকা গড়গড় করে মেঘ ডেকে শুরু হল প্রচণ্ড ঝড়-তুফান। সঙ্গে ভয়ানক তুষারপাত। তার উপর তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত্রি। মাঝেমধ্যে আকাশের এ-মাথা থেকে ও-মাথা বিদীর্ণ করে বিজলি চমকাচ্ছে। এই বিজলির আলোয় একমুহূর্তের জন্য চোখের সামনে পুরো পৃথিবী আলোকিত হয়ে উঠছে। যেন-বা আজ রাত্তিরেই ঘটে যাবে জগতের নির্ধারিত প্রলয়কাণ্ড। ভয়ানক কষ্টে কাটল সেই রাতটা। ভোরবেলা উঠে দেখা গেল—চারপাশে বরফের বড় বড় স্তূপ জমে গেছে। সমস্ত রসদ অকেজো হয়ে গেছে। ঘোড়া, মহিষ সব বরফের নিচে নিষ্প্রাণ চাপা পড়ে আছে। অসংখ্য সিপাহিও দাফন হয়ে গেছে বরফের তলায়। যারা এখনও জীবিত, তাদের হাত-পা পুরোপুরি অসাড় হয়ে গেছে ঠান্ডায়।

সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার কোনো শক্তিই আর রইল না। তা ছাড়া তুষারপাতের কারণে সমস্ত রাজপথ বন্ধ হয়ে গেছিল। বরফের শুভ্রতায় আশপাশের সবকিছু ঢেকে পড়েছিল। ওদিকে খাওয়ারিজম শাহ আটকে আছেন হামাদানে। যখন তুষারঝড় বন্ধ হল, বরফ গলে গলে ধীরে-ধীরে খুলে যেতে লাগল রাস্তা, শাহ তখন উলটোপথে নিজ সাম্রাজ্য আরগেঞ্চের পানে ছুটলেন।[৭৬]

তুষারপাত ছাড়াও শাহের সেদিনকার এই প্রত্যাবর্তনের অন্য একটি কারণও ছিল। বলা হয়ে থাকে—এই অভিযানে বেরোনোর কালে তিনি নাকি ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়েছিলেন। ফলে নিজ আকিদামতো ভেবে বসলেন, 'এই যুদ্ধযাত্রায় হয়তো অশুভ কিছু আছে।'[৭৭] তাই আর সামনে বাড়েননি তিনি। ইতিহাসে এমন বর্ণনাও পাওয়া যায়—আরগেঞ্চ থেকে শায়েখ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দি ফিরে যাবার সময় খাওয়ারিজম শাহের জন্য বদদোয়া করে গিয়েছিলেন। একারণে তার উপর সেদিন আজাব নেমে এসেছিল।[৭৮] কিন্তু গ্রহণযোগ্য কোনো গ্রন্থে এমনটি খুঁজে পাওয়া যায়নি।

এবার অবশ্য খাওয়ারিজম শাহ বাগদাদে আক্রমণ করতে পারেননি। তবু অদম্য ইচ্ছেটা তার রয়ে গেল। ভাবলেন—আগামী বছর নতুন শক্তিতে এসে হামলা করবেন। কিছুদিনের জন্য আপাতত স্থগিত রাখা যাক।

---

[৭৬] ইবনুল আসির ৭/৫৪৪; সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৬৪

[৭৭] তারিখে ইসলাম লিয-যাহাবি ৬২/৬১৪

[৭৮] তারিখে ইসলাম আকবর শাহ নজিবাবাদী খণ্ড ৩

বিরল কাণ্ড

খাওয়ারিজম শাহের দরবারের সঙ্গে সম্পৃক্ত একজন দক্ষ আলেম ছিলেন। নাম আল্লামা সিরাজুদ্দীন সাক্কাকি আল-খাওয়ারিজমি। সকল শাস্ত্রেই সমান পারদর্শী ছিলেন তিনি।[৭৯] লোকদের তাবিজ ও ঝাড়ফুঁক প্রদান করে আয়-রোজগার করতেন। এ ব্যাপারে খাওয়ারিজম শাহকে সহায়তা করতেও প্রস্তুত থাকতেন সবসময়। তিনি একটি পুতুল বানিয়ে শাহকে বললেন—এই পুতুল যদি বাগদাদের জমিনে পুঁতে দেওয়া যায়, এর প্রভাবে অতি দ্রুত খলিফার ভাগ্য-তারকা ভিন্নদিকে গড়াবে।

খাওয়ারিজম শাহ জ্যোতিষশাস্ত্রে প্রবল বিশ্বাস রাখতেন। খলিফাকে ঘায়েল করা যায়—এমন সব রকমের কাজই করে উঠতে প্রস্তুত ছিলেন তিনি। প্রথমবার ব্যর্থ হয়ে তখন ভেতরে-ভেতরে তিনি নিদারুণ ক্ষুব্ধ। কাজি মুজিরুদ্দীনকে অনুরোধ করে বললেন—আপনি বাগদাদ যান। লুকিয়ে কোনোভাবে এই পুতুলটা পুঁতে আসুন। ভালো কিছু হবে আশা করছি। দূত হিসেবে কাজি সাহেব গেলেন বাগদাদে। বাগদাদের সীমানায় প্রবেশ করে ভয়-ভয় দৃষ্টিতে ইতিউতি কতক্ষণ তাকালেন। আচমকা ক্ষিপ্র হাতে পুতুলটি পুঁতে ফেললেন বালির ভেতর। তারপর, যেন কিছুই হয়নি, এমন একটা ভঙ্গি নিয়ে সেখান থেকে খাওয়ারিজমে ফিরে এলেন। শাহ ভাবেন—এখন শুধু অপেক্ষা। দেখবেন, দৈবাৎ কেমন করে খলিফার উপর নেমে আসে বিপর্যয়।[৮০] কিন্তু, তার নিজের মাথার উপরেই যে তখন চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছিল বিপদ, সেটা কি তিনি জানতেন? সেই বিপদের সমস্ত কার্যকারণ কিংবা প্রেক্ষাপট ইতোমধ্যে প্রকাশ পেয়ে গিয়েছিল। তাতার নামক হিংস্র নরপশুদের হাতে পুরো উম্মাহর উপর কেয়ামতের আগেই কেয়ামত নেমে আসার সময়টা ছিল অত্যাসন্ন।

বঞ্চনা

তখনকার স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম ছিল—বাদশাহর বড় পুত্রই হবেন বাদশাহর স্থলাভিষিক্ত। এই প্রচলিত রীতির প্রতি ভ্রুক্ষেপ না-করেও বলে দেওয়া যায়, নিজের যোগ্যতা-বলে শাহজাদা জালালুদ্দীনই ছিলেন পিতার সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরসূরি। কিন্তু দাদি তুর্কান খাতুন হিন্দুস্থানি বংশোদ্ভূত জালালুদ্দীনের মাকে দেখতে পারতেন না। খুব অপছন্দ করতেন। তুর্কান খাতুনের ঘনিষ্ঠতা ছিল তার স্বগোত্রীয় এক পুত্রবধূর সাথে, যে পুত্রবধূ ছিল কিপচাক বিয়ারুত গোত্রের। দাদি চাচ্ছিলেন এই বৌয়ের ছেলে কুতুবুদ্দীন আযলাকই হোক রাজ্যের স্থলাভিষিক্ত। এ ব্যাপারে তিনি পুত্র আলাউদ্দীন খাওয়ারিজম শাহকে বাধ্যও করে ফেললেন। খাওয়ারিজম শাহ ফেলতে পারলেন না মায়ের কথা। তিনি বরং ভয় পাচ্ছিলেন—যদি না-মানেন, তা হলে কিপচাক গোত্রগুলো তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসতে পারে। এরা হচ্ছে খাওয়ারিজমি বাহিনীর একটা বড় শক্তি।

---

[৭৯] মুখতাসারুল মাআনির মূলপাঠ তালখিসুল মিফতাহর উৎস মিফতাহুল উলুম তারই রচিত।
[৮০] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ২৫৩; তারিখে খাওয়ারিজম শাহি ১৭৮

রাজ্যে জালালুদ্দীনের পরিবর্তে কুতুবুদ্দীন আযলাকের স্থলাভিষিক্ততার কথা ঘোষণা করে দেওয়া হল। ঘোষণাটি খাওয়ারিজম শাহ বাগদাদ অভিযান থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসার পর দিয়েছিলেন। সে-সময়কার ইতিহাসে এমন অনেক ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়, ক্ষমতা-বণ্টনে যখন কোনো এক দিকে স্বজনপ্রীতি বা বাড়াবাড়ি করা হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহে ফেটে পড়েছে বঞ্চিত দল। মেনে নেয়নি সেই বণ্টন। অথচ এখানে প্রকৃত যোগ্য শাহজাদা জালালুদ্দীনকে বাদ দিয়ে অযোগ্য কুতুবুদ্দীনকে ক্ষমতাপ্রদানের মাঝে স্পষ্ট অতিরঞ্জন ঘটেছে।

এই আচরণ যদি অন্য কারুর সঙ্গে করা হতো, এবং সে হতো শাহজাদা জালালুদ্দীনের মতোই ব্যাপক জনপ্রিয়, নিজ অধিকার ফিরে পেতে নিশ্চয় নেমে আসত মাঠে, পিছপা হতো না এক কদম। কিন্তু মহান সৃষ্টিকর্তা জালালুদ্দীনের জন্মমাটিই অন্য কোনো মূল্যবান স্থান থেকে নিয়েছিলেন। এই ঘোষণা জালাল এতটাই ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে শুনলেন, যেন কিছুই হয়নি। তার নিকট বড়দের, ভাইদের ও আত্মীয়দের চেয়ে সিংহাসনের মূল্য বেশি ছিল না। সেই নাজুক মুহূর্তে নীরবতা অবলম্বন করে মুসলিমদেরকে তিনি অভ্যন্তরীণ কোন্দল থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন।

নিছক ক্ষমতার জন্য উন্মাহর রক্তপাত ঘটানোর মতো জঘন্য কাজ তার পক্ষে করে-ওঠা ছিল অসম্ভব। তিনি বরং, পিতা-দাদি যেন তাকে অভ্যন্তরীণ শত্রু ভেবে না-বসেন, আগ বাড়িয়ে তাদের দ্বিগুণ আনুগত্য দেখাতে লাগলেন।[৮১] কুতুবুদ্দীনের মা (জালালুদ্দীনের সৎমা) ও দাদি তুর্কান খাতুনের সাথেও সদা স্মিতহাস্যে কথা বলতেন। বড় মধুর আচরণ করতেন। তবু তার প্রতি তুর্কান খাতুনের নাক সিঁটকানো মনোভাব এতটুকু কমেনি।

সাম্রাজ্যের ভাগ-বাটোয়ারা

খাওয়ারিজম শাহ পুত্র কুতুবুদ্দীনকে স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে তার হাতে রাজধানী আরগেঞ্চসহ মা-ওয়ারাউন-নাহার ও খোরাসান সাম্রাজ্যের ভার হস্তান্তর করলেন। শাহজাদা জালালুদ্দীনকে দিলেন বামিয়ান, গজনি, গৌড়, পেশোয়ার ও হিন্দুস্থানের সঙ্গে লাগোয়া এলাকাগুলোর কর্তৃত্ব। বেলুচিস্তান, মাকরান ও কিরমান (বেশিরভাগ বর্তমান ইরান এলাকা) শাহজাদা গিয়াসুদ্দীনকে বুঝিয়ে দিলেন। ইরাক-সংলগ্ন ইরানের পার্বত্য অঞ্চলগুলো দিলেন শাহজাদা রোকনুদ্দীনকে। এই ক্ষমতা-বণ্টনের পর সাম্রাজ্যের কিছু কাজ আঞ্জাম দিতে শাহজাদা জালালুদ্দীনকে খাওয়ারিজম শাহ নিজের কাছে রেখে দিলেন।[৮২]

---

[৮১] তারিখে গুযিদাহ ৫০০; তারিখে খাওয়ারিজম শাহি ১৭৯

[৮২] ইবনে খালদুন ৫/১০৮

আক্রমণের দ্বিতীয় কারণ

চেঙ্গিজ খান এশিয়ার বিপুল-বিস্তৃত অঞ্চল দখল করে ফেলায় সেই গৃহযুদ্ধ থেমে গিয়েছিল, দীর্ঘকাল ধরে দক্ষিণ এশিয়াকে যা ভীষণভাবে ব্যস্ত করে রেখেছিল। অন্য দিকে মধ্য-এশিয়ার ছোট-বড় সব এলাকা খাওয়ারিজমি বিজেতা সুলতান আলাউদ্দীনের কবজায় চলে এল। খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলগুলো তাতার সাম্রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। দুই রাজ্যের মাঝখানে ছিল এক বিশাল পাহাড়সারির ব্যবধান। সেই পাহাড়সারি পর্যন্ত পৌঁছে দু-দিকের দুই বিজেতার অগ্রযাত্রাই থেমে গিয়েছিল। এবং কয়েক বছর ধরে এশিয়ার এই এলাকা (যার উপর দিয়ে সবসময় উড়ে যেত যুদ্ধের কালো ছায়া) পুরোপুরি নীরব হয়ে পড়ে রইল। ঝড় আসার কিছুক্ষণ পূর্বে মাঠ-ঘাট যেমন স্তব্ধ হয়ে পড়ে ভয়াবহভাবে, খানিকটা সেই রকম বলা যায়। তবে আশ্চর্য স্তব্ধতার পর এক ভয়াবহ যুদ্ধের সংকেতও দেখা যাচ্ছিল।

কারাকোরামের নিস্তব্ধ মরু অঞ্চলে বৃদ্ধ যোদ্ধা চেঙ্গিজ খান গভীর নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ভাবছিলেন—কতদিন তিনি যুদ্ধে যান না! হাত-পা কেমন বিবশ হয়ে গেছে। রক্তের রঙিন উৎসব না দেখলে এখন মেজাজ ঠিক হবে না।

একদিন পুরোনো বন্ধু বাগোরচি নৈয়ানকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা, সবচেয়ে আনন্দদায়ক বস্তু কী, বলো তো দোস্ত!

বন্ধু জবাব দিল—উদ্দাম ঘোড়ার পিঠে ছুটে বেড়ানো। তোমার হাতে থাকবে তির। প্রবলভাবে দুলতে দুলতে তুমি শিকারের পেছন-পেছন ছুটে চলবে।

চেঙ্গিজ খান ঘাড় নাড়িয়ে বললেন—না না। ঠিক বলোনি। বরং দুশমনকে পায়ের নিচে পিষে ফেলাই হচ্ছে আমার কাছে সবচেয়ে আনন্দের। পদপিষ্ট করে তাদের সমস্ত সম্পত্তি ছিনিয়ে নেওয়া, বিজিত অঞ্চলের অবলা রমণীদের কপোল বেয়ে অশ্রুধারা বয়ে যেতে দেখা পরম আনন্দের।

কী নিষ্ঠুর হিংস্রতা! মানবতার চিরশত্রু এ নরপশুর নৃশংসতা তার বলা এই শব্দগুলো থেকে এতটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তার হিংস্রতা কোন পর্যায়ের ছিল—সে আলাপ তুলবার আর প্রয়োজন পড়ে না।[৮৩] চীনে এত বড় হত্যাযজ্ঞ চালাবার পরও চেঙ্গিজ খানের রক্তনেশা কাটেনি। তিনি রক্তের নতুন আরও স্রোত দেখতে চাচ্ছিলেন। তার এই রক্তোন্মাদনা বাস্তবায়নের জন্য পড়ে ছিল পশ্চিমের ওই বিশাল-বিস্তৃত অঞ্চল, যা মুসলিমবিশ্বের অনেক সাম্রাজ্যের সাথে জড়িত ছিল। কিন্তু তার সবচেয়ে বড় বাধা ছিল খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য। ওখানকার সৈন্য-শক্তি ছিল বড়ই কঠিন। একসময় ওখানকার শক্তিশালী শাসকরা বিজয়ের উৎসবে পুরো বিশ্বকে চমকে দিয়েছিল। এজন্য চেঙ্গিজ খান তাড়াহুড়ো না করে ঠান্ডা মাথায় সামনে এগোতে চাইলেন। গভীর চিন্তাভাবনার পর, খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের জন্য খাওয়ারিজম শাহের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিলেন।

---

[৮৩] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১১, পৃষ্ঠা ৯০

তৃতীয় কারণ : চুক্তিনামা

বাগদাদের যুদ্ধযাত্রা থেকে ফিরে সুলতান আলাউদ্দীন সমরকন্দে অবস্থান করছিলেন। সমরকন্দে তার শাহি দরবারে চেঙ্গিজ খানের একটি প্রতিনিধিদল এসে হাজির হল। এটি ৬১৫ হিজরির ঘটনা (১২১৮ খ্রিষ্টাব্দ)।[৮৪] প্রতিনিধিরা খাওয়ারিজম শাহকে বলল—খানে আজম আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। তিনি পয়গাম পাঠিয়েছেন—আমি তোমাদের শক্তি, তোমাদের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও বিজয়ের অব্যাহত ধারা জানতে পেরেছি। তোমাদের সাথে সন্ধি স্থাপনের প্রয়োজন বোধ করছি আমি। আমার সন্তানের মতো প্রিয় মনে করি তোমাদের। তোমরাও হয়তো জেনে থাকবে, আমি চীন সাম্রাজ্য আয়ত্ত করেছি। কিছু তুর্কি গোত্র আমার অনুসারী। তোমরা নিশ্চিত জানো—আমার এলাকা সেনাশিবির হওয়ার পাশাপাশি চমৎকার রুপোলি ও মায়াবী অঞ্চল। আমার বিজয়ের আর বেশি চাহিদা নেই। আমি মনে করি, চুক্তিতে আমাদের পরস্পরের কল্যাণ নিহিত আছে। চলো, আমরা বাণিজ্য-সম্পর্ক গড়ে তুলি।[৮৫]

খাওয়ারিজম শাহ খুব মনোযোগ দিয়ে পত্রপাঠ শুনছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে তাকালে মনে হবে এই চিঠিতে আপত্তি তোলার মতো কোনো কথাই নেই। কিন্তু বাদশাহদের কথার সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচ তো বাদশাহরাই বুঝে থাকেন। চিঠিতে খাওয়ারিজম শাহকে ছেলে বলে সম্বোধন করা হয়েছে মানসিকভাবে তাকে হীনম্মন্য ও অধীনস্থ করে ফেলার জন্য। এশিয়ার সুলতানরা তখন অধীনস্থ হাকিমদের 'ব্যাটা' বলে সম্বোধন করতেন। চিঠিতে তুর্কি বাহিনীকে পরাজিত করার বীরত্বও একচোট বলে দেওয়া হয়েছে। কারণ, চেঙ্গিজ খান জানতেন, খাওয়ারিজম শাহ নিজেও একজন তুর্কি বংশোদ্ভূত।[৮৬] খুবই সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচ।খাওয়ারিজম শাহ ইঙ্গিতগুলো খুব ভালোভাবে ধরতে পেরেছিলেন। তবু যথাসম্ভব সহনশীলতার পরিচয় দিলেন তিনি। বার্তাবাহক তার সামনে চেঙ্গিজ খানের পক্ষ থেকে পাঠানো মূল্যবান তোহফা পেশ করল। তা ছিল—মৃগনাভি, মেশকে আম্বর, রেশমি কাপড়, সাদা উটের চামড়া দিয়ে বানানো কোট ও মূল্যবান মণিমুক্তা।[৮৭]

খাওয়ারিজম শাহ তখনও প্রতিনিধিদলের প্রতিটি কর্মকাণ্ড সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। এদের চঞ্চলতা ও সাহসিকতা দেখে বড় অবাক হচ্ছিলেন তিনি। তার বুঝতে বাকি ছিল না যে, গোবি মরুভূমির এই হায়নাগুলো নতুন শিকারের সন্ধানে ব্যস্ত!

চিঠির জবাব দেওয়ার আগে খাওয়ারিজম শাহ প্রাথমিকভাবে কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলা জরুরি মনে করলেন। প্রতিনিধিদের ভেতর মুসলমানও ছিল কয়েকজন। চেঙ্গিজ খান বাণিজ্য-কাফেলা ও প্রতিনিধিদলের মধ্যে নিজ দেশের অথবা ভিনদেশের

---

[৮৪] ইবনে খালদুন ৫/১০৯; সিয়ারু আলামিন নুবালা ২২/২৩৩

[৮৫] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৮৩; নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৬০

[৮৬] ইবনে খালদুন ৫/১০৯

[৮৭] ইবনে খালদুন ৫/১০৯, নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৬০

মুসলিমদেরও সুযোগমতো ব্যবহার করতেন। এই প্রতিনিধিদলের মুসলমানরা—কঙ্কা আতরারি, আলি খাজা বোখারি ও মাহমুদ এলোয়াজ খাওয়ারিজমি—ছিল স্বয়ং খাওয়ারিজমের বাসিন্দা। কোনো কারণে এরা কারাকোরাম গিয়েছিল। তারপর চেঙ্গিজ খানের সহযোগী হিসেবে তার প্রতিনিধিদলে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্মানলাভে সফল হল।[৮৮] মাহমুদ এলোয়াজ খাওয়ারিজমিকে একটু বেশিই চালাক মনে হচ্ছিল।

খাওয়ারিজম শাহ বাকিদের মেহমানখানায় বসিয়ে রেখে রাতেরবেলা মাহমুদকে নির্জনে নিয়ে গেলেন। তার মনে তখন জন্ম নিয়েছে সংশয়। তা বিদূরিত করতে মাহমুদের কাছ থেকে কিছু তথ্যটথ্য জানতে চাচ্ছিলেন। খাওয়ারিজম শাহের ধারণা জন্মেছিল—মাহমুদ খাওয়ারিজমের মানুষ বলে সে আমার কল্যাণকামীই হবে সবসময় এবং সত্য-সত্য বলে দেবে সবকিছু।

আফসোস, বাস্তবতা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। মাহমুদ এলোয়াজ ছিল আপাদমস্তক একজন মতলববাজ। চেঙ্গিজীয় চক্রান্তের ফাঁদে ফেঁসে গিয়েছিল সে। শাহ মূল্যবান মণিমুক্তা উপহার দিয়ে তার থেকে প্রতিশ্রুতি নিলেন—গোয়েন্দা হিসেবে সে যেন চেঙ্গিজ খানের সব তথ্য তাকে বলে দেয়। শাহ গম্ভীর গলায় বললেন—তুমি আমাদের লোক। আমাকে সত্য-সত্য সব বলো। চেঙ্গিজ খান কি সত্যিই চীন জয় করে ফেলেছে?

মাহমুদ বলল, জি হ্যাঁ। এটা সত্য। এমন খবর গোপন থাকার কথা না। সবাই জানে।

শাহ ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি আমার সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও আমার বাহিনীর সংখ্যাধিক্য সম্পর্কে জানো। তা হলে এ আবার কোন অভিশপ্ত যে, তা সত্ত্বেও আমাকে ব্যাটা বলে সম্বোধন করছে? তার সৈন্যসংখ্যা কত? তারা কি আমার সৈনিকদের মতোই সংখ্যায় অনেক?

শাহের চেহারায় ফুটে-ওঠা ক্রোধের আঁকিবুকি ধরে ফেলল মাহমুদ এলোয়াজ। তাই সত্যটা এড়িয়ে চালাকি করে সে জবাব দিল—শুনুন, আপনার বাহিনী আর তার বাহিনীর মাঝে তুলনা কীসের? মনে রাখবেন, তাদের ও আপনাদের উপমা হচ্ছে—বিশাল বাহিনীর মোকাবেলায় নিছক একজন ঘোড়সওয়ার কিংবা সূর্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ একটি বাতি। অথবা এটাও বলা যায় যে, অন্ধকারের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় একটুখানি ধোঁয়া।

খাওয়ারিজম শাহ তাকে চেঙ্গিজ খানের সাম্রাজ্যের সীমানা, সেখানকার মানুষের জীবনপদ্ধতি এবং অন্যান্য ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন করলেন। কিন্তু মাহমুদ এলোয়াজ তাকে সম্পূর্ণ ভুল বোঝাল। বলল, চেঙ্গিজ খানের রাজ্য কোনো দিক থেকেই খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের সমান হবে না।

খাওয়ারিজম শাহ তখন বললেন, তা হলে তুমি বলো, এখন কী করা যায়?

'আমি আর কী বলব! তবে আমার মত হল, আপনি চুক্তি করে ফেলুন।'

---

[৮৮] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৮৩; তারিখে খাওয়ারিজম শাহি ৯৬

খাওয়ারিজম শাহ ভাবলেন—পড়শি রাজ্যের এই লোকগুলো সংস্কৃতিবিহীন হওয়ার কারণে কিছুটা অহংকারী এবং উগ্র হতে পারে বটে; তবে তেমন ক্ষতিকর নয়। এদের থেকে বাণিজ্যিক ফায়দা হাসিল করাই যায়। কোনো সমস্যাটমস্যা হবার কথা নয়।

তিনি চুক্তি স্থাপনে সম্মতি জানালেন। ফিরতি চিঠির সঙ্গে মূল্যবান হাদিয়া-তোহফাও পাঠিয়ে দিলেন কারাকোরামে। যাবার সময় মাহমুদকে গোপনে বললেন—ওখানে গিয়ে আমার জন্য গোয়েন্দাগিরি করবে। সব তথ্য আমাকে জানাবে।[৮৯]

'অবশ্যই জানাব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

মাহমুদ এলোয়াজের প্রতি আস্থা রেখে খাওয়ারিজম শাহ বিরাট ভুল করে ফেললেন। লোকটা ছিল ভীষণ ধোঁকাবাজ। তার ভুল তথ্যপ্রদানের কারণে প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে কমজোর মনে করে বসলেন খাওয়ারিজম শাহ। এই একটি ভুলের কারণে পরবর্তীকালে তাকে অনেক মাশুল দিতে হয়েছে। বহিঃসাম্রাজ্যে নিয়োজিত তার কূটনীতিক দলটি ছিল অবিশ্বস্ত। তারপর যখন দুশমনের কবলে পড়ে গেলেন, তখনো শাহের সমস্ত পরিকল্পনা ছিল অসম্পূর্ণ। গুছিয়ে সঠিক কোনো সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করতে পারেননি।

ভালোভাবে খতিয়ে দেখলে মনে হবে—এই কাজটা ছিল খাওয়ারিজম শাহের অদূরদর্শিতা ও অজ্ঞতার প্রমাণ। একজন মাত্র লোকের কথায় বিশ্বাস করে কীভাবে তিনি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ব্যাপারে এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন? খাওয়ারিজম শাহের জন্য জরুরি ছিল—পামির মালভূমিতে উত্থিত এই নতুন শক্তির ব্যাপারে পুরোপুরি তথ্য নেওয়া। সঠিক নিয়মে ওখানে গুপ্তচর নিয়োগ করা। চেঙ্গিজ খানের শক্তি ও সংকল্প সম্পর্কে অবগত হওয়া। চেঙ্গিজ খানের চীন-বিজয় কোনো সাধারণ কথা ছিল না। বহু আগেই এই ভয়ংকর প্রতিবেশীর ব্যাপারে জানা তার জন্য অপরিহার্য ছিল। আশ্চর্য, তিনি সভ্য রাজ্যের একজন বাদশাহ হয়েও গোবি মরুভূমির জংলিদের সমান রাজনীতিও করতে পারলেন না! অথচ একসময় এই তিনিই সফল গুপ্তচরবৃত্তি চালিয়ে বিজয়ের পর বিজয় অর্জন করেছিলেন।

চেঙ্গিজ খানের দোদুল্যমানতা

খাওয়ারিজম শাহের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কারাকোরামে এসে পৌঁছল কাফেলা। এই কাফেলার ভেতর একজন বুজুর্গ লোক ছিলেন। তার নাম ছিল সাইয়েদ বাহাউদ্দীন রাজি। তাবাকাতে নাসিরি গ্রন্থের লেখক এই ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেন—যখন আমরা চেঙ্গিজ খানের কাছে গেলাম, তিনি তার মন্ত্রী, পুত্র ও ভাতিজাদের উপস্থিতিতে আমাদের ডাকলেন। তাদের দিকে ফিরে আস্ফালন করে

---

[৮৯] রওজাতুস সফা ৫/২৪; শাযারাতুয যাহাব ৫/৬১; সিয়ারু আলামিন নুবালা ২২/২৩৩

বলতে লাগলেন, দেখেছ আমার বড়ত্ব, রাজত্ব ও বাদশাহি কোন পর্যন্ত পৌঁছে গেছে? পশ্চিম দেশের বাদশাহ আমার কাছে বার্তাবাহক পাঠিয়েছে!

যখন আমরা ফিরে আসতে লাগলাম তখন বললেন—শোনো, উভয় দিক থেকে বার্তাবাহক ও বাণিজ্য-কাফেলার আসা-যাওয়া অব্যাহত থাকুক। দামি দামি অস্ত্র, কাপড় ও পাত্র নিয়ে কাফেলা এভাবেই যাওয়া-আসা করতে থাকুক।[৯০]

এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায়—এই বাণিজ্য-চুক্তিতে চেঙ্গিজ খান সীমাহীন খুশি হয়েছিলেন। খাওয়ারিজম ও কারাকোরামের মধ্যকার চুক্তি স্থাপনের পর নিয়মিত যাওয়া-আসা করতে লাগল বাণিজ্য-কাফেলা। সেই সঙ্গে তাতাররা ব্যবসায়ীদের সাথে বণিকবেশে গিয়ে চালিয়ে যেতে লাগল তাদের গোয়েন্দাবৃত্তি। অবলোকন করতে লাগল খাওয়ারিজমের সবকিছু। খাওয়ারিজমের সীমানা পেরিয়ে পার্শ্ববর্তী অন্যান্য অঞ্চলেও এবার দূত পাঠানো শুরু করে দিলেন চেঙ্গিজ খান।

ব্যবসাসূত্রে চেঙ্গিজ খানের পরিচিতি দূরদূরান্তের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ছিল। চেঙ্গিজ খান খাওয়ারিজমি সৈন্যদের প্রকৃত শক্তি অনুধাবন করে উঠতে পেরেছিলেন ঠিকই; কিন্তু তাদের উপর আক্রমণের ব্যাপারে তখনও দোদুল্যমান তিনি। কারণ, খাওয়ারিজমের ৩ লক্ষ সৈন্য সব ধরনের আক্রমণের মুখে শত্রুকে দাঁতভাঙা জবাব দেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে আছে, বোঝা যাচ্ছিল। তাদের উপর আক্রমণের কথা ভাবতে গিয়ে চেঙ্গিজ খানের চোখের সামনে ভেসে উঠছিল যুদ্ধের একটা ভয়াবহ চিত্র। তার আশঙ্কা হচ্ছিল—খাওয়ারিজমিরা তাকে পরাজিত করে চিরতরে নিশ্চিহ্নও করে ফেলতে পারে। তার মনে সবচেয়ে বড় সংশয়টা ছিল—এখন খাওয়ারিজমে আক্রমণ করে বসা মানে পুরো মুসলিমবিশ্বের সীমান্তে গিয়ে হামলে পড়া। খাওয়ারিজম, হিন্দুস্থান, বাগদাদ ও সিরিয়ার মুসলমানরা একই গোত্রের। ফলে, সবাই যদি একই পতাকাতলে এসে তাতারদের মোকাবেলায় নেমে পড়ে, আমাদের সিপাহিদের কাউকেই তারা জীবন্ত রাখবে না।

চতুর্থ কারণ : খলিফা নাসিরের ষড়যন্ত্র

খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যে আক্রমণের ব্যাপারে চেঙ্গিজ খান তখনও দোদুল্যমান ছিলেন। অকস্মাৎ তার সমস্ত দোলাচল ভেঙে দিল একটা চিঠি। চেঙ্গিজ খানের দিগন্তজোড়া বিজয়গাথায় প্রভাবিত হয়ে বাগদাদের খলিফা নাসির খাওয়ারিজমিদের বিরুদ্ধে তাকে মিত্র মনে করে বসেছিলেন। তার অনুগত থাকবেন বলে আশ্বাসও দিয়েছিলেন। সময়টা এমনই নাজুক ছিল, উত্তর-পূর্ব থেকে উঠে আসা চেঙ্গিজীয় অগ্নিশিখার আঁচ এসে মুসলিমবিশ্বের পশ্চিমদিকেও লাগছিল আর খাওয়ারিজম ও বাগদাদের মধ্যকার ঐক্যপ্রতিষ্ঠা নিজেদের জীবনের চেয়েও হয়ে উঠেছিল বেশি জরুরি। অথচ খলিফা নাসির চেঙ্গিজ খানকে খাওয়ারিজম আক্রমণের আহ্বান জানালেন। এই আক্রমণে

---

[৯০] তাবাকাতে নাসিরি ১/৩৬৭

তিনি নিশ্চিত সহযোগিতা করবেন বলেও জানিয়ে দিলেন। এটা এমনই এক আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত ছিল—যা পুরো মুসলিমবিশ্বকে রক্তাক্ত করে ছেড়েছিল। বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসবে।

খলিফা নাসিরের পরামর্শসভা

আলাউদ্দীনের ব্যর্থ বাগদাদ আক্রমণের পর থেকে খলিফা নাসির তেলেবেগুনে জ্বলছিলেন সারাক্ষণ। কীভাবে আলাউদ্দীনের শক্তি চুরমার করে স্থায়ীভাবে এই আপদ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়—খুঁজছিলেন সেই সুযোগ। এজন্য উপদেষ্টা ও মন্ত্রীদের কাছে পরামর্শ চাইলেন তিনি।

মন্ত্রীদের কেউ কেউ বলল—জাহাঁপনা, আলাউদ্দীনের শক্তি খর্ব করতে হলে আমাদের শুধু চেঙ্গিজ খানের সাহায্যই দরকার। কারণ চেঙ্গিজ খান ব্যতীত জমিনে এমন কোনো বিজেতা নেই খাওয়ারিজম শাহের বিরুদ্ধে লড়তে পারেন। খাওয়ারিজম শাহের যুদ্ধের উন্মত্ততা ও রাজ্য-জয়ের নেশা একমাত্র চেঙ্গিজ খানই চূর্ণিত করতে পারবেন। তার ফেতনা জ্বালিয়ে দিতে চেঙ্গিজের অগ্নিশিখাই যথেষ্ট।

আমাদের পরামর্শ হল বিষয়টা পুরোপুরি মিটিয়ে ফেলতে মাহমুদের মাধ্যমে চেঙ্গিজ খানের কাছে সাহায্যের আবেদন করুন। মাহমুদ চেঙ্গিজের একজন দরবারি।

এই পরামর্শ খলিফার খুব পছন্দ হল। তিনি আদেশ দিলেন, চেঙ্গিজ খানের নামে মাহমুদ এলোয়াজ মারফত একটি চিঠি লেখা হোক। চিঠিতে চেঙ্গিজ খানের কাছে সাহায্যের আবেদন থাকবে, যেন তিনি বাহিনী-সমেত খাওয়ারিজমে আক্রমণ করতে আসেন। কিছু পরামর্শক তাকে এই কাজে বাধা দিল অবশ্য। বলল—খলিফাতুল মুসলিমিন, এ কাজ করা উচিত হবে না কয়েক কারণে। প্রথমত, যে বার্তাবাহক চিঠি নিয়ে মোঙ্গলিয়া যাবে, তাকে অন্তত চার মাস খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের চারপাশের সীমানা ঘুরে যেতে হবে। তারপর মোঙ্গলিয়া। এটা খুবই কঠিন কাজ। ভয় আছে—তখন যদি খাওয়ারিজমি বাহিনীর হাতে বার্তাবাহক ধরা পড়ে যায়! ফল খুব খারাপ হয়ে যাবে। সুলতান আলাউদ্দীনেরও তাতে বেড়ে যাবে ক্রোধ।

দ্বিতীয়ত, এই তাতার কাফেরদের মুসলিমদের উপর কর্তৃত্ব চালানোর সুযোগ দেওয়া ঠিক হবে না। এটা নিশ্চয় যুক্তি ও শরিয়তবিবর্জিত যে, আমরা তাদের মুসলিমদের রক্তে হোলিখেলার সুযোগ করে দেব। তা ছাড়া এই তাতাররা যখন খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য আয়ত্ত করে ফেলবে, খেলাফতের প্রাণকেন্দ্র বাগদাদের আদব-সম্মানও তখন ভুলে যায় কি না, বড়ই চিন্তার বিষয়! আমাদের সাথেও তো তেমন জঘন্য আচরণ করতে পারে তারা। তা হলে এটা হবে আমাদের জন্য নিশ্চিত লজ্জা ও তিরস্কারের বিষয়।

এই কল্যাণচিন্তাপূর্ণ পরামর্শে খলিফা নাসির একটুও কর্ণপাত করলেন না। দম্ভ-ভরে বললেন—আমাদের উপর আক্রমণ করে এই মুসলিম অঞ্চল কবজা করতে তাতারদের কমপক্ষে ৫০ বছর লাগবে। এর মধ্যে তো ওদের খাওয়ারিজম আক্রমণে

আমাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। আলাউদ্দীন মুহাম্মদের শক্তি ও শান-শওকত ছিন্নভিন্ন করে দেবে ওরা আশা করি।[৯১]

পরামর্শসভায় খলিফা নাসির চেঙ্গিজ খানের কাছে সাহায্য চাওয়ার ও খাওয়ারিজম শাহকে ধ্বংস করে দেওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। তবে এই খতরনাক বিষয়ে চেঙ্গিজ খানের কাছে চিঠি প্রেরণ করা সহজ ব্যাপার ছিল না। চেঙ্গিজের সাম্রাজ্যে পৌঁছার জন্য বাগদাদের লোকদের খাওয়ারিজমের সীমানা পার হয়ে যেতে হতো। এবং পথিমধ্যে, বাগদাদ থেকে আসা লোকদের খাওয়ারিজমের অধিবসীরা সন্দেহের চোখে দেখত। বিভিন্ন মনজিলে একটু পরপর তল্লাশি নেওয়া হতো—এদের সফরের মালপত্রের সঙ্গে গোপন কিছু আছে কি না। স্পষ্টতই এ চিঠি বহন করে মোঙ্গলিয়া যাওয়া লোকটির জীবিত ফিরে আসার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু খলিফার সূক্ষ্ম চক্রান্তধর্মী মেজাজ এই কঠিন কাজটিও পৃথিবীর ইতিহাসে সহজ করে দেখাল।

খলিফা এই গোপন চিঠি কীভাবে লেখালেন, কীভাবে পাঠালেন মোঙ্গলিয়ায়, সে এক গা শিউরে-তোলা বিস্ময়কর কাহিনি। পৃথিবীর ইতিহাসে হয়তো এমন চিঠি লেখার চিন্তা কারুর মাথায় পূর্বেও আসেনি, আসবে না পরেও। খলিফার ধূর্ত মেজাজ এমন এক আজব কাণ্ড ঘটাল, কারও কল্পনাতেই যা আসতে পারে না।

ইতিহাসের গোপন চিঠি

খলিফার আদেশে চেঙ্গিজ খানের কাছে পাঠানো হবে এমন এক লোককে প্রস্তুত করা হলো। মুণ্ডিত করা হলো তার মাথা। তারপর কয়েকজন তাকে শক্ত করে এঁটে ধরল। পাশেই একটি মশালে দপদপ করে আগুন জ্বলছে। চিঠিলেখক একটি সুঁই নিয়ে এসে মশালের আগুনে পুড়িয়ে সেটা লাল করে নিল। ন্যাড়ামাথা-লোকটি অস্বাভাবিক সহ্যশীল। প্রচণ্ড শক্তিতে নাক-মুখ-চোখ বন্ধ করে আছে সে। লোকটির মাথায় চিঠিলেখক খুবই একাগ্রতায় লাল হয়ে-ওঠা গরম সুঁই দিয়ে টেনে টেনে লিখল—চেঙ্গিজ খান যেন খুব শিগগির খাওয়ারিজমে আক্রমণ করেন। বাগদাদ তার সাথে আছে।

লেখকের মনোনিবেশ ছিল দেখার মতো। মাথায় সুঁই দিয়ে যখন লিখছিল, পুড়ে ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ করে উঠছিল চামড়া-মাংস। লোকটি দেহের সমস্ত রগ খিঁচিয়ে আকাশ-কাঁপানো চিৎকার দিয়ে উঠছিল। পুড়ে-যাওয়া ক্ষত থেকে অনবরত পড়ছিল রক্ত। কিন্তু, তাতে লেখকের কোনো ভাবান্তর দেখা যায়নি।

দরবারে খেলাফতের পক্ষ থেকে লোকটিকে প্রচুর সোনার মহর দেওয়া হয়েছিল। কাহিনি আরও বাকি—খলিফার আদেশে ওভাবে লেখার ফলে মাথায় যে দাগগুলো বসে গিয়েছিল, তাতে তেল-চিকনাই দেওয়া হতে লাগল নিয়মিত। মাথাও ধীরে ধীরে হয়ে উঠতে লাগল সুস্থ, চুলও হতে থাকল খানিক বড়।

---

[৯১] রওজাতুস সফা ৫/২৫

কয়েক সপ্তাহ কেটে গেছে, আজব এই বার্তাবাহকের মাথাও মোটামুটি ভরে গেছে চুলে। খলিফা এবার তাকে কারাকোরামে পাঠিয়ে দিলেন। কী অদ্ভুত! কী অদ্ভুত!!

খাওয়ারিজমের পাশ দিয়ে লোকটি যখন যাচ্ছিল, তার সারা দেহে, জামায়, মাল-সামানায় তল্লাশি চালালো খাওয়ারিজমি সেনারা। কিছুই যখন পেল না, বুঝল—এই লোক খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সঙ্গে করে কোনো চিঠিফিঠি নিয়ে যাচ্ছে না। অথচ খাওয়ারিজমিদের চিন্তাতেই আসেনি—তারা যে গোপন চিঠিটা খুঁজছে, এই লোক তা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে তার মাথার চুলের নিচে করে।

খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করে, বিস্তৃত মরুভূমি ও পাহাড়বেষ্টিত এলাকা পেরিয়ে খুব সফলভাবে সে চেঙ্গিজ খানের রাজ্যে পৌঁছে গেল। প্রথমেই দেখা করল মাহমুদ এলোয়াজের সাথে। এখানে আসার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে দ্রুত তাকে চেঙ্গিজ খানের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করল। মাহমুদ এলোয়াজ চেঙ্গিজ খানের দরবারে তৎক্ষণাৎ পাঠিয়ে দিল সংবাদ। চেঙ্গিজ খান বার্তাবাহককে ডেকে মাথার চুলে বিলি কেটে উদ্ধার করে নিলেন খলিফার চিঠি।[৯২]

ইবনুল আসিরের সাক্ষ্য

চেঙ্গিজ খানকে মুসলিমবিশ্বে আক্রমণের আহ্বান জানিয়ে সবচেয়ে বড় অপরাধ করেছিলেন খলিফা নাসির। অনারব ইতিহাসপ্রণেতারা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সে-কথা লিখে গেছেন। তবে আরব ইতিহাসবিদরা খলিফা নাসিরের জীবদ্দশায় একটা আবদ্ধতার ভেতর ছিলেন। এ নিয়ে তাই বাস্তবধর্মী কোনো সমালোচনা করতে পারেননি তখন। তবে পরবর্তীকালে ঠিকই লিখেছেন।

খলিফা নাসিরের জীবৎকালে আল্লামা ইবনুল আসির তার ইতিহাস লেখা শুরু করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত লিখেও ফেলেছিলেন। সর্বশেষ অধ্যায়ে, ৬১৭ হিজরির বর্ণনায় উল্লেখ করলেন মুসলিমবিশ্বে তাতার-আগ্রাসনের বিস্তারিত আলোচনা। তারপর লিখলেন—মুসলিমবিশ্বে তাতারদের আক্রমণের একটি বড় কারণ রয়েছে। কিন্তু সেটি খুব গোপন ব্যাপার। এখনও কোনো কিতাবে কেউ উল্লেখ করেননি।

فكان ما كان مما لست اذكره فظن خيرًا ولا تسأل عن الخبر

যা হবার হয়ে গেছে। খুব গোপন বিষয়। আমি কখনও বলব না। তোমরা আমার প্রতি সুধারণা রেখো। কখনও জানতে চেয়ো না বাস্তবতা।[৯৩]

পাঁচ বছর পর যখন (৬২২ হিজরি, ১২২৫ খ্রিষ্টাব্দ) মৃত্যু ঘটল খলিফা নাসিরের, ইবনুল আসিরের সামনে তখন কোনো বাধা রইল না। বাস্তবতা বলা সম্ভবপর হয়ে উঠল। ৬২২ হিজরির বর্ণনায় খলিফা নাসিরের মৃত্যুকথায় তিনি লিখলেন—

---

[৯২] রওজাতুস সফা ৫/২৫

[৯৩] ইবনুল আসির ৭/৫৮৩

অনারব ইতিহাসবিদরা খলিফা নাসিরের দিকে অভিযোগের যে আঙুল তুলেছেন—মুসলিমবিশ্বে হামলে পড়ার জন্য তাতারদের তিনি উৎসাহ যুগিয়েছিলেন, প্রেরণ করেছিলেন চিঠি—সে-কথা সত্য। তার কাছে সমস্ত বড় গুনাহই নিতান্ত ছোট মনে হতো।

পঞ্চম কারণ : খাওয়ারিজম শাহের বোকামি

চেঙ্গিজ খানের মাথায় আগে থেকেই ঘুরঘুর করছিল রাজ্যদখলের ভাবনা। খলিফা নাসিরের চিঠি পেয়ে তার সেই ভাবনা সংকল্পে রূপ নিল।[৯৪] খাওয়ারিজম কবজার নেশা তার রক্তে জাগিয়ে তুলল উন্মাদনা। দিনের পর দিন তা বেড়েই চলল। তিনি ভাবতে লাগলেন—এবার যদি খাওয়ারিজমে হামলা করে বসেন, অন্য কোনো মুসলিম সাম্রাজ্য আলাউদ্দীনের পাশে দাঁড়াবে না। এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিন্ত। আক্রমণ তা হলে করেই ফেলা যায় এবার। কিন্তু খাওয়ারিজম শাহের সাথে বাণিজ্য-চুক্তি হয়েছে এখনও বছর পেরোয়নি। নাহ, আরও কিছুদিন নাহয় কাটুক। আগে দুশমনের উপর আক্রমণের একটা বাহানা তৈরি হোক।

বেশিদিন কাটেনি, খুব শিগগির তৈরি হয়ে গেল সেই বাহানা। এক আজিব ঘটনা। এই ঘটনায় চেঙ্গিজ খানের আক্রমণের পথ সুগম হয়ে গেল।

ঘটনাটি কি দৈবাৎ ঘটে গিয়েছিল, নাকি তা-ও চতুর চেঙ্গিজ খানের গোপন কোনো ফন্দিতে সম্পন্ন হয়েছিল? অধিকাংশ ইতিহাসবিদ লেখেন, এ ছিল আচানক ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা।

কিন্তু তাতারদের সূক্ষ্ম কূটচাল ও চেঙ্গিজ খানের রাজনৈতিক চতুরতা সম্পর্কে যার জানাশোনা আছে, তিনি ধারণা করতেই পারেন—পরিকল্পিতভাবে চেঙ্গিজ খান নিজেই এই ঘটনা ঘটিয়েছিলেন!

এবার আসুন, জেনে নিই কী সেই উত্তেজনাকর বিরল ঘটনা?

কাফেলা

৬১২ হিজরি, ১২১৯ খ্রিষ্টাব্দ। আহমাদ খাজান্দি নামে খাওয়ারিজমের এক ব্যবসায়ী বোখারা থেকে অন্য দুই ব্যবসায়ীর সাথে চেঙ্গিজ খানের এলাকায় রওনা দিল। সঙ্গে তাতার-জাতির পছন্দসই সোনালি ও সাদা সুতোয় বোনা বিভিন্ন কাপড়। চেঙ্গিজের সাম্রাজ্যে ব্যবসায়ীদের সওদা করবার অবাধ সুযোগ ছিল। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় হেফাজত করা হতো তাদের ব্যবসাপত্র। সরকারি কর্মচারীদের বলে রাখা হয়েছিল—কেউ যদি রাজা-বাদশাহদের পরার উপযোগী কোনো মূল্যবান পোশাক নিয়ে আসে, সোজা চেঙ্গিজ খানের দরবারে যেন তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। খান পছন্দমতো ভালো কাপড় বেছে নেবেন।

---

[৯৪] রওজাতুস সফা ৫/২৫

ব্যবসায়ীরা যখন কারাকোরামে পৌঁছাল, চেঙ্গিজ খানের কর্মচারীরা আহমাদ খাজান্দির কাছে কিছু মূল্যবান কাপড় দেখতে পেল। গাটরি-বোঁচকা দিয়ে সোজা চেঙ্গিজ খানের দরবারে পাঠাল তাকে। খানের সামনে দামি দামি থানের ভাঁজ খুলে দেখাতে লাগল সে। তা দেখে তাতাররা প্রবল আগ্রহী হয়ে উঠল।

অবস্থা বুঝে ভেতরে-ভেতরে আহমাদ খাজান্দি লোভী হয়ে ওঠে। মূলত তার ব্যবসাসংক্রান্ত বুদ্ধিসুদ্ধি ছিল কম। যে কাপড়গুলো ১০ কিংবা ২০ দিনারে কিনে এনেছিল, সেগুলো দাম কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে বেচতে চাইল সে।

কাপড়ের মূল্যমান সম্পর্কে চেঙ্গিজ খানের যথেষ্ট ধারণা ছিল। ক্রোধে রক্তিম হয়ে আচমকা তিনি বলে ওঠেন—'ও কি মনে করেছে সারা জীবন ধরে আমরা কোনো কাপড় দেখিনি?' এই বলে পূর্বে যেসব কাপড় তিনি চীন ও মোঙ্গলিয়ার সাবেক শাসকদের থেকে লুট করে এনেছিলেন, কয়েকজনকে বললেন, তা এনে ব্যবসায়ীর সামনে স্তূপ করে রাখতে। আহমাদ খাজান্দির সামনে একরকম ছুড়ে ছুড়ে ফেলা হল সমস্ত কাপড়।

চেঙ্গিজ খান বজ্রকঠিন গলায় হুকুম দিলেন—'ওর সব কাপড় বাজেয়াপ্ত করো। ওকে বন্দি করে ফেলো।'

খানিক পরে বাকি দুই ব্যবসায়ীকে ভেতরে ডেকে আনা হল। এই দুজন ছিল খুব চালাক। লোকদের সাথে অবস্থা-ভেদে তাল মিলিয়ে কথা বলতে পারত। তাতার-বাহিনী নানান জেরা শুরু করলে এরা খুব ধূর্ত হয়ে ওঠে। বলে—'আমরা তো এইসব কাপড় বেচতে আসিনি। খানে আজমের খেদমতে হাদিয়াস্বরূপ এনেছি।' এই বলে তাতারদের হাতে তুলে দিতে লাগল সব কাপড়।

তাতাররা, বলা যায়, তখন একরকম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। তারপর দাম দিতে খুব জোরাজুরি করল। কিন্তু তারা নিল না। কাণ্ড দেখে চেঙ্গিজ খানের সমস্ত রাগ এক দমকায় উবে গেল। আহমাদ খাজান্দিকেও তখন মুক্ত করে দিলেন তিনি। এবং তিনজনকেই তাদের সব সাদা ও সোনালি সুতি কাপড়ের বদলায় কয়েক গুণ বেশি রুপা দিয়ে খুশি করে দিলেন।

কারাকোরামে ইসলামি সাম্রাজ্য থেকে আরও কিছু বণিক এসেছিল। তাদের সংখ্যা ছিল ৪৫০। আহমাদ খাজান্দিরা যখন ফিরে যেতে চাচ্ছিল, তারাও তখন প্রস্তুতি নিচ্ছিল ফেরার।

চেঙ্গিজ খান তার ছেলে, সরদার ও আত্মীয়দের ডেকে গম্ভীরস্বরে বললেন—'এক কাজ করো। এই কাফেলার সাথে আমাদের কারাকোরামের কিছু সামানপত্রও পাঠিয়ে দাও, যাতে অর্থনৈতিকভাবে ইসলামি সাম্রাজ্য থেকে আমাদেরও কিছু মুনাফা উঠে আসে।'

এভাবে মুসলিম ও তাতারদের বিশাল এক বাণিজ্য-কাফেলা গড়ে উঠল সেদিন। চেঙ্গিজ খান এই কাফেলাকে প্রতিনিধিদল বানিয়ে খাওয়ারিজম শাহের কাছে একটি চিঠি পাঠালেন। চিঠির বক্তব্য ছিল এমন—'তোমাদের কিছু ব্যবসায়ী আমার এখানে

এসেছিল। সঙ্গে আমাদের কিছু ব্যবসায়ীকেও পাঠাচ্ছি। তোমার রাজ্য থেকে যেন আমরাও উপকৃত হতে পারি।'

খুব সম্মানের সাথে এই প্রতিনিধিদলের সদস্যদের খাওয়ারিজমে পাঠালেন চেঙ্গিজ খান।[৯৫]

ওদিকে খাওয়ারিজমের সীমান্তপ্রদেশের এক আমির কারাকোরাম থেকে আগত পুরো কাফেলা আটকে দিলেন। কাফেলার উপর তার সন্দেহ হচ্ছিল। আমির দেখলেন—কাফেলার সাথে আছে চেঙ্গিজের তরফ থেকে দেওয়া পুরস্কার। আবার, চেঙ্গিজ খান এদের খুব সমাদর করে প্রতিনিধিস্বরূপ পাঠিয়েছেন।

বিষয়টা জেনে আমিরের সন্দেহ প্রগাঢ় হয়ে ওঠে। অবশ্য সতর্কতাবশত এমনটা হওয়া উচিতও ছিল। তা ছাড়া আগে থেকে এরকম একটা উড়োকথাও শোনা যাচ্ছিল যে, চেঙ্গিজ খানের বাণিজ্যচুক্তির উদ্দেশ্য নাকি নিরাপদে-নির্বিবাদে খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যে গুপ্তচরবৃত্তি চালানো।

কারাকোরাম থেকে আগত এই কাফেলা সাইহুন-নদীর কিনারে 'আতরার' এলাকায় এসে তাঁবু টাঙাল। আহমাদ খাজান্দি ব্যতীত কয়েকজন মুসলামান ছিল কাফেলায়—আমিনুদ্দীন, ফখরুদ্দীন বোখারি, জামাল মারাগি, উমর খাজা আতরারি প্রমুখ। মাঝেমধ্যেই এরা দামি রসদপত্র নিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে সওদা করতে যেত। মিনহাজুস সিরাজের বর্ণনামতে—এদের নিকট ছিল দামি পাত্র, স্বর্ণ-রৌপ্য ও রেশমের বোঝা-ভরতি ৫০০ উট।[৯৬]

আতরারের গভর্নরের নাম ইয়ান্নাল খান ওরফে আইনুল হক। তিনি খাওয়ারিজম শাহের মামাতো ভাই ছিলেন।[৯৭] অসামান্য সাহসী ছিলেন; তবে স্বভাবে সারাক্ষণ একটা কঠোরতা মেশানো থাকত। ধন-রত্ন সঞ্চিত করবার খুব লালসা ছিল তার। কাফেলাকে তিনি সন্দেহজনক দৃষ্টিতে দেখছিলেন। ইয়ান্নালের পরিচিত এক হিন্দুস্থানি বংশোদ্ভূত লোককেও দেখা যাচ্ছিল কাফেলায়। সে চেঙ্গিজ খানের পক্ষ থেকে বিশেষ সম্মাননা পেয়েছে বলে কাউকেই পাত্তা দিচ্ছিল না। বরং, খানে আজমের শক্তিমত্তায় মৃদু-মৃদু গর্ব হচ্ছিল তার। ফলে কোনো ভদ্রতার ধার না ধেরে গভর্নরকে সে মুখের উপর ইয়ান্নাল খান সম্বোধনে ডেকে ওঠে।[৯৮]

এমন আচরণে রক্ত চড়ে ওঠে ইয়ান্নাল খানের মাথায়। তাদের ব্যাপারে জেগে-ওঠা তার পূর্ব সন্দেহ আরও পোক্ত হয়ে বসে। তা ছাড়া তিনি ভাবতে থাকেন—কাফেলার সঙ্গে থাকা সমস্ত ধনদৌলত জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেবেন।

---

[৯৫] জাহাঁকুশা ১/৫৯-৬০
[৯৬] তাবকাতে নাসিরি ১/৩৬৭
[৯৭] তার নাম আইনাল জক অথবা আইনাল হক, উপাধি গায়ের খান
[৯৮] জাহাঁকুশা ১/৬০

কিছুদিন পর গভর্নরের পক্ষ থেকে খাওয়ারিজম শাহ সংবাদ পান—কারাকোরাম থেকে আসা বণিকদলকে আতরারে আটক করা হয়েছে। এরা মূলত ব্যবসায়ী না, ছদ্মবেশী গোয়েন্দা। আতরারবাসীদের খুব ধমকি-ধামকি দিচ্ছে এরা; ঠাঁট দেখাচ্ছে। গর্ব-দৃপ্ত গলায় বলছে—তোমরা নিজেদের সম্পর্কে জানো না। শিগগির এমন অবস্থা হবে তোমাদের, যা এখন কল্পনাই করে উঠতে পারছ না। এরা গুপ্তচর সেজে এসেছে। এদের ব্যাপারে আমি শাহি ফরমানের অপেক্ষায় আছি।[৯৯]

সে-সময় কারাকোরামের সব রাজপথে চক্রান্তকারী আমলাদের যাওয়া-আসা খুব বেড়ে গিয়েছিল দেখে খাওয়ারিজম শাহের মেজাজও খারাপ ছিল। তিনিও ভেতরে-ভেতরে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠছিলেন। এই ঘটনায় তার সন্দেহ দ্বিগুণ ঘন হয়ে ওঠে। তবু সতর্কতাবশত তিনি লিখলেন—আমার দ্বিতীয় আদেশ না-পাওয়া পর্যন্ত এদের আটকে রাখো। এ বিষয়ে আমি ভাবছি।

কিন্তু আতরারের গভর্নর আগ বাড়িয়ে, গোয়েন্দাবৃত্তির অপরাধে, কাফেলার সবাইকে হত্যা করে ফেললেন। জব্দ করে নিলেন সঙ্গে থাকা যাবতীয় সম্পদ। কাফেলার ভেতর এক লোক ছিল উটের রাখালির জন্য নিযুক্ত। কাফেলাকে যখন আটক করা হল, সে তখন গোসলখানায়। তারপর সেখান থেকে আর বের হল না সে। হত্যার কথা টের পেয়ে গোপনে পালিয়ে গেল। লুকিয়ে-লুকিয়ে পার হল খাওয়ারিজমের সীমান্ত। ছুটতে ছুটতে, সুদীর্ঘ কয়েক মাস পরে গিয়ে পৌঁছাল কারাকোরামে। ক্ষুধায়-ক্লান্তিতে তার সারা দেহ তখন বিধ্বস্ত। কোনোভাবে চেঙ্গিজ খানের দরবারে উঠে হাঁপাতে হাঁপাতে সে খুলে বলল সমস্ত ঘটনা।[১০০]

বার্তাবাহক হত্যা

এর মধ্যে কয়েক মাস কেটে গেছে। একদিন তাতারদের বার্তাবাহক চিঠি নিয়ে খাওয়ারিজমে এল। খাওয়ারিজম শাহ আপন শান মোতাবেক সিংহাসনে বসে ছিলেন। আতরারে বাণিজ্য-কাফেলার সদস্যদের হত্যা করা হয়েছে বলে তিনি শুনেছেন। চেঙ্গিজ খানের পক্ষ থেকে বার্তাবাহক এবার প্রতিশোধমূলক চিঠি নিয়ে এসেছে। দরবারে প্রবেশের অনুমতি চাইল প্রতিনিধিদল।

খাওয়ারিজম শাহের ভুরু কুঁচকে উঠল—কাফেলার নিহতদের সঙ্গে চেঙ্গিজ খানের কী সম্পর্ক? অধিকাংশই তো ছিল খাওয়ারিজমের বাসিন্দা; তবে চেঙ্গিজ খানের অধীনস্থ হয়ে থাকত। শত হোক, এই হত্যাকাণ্ড খাওয়ারিজমের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। বাইরের একজন শাসক এতে নাক গলাতে আসছে কেন? এটা আমার সাম্রাজ্যে বহিরাগতের হস্তক্ষেপ নয় তো কী? চেঙ্গিজ খানের এই প্রতিশোধমূলক পয়গাম পাঠানোরই-বা কী প্রয়োজন?

---

[৯৯] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৮৬; ইবনে খালদুন ৫/১০৯

[১০০] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৮৬; রওজাতুস সফা ৪/৮২৩; তাবাকাতে নাসিরি ১/৩৬৭

শাহের অনুমতিক্রমে চিঠিপাঠ আরম্ভ হল—'ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা দেবে বলে নিজহাতে তুমি চুক্তিনামা লিখেছিলে। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে, বণিকদলকে কোনোরূপ ধড়পাকড় করা হবে না। কিন্তু গাদ্দারি করেছ তুমি। ভঙ্গ করেছ প্রতিশ্রুতি। শাসকদের ওয়াদা ভঙ্গ করার ব্যাপারটা খুব জঘন্য! আতরারের গভর্নর ইয়ান্নাল খান ওরফে আয়নুল হক আমাদের ৪০০ বেকসুর বণিককে হত্যা করেছে। ওকে শায়েস্তা করবার জন্য শিগগির আমার হাতে ওকে তুলে দাও। জব্দকৃত সমস্ত সম্পদ ফিরিয়ে দাও। আর সব যদি তোমার নির্দেশেই ঘটে থাকে, দ্রুত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। পরিণতি খুব খারাপ হবে, জেনো। আমি কেমন রুক্ষ হয়ে উঠি দেখবে। আমি প্রবল এক বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হচ্ছি। মোকাবেলা করার সাধ্য তোমাদের নেই।'[১০০]

চিঠির প্রতিটি শব্দ খাওয়ারিজম শাহের ব্যক্তিত্বে শক্ত করে ঘাঁই বসাচ্ছিল। ইয়ান্নাল খান হচ্ছে তার মামাতো ভাই, খাওয়ারিজমের যুদ্ধংদেহী গোত্রগুলির সরদার। শাহ যদি এখন ব্যাপারটাতে কোনো কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, ইয়ান্নাল খান এবং তার অধীনস্থ গোত্রগুলি মুহূর্তে তার বিরুদ্ধে চলে যাবে। এজন্যই হয়তো কাফেলা-হত্যার ঘটনায় তিনি চুপচাপ ছিলেন তখনও। তখন পর্যন্ত সে-বিষয়ে কোনো তদন্তে নামেননি। তদন্ত যদি চালাতেনই, অপরাধও সাব্যস্ত হয়ে যেত, তা হলেও তো ইয়ান্নালের শাস্তির প্রকৃত জিম্মাদার ছিল খাওয়ারিজম শাহের আদালত। কোনো ভিনদেশির হাতে কেন তাকে ছেড়ে দিতে হবে? তাকে তাতারদের কাছে সোপর্দ করা কীভাবে সম্ভব?

চিঠির শেষদিকে চেঙ্গিজ খান যুদ্ধের যে-চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন, খাওয়ারিজম শাহের তা সহ্য হল না। রক্তে আগুন ধরে গেল তার। ক্রোধে তিনি হুংকার দিয়ে উঠলেন—চেঙ্গিজের বার্তাবাহককে হত্যা করে ফেল! তার সঙ্গে আর যারা এসেছে, তাদের মাথা ও দাড়ি কামিয়ে স্বদেশে ফেরত পাঠাও। আর চেঙ্গিজকে আমার পয়গাম দিয়ে এসো যে, আমি নিজেই আসছি ওর মোকাবেলা করার জন্য। সে পৃথিবীর সর্বশেষ প্রান্তেও যদি চলে যায়, পাতিপাতি করে খুঁজে তারপর শক্ত সাজা দেব আমি। ওর এই চ্যালাদের যে-অবস্থা করেছি, ওর দশাও ঠিক তেমন করে ছাড়ব।[১০১]

চেঙ্গিজ খানের পক্ষ থেকে অপমানকর এই চিঠি পেয়ে খাওয়ারিজম শাহের মাথায় রক্ত চড়ে গেছিল। লোপ পেয়েছিল সমস্ত চিন্তাশক্তি। পরিণামদর্শী কিছু মন্ত্রী অবশ্য বোঝাতে চেষ্টা করেছিল—বার্তাবাহককে হত্যা করা মুসলিমদের জন্য একটি নীতিবিরুদ্ধ কাজ। এতে ভয়ানক ফেতনা নেমে আসতে পারে। কিন্তু, খাওয়ারিজম

---

[১০০] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৮৭; ইবনুল আসির ৭/৫৭৩; নিহায়াতুল আরব ২৪/৩৬১; শাযারাতুয যাহাব ৫/৬১; তারিখে খাওয়ারিজম শাহি ৯৮

[১০১] ইবনুল আসির ৭/৫৭৪

স্থাপিতঃ ২০২০ইং

শাহ তার শক্তির দম্ভে চেঙ্গিজ খান এমনকি পৃথিবীর কোনো সাম্রাজ্যকে পিঁপড়ের সমতুল্যও ভাবতেন না। তার ধারণা ছিল—এ মুহূর্তে বিগলিত ভাব দেখালে চলবে না। এতে তাতাররা মাথায় উঠতে চাইবে। ওদের সন্ত্রস্ত করে তুলতে পারে আমার এক কঠিন চোখ-রাঙানি।

সবার মতামত ভণ্ডুল করে দিয়ে নিজ সিদ্ধান্তেই অটল থাকলেন শাহ। বণিক-হত্যার ব্যাপারটা আসলে তেমন কঠিন কিছু ছিল না। কোনোভাবে মিটমাট করে ফেলা যেত। কিন্তু শাহের এই জোরালো বক্তব্যের কারণে বিপদ একেবারে মাথার উপর এসে গেল।

তিনি যদি খানের বার্তাবাহককে হত্যা না-করতেন, মুসলিমবিশ্বে এত দ্রুত আক্রমণ করতে আসতেন না চেঙ্গিজ খান। কিন্তু অবস্থা পুরোপুরি বিগড়ে গেছে তখন। ফলে কেউ আর চেঙ্গিজ খানকে আটকে রাখতে পারেনি। প্রতিশোধের আগুনে তিনিও জ্বলছিলেন। তাই প্রচণ্ড শক্তিমত্তায় এসে হামলে পড়লেন মুসলিমবিশ্বে। শুধু একজন বার্তাবাহকের প্রাণের বদলায়, হত্যা করলেন ১ কোটির বেশি মুসলমানকে।

একজন উঁচুমাপের সাহিত্যিক ও ইতিহাসবিদ লিখেছেন—প্রতিটি রক্তকণার বদলায় তিনি বইয়ে দিয়েছিলেন একেকটি বিশাল সমুদ্র।[১০২]

আজ আমরা আট শতাব্দী পূর্বের এই ঘটনা, যা চেঙ্গিজ খানের আক্রমণের প্রধান কার্যকারণ, যদি চিন্তা করে দেখি, বড়ই হতভম্ব লাগে। আলামত আর বর্ণনার আলোকে মনে হয়—এই বাণিজ্য-কাফেলার ভেতর চেঙ্গিজ খানের গুপ্তচর ছিল। বরং এটাও সম্ভব যে, কাফেলা-হত্যার পেছনে চেঙ্গিজের গোপন পলিসি কাজ করেছে।

অর্থাৎ, দুচারজন গোয়েন্দাকে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে এই ব্যবসায়ীদের সাথে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে খাওয়ারিজমের সীমান্তে এরা ধরা পড়ে যায়। তারপর এদের বিরুদ্ধে খাওয়ারিজমি হুকুমত যে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, ওটাকেই যেন বানানো যায় যুদ্ধের বাহানা।

এ যদিও একটি অনুমানভিত্তিক কথা; কিন্তু ইতিহাসের সেই চিত্রও আপনি দেখুন—যখন চেঙ্গিজ খান খাওয়ারিজম শাহ ও তার মা তুর্কান খাতুনের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টির জন্য এভাবেই এক গোয়েন্দা পাঠিয়েছিলেন। এবং নিজেই তাকে খাওয়ারিজমের সীমানায় ধরিয়ে দিয়েছিলেন। খাওয়ারিজমি গোয়েন্দারা তাকে গ্রেফতার করে একটি চিঠি উদ্ধার করেছিল। চিঠির ভাষা চেঙ্গিজ খান জেনে-বুঝেই তেমন ব্যবহার করেছিলেন, যা পড়ে মায়ের প্রতি খাওয়ারিজম শাহ ঘৃণা করতে শুরু

---

[১০২] আল-ইবার ৩/১৬৫

করবেন। চেঙ্গিজ খান যেমন চেয়েছিলেন, হয়েছিলও তা। খাওয়ারিজম শাহ তার মা ও মায়ের পুরো গোত্রের প্রতি ভুল ধারণা পোষণ করতে শুরু করেছিলেন।

এজন্য এটাও কোনো অসম্ভব ব্যাপার নয় যে, এই বাণিজ্য-কাফেলাকেও সেভাবেই ফাঁসিয়েছেন চেঙ্গিজ খান। এদের হত্যা করার প্রতি খাওয়ারিজমি হাকিমদের উদ্বুদ্ধ করে যুদ্ধের একটি বাহানা তৈরি করতে চেয়েছেন তিনি।

এ কথা বলার দ্বারা আমার উদ্দেশ্য এই নয় যে, ব্যবসায়ীদের ব্যাপারে ইয়ান্নাল খানের গৃহীত সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল। কখনোই নয়, নিঃসন্দেহে তা ছিল জুলুম। সবকিছু জেনে-বুঝে শরিয়তের আলোকে এদের ব্যাপারে যে সিদ্ধান্তই নেওয়া হতো, সেটাই হতো উত্তম।

আমার মত হল, যদি প্রকাশ্য আদালতে মোকাদ্দমা চলত, তা হলে অধিকাংশ ব্যবসায়ী সসম্মানে মুক্তি পেয়ে যেত। কারণ, এই ব্যবসায়ী লোকগুলো ভিনদেশে ব্যবসা করতে গিয়ে গোয়েন্দাগিরি করবে, সেটা অসম্ভব ছিল; তাও একটিমাত্র সফর এবং ভিনদেশি তাতার শাসকের সাথে শুধু একবার সাক্ষাতের পর! তা ছাড়া, তাহজিব-তামাদ্দুন ও ধনদৌলতে খাওয়ারিজমের চেয়ে তাতারদের ওই রাজ্যও ছিল অনেক পিছিয়ে!

ইয়ান্নাল খান কর্তৃক ব্যবসায়ী-হত্যার ঘটনা আল্লাহ তায়ালার ক্রোধের কারণ ছিল। পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখলে বোঝা যায়, তিনি শরয়ি কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। বরং নিজের পক্ষ থেকে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সেই সময়ের মুসলিমবিশ্বের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার সবচেয়ে দুর্বল দিক ছিল—বাদশাহরা তো করবেনই—কিন্তু একজন আঞ্চলিক শাসকও হুকুমতের কাজে নিরঙ্কুশভাবে হস্তক্ষেপ করে বসত।

ব্যবসায়ীদের এই ব্যাপারটায়, পরবর্তীতে ইয়ান্নালকে একথাও কিন্তু খাওয়ারিজম শাহ বলে দিয়েছিলেন—তোমার যা ইচ্ছা, করো। ফলে ইয়ান্নাল খান যা ইচ্ছা, ঠিক তা-ই করলেন।

হায়, ব্যবসায়ীদের গ্রেফতার করে যদি শুধু মোকাদ্দমা চালিয়ে যাওয়া হতো, মুসলিমদের হয়তো এমন নাজুক দিন দেখতে হতো না। মুসলমানদের দুর্ভাগ্য যে, দুশমন যে পরিমাণ চালাক-চতুর ছিল, তারা ঠিক সেই পরিমাণ অপরিণামদর্শিতার প্রমাণ দিয়েছে সবসময়। ইয়ান্নাল খানের সম্পদের লোভ, খাওয়ারিজম শাহের তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত ও বোকামি চেঙ্গিজ খানের দ্রুত আক্রমণের কারণ হল।

চেঙ্গিজ খানের পরিকল্পনা ও গোয়েন্দা-ব্যবস্থা

সম্ভাবনা আছে—সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রতি যিনি সুধারণা রাখেন, অথবা লেখকের মেজাজের চেয়েও সামনে বেড়ে যান, তাদের কেউ কেউ আমার এই ভাবনাকে (ব্যবসায়ীদের হত্যাকাণ্ডের পেছনে চেঙ্গিজ খানের কোনো গোপন চালাকি কাজ

করেছে) অমূলক বলতে পারেন। কিন্তু এটা ভাবতে আমি বাধ্য হয়েছি। কারণ, ইতিহাসে প্রায় সব সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উদ্ভব কিংবা আক্রমণ এমন সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্রের পরেই ঘটেছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সমস্ত ধ্যানধারণা ও চিন্তাভাবনা প্রাচীন আর বর্তমানকালে প্রায় একই রকম। যুগের পরিবর্তনে এতে কোনো ধরনের পরিবর্তন ঘটেনি।

উপনিবেশ-যুদ্ধ আজও সেই একই ছাঁচে বর্তমান রয়েছে। স্থান-কাল-পাত্রভেদে কারুর কারুর কর্মপদ্ধতিতে ভিন্নতা আসতে পারে খানিক; কিন্তু ধরন প্রায় একই। সাম্রাজ্যগুলো রক্তপাত, আগ্রাসন আর কূটকৌশলের সেই একই ধারা ধরে রেখেছে। ভারত উপমহাদেশ, ইরাক, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের নিকট-অতীতের ইতিহাসই এর সাক্ষী। চেঙ্গিজ খানের বিরোধীদের একটি ভুল ধারণা ছিল (এখনও অনেকের আছে) যে, চেঙ্গিজ খান ছিলেন নিছক একজন যুদ্ধবাজ লোক। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। তিনি প্রচণ্ড যুদ্ধবাজ হওয়ার পাশাপাশি কঠিন ফেরেববাজও ছিলেন। রাজনীতি খুব বুঝতেন। তার সূক্ষ্মদর্শিতা এতদূর পৌঁছেছিল যে, ওই সময়ের সভ্য দেশগুলোর চিন্তার দৌড়ও সে পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি।

চেঙ্গিজ খানের সফলতার আরেকটি বড় কারণ হল—দুশমনের এলাকায় আক্রমণের পূর্বেই তাদের যাবতীয় তথ্য তার হাতে এসে যেত। প্রতিবেশী রাজ্যের আবাদি এলাকা, সৈন্যশক্তি ও শাসকদের বৈশিষ্ট্য, রীতি-অভ্যাস, শহর, জঙ্গল, প্রান্তর, মরুভূমি ও পাহাড়সমূহের পূর্ণাঙ্গ নকশা দুশমনের উপর আক্রমণের আগেই তার নখদর্পণে চলে আসত। আর এর পরেই শত্রু-অঞ্চলে আক্রমণের বিস্তারিত প্ল্যান-প্রোগাম সাজাতেন তিনি। এটাও খেয়াল রাখতেন—আক্রমণের পূর্বে বৈধ (তার নিকট) ও যৌক্তিক কোনো কারণ তৈরি হোক।

কেউ হ্যারল্ড ল্যাম্ব লিখিত 'চেঙ্গিজ খান' বইটি গভীরভাবে পাঠ করলে বুঝতে পারবেন—কেরায়েত গোত্রের সরদার তুগরুল উঁক খানের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রেরণের কার্যকারণ চেঙ্গিজের দিক থেকে সূক্ষ্মভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছিল।

সন্ধিপ্রিয় খাতাই বাদশাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে এই ঘৃণ্য চক্রান্তের মাধ্যমেই যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্বলিত করা হয়েছিল। মূলত, চেঙ্গিজ খান এই সূক্ষ্ম কূটচাল এমনভাবে সাজিয়েছিলেন যে, পরবর্তী শতাব্দীর ইতিহাসপ্রণেতারা তাতে ধন্দে পড়ে গেছেন। মনে করেছেন—চেঙ্গিজ খান নিছক একজন যোদ্ধা; অথচ তার কূটচক্রান্ত তারা ধরতে পারেননি।[১০৩]

তাতাররা যে-সময় খাতাই সাম্রাজ্যের অধীনস্থ ছিল, চেঙ্গিজ খান তখন খাতাই বাদশাহর আদেশে চীনের অভ্যন্তরে ঢুকে বাদশাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের শায়েস্তা

---

[১০৩] যেমন : মরহুম মাওলানা আকবর শাহ নজিবাবাদী

করে আসতেন। কিন্তু, বিদ্রোহীরা মূলত চেঙ্গিজ খানের আদেশেই ওই এলাকায় গুপ্তচরবৃত্তিতে নিযুক্ত ছিল। চেঙ্গিজ খানের ভবিষ্যৎ-প্রয়োজনে সেখানকার সব পথ-ঘাট, শহর-নগর ও অন্যান্য ভৌগোলিক সীমানার নকশা তৈরি করত তারা। এবং খাতাইদের সেনাশক্তি নিরীক্ষণ করে সবকিছু এসে চেঙ্গিজ খানকে জানাত।

উল্লিখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ করলে এই সম্ভাবনা আরও গাঢ় হয়ে ওঠে যে, খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের সাথে চেঙ্গিজ খানের ব্যবসায়িক চুক্তি শুধু অর্থনৈতিক উপকার হাসিলের জন্যই ছিল না; বরং, তার একটি বড় উদ্দেশ্য ছিল সেখানে গুপ্তচর নিয়োগ করা। আতরারের হাকিম কারাকোরাম থেকে আগত বণিকদের উপর গোয়েন্দাবৃত্তির যে অভিযোগ আরোপ করেছিলেন, তা একেবারে অমূলকও নয়।

মুসলিমবিশ্বে তাতারদের নির্বিঘ্ন ও সফল আক্রমণ থেকে বোঝা যায়—খাওয়ারিজমে নিশ্চয় তাদের গোয়েন্দাদের কার্যকর তৎপরতা ছিল। চেঙ্গিজ খানের গুপ্তচর যদি খাওয়ারিজমে না-ই থাকত, তা হলে শাহের গোয়েন্দাদের চোখ এড়িয়ে, কীভাবে ১ লক্ষ সিপাহি নিয়ে পেছন থেকে আক্রমণ করে বসেছিলেন খান? লাখো সৈনিক নিয়ে এত সহজে অজানা-অচেনা পথঘাট অতিক্রম করে ফেলার ব্যাপারটা নিশ্চয় গোয়েন্দাদের পাচারকৃত তথ্যের ভিত্তিতেই সম্ভব হয়েছিল।

এই বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ করে বলাই যায়—অন্যান্য সাম্রাজ্যের মতো খাওয়ারিজমেও চেঙ্গিজ খানের বিজয়লাভে গোয়েন্দাদের বড় হাত ছিল।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আক্রমণ

চেঙ্গিজ খানের কর্মচারীরা দূত ও বণিক-বেশে চীন-খাওয়ারিজমসহ পার্শ্ববর্তী সমস্ত এলাকায় তাদের গোপন তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিল। খুঁজে-খুঁজে, বাছাইকৃত কিছু স্থানীয় লোককে অর্থবিত্তের লোভ দেখিয়ে প্রস্তুত করেছিল তাদের কাজের জন্য। কেউ কেউ ইতোমধ্যে তাতারদের পক্ষে তথ্য সরবরাহে নেমেও গিয়েছিল। অনেকে বোকামির দরুন অসহায়ভাবে তাতারদের হাতে ব্যবহৃত হচ্ছিল। আমির ও সরদার শ্রেণির কিছু লোক ক্ষমতার লোভে জড়িয়ে পড়েছিল চেঙ্গিজীয় গুপ্তচরদের সাথে। এমনকি, প্রয়োজনে এরা কারাকোরামের জন্য সব রকমের কাজ আঞ্জাম দিতে প্রস্তুত ছিল।

এজাতীয় লোকগুলো যুদ্ধের সময় তাতারদের খুব কাজে আসত। এমনকি, তাদের জন্য কখনও কখনও এরা শহরের প্রধান ফটকও খুলে দিয়েছে।

এই আত্মবিক্রীত লোকগুলো যুদ্ধের সময়েই তাতারদের ফাঁদে আটকা পড়ে যেত—এমন ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। মূলত বহু আগে থেকেই এদের প্রস্তুত করে ফায়দা ওঠাত তাতাররা। সে-কাজে সবচেয়ে বেশি জড়িত ছিল সেইসব লোক, নিজ দেশের বাদশাহর প্রতি বিতৃষ্ণায় ভরে উঠেছিল যাদের মন।

খাওয়ারিজমের কিছু লোক স্বজাতির সাথে গাদ্দারি করে তাতারদের কাছে বিক্রি হয়ে গেছিল স্রেফ এই ধারণায় যে, তাতাররা শুধু খাওয়ারিজম শাহকেই শায়েস্তা করতে এসেছে। বিজয়ের পর এখানকার রাজত্ব আমাদের হাতে ছেড়ে চলে যাবে।

আবার কিছু লোক জানত, তাতাররা ইসলাম ও মুসলিমজাতির শেকড় কাটতে এসেছে। কাউকেই ছাড়বে না এরা।

তা সত্ত্বেও মর্যাদা ও পদ লাভের সেই ব্যাপক ফেতনায় তারাও পড়ে গিয়েছিল। দুনিয়ার মহব্বত তাদের অন্ধ করে দিয়েছিল। তারা লিপ্ত হয়েছিল স্বজাতীয় মুসলিম ভাইদের উৎখাত-কর্মে। তারা ছিল নামেমাত্র মুসলমান এবং মুসলমানদের জন্য কাফেরদের চেয়েও অনেক বেশি ভয়ংকর।

শিয়া ও বাতেনি ফেরকার গাদ্দারি

উম্মাহর সাথে সবচেয়ে বেশি গাদ্দারি করেছে শিয়া ও বাতেনি ফেরকা। সকল ক্ষেত্রেই তাতাররা তাদের দ্বারা উপকৃত হয়েছে। বাতেনি ফেরকা সাধারণ মুসলিমদের বেশ ধরে সকল যুগেই গাদ্দারি করেছে। খাওয়ারিজমের শক্তি খর্ব করতে এরা ছিল সদা প্রস্তুত এবং বদ্ধপরিকর। এই দুই ফেরকার নোংরা কর্মকাণ্ডে খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন শাসক তাদের বিরুদ্ধে সবসময় লড়ে গেছেন। তবে কখনোই পুরোপুরিভাবে শায়েস্তা করতে পারেননি। খাওয়ারিজমি শাসকদের উপর তাদের ক্রোধ-জিঘাংসা সবসময় বেড়েই চলেছে। তারা এই সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে শক্তিশালী করেছে সকল বহিঃশত্রুর হাত।

তাতারদের হাতে মুসলিমবিশ্বের ধ্বংস হওয়ার পেছনে শিয়া-চক্রান্তের বিরাট ভূমিকা ছিল। ব্যাপারটা গভীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দাবি রাখে। এটা অবশ্য স্বতন্ত্র আলোচ্য বিষয়। তবে পাঠকদের একটুখানি কৌতূহল উৎপাদনের জন্য এখানে বলে রাখি—মুসলিমবিশ্বে চেঙ্গিজ খানকে আক্রমণের আহ্বানকারী স্বয়ং 'খলিফাতুল মুসলিমিন' নাসির লি দীনিল্লাহও ছিলেন একজন শিয়া।

তার ৪০ বছর পর—যখন হালাকু খানের নেতৃত্বে তাতাররা বাগদাদ আক্রমণ করে, সেই আক্রমণের জন্যও হালাকু খানকে উৎসাহ যুগিয়েছিল ও গোপন ছক এঁকে দিয়েছিল কেন্দ্রীয় দুই চরিত্র—ইবনে আলকামি ও নাসিরুদ্দীন তুসি। তারাও ছিল শিয়া।

খলিফা নাসির শিয়া : দলিল কী?

আপনারা হয়তো অবাক হচ্ছেন, এই পর্যায়ে এসে হয়তোবা কুঁচকে উঠেছে আপনাদের ভ্রু—আচ্ছা, একজন আব্বাসি খলিফা শিয়া হবেন কীভাবে! তার পূর্বসূরি ও পরিবার-পরিজন তো ছিলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত!

বলি—সত্য সকল যুগে স্ব-স্থানে সত্য হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং থাকবে, তা যত বিস্ময়করই লাগুক না কেন!

হাফেজ ইবনে কাসির তার ইতিহাসগ্রন্থের সপ্তম খণ্ডে খুব সংক্ষেপে, আর ইবনে শিহাব হামবলি كتاب الذيل على طبقات الحنابلة গ্রন্থে সবিস্তারে খলিফা নাসিরের শিয়া হওয়ার আলোচনা করেছেন।[১০৪]

[১০৪] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ৮, পৃষ্ঠা ৬৬

সপ্তম অধ্যায়

মুসলিমবিশ্বে চেঙ্গিজ খানের আক্রমণ

চেঙ্গিজ খানের ক্রোধাগ্নি

বার্তাবাহককে হত্যা করে ফেলার পর প্রতিনিধিদলের অন্য কয়েকজন লুকিয়ে-চুরিয়ে কোনোভাবে গোবি মরুভূমিতে ফিরে গেল। তাদের বিধ্বস্ত অবস্থা দেখে চেঙ্গিজ খান ক্রোধে কাঁপতে থাকেন। রক্তিম চেহারা হয়ে ওঠে দ্বিগুণ লাল। বার্তাবাহকের হত্যার কথা শুনে তার সর্বাঙ্গে আগুন ধরে যায়। প্রতিশোধস্পৃহায় শক্ত হয়ে ওঠে চোয়াল।

কাঁপতে কাঁপতে তিনি সেই পাহাড়ে গিয়ে ওঠেন, যেখানে তার কল্পিত তেংরিদের মারকাজ। সেখানে চোখ বন্ধ করে নতজানু হয়ে ঠোঁট নেড়ে নেড়ে কিছুক্ষণ বিড়বিড় করেন। তারপর কল্পিত উপাস্যের উদ্দেশে ঝুঁকতে ঝুঁকতে জমিনে কপাল ঠেকান। এই ব্রত পালনে সেখানে তার কেটে যায় তিন দিন, তিন রাত।[১০৫]

একসময় মাথা তুলে বাতাস-কাঁপানো বিকট এক হাঁক ছাড়েন—'আসমানে যেভাবে কখনও দুই সূর্য ওঠে না, জমিনেও একসঙ্গে হতে পারে না দুই শাহানশাহর রাজত্ব!'

তারপর দ্রুত খাওয়ারিজম শাহের কাছে নতুন বার্তাবাহক পাঠান তিনি। বার্তাবাহক গিয়ে শাহকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনিয়ে আসে—'তুই যুদ্ধই পছন্দ করেছিস। এখন যা হবার হবে। কী যে হবে, আমরা ঠিক জানি না, একমাত্র খোদা জানেন।'

চেঙ্গিজ খানের হুকুম পেতেই এশিয়ার সমস্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পাষণ্ড তাতাররা ঝাঁক বেধে গোবি মরুভূমির দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে এসে জড়ো হতে থাকে। ১০ হাজার সিপাহি নিয়ে গঠিত একটি দলকে বলা হতো তাওমান। তেমন ২০টি তাওমান জড়ো হয়ে মেতে উঠেছিল কুচকাওয়াজে।

হাজার হাজার সেপাই এসে নির্ধারিত পতাকাতলে যার যার মতো করে জমে যেতে থাকল। সবাই যখন এসে গেল, তখন পতাকার সংখ্যা দাঁড়াল ৭০০।[১০৬] বলা হয়—চেঙ্গিজ খানের এ বাহিনীর লোকসংখ্যা ৭ লাখের কম ছিল না। ৮ লাখের কথাও বর্ণনা করেছেন কোনো কোনো ইতিহাসবিদ। এর কারণ, চেঙ্গিজ খান অভিযান যখন শুরু করেন, যাত্রাপথে আরও বিভিন্ন দল এসে তার সাথে মিলিত হয়। এভাবে সেনাসংখ্যা অনেক বেড়ে যায়।

---

[১০৫] জাহাঁকুশা ১/৬০

[১০৬] জাহাঁকুশা ১/৬১

তাতার-বাহিনীর সঠিক সংখ্যা

রওজাতুস সাফা গ্রন্থের বর্ণনা—মার্ভ শহরে আক্রমণের সময় তুলি খানের সাথে ছিল ৮০ হাজার সৈনিক। সেই ৮০ হাজার ছিল পুরো বাহিনীর এক-দশমাংশ। অর্থাৎ পুরো বাহিনীতে ছিল ৮ লক্ষ সৈনিক। হাফেজ ইবনে কাসির এই রকমই বলেছেন। তার বক্তব্য হল—চেঙ্গিজ খানের সৈনিক ছিল ৮ লাখের কাছাকাছি। শুধু তাবাকাতে নাসিরির বর্ণনা অনুযায়ীই সৈন্যসংখ্যা ছিল ৭ লাখ।[১০৭] যা হোক, সে-সময়কার কোনো ইতিহাসপ্রণেতাই সাত লাখের কম সংখ্যা লেখেননি। বর্ণনা ও যুক্তিগতভাবে এটাই সঠিক।

ইউরোপিয়ান ইতিহাসবিদের ভুল

ইতিহাসবিদদের এইসব বর্ণনা থাকা সত্ত্বেও যখন সমকালের আমেরিকান প্রাচ্যবিদ ঐতিহাসিক হ্যারল্ড ল্যাম্বের বর্ণনায় দেখি—খাওয়ারিজমে হামলাকারী তাতারদের সংখ্যা ছিল আড়াই লাখ—হতভম্ব না-হয়ে পারি না। তার একথা অন্যান্য ইতিহাসপ্রণেতার বর্ণনার বিপরীত তো হয়েছেই, আবার সম্পূর্ণ যুক্তিবিবর্জিতও। কারণ, খাওয়ারিজম হামলার কয়েক বছর আগে খাতা হামলার সময় চেঙ্গিজ খানের সিপাহি ছিল তিন লাখের কাছাকাছি। (হ্যারল্ড ল্যাম্বের বর্ণনায়ও তাই বলা হয়েছে!)

খাতা ছিল গোবি মরুভূমির নিকটবর্তী একটি এলাকা। ওখানে যুদ্ধ-চলাকালে, তাতারদের পক্ষে কারাকোরামে রয়ে-যাওয়া তাদের অবশিষ্ট সৈন্যদের থেকে সহজেই সাহায্যগ্রহণ সম্ভব ছিল। অন্যদিকে মুসলিমবিশ্বের সীমান্ত ছিল ৩ হাজার কিলোমিটার দূরে। ওখানে তাতারদের স্বগোত্রীয়দের থেকে সাহায্য পৌঁছার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না!

এজন্য সবকিছু জেনে-বুঝে পুরো বাহিনীকেই নিয়ে গিয়েছিলেন চেঙ্গিজ খান। কারণ পথে ছিল বিপদের আশঙ্কা—মৌসুম খারাপ হলে নামতে পারে ঝড়-তুফান। ওদিকে খাওয়ারিজমের সাকুল্যে ৩ লক্ষ সিপাহি হলেও তাদের কাছে আফগান ও ইরানের মুসলিম গোত্রগুলো থেকেও সহযোগিতা আসবার সম্ভাবনা ছিল। একথা চেঙ্গিজ খান খুব ভালো করেই জানতেন। এইরকম যখন অবস্থা, তখন স্রেফ আড়াই লাখ সৈন্য নিয়ে মৃত্যুঘাটে ঝাঁপ দেওয়ার মতো বোকামি নিশ্চয় চেঙ্গিজ খান করবেন না!

এই আক্রমণে তাতার-বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা যে অনেক বেশি ছিল—এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। কারণ, অন্যান্য বিজিত এলাকার শাহজাদা ও সরদাররা, এবং কামান ও আগ্নেয়াস্ত্র নির্মাণে পারদর্শী চীনা ইঞ্জিনিয়াররাও এই বাহিনীতে শামিল হয়েছিল।[১০৮]

---

[১০৭] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১২, পৃষ্ঠা ৯৪

[১০৮] তাবাকাতে নাসিরি ১/৩৬৭; চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১৩, পৃষ্ঠা ১০০

প্রথম হামলা

শরৎকাল। (রজব ৬১৬ হিজরি, সেপ্টেম্বর ১২১৯ খ্রিষ্টাব্দ) গোবি মরুভূমি থেকে উঠে এসেছে এক অপ্রতিরোধ্য প্রলয়ঙ্করী ঝড়। সবকিছু লন্ডভন্ড করে বৈকাল লেক হয়ে সেই ঝড় ছুটে যাচ্ছে পশ্চিমের দিকে। এই বৈকাল লেক থেকে খাওয়ারিজম পর্যন্ত ঠিক তিন মাসের পথ। পথিমধ্যে কোনো জনবসতি নেই। বিশুষ্ক মরুর ধু-ধু বালিয়াড়ি। কখনও অনতিক্রম্য সুবিশাল পাহাড় ও কাঁকর বিছানো গিরিপথ।[১০৯]

সেবার খুব শীত পড়েছিল। শীতের প্রথম থেকেই শুরু হয়েছিল তুষারপাত। মৌসুম অত্যন্ত প্রতিকূল হয়ে উঠেছিল। চেঙ্গিজ খানের বাহিনী সঙ্গে যথেষ্ট খাদ্যসামগ্রী ও অন্যান্য রসদপত্র নিয়ে গিয়েছিল। নতুবা হয়তো এই তুষারঝড়েই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত তারা।

চেঙ্গিজ খানের দৃষ্টি ছিল খুব প্রখর। এইসব ঝুঁকির কথা জানতেন বলেই আগে থেকে তিনি প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিলেন। এজন্য তার পরিকল্পনা অনুসারে কঠিন-হৃদয়ের লোকগুলি বরফ-ঢাকা অনতিক্রম্য পাহাড়-পর্বত, পথঘাট, বরফ পড়ে জমে-যাওয়া নদীনালা—সব অনায়াসে নিরাপদে পেরিয়ে যাচ্ছিল। সাধারণ কোনো বাহিনীর পক্ষে সেসব পেরোনো কোনোক্রমেই সম্ভব ছিল না।

চেঙ্গিজ খান খোরাকি হিসেবে সঙ্গে নিয়েছিলেন অসংখ্য মহিষ। বাহিনীর সর্বাগ্রে হাঁকিয়ে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সেসব। প্রতি দশজন লোকের জন্য তিনটি করে বকরির শুকনো মাংস সার্বক্ষণিকভাবে লোহার পাত্রে সংরক্ষিত ছিল। ছিল অতি দ্রুত ছুটতে পারে এমনসব ঘোড়ার পাল। প্রত্যেক সিপাহির সাথেই কয়েকটি করে ঘোড়া ছিল। একটি ক্লান্ত হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে সেটি পালটে আরেকটি নিয়ে নিত।[১১০]

কিছু রাহবার এই বিশাল বাহিনীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। অনেক দোভাষী, চিকিৎসক, অস্ত্রনির্মাতা ও বণিকরূপী গুপ্তচরও ছিল। এমনকি বিজিত এলাকার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সামলাবার জন্য লেখাপড়া-জানা কিছু লোককেও নিয়ে নিয়েছিলেন চেঙ্গিজ খান। ক্ষেত্রভেদে এদের সবার থেকেই উপকার হাসিল করতেন তিনি। সিপাহিরা ব্যক্তিগত সেবালাভের জন্য নিজ নিজ স্ত্রীদেরও সঙ্গে নিয়ে এসেছিল।

মাঝেমাঝে কোথাও এরা বিশ্রাম নিতে থামলে পলকের ভেতর সেখানে গড়ে উঠত তাঁবুর শহর। তাঁবুর সেই অস্থায়ী শহরে তাদের খাদ্য ছিল জমিনে উৎপাদিত ফসল। মাঠের ভেতর খুঁজে খুঁজে তা সংগ্রহ করত তারা। হঠাৎ কখনও শিকার করে জন্তুজানোয়ারও ধরে আনত। সাথে অবশ্য মহিষগুলো রয়ে গিয়েছিল, ওগুলো পরবর্তীতে খাওয়া যাবে চিন্তায়।

---

[১০৯] রওজাতুস সফা ৫/৩৫; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৭/১৩৮; তাবাকাতে নাসিরি ১/৩৬৭

[১১০] তাবাকাতে নাসিরি ১/৩৬৭

দিন যতই গড়াচ্ছিল, ঠান্ডা ও বরফবারি নেমে আসছিল ঝেঁপে। বরফের শুভ্র চাদরে ঢাকা পড়ে যাচ্ছিল চারদিক। কিন্তু তাতাররাও খুব জেদি। তারা কোনোভাবেই হাল ছাড়ার পাত্র ছিল না। বরফ কেটে রাস্তা খোলাসা করে করে তারপর সামনে এগোতে লাগল। চলতে চলতে এগিয়ে গেল বহুদূর। এর মধ্যে কখনও খোরাকি কমে গেলে ঘোড়ার রগ কেটে সেখানটায় মুখ লাগিয়ে চুকচুক করে চুষে খেতে লাগল রক্ত। কী ভয়ানক মানবরূপী পশু এরা! রক্ত খেতে খেতে খিদে-জ্বলন্ত পেট যখন মোটামুটি ঠান্ডা হয়ে আসত, কাটা রগের জায়গাটা সুন্দর করে সেলাই করে দিত।

তখন দেড়শ মাইল চওড়া বিশাল মরুভূমির ভেতর তাতার-বাহিনীর কালো কালো মাথাই শুধু চোখে ভাসছিল। যেন অজস্র হরফ এঁকে পুরোপুরি ভরে ফেলা হয়েছে খাতার চওড়া একটা পাতা। তিল ধারণের ঠাঁইটুকু অবশিষ্ট নেই। আশ্চর্য লেও সত্য—পিঁপড়ের মতো এমন গিজগিজে অবস্থা সত্ত্বেও প্রতিটি সৈন্যসারি খুব শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে এগোচ্ছিল।

যেতে যেতে প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে ফেলল তারা। এমন এক স্থানে এসে পৌঁছাল, যেখান থেকে খানিক দক্ষিণে গেলেই সেই কুদরতি রাস্তা, যা দিয়ে বহু শতাব্দী ধরে মধ্য-এশিয়া ও চীনের লোকজন নিজ-নিজ দেশে যাওয়া-আসা করত। এই সড়ককে বলা হতো উত্তরের রাজপথ।[১১১]

জোচি খানের অগ্রযাত্রা

এখানটায় এসে চেঙ্গিজ খান বাহিনী দু-ভাগে বিভক্ত করে ফেললেন। তার দৃষ্টিতে এতে ছিল কয়েকটি লাভ। বড় ছেলে জোচির হাতে ২০ হাজার সৈন্য দিয়ে এই প্রাচীন পথে তাকে রওনা করিয়ে দিলেন। খাওয়ারিজমের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে গিয়ে লেগেছে এই পথ।[১১২] চেঙ্গিজ খান ধারণা করেছিলেন—খাওয়ারিজম শাহ এদিক থেকেই আক্রমণের আশঙ্কা করবে এবং সৈন্যদল নিয়ে এদিকেই অগ্রসর হবে মোকাবেলার জন্য। ফলে খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের পেছন-দিক ও মধ্যাংশ খালি পড়ে যাবে।

জোচিকে প্রদত্ত নির্দেশনা

চেঙ্গিজ খান জোচিকে বললেন—খাওয়ারিজম শাহের এই সম্ভাব্য ভুল ধারণাকে পোক্ত করতে দ্রুত তোমাকে উত্তর-পূর্ব সীমান্তে গিয়ে উঠতে হবে এবং সেখানেই আটকে ফেলতে হবে তাকে। এর ভেতর ভিন্ন পথে গিয়ে আমি বোখারা অবরোধ করে ফেলতে চাইছি।

---

[১১১] তাবাকাতে নাসিরি ১/৩৬৭; চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১৩, পৃষ্ঠা ১০১

[১১২] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১৩, পৃষ্ঠা ১০২; তাবাকাতে নাসিরি ৩৬৭

জোচিকে ওদিক থেকে পাঠিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্য আরেকটি গোপন উদ্দেশ্য ছিল। এই প্রাচীন রাজপথের আশপাশেই তুকতুগান নামের এক গোত্রসরদার বাস করত। এককালে তাতার-বাহিনীকে বড় জ্বালাতন করেছে সে। চেঙ্গিজ খান চাচ্ছিলেন—খাওয়ারিজম শাহের সাথে যুদ্ধে নামার আগেই যেন নির্মূল করে ফেলা যায় তুকতুগানের ফেতনা। নাহয় মাঝপথে ও এসে আবার বাধ সেধে বসে কি না কে জানে!

জোচি দক্ষিণদিকে মোড় নিয়ে ৭ হাজার ফিট উঁচু পাহাড়ি গিরিপথ অতিক্রম করে মধ্য-এশিয়ায় যে রাস্তাটা গেছে, সেখানে গিয়ে পৌঁছে। তিয়ান-শিয়ান পর্বতের ভেতর দিয়ে গেছে রাস্তাটা। জোচি দ্রুত সে-পথে খাওয়ারিজম সীমান্তের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এই রাস্তা বৃক্ষবীথির ভেতর দিয়ে সোজাসুজি গিয়ে সাইহুন-নদী ছুঁয়েছে।[১১৩]

পাঠকদের মনে আছে হয়তোবা—কিছুকাল আগে চীনা তুর্কিস্তানের হাকিম কিশলুক খানকে শায়েস্তা করতে জুবি নৈয়ানকে একটি সৈন্যদল দিয়ে পাঠানো হয়েছিল।[১১৪] কিশলুককে শায়েস্তা করে ওই এলাকাতেই থেকে গিয়েছিল জুবি নৈয়ান। চেঙ্গিজ খান এবার তাকেও খাওয়ারিজম আক্রমণে শামিল হওয়ার আদেশ দিয়ে রাখলেন। জোচি খানের ২০ হাজার সিপাহির সাথে এসে শরিক হল জুবি নৈয়ানের সৈন্যদল। ফলে খাওয়ারিজমের উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল ধ্বংস করতে গঠিত হল একটি শক্তিশালী ও তৎপর বাহিনী।

খাওয়ারিজম শাহের পরামর্শ

খাওয়ারিজম শাহ নিশ্চিত ছিলেন যে, চেঙ্গিজ খানের বার্তাবাহককে যখন হত্যা করে ফেলেছেন তিনি, অবশ্যই বেধে উঠবে যুদ্ধ। এজন্য তিনি উত্তর-পূর্ব সীমান্তে গুপ্তচর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। দূর থেকে তাতার-বাহিনীকে আসতে দেখে ছুটতে ছুটতে এক গুপ্তচর খাওয়ারিজম শাহের কাছে আসে এবং খুলে বলে ঘটনা। খাওয়ারিজম শাহ ভাবিত হয়ে পড়েন। তার বিশ্বস্ত শিহাবুদ্দীন খুয়ুফির কাছে দ্রুত পরামর্শ চান।

শিহাবুদ্দীন বলেন—আপনার বাহিনীও কিন্তু বিশাল! তবে আশপাশের গোত্রগুলো থেকে আরও সিপাহি নিতে হবে। সেজন্য 'নফিরে আম'[১১৫]-এর ঘোষণা করে দিন। মুসলমানদের উপর যাতে, নিজ নিজ জান-মাল ব্যয়সহ, আপনাকে সাহায্য করাও জরুরি হয়ে ওঠে। সবকিছু গোছগাছ করে সমস্ত সেনা নিয়ে, সাইহুন-নদী অতিক্রম করে দুশমনের আসার পথে গিয়ে, তাদের জন্য অপেক্ষা করা উচিত।

---

[১১৩] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১৩, পৃষ্ঠা ১০২

[১১৪] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১৩, পৃষ্ঠা ১০৩

[১১৫] সর্বসাধারণের জিহাদে শামিল হওয়ার ঘোষণা

দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসে তাতাররা যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বে, আমরা তাজাপ্রাণ সেপাইদের নিয়ে একসঙ্গে খতম করে ফেলব তাদের।

এই সাদাসিধে পরামর্শ খুব পছন্দ হয়ে গেল খাওয়ারিজম শাহের। তবে এতে আমল করার আগে সাম্রাজ্যের আমিরদের পরামর্শসভায় একত্র করে তাদের অভিমত নিলেন। কমান্ডাররাও রাজ্যের সীমান্ত এলাকায় সেনাবাহিনী একত্র করার পরামর্শটি পছন্দ করলেন; কিন্তু ভিন্নমত পোষণ করলেন নদী পেরিয়ে সামনে এগোবার ক্ষেত্রে।

তাদের অভিমত ছিল–যতক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে বুঝে-ওঠা না যায় যে তাতার-বাহিনী এদিকেই আসছে, আমরা স্রেফ সন্দেহের ভিত্তিতে ওই একদিকেই পুরো সেনাশক্তি নিয়োগ করে বসতে পারি না। বিশেষত, নদী-তীরের পাহাড়ি এলাকাগুলোতে দুশমনের মুঠোর ভেতর চলে যাবে আমাদের বাহিনী। তারা আমাদের কোণঠাসা করে ফেলবে। ওখানে চারদিক থেকে ময়দান সঙ্কীর্ণ বলে ইচ্ছেমতো আমরা লড়তে পারব না তাদের সাথে। দুশমনের বেড়ের মধ্যে পড়ে যেতে পারি আমরা।

এই বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ করে অভিজ্ঞ সেনানায়করা সাইহুন-নদী পেরোবার ব্যাপারটাকে ঝুঁকিপূর্ণ সাব্যস্ত করলেন। খাওয়ারিজম শাহের কাছে আরজ করলেন–জাহাঁপনা, আমাদের অভিমত হল, দুশমনকে আমরা সংকীর্ণ সেই ঘাঁটিগুলো পেরিয়ে সাইহুনের পারে এসে ওঠার সুযোগ দেব। এখানটায় আমরা তাদেরকে কবজায় নিয়ে আসতে পারব। একজনকেও জীবিত ফিরে যেতে দেব না।[১১৬]

সেনাপতিদের এই বক্তব্য প্রকৃতপক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু আফসোস, খাওয়ারিজম শাহ তাতে একমত হননি। তিনি ভাবছিলেন—এই বেদুইন পশুগুলোকে সন্ত্রস্ত করবার উপায় একটাই–আগ বাড়িয়ে নিজে গিয়ে আক্রমণ করে বসা।

মূলত, মোঙ্গলিয়া থেকে উঠে-আসা তাতার-তুফানের মোকাবেলার জন্য এক প্রজ্ঞাপূর্ণ শক্ত পদক্ষেপের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেননি খাওয়ারিজম শাহ। তিনি ভেবেছিলেন—কোনো বিপদই তাকে ঘিরতে পারবে না।

গভীর পরিকল্পনার পরিবর্তে প্রাসঙ্গিক কিছু ব্যবস্থাপনা তিনি নিয়েছিলেন বটে; তবে সেসব ছিল অনর্থক। বরং এভাবে বলি যে, ক্ষতিকর সিদ্ধান্ত। যেমন :

১. সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় করার জন্য প্রজাদের কাছ থেকে অগ্রিম দু-বছরের ট্যাক্স উসুল করে নিলেন।

---

[১১৬] ইবনুল আসির ৭/৫৭৩

২. সমরকন্দের চারপাশে ৩৬ মাইল দীর্ঘ শক্তিশালী প্রাচীর নির্মাণের আদেশ দিলেন। পরিকল্পনা ছিল—প্রয়োজন পড়লে এখানে সংঘবদ্ধ হয়ে দীর্ঘ সময় তাতারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া যাবে। শেষমেশ ক্লান্ত হয়ে দুশমন হয়তো পিছপা হতে বাধ্য হবে।

দুটো পদক্ষেপই ছিল অনুপকারী। দুই বছরের অগ্রিম ট্যাক্স গ্রহণের ফলে সে বছর (৬১৬ হিজরি) প্রজারা দেউলিয়া হয়ে গেল। এজন্য সামষ্টিক আত্মরক্ষার যুদ্ধে প্রজাদের আস্থা অর্জন করতে পারেনি রাষ্ট্র।

দ্বিতীয় বিষয় তথা প্রাচীর নির্মাণ-খাতে পুরো এক বছরের অর্থ ব্যয় হয়েছিল, তা অনর্থক সাব্যস্ত হয়। তিনি এটা ভেবে দেখেননি যে, প্রাচীর নির্মাণের আগেও বেধে যেতে পারে যুদ্ধ!

এই দুটো পদক্ষেপ ছাড়াও, খাওয়ারিজম শাহ সেনাবাহিনীতে ইরান ও খোরাসানের বিভিন্ন গোত্র থেকে অধিকহারে লোক ভর্তি করার হুকুমও দিয়ে রেখেছিলেন।[১১৭] প্রতিরোধ-বিবেচনায় দুর্বল সীমান্তবর্তী শহরগুলোর লোকদের প্রথম থেকেই সতর্কতাবশত অন্য শহরগুলোতে স্থানান্তর করছিলেন।[১১৮]

খাওয়ারিজমি বাহিনীর সীমান্তের দিকে রওনা

কয়েক সপ্তাহের প্রস্তুতির পর খাওয়ারিজম শাহ ৪ লাখ সিপাহির এক বিরাট বাহিনী নিয়ে উত্তর-পূর্বের সীমান্ত এলাকাগুলোর দিকে রওনা দিলেন।[১১৯] ৮ শাওয়াল ৬১৬ হিজরি মোতাবেক ১৭ ডিসেম্বর ১২১৯ খ্রিষ্টাব্দে বোখারায় গিয়ে পৌঁছলেন।

সেখানে দুই-তিন দিন অবস্থান করার পর ফের এগোলেন সামনে। সমরকন্দে পৌঁছে সেখানেও কাটালেন কিছুদিন। জোচি খান সেনাবাহিনী নিয়ে এই উত্তর-পূর্ব দিক থেকেই খাওয়ারিজম সীমান্তে অগ্রসর হচ্ছিল।[১২০]

শাহজাদা জালালুদ্দীন তাতারদের ঘাঁটিতে

জোচি খান খুব কাছাকাছি এসে গেছে—এই সংবাদ যখন শুনলেন খাওয়ারিজম শাহ, সর্বপ্রথম ১৫ হাজার সিপাহিকে শাহজাদা জালালুদ্দীনের অধীনে দিয়ে বললেন—সাইহুন-নদী পেরিয়ে তাতারদের আসবার পথে গিয়ে ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকো। ওখান

---

[১১৭] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৮৯; নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৬১; খাওয়ারিজম শাহি ৯৯; চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১৪, পৃষ্ঠা ১০৬

[১১৮] ইবনে খালদুন ৫/১০৫

[১১৯] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১৪, পৃষ্ঠা ১০৬

[১২০] জাহাঁকুশা ২/১০০

দিয়ে যখন তাতাররা অতিক্রম করবে, তাদের উপর আচমকা হামলা করে বসবে। না-জেনে দুশমন তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ফলে তারা পিছিয়ে যেতে বাধ্য হতে পারে। এই প্রথম পরাজয়েই সম্ভবত ভীত হয়ে পড়বে তারা। আর বেশি সামনে অগ্রসর হবার হিম্মত করে উঠবে না।

জালালুদ্দীনের নেতৃত্বে ১৫ হাজার মুসলিম সৈনিক নদী পেরিয়ে পাহাড়ের গিরিপথে এক বিশেষ জায়গায় পৌঁছে ঘাঁটি গেড়ে বসে রইল। জালালুদ্দীন প্রতিদিনই শ্বাসরুদ্ধকর সংবাদ পাচ্ছিলেন যে, ২০ হাজার তাতার সিপাহি এদিকেই আসছে। কিন্তু আচমকা এক দুঃখজনক কাণ্ড ঘটে গেল। গুপ্তচরদের মাধ্যমে তাতাররা জেনে গেল বাহিনী-সমেত গোপন ঘাঁটিতে ওত পেতে আছে জালালুদ্দীন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগমুহূর্তে এমন গুরুত্বপূর্ণ একটা গোপন খবর পেয়ে যাওয়াতে প্রমাণিত হয়, খাওয়ারিজমি বাহিনীর ভেতর গাদ্দারের অভাব ছিল না।

তাতাররা সংবাদটা পাওয়ামাত্র বাঁক ঘুরিয়ে ভিন্নদিকে চলে গেল। ডানে এবং বামে, অল্প-অল্প সিপাহি আলাদা-আলাদাভাবে বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে এসে জালালুদ্দীনের অজ্ঞাতে তার বাহিনীকে ঘিরে ফেলল। তাতারদের এই আক্রমণ রাত্রি-আঁধারে হঠাৎ আসা তুফানের মতোই ছিল। অনেক সিপাহি তাতে শহিদ এবং অনেকে আঘাতপ্রাপ্ত হল। বাকিরা প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে গেল। শক্ত মোকাবেলার পরেও শাহজাদা জালালুদ্দীন যখন দেখলেন বিজয়লাভ অসম্ভব, পিছপা হওয়াকেই প্রাধান্য দিলেন। দুশমনের ঘেরের ভেতর থেকে তিনি খুব কষ্টে বেরোতে পেরেছিলেন সেদিন। তারপর দীর্ঘ সফর শেষে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এলেন পিতার কাছে।

বাহিনীর এই দুরবস্থার কথা শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন খাওয়ারিজম শাহ। তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিলেন—বিশাল সৈন্যবহর নিয়ে অবিলম্বে নিজেই অগ্রসর হবেন তিনি। লৌহপ্রাচীরের মতো সারিবদ্ধভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া হবে এবার।[১২১]

তুকতুগানের সাথে জোচির মোকাবেলা

ওদিকে চেঙ্গিজ খানের নির্দেশনা মেনে জোচি সেই পাহাড়ি এলাকায় বসবাসরত বিদ্রোহী তুর্কি-সরদার তুকতুগানকে খতম করতে চাচ্ছিল। তুকতুগান যখন তাতার-বাহিনীর আসার সংবাদ পেল, গোত্র-সমেত সে ভেগে গেল। কানকালি গোত্রগুলির যেখানে বাসস্থান, সেই কারাকোরামের দিকে যাত্রা করল। এর একটু সামনেই ছিল খাওয়ারিজমের উত্তর-পূর্ব সীমান্তবর্তী শহর জান্দ।

খাওয়ারিজম শাহ সমরকন্দে বসে সংবাদ পেলেন—তুকতুগান সীমান্তবর্তী শহরগুলোর দিকে এগোচ্ছে। এই আওয়ারা সরদারের সাথে খাওয়ারিজমের

---

[১২১] তারিখে কাবির লিয-যাহাবি ৬২/৬১৭, ৬২৮

সম্পর্কও ভালো ছিল না। খাওয়ারিজম শাহ ভাবলেন—তাতারদের আগে একেই তা হলে খতম করা যাক। ফলে কিছু সিপাহি নিয়ে সেদিকেই রওনা দিলেন তিনি। কিন্তু সমরকন্দ থেকে কিছুদূর এগোতেই সংবাদ পান—তুকতুগানের পেছনে আসছে তাতার-বাহিনী।

খাওয়ারিজম শাহ তখন বুঝে গেলেন তুকতুগানের আসার মূল কারণ। পুরো চালচিত্রই তার সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। খাওয়ারিজম শাহ নিজেও এসেছিলেন তাতারদের সাথে মোকাবেলা করতে। সংবাদটা জানতে পেরে 'এক তিরে দুই শিকার' টাইপের একটা ভাবনা খেলে গেল তার মনে। চাইলেন, এই এক হামলাতে দুই বাহিনীকেই খতম করে দেবেন।

তিনি তখন তার সঙ্গে-থাকা বাহিনীকে স্বল্পসংখ্যক ভেবে উলটো পথে সমরকন্দে ফিরে এলেন এবং এখানে রয়ে-যাওয়া সৈন্যদের নিজের নেতৃত্বে নিয়ে পৌঁছে গেলেন সীমান্ত-শহর জান্দে।[১২২]

তুকতুগান তখনও খাওয়ারিজমি সীমান্ত থেকে খানিকটা দূরে, এমন সময় জোচি তাকে ধরে ফেলল। রক্তক্ষয়ী সংঘাতের পর তুকতুগানের পুরো বাহিনীকেই নিঃশেষ করে দিল সে।[১২৩]

এর পূর্বে জোচি খান কিছু তাতার-সেনাকে লুটপাটের জন্য খাওয়ারিজমের সীমান্তপ্রদেশে পাঠিয়ে দিয়েছিল। তারা সাইহুন-নদীর আশপাশের গ্রামগুলোতে নৈশ-হামলা চালিয়ে মহিষ, গরু ও খাদ্যখোরাকি লুট করে নিয়ে যাচ্ছিল। এলাকার কেউ সংঘর্ষ বাধাতে চাইলে তারা তাকে হত্যা করে ফেলত। বাড়িঘরে জ্বালিয়ে দিত আগুন। তারপর পাহাড়ের গুহায় গিয়ে লুকিয়ে পড়ত।[১২৪] মূলত এদেরকে প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল—রসদ ও খোরাকি গ্রাস করার পাশাপাশি খাওয়ারিজম শাহকে এই বিপজ্জনক পাহাড়ি গিরিপথগুলোতে ডেকে আনা। কারণ, জোচি ভেবেছিল, শাহের জন্য এগুলো হতে পারে মৃত্যুর ভয়ংকর ফাঁদ।

খাওয়ারিজম শাহ সীমান্ত পেরিয়ে সাইহুন-নদীর দুই শাখার মধ্যবর্তী একটি স্থানে পৌঁছে দেখেন—রক্তে-মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে হাজারো লাশ। হতভম্ব হয়ে যান তিনি। জানতে পারেন—একদিন আগে তাতার ও তুকতুগানের মাঝে এখানে যুদ্ধ বেধেছিল। বিজয় লাভ করেছে তাতাররা।[১২৫] খাওয়ারিজম শাহ ভাবেন—এক দুশমন তো এমনিতেই খতম হয়ে গেছে। কিন্তু তাতারদের ছেড়ে দেওয়া যায় না। তাতাররা নাকি এই পাহাড়গুলোতেই লুকিয়ে আছে। খুব বেশি দূরে না।

---

[১২২] রওজাতুস সফা ৪/৮২৩

[১২৩] জাহাঁকুশা ২/১০১

[১২৪] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১৪, পৃষ্ঠা ১০৬

[১২৫] জাহাঁকুশা ২/১০২

সেখানে এখন কিছুসংখ্যক সৈনিক নিয়ে অগ্রসর হওয়াই যথেষ্ট মনে করলেন তিনি। তাই ৪ লাখের অধিকাংশ সেপাইকে নদীর কিনারে ছেড়ে, বাকিদের নিয়ে তিনি সংকীর্ণ ও ঘোরানো-প্যাঁচানো পাহাড়ি রাস্তায় ঢুকে পড়লেন।[১২৬] দুপাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সুবিশাল পাহাড়।

সেনা-অফিসাররা অবশ্য এ থেকে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু একদিকে সীমান্তে ঘটতে থাকা সেই লুটতরাজ খাওয়ারিজম শাহকে ক্রুদ্ধ করে তুলছিল, অন্যদিকে তাতাররা সামনে এগোচ্ছিল না দেখে বেড়ে যাচ্ছিল তার সাহস। ব্যাপারটাকে তিনি দুশমনের দুর্বলতা মনে করে বসেছিলেন। খাওয়ারিজম শাহ তখন পৃথিবীর ছাদ-খ্যাত পামির মালভূমি ও মাউন্ট তিয়ান-শিয়ানের গিরিপথে সফর করছেন।

হামদুল্লাহ মুসতাওফা কাজবিনির বর্ণনামতে—এ অঞ্চলকে তখন কাশগরের সীমান্তভুক্ত এলাকা গণ্য করা হতো।[১২৭]

তাতারদের পিছু-পিছু একদিনের অভিযান শেষে এক সকালে খাওয়ারিজমি সেপাইরা গাছপালাভর্তি এক ছোট্ট উপত্যকায় গিয়ে পৌঁছে। তখন জোচি খানও বাহিনী-সমেত এই উপত্যকারই অন্যপ্রান্তে অবস্থান করছিল।[১২৮]

দূর থেকে এক তাতার সরদার খাওয়ারিজমিদের সৈন্যসংখ্যা অধিক দেখে ভয় পেয়ে গেল। আতঙ্কিত চেহারায় জোচি খানকে সে পরামর্শ দিল—চলুন, আমরা আরও পিছিয়ে যাই। আমাদের প্রধান বাহিনীর সাথে গিয়ে মিশি। তারপর নাহয় একযোগে সর্বশক্তিতে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ব সবাই। এটাই বোধকরি ভালো হবে।

জোচি এই কাপুরুষোচিত পরামর্শ পছন্দ করল না। পিতা তাকে আদেশ করেছে দ্বিতীয় আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত যেন খাওয়ারিজম শাহকে এই রণাঙ্গনেই আটকে রাখে সে। পরামর্শদাতা সরদারকে খানিকটা রাগতস্বরে সে বলল—চেঙ্গিজ খানের ছেলে যদি ময়দান ছেড়ে পালায়, তার পিতাকে সে কীভাবে মুখ দেখাবে, বলো![১২৯]

মানে, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত জোচি। আশ্চর্যজনক কথা হল—(সমস্ত মুসলিম ইতিহাসবিদ তাতে একমত) তা সত্ত্বেও খাওয়ারিজম শাহের কাছে জোচি খান চিঠি প্রেরণ করেছিল যে, খানে আজমের কাছ থেকে আপনার সাথে যুদ্ধ করবার অনুমতি মেলেনি। এখানে আমরা অন্য একটি উদ্দেশ্যে এসেছিলাম। হ্যাঁ, আপনি যদি যুদ্ধ শুরু করে দেন, তবে আমরাও ফিরে যাব না।[১৩০]

---

[১২৬] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১৪, পৃষ্ঠা ১০৭

[১২৭] তারিখে গুযিদাহ ১/৪৯৭

[১২৮] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১৪, পৃষ্ঠা ১০৭; জাহাঁকুশা ২/১০২

[১২৯] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১৪, পৃষ্ঠা ১০৭

[১৩০] রওজাতুস সফা ৪/৮২৩; জাহাঁকুশা ২/১০২-১০৩

জোচি খান এরকম চিঠি পাঠিয়েছিল বোধকরি শত্রুপক্ষকে গাফেল রাখার জন্য, যাতে পরবর্তী সময়ে এসে আচমকা হামলা করা যায় এবং সৈন্যসংখ্যা স্বল্প হওয়া সত্ত্বেও অর্জন করা যায় নিশ্চিত বিজয়। চিঠির উত্তরে খাওয়ারিজম শাহ বলেছিলেন—চেঙ্গিজ খান তোমাদেরকে আমাদের সাথে যুদ্ধ না-করার আদেশ দিয়েছে; কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তো আমাদেরকে তোমাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবার নির্দেশ দিয়েছেন। যুদ্ধের সর্বোত্তম প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন তিনি। আমার কাছে তোমরা কিংবা অন্য কোনো দুশমন—সবাই সমান।

এই জবাবের ভেতর দিয়েই কিন্তু যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে ফেলেছিলেন খাওয়ারিজম শাহ। উপত্যকার ভেতরেই সৈন্যদের সারিবদ্ধ করে ফেললেন তিনি। মোকাবেলার জন্য তাতার-বাহিনীও কাতারবদ্ধ হয়ে সামনে এসে গেল।

মুসলমান ও তাতারদের মাঝে প্রথম যুদ্ধ

খাওয়ারিজম শাহ খানিকটা বিস্ময় এবং অনেকটা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে সারিবদ্ধভাবে অগ্রসরমান তাতার-বাহিনীকে দেখছিলেন। তাতারদের দেহে ছিল পশমের লম্বা পোশাক। বড়সড় শক্তিশালী ঘোড়ার পিঠে কোনো ধরনের জিন ছাড়াই বসে ছিল তাদের একেকজন সৈনিক। হাতে না ছিল কোনো ঢাল, গায়ে না ছিল লৌহবর্ম। এমনকি তাদের নিকট প্রতিরক্ষাকারী ভারী কোনো সমরাস্ত্রের নামনিশানা পর্যন্ত ছিল না। শুধু তলোয়ার, তির ও কামান ছিল প্রতিটি সিপাহির প্রকৃত সরঞ্জাম। কারুর কাছে বর্শাও ছিল।[১৩১]

তাতারদের দেখার পর ঘাড় ঘুরিয়ে খাওয়ারিজম শাহ নিজের সারিবদ্ধ সৈনিকদের দিকে তাকালেন—আরব্য ঘোড়ায় বসে আছে একেকজন অসামান্য সাহসী সিপাহি। বর্শাসজ্জিত তুর্কি বাহিনী। সারিবদ্ধ পদাতিক তিরন্দাজ বাহিনী। আফগান ও পারস্যের তলোয়ারধারী বাহিনী। সবার হাতেই লোহার ভারী ঢাল। সবাই জালিদার ঝকঝকে সোনালি লৌহবর্ম পরিহিত। সূর্যকিরণে শিশার মতো চমকাচ্ছে চকচকে ঢাল ও তরবারি। শাহের মনের গভীরে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেল যে, আজ বিজয় আমাদের জন্যই নির্ধারিত।

তিনি আর কাল ক্ষেপণ করলেন না। সঙ্গে সঙ্গে হুকুম দেন আক্রমণের। বেজে ওঠে যুদ্ধের দামামা। বেধে ওঠে রক্তক্ষয়ী সংঘাত।

এই লড়াইয়ের পর থেকেই একে-একে শুরু হয়ে যায় তাতারদের রক্তঝরা সব অভিযানের সিলসিলা। তাতে পুরো মুসলিমবিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি এলাকা পরিণত হয় মৃত্যুপুরীতে।

---

[১৩১] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১৩, পৃষ্ঠা ১০১

স্ফুলিঙ্গ ছড়াচ্ছে প্রচণ্ড যুদ্ধের অগ্নিশিখা। তাতার ও তুর্কি সেনারা একদম কাছাকাছি, গা ঘেঁষে ঘেঁষে, একহাতের মতো দূরত্বের ভেতর থেকে ঘোড়ার পিঠে বসে তলোয়ার চালাচ্ছে। উদ্ধত তাতার-বাহিনী খাওয়ারিজমি সিপাহিদের কচুকাটা করে ফেলছে। খাওয়ারিজম শাহ দ্রুতই বুঝে গেলেন—আজ এ উপত্যকায় বড় বাজেভাবে ফেঁসে গেছে তার বাহিনী। অশ্বারোহীদের জন্য তেজোদ্দীপ্ত গতিতে তলোয়ার চালানো কঠিন হয়ে উঠেছে। তিরন্দাজরা খুঁজছে তাদের সূক্ষ্ম দক্ষতা প্রকাশের উপযুক্ত সুযোগ। সেই সুযোগ কোনোভাবেই পেয়ে উঠছে না। দুই দল এতটা ঘেঁষাঘেঁষি করে লড়ে যাচ্ছে যে, তির ছুড়লে নিজেদের সৈন্যদের গায়ে বিঁধে যাওয়াও বিচিত্র নয়। ময়দানে তাতার-বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল খাওয়ারিজমি সৈন্যদের অর্ধেকের চেয়েও কম।[১৩২] এই স্বল্পতাতেও তাদের মধ্যে যুদ্ধ সংক্রান্ত কোনো ত্রুটি দেখা যাচ্ছিল না। চাপাচাপির কারণে খাওয়ারিজমি সৈন্য-সারিতে জায়গা হচ্ছিল না বলে দুশমনের সাথে তারা তেমন খোলামেলা লড়তে পারছিল না। তাদের প্রথম সারির যারা তাতারদের সাথে একদম মুখোমুখি লড়ে যাচ্ছিল, তাতার-বাহিনী তাদের ভেতর শুরু করল ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ।

যুদ্ধের নাজুক মুহূর্ত

চোখের সামনে সেদিন খাওয়ারিজম শাহ জীবনের সবচেয়ে বিস্ময়কর, ভীতিপ্রদ ও আপাত-অবাস্তব এক দৃশ্য প্রতিফলিত হতে দেখছিলেন। তাতার সওয়ারিরা বিজলির ঝটকায় একের পর এক খাওয়ারিজমি সেনাদের দ্বিখণ্ডিত করে দিচ্ছিল। তাদের এই নিষ্ঠুরতা, বাহাদুরি ও রক্তোন্মত্ততাই খাওয়ারিজমের সাধারণ সৈনিকদের মনে আতঙ্ক ধরিয়ে দেবার জন্য ছিল যথেষ্ট। সাধারণ সৈন্যরা বাহিনীর একেবারে অভ্যন্তরে ছিল বলে সাময়িকভাবে তারা একটু নিরাপত্তার মধ্যে ছিল। তবে যমের মতো প্রসারিত হস্ত নিয়ে ক্রমেই বিপদ তাদের গলার কাছে এগোচ্ছিল, চেপে ধরবে বলে।

ক্রমে ক্রমে তারা পিছু হটতে চাচ্ছিল। কিন্তু পরবর্তীরা অর্থাৎ একদম পেছনের সারির সেনারা তাদের সাহস ও সমর্থন যোগাবার চেষ্টা করছিল। কাজ হচ্ছিল না। প্রতিনিয়ত অগ্রসরমান তাতার-বাহিনী আশপাশ থেকে খানিক উঁকি দেওয়ার ভঙ্গিতে তলোয়ার চালিয়ে অসংখ্য মস্তক নামিয়ে ফেলছিল মুসলিম সেনাদের ধড় থেকে। রক্তে চারদিক তখন লাল। তারপর যেতে যেতে হঠাৎ করেই দু-দিক থেকে মুসলিমদের ঘিরে ফেলল তারা। তখন, কীভাবে খাওয়ারিজম শাহকে গ্রেফতার করা যায়, সেটাই হয়ে উঠল তাদের প্রধান চেষ্টা।[১৩৩]

---

[১৩২] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১৪, পৃষ্ঠা ১০৮

[১৩৩] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১৪, পৃষ্ঠা ১০৮

খানিক আগেও বিজয়ের স্বপ্নে বুঁদ হয়ে ছিলেন খাওয়ারিজম শাহ। এবার নিজেকে দেখছেন মৃত্যুমুখে দাঁড়িয়ে থাকতে। তার মেরুদণ্ড দিয়ে বয়ে গেল ভয়ের এক অস্বাভাবিক শীতল স্রোত। শিউরে উঠল দেহের প্রতিটি লোমকূপ। এই দুর্দশা থেকে কীভাবে বেঁচে উঠতে পারেন, তখন সেই নিয়ে তার যত উদ্বেগ ও চঞ্চলতা।

কিন্তু সময় তখন একেবারেই ফুরিয়ে গেছে। তাতাররা মহা উল্লাসে তলোয়ার উঁচিয়ে শাহের স্রেফ শ-দেড়শ গজের ভেতর এসে গেছে। খাওয়ারিজম শাহের দু-চারজন দেহরক্ষীকেও তারা কচুকাটা করে ফেলল। এই একটুক্ষণ পরেই তাদের রক্তলোলুপ তরবারি নেয়ে উঠবে শাহের রক্তে। পৃথিবীর কারুর এখন সাধ্য নেই শাহকে বাঁচায়। এ মুহূর্তে বেঁচে উঠতে পারাটা হবে তার জন্য এক অলৌকিক ঘটনা। শাহের মাথাটা ভীষণ ফাঁকা ফাঁকা লাগতে শুরু করল। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে ছিলেন বটে; তবে সম্মুখে ছিল শুধু জমাটবাঁধা গাঢ় অন্ধকার। তখন বেঁচে থেকেও যেন মরে গেছেন তিনি।

জালালুদ্দীনের পালটা আক্রমণ

আচমকা নারায়ে তাকবিরের বজ্রধ্বনিতে কেঁপে ওঠে ময়দান। খাওয়ারিজম শাহ, যেন সংবিৎ ফিরে পেয়েছেন, এমন এক ভঙ্গিতে চমকে ওঠেন। দেখেন—শাহজাদা জালালুদ্দীন (যাঁর নেতৃত্বে ছিল বাহিনীর দ্বিতীয় অংশ) তার জানবাজ বাহিনী নিয়ে উপত্যকার এক কোণে গর্জে উঠেছেন।[১৩৪] তাতার-বাহিনীও সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা চালালো প্রতিরোধের।

কিন্তু জালালুদ্দীন ও তার সহযোদ্ধারা খাওয়ারিজম শাহকে ভয়ে থমকে যেতে দেখে পলকের মধ্যে চলে এলেন শাহের দেহরক্ষীদের কাছাকাছি। বিক্ষিপ্ত হয়ে-যাওয়া শাহি রক্ষীদল ও সহযোদ্ধাদের একত্র করে পিতার উপর আক্রমণাত্মক হয়ে-ওঠা তাতারদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি।

তার তলোয়ার বিজলির মতো ঝলকানি দিয়ে দুশমনকে রক্তাক্ত করতে শুরু করল। কড়ায়-গণ্ডায় উসুল করে নিতে লাগল প্রতিশোধ। খাওয়ারিজম শাহ পুত্রের এই সাহসিকতা দেখে মুগ্ধ হয়ে পড়েন। সেই মুগ্ধতার উপজাত হিসেবেই ভেতর থেকে তার উঠে আসে অফুরন্ত দোয়া। জালালুদ্দীনের উপর্যুপরি আক্রমণে তাতার-বাহিনী বিক্ষিপ্তভাবে পিছু হটতে থাকে। মুসলিমদের অভ্যন্তরীণ সৈনিকরাও ফের দ্রুত সারিবদ্ধ হয়ে ওঠে।[১৩৫]

দুর্দমনীয় লড়াইয়ে ময়দানের উৎক্ষিপ্ত ধুলোয় তখন ঢেকে গেছে সমস্ত আকাশ। সেই ধুলোর আস্তরণ ভেদ করে জমিনে এসে পড়তে পারছে না সূর্যের আলো।

---

১৩৪ রওজাতুস সফা ৪/৮২৩; জাহাঁকুশা ২/১০২-১০৩

১৩৫ রওজাতুস সফা ৪/৮২৩,

ময়দানজুড়ে শুধু আবছাভাবে ভাসছে উঁচিয়ে-ধরা অজস্র তলোয়ার ও বর্শা। খানিক আগের বয়ে যাওয়া রক্তস্রোত ধুলোবালির সাথে মিশে চটচটে হয়ে উঠেছে। কোথাও কোথাও তখনও গড়াগড়ি খাচ্ছে টাটকা রক্ত। সেই রক্তে পিছলে যাচ্ছে ঘোড়াদের পা। জায়গায়-জায়গায় দুশমন তাই ঘোড়া থেকে নেমেই সংঘর্ষ বাধাতে চাচ্ছে।[১৩৬]

সেদিন, সংকীর্ণ উপত্যকায় দুইদল এত কাছাকাছি লড়ে গেল যে, তলোয়ার চালানোর সুযোগটাও রইল না। খঞ্জর, তলোয়ারের কোপ কখনও নিজেদেরই সৈনিকদের উপর পড়তে লাগল। প্রতিমুহূর্তে বদলে যাচ্ছিল যুদ্ধের চিত্রপট। কখনও মুসলিমবাহিনী তাতারদের পিছপা করে দিচ্ছিল, কখনওবা মুসলিমদের উপর চড়াও হয়ে উঠছিল তাতার। ময়দান সংকীর্ণ হওয়ায় দুইদল বৃত্ত রচনা করে লড়ে যাচ্ছিল।[১৩৭] একবার এক মুসলিম সৈনিকের তলোয়ার দ্বিগুণ শক্তিতে জোচির মাথার একেবারে কাছাকাছি চলে গেল। কোপটা বসাবে ঠিক সেই মুহূর্তে মধ্যখানে এসে বাধ সেধে বসে এক খাতাই শাহজাদা।[১৩৮] নয়তো জোচি খান এই তলোয়ারের আঘাতেই মারা পড়ত।

আরেকবার তাতারদের আক্রমণে খাওয়ারিজমি বাহিনীর অবস্থানও নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে আবার প্রকাশ পেয়েছিল শাহজাদা জালালুদ্দীনের যোগ্য নেতৃত্ব। তিনি সৈন্যদের নেতৃত্ব দিয়ে প্রবল শক্তিতে আক্রমণ করেন তাতারদের উপর। ফলে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়।[১৩৯] সেদিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত অব্যাহত থাকে এই জীবন-মৃত্যুর লড়াই। মাগরিব ও ইশার মাঝামাঝিতে রাত্রি যখন অন্ধকার হয়ে ওঠে, ধীরে-ধীরে দুইদল পিছিয়ে আসতে শুরু করে।[১৪০]

ইবনুল আসিরের তারিখুল কামিল গ্রন্থে বর্ণিত আছে—এই যুদ্ধ লাগাতার তিন দিন অব্যাহত ছিল। তাতে মুসলিমদের ২০ হাজার সৈনিক শহিদ হয়েছিলেন। হ্যারল্ড ল্যাম্ব ও জুওয়াইনির বর্ণনা থেকে বোঝা যায় লড়াই একদিনেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। হ্যারল্ড ল্যাম্ব বলেছেন মুসলিম শহিদদের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৬০ হাজার। আবার এই বর্ণনাকে তিনি নিজেই অতিরঞ্জন বলেছেন।

যা হোক, তবু নিশ্চিতভাবেই বলা যায়—এই যুদ্ধে মুসলিমবাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। ফলে আগ্রাসনের প্রথমদিকেই খাওয়ারিজম শাহ ও তার অধিকাংশ আমির তাতার-জাতির ব্যাপারে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন। আর পরবর্তী প্রতিটি যুদ্ধে ব্যাপকহারে প্রকাশ পেতে থাকে এই ভীতির মন্দ প্রভাব।

---

[১৩৬] ইবনুল আসির ৭/৫৭৪

[১৩৭] তাবাকাতে নাসিরি ১/৩৬৬

[১৩৮] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১৪, পৃষ্ঠা ১০৮; তাবাকাতে নাসিরি ১/৩৬৬

[১৩৯] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১৪, পৃষ্ঠা ১০৮

[১৪০] জাহাঁকুশা ২/১০৩

প্রত্যাবর্তন

উপত্যকার এ যুদ্ধ তখনও চূড়ান্ত কোনো প্রেক্ষাপট তৈরি করতে পারেনি। পরবর্তী হামলায় কিছু-একটা ঘটতে পারত। কিন্তু জোচি তার আসল উদ্দেশ্য হাসিল করে ফেলেছিল। সেজন্য ওখানে থাকা আর উচিত মনে করেনি সে। খাওয়ারিজমি বাহিনীকে ধোঁকা দিতে রাতেরবেলা জায়গায়-জায়গায় শূন্য তাঁবু খাটিয়ে কোথাও-কোথাও আগুন জ্বালিয়ে সে চলে গেল।

দুইদিকের সেনা-ব্যারাকের মাঝখানে ছিল একটি নদীর ব্যবধান। ওপারে রাতভর তাতারদের তাঁবুর কাছে আগুনের লকলকে শিখা জ্বলতে দেখে এপার থেকে খাওয়ারিজমিদের মনে ভুল বিশ্বাস তৈরি হল যে, তাতাররা এখনও আছে। কিন্তু ভোরবেলা উঠে দেখে, এখান থেকে রাতারাতি তারা কেটে পড়েছে।[১৪১] তাতারদের অপেক্ষায় একটা রাত অনর্থক কাটাতে হল মুসলিমদের। পরবর্তীকালের জন্য বিপদেরও কারণ হয়েছিল ব্যাপারটা। তবু জোচির ফিরে যাওয়াতে খাওয়ারিজম শাহ স্বস্তির এক গভীর নিঃশ্বাস ফেললেন। সবকিছু গোছগাছ করে পাহাড়ের সেই পাদদেশ থেকে ফিরে আসতে দেরি করলেন না। পেছনে ফেলে এলেন ২০ হাজার মুসলিম সিপাহির টকটকে তাজা রক্ত।

বিজয়োৎসব

সাইহুন-নদী অতিক্রম করে খাওয়ারিজম শাহ সীমান্তবর্তী প্রাচীর-বেষ্টিত শহরগুলোতে ঢুকে পড়লেন। মনে করছিলেন—তাতার-বাহিনী দ্বিতীয়বার আক্রমণ করতে চাইলে এদিক থেকেই অগ্রসর হবে। আফসোস, তখনকার প্রকৃত হালচিত্র পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেননি তিনি। তারপর সরকারিভাবে সারা রাজ্যে যুদ্ধজয়ের ঘোষণা ছড়িয়ে দিলেন। অল্পদিন পরে খাওয়ারিজমি বীর সেনাদের রাষ্ট্রীয় পোশাক প্রদানে ধন্য করেন।[১৪২]

চেঙ্গিজ খানের অবস্থান

ইতিপূর্বে পড়ে এসেছেন, চেঙ্গিজ খান মূল বাহিনী নিয়ে মধ্য-এশিয়াগামী সিল্করোড দিয়ে সোজা পশ্চিম দিকে চলে গিয়েছেন। এই সড়ক তেমন যাত্রা-উপযুক্ত ছিল না। পদে পদে ছিল প্রাকৃতিক দুর্যোগের আশঙ্কা। আবহাওয়াও কেমন পালটে গিয়েছিল। চেঙ্গিজের বাহিনী তবু প্রাণপণ চেষ্টায় সামনে এগিয়ে গেছে।

---

[১৪১] জাহাঁকুশা ২/১০৪; তাবাকাতে নাসিরি ১/৩৬৬

[১৪২] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১৪, পৃষ্ঠা ১০৯

বসন্তের শুরু তখন। পাহাড়গুলো থেকে গলে গলে বরফ পড়ে সাইহুন-নদীতে উন্মত্ত মৌজ সৃষ্টি করছে। তাতাররা গিয়ে বলকশ লেকের পতিত ময়দানগুলিতে ঢুকে পড়ল।[১৪৩] এ মরুভূমি এলাকায় উঠে তারা খুব দ্রুত সামনে এগোতে থাকল। তারপর একেবারে সাইহুন-নদীর পারে গিয়ে তাঁবু খাটাল। যেখানে তাঁবু টানিয়েছিল, সেখান থেকে সাইহুন-নদী গিয়ে অরাল সাগরে মিশেছে। কিছুদিন আগে মুসলিম ও তাতারদের মাঝে খাওয়ারিজমের যে সীমান্ত এলাকায় প্রথম যুদ্ধটা বেধেছিল, সেখান থেকে সাইহুনের এদিকটা পড়েছিল অনেকটা দূরে। কয়েক দিন ধরে দিগ্বিদিক ছড়িয়ে-থাকা তাতার সেপাইরা চেঙ্গিজের কাছে এখানে এসে জড়ো হচ্ছিল; এবং পরবর্তী আক্রমণের জন্য তারা প্রস্তুতি নিচ্ছিল ব্যাপক। মুসলিম বণিকের বেশে গুপ্তচর ও বার্তাবাহকেরা দু-তিনজন করে রওনা হয়ে গিয়েছিল খাওয়ারিজমের সীমান্ত এলাকাগুলোতে।

কিছুদিন পর তিয়ান-শিয়ান পর্বত থেকে জোচি খানের পক্ষ হতে বার্তাবাহক আসে। চেঙ্গিজ খানের কাছে জোচির প্রথম যুদ্ধে সফল হওয়ার কথা বর্ণনা করে সে। খাওয়ারিজম শাহের দুর্বল কর্মপন্থা ও সেনাশক্তির খুঁটিনাটি অবগত করে তাকে। চেঙ্গিজ খান জোচির শক্তি বৃদ্ধির জন্য আরও ৫ হাজার সৈন্য ওদিকে পাঠিয়ে দেন।[১৪৪] সঙ্গে হুকুম দিয়ে দেন—সাইহুন-নদী থেকে খাওয়ারিজম শাহ পিছু হটতেই তীরবর্তী শহরগুলো যেন ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দেয় জোচি, তারপর পূর্বদিক থেকে সমরকন্দ অভিমুখে অগ্রযাত্রা করে।

খাওয়ারিজম শাহের অনুভূতিশূন্যতা

সাইহুন-নদীর অববাহিকায় প্রথম যুদ্ধে অনেক মুসলিম সিপাহির প্রাণ গিয়েছে। ভেতরে-ভেতরে কি খাওয়ারিজম শাহ খানিক ভেঙে পড়েছিলেন? অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে রাজ্যের মধ্যখানে এসে তাঁবু খাটিয়েছিলেন তিনি। পরবর্তী কর্মপন্থা ঠিক কী হতে পারে—সেই নিয়ে তার গভীর চিন্তাভাবনা তখন। যুদ্ধের প্রজ্ঞাপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সতর্ক দৃষ্টিতে আগে শত্রুপক্ষের গতিধারা উপলব্ধি করা প্রয়োজন ছিল। খাওয়ারিজম শাহের দুর্ভাগ্য যে, সেক্ষেত্রে তার গুপ্তচরেরা যথাযথ সংবাদ বয়ে আনতে পারেনি। তাদের কেউ কেউ হয়তো দুশমনের হাতে বিক্রি হয়ে গিয়েছিল।

তাতার-বাহিনী পৃথক-পৃথকভাবে কয়েক দিক থেকে প্রচণ্ড বিক্রমে এদিকেই অগ্রসর হচ্ছিল। খাওয়ারিজম শাহ সেই পরিস্থিতি পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেননি। মূলত, প্রথম যুদ্ধেই ভীষণ ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গেছিল বলে ভেতর থেকে আত্মবিশ্বাস

---

[১৪৩] আনুমানিক এটি ফেব্রুয়ারি ১২২০ খ্রিষ্টাব্দের (জিলহজ ৬১৬) প্রথমদিকের কোনো দিন ছিল।

[১৪৪] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১৪, পৃষ্ঠা ১০৯

হারিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। রক্তের মধ্যে পূর্বের সেই উত্তেজনা আর ছিল না। তিনি এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাধারণ বোধশক্তিও লোপ পেয়েছিল তার। তার সামনে তাতার সম্পর্কিত কোনো আলোচনা হতেই সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে তিনি বলে উঠতেন—না, না, আমি এই তাতারদের মতো যুদ্ধংদেহী শক্তিশালী জাতি আর দেখিনি! তাদেরকে তলোয়ার কিংবা বর্শায় আঘাত করবার মতো কেউ নেই।[১৪৫]

এই ভীতিবিহ্বলতার ভেতর কী ধরনের সিদ্ধান্ত তিনি নেবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। এর মধ্যে হঠাৎ করে সংবাদ এলো—ওদিকে তাতাররা আতরার, কুকন্দ ও সাইহুনের তীরবর্তী অন্যান্য শহরে আক্রমণ শুরু করে দিয়েছে। তারপর প্রায় প্রতিটি শহরের গভর্নর শাহের কাছে সহযোগিতা তলব করে পয়গাম পাঠাতে শুরু করেছিল।

জুবি নৈয়ানের আক্রমণ

এদিকে জুবি নৈয়ান জোচি খানের থেকে পৃথক হয়ে বহুকষ্টে দক্ষিণ-পূর্বের পাহাড় ও হিমবাহ পেরিয়ে (যেখান থেকে নদীর শুরু) সমরকন্দ অভিমুখে অগ্রসর হতে লাগল। এই সংবাদ আরও অনেক পরে পেয়েছিলেন খাওয়ারিজম শাহ। ততক্ষণে জুবি নৈয়ান সমরকন্দের প্রায় দুইশ মাইল দূরত্বের মধ্যে এসে গেছে।[১৪৬] পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বদিক থেকে তাতার-বাহিনীর এই একযৌগিক অতর্কিত যুদ্ধযাত্রায় খাওয়ারিজম শাহের চেতনা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেল। তিনি বুঝতে পারছিলেন না কোনো কিছু। এক হাজার মাইলের চেয়েও বিস্তৃত ময়দান নিয়ে তখন গড়ে উঠেছে নতুন রণাঙ্গন।

যথাযথ সংবাদ সরবরাহের দুর্বলতার কারণে খাওয়ারিজম শাহ জানতে পারলেন না যে, সমরকন্দ অভিমুখী দুশমনদের সংখ্যা স্রেফ ২০ হাজার। এই স্বল্পসংখ্যকদের পক্ষে সমরকন্দের মতো মজবুত দুর্গ কবজা করে ওঠা সহজ কাজ নয়। যদি প্রকৃত চিত্র খাওয়ারিজম শাহের সামনে থাকত, হয়তোবা এতটা ভেঙে পড়তেন না তিনি। ভাবতে লাগলেন—সমরকন্দ ও অন্যান্য শহরের প্রতিরক্ষা এখন কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

খাওয়ারিজমি শক্তির বিভক্তি

খাওয়ারিজম শাহ যুদ্ধের জন্য পরামর্শসভা ডাকলেন। রাজ্যের আমির, সেনাপতি ও শাহজাদারা দীর্ঘসময় ধরে এ নিয়ে আলোচনা করলেন। শাহজাদা জালালুদ্দীন ও সকল জেনারেলের অভিমত ছিল—আমাদের পুরো বাহিনীকে একত্র করে,

---

[১৪৫] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৪৮

[১৪৬] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১৫, পৃষ্ঠা ১১৩

একেবারে প্রথমদিকেই চূড়ান্ত যুদ্ধে নামতে হবে খোলা ময়দানে।[১৪৭] এখন সামষ্টিকভাবে শক্তি যোগানোর সময়।

শাহজাদা ও অভিজ্ঞ সরদারদের এই অভিমত খুবই যুক্তিসঙ্গত ছিল। এ অনুযায়ী যদি শাহ কাজ আঞ্জাম দিতেন, খাওয়ারিজমিরা যুদ্ধবাজ তাতারদের সাথে যে পেরে উঠত না, সে-কথা বলা যায় না। আফসোস, খাওয়ারিজম শাহ এই মূল্যবান অভিমতটি প্রত্যাখ্যান করে বসলেন। তিনি নিজে হয়তোবা ধোঁকায় পড়ে গিয়েছিলেন। অথবা ভেতরে-ভেতরে উম্মাহর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব থেকে পালিয়ে বেড়াবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে পুরো জাতিকেই ধোঁকায় ফেলে রাখতে চাচ্ছিলেন।

তিনি সেনাপতিদের বোঝালেন—আমাদের সকল প্রাচীরবেষ্টিত শহর ও দুর্গ খুবই সুরক্ষিত। তাতাররা কয়েক মাস পর্যন্ত মাথা কুটে মরলেও জয় করে উঠতে পারবে না সেসব। খেত-খামারের ফসলাদি ও বাগ-বাগিচার ফলমূল লুটপাট করবে, তা করুক। তবে আক্রমণে ব্যর্থ হয়ে সেসব নিয়েই তারা ফিরে যাবে। এজন্য নির্দিষ্ট কোনো রণাঙ্গনে চূড়ান্ত যুদ্ধে অবতীর্ণ না-হয়ে প্রাচীর-ঘেরা বিভিন্ন শহরে অবস্থান করে কেবল প্রতিরোধ করে যাওয়াটাই যথেষ্ট।[১৪৮]

খাওয়ারিজম শাহ তখন পুরো বাহিনী থেকে ২ লক্ষ সিপাহিকে আলাদা করে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন শহর রক্ষার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। ইয়ান্নাল খানের হাতে ২৫ হাজার সিপাহি দিয়ে আতরার প্রতিরোধের জন্য নিযুক্ত করলেন তাকে।

কিতলুগ খানকে ১০ হাজার সিপাহি দিয়ে কান্ত নগরীর দায়িত্ব দিলেন। ফখরুদ্দীন নাসাবিকে আদেশ দিলেন সিজিস্তানের বাহিনী নিয়ে তিরমিজ রক্ষার এবং বালাখমুর খান ও আবু মুহাম্মদকে দায়িত্ব দিলেন বলখ রক্ষণাবেক্ষণের।

বোখারাকে তাৎক্ষণিক কোনো আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত মনে করলেন তিনি। তাতারদের পক্ষে বোখারার অনতিক্রম্য প্রাচীর ডিঙোনো সম্ভব হবে না ভেবে সেখানে ৩০ হাজার সৈন্য নিযুক্ত করাই যথেষ্ট মনে করলেন। ইনাজ খান ও ইখতিয়ারুদ্দীন কিশকিকে বানালেন সেই বাহিনীর কমান্ডার।

নাসাবি বলেছেন—সৈন্যদলের এই বিভক্তিই ছিল মূলত খাওয়ারিজম শাহের পরাজয়ের সবচেয়ে বড় কারণ। নাসাবি লেখেন—সেনাশক্তি বিক্ষিপ্ত করে খাওয়ারিজম শাহ চরম ভুল করেছেন। তা না করে যদি পুরো বাহিনী জমাটবদ্ধ করে মোকাবেলায় নামতেন তিনি, চেঙ্গিজ খানকে পিছু হটতেই বাধ্য করতেন না শুধু; বরং ভূপৃষ্ঠ থেকে তার নামনিশানা পর্যন্ত মুছে ফেলতে পারতেন।

---

[১৪৭] তারিখে খাওয়ারিজম শাহি ৯৯; সূত্র : সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৩৬, প্যারিস থেকে মুদ্রিত

[১৪৮] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১৫, পৃষ্ঠা ১১৩

যা হোক, খাওয়ারিজম শাহ অধিকসংখ্যক সৈন্যকে বিক্ষিপ্ত করে ফেললেন। অবশিষ্ট ১ লক্ষ ১০ হাজার সৈন্য নিয়ে নিজে রওনা দিলেন সমরকন্দ অভিমুখে।[১৪৯] অথচ বাহ্যিকভাবে তখন সমরকন্দেই বিপদের সবচেয়ে বড় আশঙ্কা। কারণ, বার্তাবাহকদের বর্ণনা অনুযায়ী তাতার-বাহিনী সেখান থেকে স্রেফ দুইশ মাইল দূরত্বের মধ্যে ছিল। খুব শিগগির স্পষ্ট হয়ে গেল যে, খাওয়ারিজম শাহের 'প্রজ্ঞাপূর্ণ' এই কর্মপদ্ধতি মূলত বাস্তবতার বিপরীত। সব তার মনের অলীক কল্পনা।

সমরকন্দ থেকে খানিক দূরেই চোখে পড়ছিল জুবি নৈয়ানের ২০ হাজার সৈন্যের অগ্রগামিতা। বলা যায়, তাদের এই অগ্রসরতা ছিল কেবল প্রদর্শনীমূলক একটি কাজ। কারণ, তাদের পাঠানোই হয়েছিল শাহকে শুধু এইদিকে নিমগ্ন রাখবার জন্য। অন্যদিকে বোখারা পড়ে গেল (খাওয়ারিজম শাহের ধারণায় তখনকার পূর্ণ সুরক্ষিত শহর) তাতারদের ভয়ানক আক্রমণের মুখে। চেঙ্গিজ খান অতি দ্রুত সেই মরুভূমি এলাকা থেকে বেরিয়ে বোখারার পেছন দিক থেকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন শহরে।

সাইহুনের পারে রক্তের মহোৎসব

এদিকে জোচি খান পিতার নির্দেশনা মেনে সাইহুন-নদীর কিনারে এসে রাজত্ব শুরু করে দিল। সিকনাক, আসনাস, বারজালিগ কান্ত-সহ ছোট ছোট শহরগুলো ভগ্নস্তূপে পরিণত করে জান্দের দিকে এগিয়ে গেল সে। জান্দের গভর্নর কিতলুগ খান ভয়ে শহর ছেড়ে পালিয়ে গেল। শহরবাসী সন্ত্রস্ত আত্মায় প্রাচীরের ফটক বন্ধ করে বসে রইল অভ্যন্তরে। ভীতবিহ্বল তারা মোকাবেলার হিম্মত হারিয়ে ফেলল। তাতার-বাহিনী এসে নিশ্চিন্তে প্রাচীর টপকে ঢুকে পড়ল শহরের ভেতর।

জান্দ শহর কবজার পর জোচি খান এসে বানাকাত শহরে আক্রমণ করে। সেখানকার গভর্নর এলতাকু তিনদিন পর্যন্ত প্রাচীরের ভেতর আবদ্ধ থেকেই তাতারদের মোকাবেলা করে যান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হিম্মত হারিয়ে ফেলেন তিনি। শত্রুদলের কাছে গিয়ে প্রাণভিক্ষা চান। তাতাররা তাকে প্রতিশ্রুতি দেয় কাউকে তারা হত্যা করবে না। ফলে শহরের ফটক খুলে দিলেন এলতাকু। তাতাররা শহরে ঢুকেই ভুলে গেল তাদের প্রতিশ্রুতির কথা। সর্বত্র চালাল নির্বিচার হত্যাযজ্ঞ।[১৫০] নিজেদের তলোয়ারগুলি রক্তে পুরোপুরি স্নান করিয়ে ধ্বংসদানবরা রওনা দিল কুকন্দ শহরের উদ্দেশে।

---

[১৪৯] রওজাতুস সফা ৪/৮২৪; নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৬১

[১৫০] রওজাতুস সফা ৫/২৮

মুসলিমবিশ্বে দু-দিক থেকে আক্রমণ

মুসলিমবিশ্বের ইতিহাসে ৬১৬ হিজরিকে (১২১৯ খ্রিষ্টাব্দ) আমরা সবচেয়ে ভীতিকর ও নাজুক সময় গণ্য করতে পারি।

একদিকে পাষণ্ড বাহিনীকে নিয়ে পূর্বদিক থেকে চেঙ্গিজ খান মুসলিমবিশ্বের সব সীমান্ত শহর চুরমার করে দিচ্ছিলেন, অন্যদিকে ইউরোপের ক্রুসেড যোদ্ধারা রোমসাগর পেরিয়ে মুসলিমবিশ্বের পশ্চিমের শহরগুলোতে চালাচ্ছিল উপর্যুপরি হামলা। মিশর ও সিরিয়ার বাদশাহ আল-মালিকুল আদিলের মৃত্যুর পর সেই বিশাল সাম্রাজ্য তার ছেলেদের মাঝে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ভেঙে পড়ে সেখানকার ঐক্যবদ্ধ শক্তি। ইউরোপের খ্রিষ্টানরা এই সময়টাকে আল-কুদস দখলের সুবর্ণ সুযোগ মনে করেছিল।

৬১৬ হিজরির শাবান মাসের ২৭ তারিখে বৈকাল ও বলকশ লেকের মধ্যবর্তী মরু-অঞ্চল অতিক্রম করে চেঙ্গিজ খান যখন মুসলিমবিশ্বের পূর্বদিকের সীমান্ত এলাকাগুলোতে পৌঁছে যান, ইউরোপের ক্রুসেডাররা তখন মুসলিমবিশ্বের পশ্চিমাঞ্চলগুলো ডিঙিয়ে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধকেন্দ্র দিময়াত কবজা করে ফেলে। একই সময়ে মুসলিমবিশ্ব পড়ে যায় দু-দিকের দুই শত্রুর আক্রমণের মুখে। দু-দিকেরই প্রতিরোধমূলক সমস্ত শহর প্রচণ্ড আক্রমণে মিশে যায় ধুলোর সাথে।

আল্লামা ইবনুল আসির এই নাজুক সময়কার ইসলাম ও মুসলিমদের নিয়ে শোকগীতি লিখেছেন—এই দিনগুলিতে ইসলাম ও মুসলমান এমন ভয়ানক মুসিবতে পড়েছে যে, পূর্বের কোনো সম্প্রদায়ই মুখোমুখি হয়নি এ অবস্থার। এক মুসিবত তো এইসব তাতার হায়না, আল্লাহ তাদের ক্ষমতার ভেলা ডুবিয়ে দিক, এরা এসেছে পূর্বদিক থেকে আগ্রাসন চালিয়ে, ঘটাচ্ছে এমনসব পাশবিক কুকাণ্ড, যার সংবাদ শুনেই অন্যরা সব হয়ে পড়ছে ভীত-সন্ত্রস্ত!

ওদিকে ফিরিঙ্গিদের প্রবল আক্রমণ, নেমেছে আরেক কঠিন আপদ, তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ নামুক। এরা পশ্চিম থেকে এসে হামলা করে বসেছে সিরিয়ায়। এবার ভাবছে মিশর বিজয়ের কথা। তারা যে দিময়াত দখল করেছে, সেটাও তো এক মহা মুসিবত। আল্লাহর পরম অনুগ্রহ ও সাহায্য যদি না-হতো শামিলে-হাল, ফিরিঙ্গিরা এতক্ষণে মিশর, সিরিয়াসহ অন্যান্য ইসলামি অঞ্চল কবজা করে ফেলত পুরোপুরি!

এই বিপন্নতার আরেক দিক হল—এখনও কিছু মুসলমান এই দুই দুশমনের অধীনে দিব্যি বেঁচে আছে, খাচ্ছেদাচ্ছে, তলোয়ার নিয়ে মাঠে নামছে স্বজাতিকেই করতে নিঃশেষ। এ হচ্ছে এক ভয়ানক ফেতনা। আমাদের সামনে এখনও যা সুস্পষ্ট। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন!!

ব্যস, এখন কেবল আল্লাহর কাছে কাকুতি-ঝরা এটুকু প্রার্থনা—তিনি যেন নিজে থেকেই মুসলিমদের সাহায্য ও বিজয় প্রদান করেন। নিঃসন্দেহে ইসলামের সহায়তাকারীরা এর প্রতিরক্ষাকারী আর সেই প্রতিরক্ষকারীরা সব খতম হয়ে গেছে।

وَ اِذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ [১৫১]

যখন আল্লাহ কোনো সম্প্রদায়ের উপর মুসিবতের ফয়সালা করেন, তা কেউ ঠেকাতে পারে না। আল্লাহ ছাড়া তাদের কোনো সাহায্যকারী থাকে না।[১৫২]

অষ্টম অধ্যায়

সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী

رباط يوم فى سبيل الله خير من الدنيا وما عليها

আল্লাহর পথে একদিন সীমান্তে পাহারাদারি করা দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা-কিছু আছে, সমস্ত হতে উত্তম।

কুকন্দের মর্দে মুজাহিদ

খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের পূর্বদিকে এক বিশাল-বিস্তৃত সুদৃশ্য শহর ছিল কুকন্দ।[১৫৩] সাইহুন-নদীর তীরবর্তী এই শহরটি ছিল খুব চমৎকার—ঝকঝকে সবুজে ছেয়ে আছে চারপাশের সব উপত্যকা, মাঝেমধ্যে বিশাল ডালপালা-ছড়ানো উঁচু-উঁচু গাছের নিবিড় সারি। দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত সুবিস্তৃত আনার, খরবুজা ও তরমুজের অসংখ্য বাগিচা। হঠাৎ হঠাৎ ছোট ছোট পাহাড়ি গ্রাম। তৎসংলগ্ন খেত-খামার। মায়াবী ফসল। পাহাড়ি চারণভূমিতে অবনত মস্তকে একমনে ঘাস খেয়ে চলে ভেড়া-বকরির পাল। দূর থেকে চোখে ভাসে পাড়ায় পাড়ায় প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন মসজিদের শুভ্র সুউচ্চ মিনার।

পাহাড় থেকে এলেমেলো বরফকণা উড়ে এসে ঢেকে দেয় সাইহুন-নদীর পার। বিকেলের রোদ লেগে তা কেমন মায়াবী এক আভায় ঝলমল করে ওঠে। যেন-বা ভূপৃষ্ঠের অতুলনীয় নির্মাণশৈলীতে গেয়ে ওঠে স্রষ্টার প্রশংসাগীতি।

এই কুকন্দের হাকিম ছিলেন তুর্কি বংশোদ্ভূত অনন্য বীরত্ব ও প্রতিভাদীপ্ত এক যোদ্ধা তৈমুর মালিক। ন্যায়বিচার, প্রজাবাৎসল্য ও সর্বোত্তম চরিত্রে ইতোমধ্যে তিনি হয়ে উঠেছিলেন জনতার নয়নের মণি। যুদ্ধের কলাকৌশল, শক্তি ও চতুরতায় লোকে তাকে রোস্তম ও সোহরাব পাহলোয়ানের সমতুল্য ভাবত। তুর্কিজাতির যুদ্ধকৌশল, সাহসিকতা ও নেতৃত্বগুণ পুরোমাত্রায় ছিল তার ভেতর।[১৫৪]

সুলতান আলাউদ্দীন যখন সেনাবাহিনী নিয়ে পাহাড়ি পামির এলাকায় অগ্রসর হয়েছিলেন—সেখানে তাদের জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। তারপর সাইহুন-নদী পার হয়ে কোনোরকমে ফিরে এসেছিল তারা। তৈমুর মালিকের মধ্যে তখনই এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, দুশমন এবার খুব শিগগির সীমান্ত শহরগুলো ধ্বংসস্তূপে পরিণত করবে। ফলে তখন থেকেই প্রতিরক্ষামূলক প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিলেন তিনি।

---

[১৫৩] কুকন্দকে খাজান্দ ও খাদকানও বলা হয়েছে। এটি বর্তমান তাজিকিস্তানের একটি প্রসিদ্ধ শহর।

[১৫৪] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১৪, পৃষ্ঠা ১০৯

কিছুদিন পর তাতারদের ৫ হাজার সিপাহিসজ্জিত একটি বাহিনী এসে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলল কুকন্দ নগরী।[১৫৫] এই বাহিনী ছিল প্রথম সারির একটি খণ্ডিত সেনাদল মাত্র। জোচি খান আরও ২০ হাজার সৈনিক নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল পেছন-পেছন।[১৫৬] তৈমুর মালিকের সৈন্যসংখ্যা ছিল মাত্র এক হাজার। সবাইকে নিয়ে শহরের পেছন থেকে বের হয়ে তিনি নদীর চওড়া পারে গিয়ে উঠলেন। তীরবর্তী সমস্ত নৌকা জমা করলেন দ্রুত। তারপর সৈনিকদের নৌকায় তুলে নদীর দুই শাখার মধ্যখানে জেগে-ওঠা এক দ্বীপের ভেতর গিয়ে লুকোলেন। সেই দ্বীপে মজবুত একটি দুর্গ ছিল। দুর্গে ওঠার পর প্রতিরক্ষামূলক সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করলেন তিনি।[১৫৭]

কিছুদিন পরে জোচি খানের নেতৃত্বে যখন তাতারদের আসল বাহিনী এসে নদীতীরে পৌঁছাল, তৈমুর মালিক ততক্ষণে চওড়া নদীর মধ্যবর্তী দ্বীপে পুরোপুরি আশ্রয় নিয়ে ফেলেছেন। তীরে কোনো নৌকাই তিনি ফেলে যাননি। সব এনে দ্বীপের পাশে ভিড়িয়ে রেখেছেন। তাতাররা তাকে ধরবার কোনো উপায় না-দেখে ক্রোধে যেন অন্ধ হয়ে গেল। তাদের তিরন্দাজ বাহিনী বিকট হাঁক ছেড়ে কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেল। সাঁই সাঁই করে লাগাতার তির ছুড়তে থাকল দ্বীপের দিকে।

নদীটা বেশ চওড়া বলে একটা তিরও ঠিক নিশানায় গিয়ে পড়ছিল না। ঝপাঝপ দ্বীপের আশপাশে পড়ে তলিয়ে যাচ্ছিল পানির ভেতর। তখন জোচি খান নদীর পার থেকেই মুসলিমদেরকে অবরোধের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলল। দ্রুত কিছু কামান আনালো সে। বিকট আওয়াজে কামান থেকে নিক্ষেপ করতে লাগল বড় বড় পাথর। কিন্তু তিরের মতোই একটি পাথরও দ্বীপের দুর্গে গিয়ে লাগছিল না। ঝপাঝপ ডুবে যাচ্ছিল আশপাশে, পানির নিচে।

কয়েক দিন কেটে যায় এভাবে। দুশ্চিন্তায় জোচির মন ভারী হয়ে ওঠে। কী করা যায় ঠিক সে বুঝে উঠতে পারে না। চেঙ্গিজ খানের আদেশ ছিল—একটি দুর্গ বা প্রাচীরবেষ্টিত শহরও যেন কবজা না-করে সম্মুখে অগ্রসর না-হয় সে। বানাকাত জয়ের পর জোচি ভেবেছিল—সমুদ্রতীরের শহরগুলো শুধু অবরোধের মাধ্যমেই জয় করে ফেলা যাবে। সেখানে হয়তো কোনো সংঘর্ষের প্রয়োজন পড়বে না। তারপর কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সামনে অগ্রসর হওয়া যাবে। কিন্তু কুকন্দের বাঘের আস্তানায় এসে তার পা যেন জমিনে পুঁতে গেল।

তবে, হঠাৎ খানিক আশার আলো জ্বলে উঠতে দেখল সে। তখন সবে দু-চারদিন কেটেছে। এর মধ্যে একদিন তাতারদের কিছু সৈনিক বানাকাত ও আশপাশের

---

[১৫৫] রওজাতুস সফা ৫/২৮

[১৫৬] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১৪, পৃষ্ঠা ১১০

[১৫৭] মুখতাসারুদ দুওয়াল ২৩১

হাজারও বন্দিকে পশুপালের মতো হাঁকাতে হাঁকাতে এদিকেই নিয়ে এল। কুকন্দ অবরোধকারী বাহিনীর সঙ্গে এসে মিলিত হল তারা।

তখন তাতার-বাহিনী এক বিস্ময়কর পদ্ধতি অবলম্বন করল। পূর্বে কোনো রণকুশলী হয়তোবা সে-রকম সফল কোনো অভিযানের কল্পনাও করে উঠতে পারেনি।

মাঝদরিয়ায় রাস্তা

এই বন্দিদেরকে নিকটবর্তী একটি পাহাড় থেকে বড়-বড় পাথর আনতে আদেশ দিল তাতাররা। ক্ষুধায়-ক্লান্তিতে বন্দিরা তখন আক্ষরিক অর্থেই ভেঙে পড়েছে। তবু আদেশ পালন করতে হবে, নাহয় সরাসরি মৃত্যুদণ্ড। বাধ্য হয়ে এরা ধুঁকতে ধুঁকতে ভারী ভারী পাথর উঠিয়ে এনে ছুড়ে ফেলতে লাগল নদীর জলে। একেকটি পাথর যখন ওঠাচ্ছিল, ধনুকের মতো সমস্ত শরীর বেঁকে উঠছিল তাদের। বাহু ও গ্রীবার শিরাগুলো ছিঁড়ে যাবে অবস্থা। তবু, তাতারদের তরবারির নিচে কিছুদিন ধরে এই কাজ চালিয়ে গেল অভুক্ত কাপুরুষের দল। তারপর একসময় দেখা গেল, পানির ভেতর থেকে ধীরে-ধীরে ভেসে উঠছে একটি পাথুরে রাস্তা। প্রতিনিয়ত সেই রাস্তা আগাতে থাকল সামনে, দ্বীপের দিকে।

ওদিকে দ্বীপের দুর্গ থেকে সবকিছু দেখছিলেন তৈমুর মালিক। তিনি দ্রুত বারোটি নৌকা নিয়ে সেগুলোর উপর কাঠের শক্ত ছই স্থাপন করে দিলেন। কাঠের মাঝখান দিয়ে রেখে দিলেন ছোট ছোট কিছু ফোকর। সেইসব ফোকর দিয়ে অনবরত তির ছুড়তে লাগল তৈমুরের তিরন্দাজ বাহিনী। সাঁ সাঁ করে উল্কাবেগে ছুটে যাচ্ছিল একেকটি তির আর পারে কর্তিত কলাগাছের মতো ধপধপ করে পড়ছিল তাতারদের লাশের পর লাশ। অবশ্য তাতার-বাহিনীও এলোপাথাড়ি কিছু তির ছুড়েছিল। কিন্তু কাঠের আড়ালে লুকিয়ে থাকা মুসলিম সিপাহিদের ছুঁতেই পারছিল না সেসব।

আগ্নেয়াস্ত্র

নদীর মাঝে রাস্তা বানানো খুবই কঠিন কাজ। অসংখ্য প্রাণহানির পরেও তাতাররা তা থেকে বিরত হয়নি। তৈমুর মালিককে ধ্বংস করার জন্য ভেবেচিন্তে তারা আগ্নেয়াস্ত্রের কিছু চীনা কারিগরকে কাজে লাগাল। কামান থেকে পাথরের বদলে নিক্ষেপ করার প্রস্তুতি নিল আগুনের গোলা, উত্তপ্ত তেলের মটকা ও জ্বলন্ত মাটির পাত্র।

পরদিন পারের কাছাকাছি এসে মুজাহিদবাহিনী যখন দুশমনকে তিরের নিশানা বানালেন, তক্ষুনি, তাতারদের নিক্ষিপ্ত অগ্নিলাভায় নদীর পানি ছিটকে উঠতে লাগল। তারা শুরু করে দিল কামানের কাজ। সেদিন মুজাহিদদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হল। দ্রুত নৌকা নিয়ে তারা পিছিয়ে গেলেন। দুশমনের এই নতুন চাল দেখে চিন্তিত হয়ে পড়লেন তৈমুর মালিক। দুশমন খুব চালাকির পরিচয় দিচ্ছে। এখন খুব সূক্ষ্ম

বুদ্ধি খাটিয়ে এ যুদ্ধে লড়তে হবে। তৈমুর মালিক দীর্ঘ সময় ধরে মুজাহিদবাহিনীকে নিয়ে পরামর্শ করতে থাকেন। তাদের মধ্য থেকে কয়েকজন কারিগরকে বেছে নিয়ে কিছু দিকনির্দেশনা দেন তিনি। নৌকাগুলির কাঠামো আগের তুলনায় অনেকটা বদলে ফেলেন।[১৫৮]

তৈমুর মালিকের পরবর্তী হামলাটি তাতারদের একদম হতভম্ব করে দিল। তিনি কাঠের ছইয়ের উপর আঠালো মাটির প্রলেপ এঁটে দিলেন। এর উপর স্থাপন করলেন আরেকটি ছই। তাতেও পুরু করে জড়িয়ে দিলেন মাটির প্রলেপ। ফলে আগ্নেয়াস্ত্রের গোলায় নৌকার কাঠ পুড়বার আর কোনো আশঙ্কা রইল না।

নৌকাগুলোকে পারের কাছাকাছি নিয়ে এলেন তিনি। মুজাহিদবাহিনী এবার জুত করে দাঁড়িয়ে অনবরত তিরবৃষ্টি বর্ষণ করতে লাগলেন তাতারদের দিকে। তাদের অনেক সৈন্য নিহত হল। অনেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে ছুটে গেল এদিক-ওদিক। মুজাহিদবাহিনী তারপর ফিরে গেলেন নিজেদের আস্তানায়।

এভাবেই কাটছিল দিন। দেখতে দেখতে চলে গেল তিন মাস। যুদ্ধ চলতে থাকল। এই দীর্ঘ অবরোধে জোচিও খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। অবরোধের দায়িত্ব এক সরদারের কাঁধে ন্যস্ত করে কিছু সৈন্যকে নিয়ে সে নদীর পার ধরে ভাটির দিকে রওনা হয়ে গেল।[১৫৯]

তৈমুর মালিক তখনও মোকাবেলা জারি রেখেছেন। তবে ক'দিন ধরে দেখছিলেন—তাতারদের পাথুরে নদীপথটা দিন-দিন দ্বীপের কাছাকাছি চলে আসছে। কিছুদিন পর আরও সামনে বেড়ে নির্ঘাৎ দুর্গের একদম অভ্যন্তরে আগুনের গোলা নিক্ষেপ করে বসবে তাতাররা। তৈমুর জেনে গেলেন—এই গোঁয়ার তাতার-বাহিনীটাকে তিনি পরাজিত করতে পারবেন না। তবু চালিয়ে গেলেন যুদ্ধ। তার আশা ছিল—তাতারদের যদি এখানেই তিনি ব্যস্ত করে রাখেন, ওদিকে খাওয়ারিজম শাহ ততদিনে বিন্যস্ত করে ফেলতে পারবেন একটি বাহিনী; অন্য কোনো রণক্ষেত্রে পিছপা করে দিতে পারবেন শত্রুদের।

কয়েক মাস ধরে এই পূর্বাঞ্চলে তাতারদের আটকে রাখলেন তৈমুর। তার খুব ক্লান্তি ধরে গেল। ভাবতে লাগলেন—এখান থেকে কোনোভাবে এবার বেরিয়ে যেতে হবে। দীর্ঘদিন পেরিয়ে গেছিল বলে দেখা দিলো খাদ্যসংকট। দুশমনের প্রতিশোধের আগুনে পোড়া ব্যতীত তখন কোনো উপায়ও ছিল না। তৈমুর বুঝলেন—এখন মুসলিমদের নিশ্চিত প্রচুর রক্ত দিতে হবে।

---

[১৫৮] রওজাতুস সফা ৫/২৮

[১৫৯] রওজাতুস সফা ৫/২৮, চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১৪, পৃষ্ঠা ১১০

তৈমুর মালিকের পশ্চাদ্ধাবন

এক অন্ধকার রাতে তৈমুর মালিক সহচরদের নৌকা প্রস্তুত করতে আদেশ দিলেন। ছোট-বড় প্রায় ৭০টি নৌকা। তাদের নিয়ে তিনি নদীর ভাটার দিকে রওনা হয়ে গেলেন।[১৬০] তাতার পাহারাদাররা ছিল খুব চৌকস। তৈমুর মালিকের কাফেলা রওনা হতেই শুকনা পার দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে তারা পেছন-পেছন যেতে লাগল। খুব দ্রুত মুসলিমদের কাফেলার বরাবরে এসে গেল। এ ছিল তৈমুরের জন্য অত্যন্ত বিব্রতকর পরিস্থিতি। নৌকাগুলোকে তক্তা দিয়ে বেড় দিয়ে রেখেছিলেন বটে, যাতে তাতারদের তির নিক্ষেপের ফলে কোনো ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে না-হয়। তাতার-সিপাহিরা যখনই মুসলিমদের নৌকার বরাবর এসে যেত, মুজাহিদরা তাদের দিকে ছুড়ে মারতেন তির। ফলে তারা কিছুটা পেছনে হটে যেত।

কিছুদিন চলল এইভাবে। তৈমুর মালিক গতি থামালেন না, থামাল না পার ধরে ধাওয়া করতে-থাকা তাতাররাও। ওদিকে বানাকাতের দিকের নদীতট তখন অনেকটা কাছাকাছি। ধাওয়াকারী তাতাররা বানাকাতে তাদের যে-বাহিনী ছিল, তার চৌকিদারকে আগেভাগে জানিয়ে দিল দুশমন খুব কাছাকাছি এসে গেছে, তার জন্য মাঝপথে তুমি বাধা সৃষ্টি করো!

নদীপথে আসতে-আসতে তৈমুর মালিক যখন বানাকাতের কাছাকাছি পৌঁছলেন, অবাক হয়ে দেখলেন—দৈত্যাকার এক লোহার জিঞ্জির দিয়ে নদীর মাঝখানে পথ আটকে দেওয়া হয়েছে। তৈমুর এক আঘাতে সেই জিঞ্জির চুরমার করে ফেলেন। রাস্তা সাফ করে এগোতে থাকেন সামনে।

বাহিনী-সমেত আরেকটু সামনেই অবস্থান করছিল জোচি খান। ধাওয়া করে-আসা তাতার-সেনারা জোচির কাছে তৈমুর মালিকের এদিকে আসবার সংবাদ পাঠিয়ে দিল। জোচি কিছু নৌকা নিয়ে নদীর মাঝখানে এসে বাধা হয়ে দাঁড়াল। দুই পারে কয়েকজনকে দিয়ে কামান স্থাপন করাল। দুশমনকে আজ সে খতম করেই ছাড়বে—এরকম একটা সংকল্প দানা বেধে উঠল তার মনে। তৈমুর মালিক নির্ভয়ে জান্দ পর্যন্ত পৌঁছলেন। সেখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তিনি টের পেয়ে গেছিলেন সম্মুখে তাতাররা নিশ্চয় বাধা হয়ে দাঁড়াবে। তাতে বাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে।

তাই জোচির সুসজ্জিত কামান-শ্রেণি পর্যন্ত পৌঁছার আগেই রাতের আঁধারে বারজালিগ কান্ত-এর কিনারে কাফেলা নামিয়ে অন্যদিকে রওনা হয়ে গেলেন তিনি।

শুকনো দিয়ে আসা তাতার-বাহিনী অনেক পরে জানতে পারল—মুসলিমদের নৌকার ভেতর কেউ নেই। ততক্ষণে মুজাহিদবাহিনী এগিয়ে গেছে অনেক দূর।

---

[১৬০] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১৪, পৃষ্ঠা ১১০

তারপর তাতার-বাহিনী তাদের পেছনে ধাওয়া করতে শুরু করল। তৈমুর মালিক তখন কাফেলাকে সামনে এগিয়ে যেতে বলে নিজে আটকে যেতে লাগলেন জায়গায়-জায়গায়। সুযোগ বুঝে মোকাবেলা করতে লাগলেন তাতারদের সাথে। মাঝেমধ্যে একাই তাদের পিছপা পর্যন্ত করে দিতে লাগলেন।

এভাবে কিছুদিন কেটেছিল। তাতারদের পথে তৈমুর মালিক বারবার একাই বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিলেন। তারপর আগে বেড়ে ফের কাফেলার সঙ্গে মিশে যাচ্ছিলেন। কিন্তু একসময় অধিকাংশ সৈন্যই আহত হয়ে পড়লেন। অনেকে হলেন শহিদ। কেউ কেউ গেল পালিয়ে।

শেষমেশ শুধু রয়ে গেছিলেন তৈমুর মালিক একা। তাকে ধরতে তিনটি ঘোড়া হাঁকিয়ে ছুটে আসছিল তিন তাতার। তৈমুরের তূণীরে তখন তিরও ছিল মাত্র তিনটি। ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। ধনুকটা এক শত্রুর চোখের দিকে তাক করে ধরে, ঘাড়টা একটুখানি বাঁ-দিকে হেলিয়ে চোখ কুঁচকে ছুড়ে দিলেন তির। লক্ষ্যভ্রষ্ট হল না। সাঁ করে উড়ে গিয়ে খচ করে গেঁথে গেল দুশমনের চোখে। তৈমুর দূর থেকে চিৎকার করে উঠলেন—তোদের হিসেব অনুযায়ী আরও দুটো তির রয়ে গেছে। যদি মরতে না চাস, চলে যা। এখনও সময় আছে। এ দুটো তির ব্যয় করব বলে আমার আফসোস লাগছে!

অশ্বারোহী দুই তাতার ক্লান্তিতে আগেই ভেঙে পড়েছিল। ফলে সামনে না-এগিয়ে তারা পিছু হটে গেল।[১৬১]

কুকন্দ যুদ্ধে তৈমুর মালিকের অসাধারণ বীরত্ব ও হুঁশিয়ারি নিয়ে মুসলিম ও তাতারদের ভেতর সমানভাবে আলোচনা হতে লাগল। সঙ্গে শুধু ১ হাজার মুজাহিদ নিয়ে ২০ হাজার তাতার-সেনার বিরুদ্ধে লাগাতার তিন মাস যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া, তাতারদের ব্যাপক জান-মালের ক্ষতি সাধন করে বেঁচে ফিরে আসতে পারা—নিশ্চয় সহস্র প্রশংসার দাবি রাখে।

তৈমুর মালিকের জিহাদি অগ্রযাত্রা

কুকন্দে যখন যুদ্ধ চলছে, তখন বোখারা, সমরকন্দ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু এলাকা পুরোপুরিভাবে তাতারদের হাতে চলে গেছে। এজন্য তৈমুর মালিক সরাসরি রাজধানী আরগেঞ্চে চলে গেলেন। তাতাররা তখনও আরগেঞ্চ দখল করতে পারেনি। রাজধানীতে ক'দিন কাটিয়ে কিছু জানবাজ সহচর জুটিয়ে ফেললেন তৈমুর। দ্বিতীয়বার এসে আক্রমণ করে বসলেন তাতারদের উপর। রাতের আঁধারে দুশমনের

---

[১৬১] জাহাঁকুশা ১/৭১

কবজাকৃত বারজালিগ কান্ত শহরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি। তাতার হাকিম ও তার নিরাপত্তারক্ষীদের হত্যা করে নিরাপদে ফিরে এলেন।[১৬২]

তখন সুলতান আলাউদ্দীন এক শহর থেকে অন্য শহরে ছুটে বেড়াচ্ছিলেন। তৈমুর মালিক সফরের মাল-সামানা নিয়ে রওনা দিলেন তার খেদমতে হাজিরা দেওয়ার ইচ্ছায়। শাহরাস্তানায় গিয়ে সুলতানের দরবারে উপস্থিত হলেন।[১৬৩] তৈমুর মালিকের মুখে তাতারদের ভয়াবহ জুলুম-পীড়নের কথা শুনে আরও হতবিহ্বল হয়ে পড়লেন খাওয়ারিজম শাহ। তিনি শুধু এটুকু অনুভব করতে পারছিলেন যে, তার সমস্ত অস্তিত্ব অসাড় হয়ে আসছে।

খাওয়ারিজম শাহ কিছুকাল পালিয়ে বেড়ালেন। তার সঙ্গে ছিলেন তৈমুর মালিকও। তারপর তাতারদের বিরুদ্ধে শাহজাদা জালালুদ্দীনের জিহাদেও অংশগ্রহণ করেছিলেন তৈমুর। এ হচ্ছে তখনকার কথা, যখন রাজধানী আরগেঞ্চ সুলতান জালালুদ্দীনের করতলগত হয়েছিল। জালালুদ্দীনের সাথে সারা জীবন যুদ্ধে শামিল ছিলেন তৈমুর মালিক। এর শুরুটা হয়েছিল সুলতান আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর।[১৬৪]

আতরারের রণক্ষেত্র

কুকন্দ হামলার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে তাতারদের আরেকটি সৈন্যদল সাইহুন-নদীর তীরবর্তী তাশখন্দ ও আতরার শহরে আক্রমণ করে। উল্লেখযোগ্য কোনো যুদ্ধ-সংঘাত ছাড়াই পতন হয়ে গেল তাশখন্দের। তবে আতরারের শক্ত প্রাচীর তাতারদের সামনে দীর্ঘক্ষণ বাধা হয়ে ছিল। সেখানকার গভর্নর ছিলেন ইয়ান্নাল খান। ইতিপূর্বে তাতারদের বাণিজ্য-কাফেলাকে গোয়েন্দা বলে ইয়ান্নাল খানই হত্যা করেছিলেন। পরিবর্তে খাওয়ারিজম শাহের কাছে জীবিত ইয়ান্নাল খানকে চেয়েছিলেন চেঙ্গিজ খান। কিন্তু পাননি।

সে হিসেবে চেঙ্গিজ খানের কাছে আতরার দখল করা ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই একসঙ্গে দুই পুত্র উকতাই ও চোগতাইকে আতরার-অভিমুখী সৈন্যদলের কমান্ডার নিযুক্ত করলেণ তিনি। খুব তাগিদ করে বলে দিলেন—ইয়ান্নাল খানকে যেকোনো উপায়ে জীবিত ধরে এনে আমার হাতে সোপর্দ করবে। ওকে শায়েস্তা করব স্বয়ং আমি।

তাতার-বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে ইয়ান্নাল খানও মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। সঙ্গে ছিল ৫০ হাজার সিপাহি। ইয়ান্নাল খান এক দুর্বোধ্য

---

[১৬২] রওজাতুস সফা ৫/২৮; জাহাঁকুশা ১/৭২

[১৬৩] জাহাঁকুশা ১/৭৩; চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১৪, পৃষ্ঠা ১১১

[১৬৪] তারিখে খাওয়ারিজম শাহি ১০৫

চরিত্রের নাম। তিনি 'হঠাৎ গরম হঠাৎ নরম' মেজাজের মানুষ। হাতে একবার হাতিয়ার উঠে গেলে জীবিতের চেয়ে মৃতের সংখ্যাই থাকত বেশি।[১৬৫] প্রথম থেকেই তিনি আশপাশের সব খেত-খামার ও বাগবাগিচা থেকে আনাজ, ফলমূল জমিয়ে নিয়েছিলেন আতরারের প্রাচীরের ভেতর। আরও নিয়েছিলেন বড় বড় মহিষের পাল, জমিয়ে তুলেছিলেন তির ও পাথরের স্তূপ।

আগে থেকেই দীর্ঘ প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলেন তিনি। সাইহুন-নদী অতিক্রম করে তাতার-বাহিনী চলে এল আতরারে। কঠিনভাবে অবরোধ করল সমস্ত শহর। রোজ রোজ বিভিন্ন দিক থেকে প্রাচীরে আক্রমণ করতে লাগল তারা। তবে ভেতরকার খাওয়ারিজমি সিপাহিদের তির ও পাথর বর্ষণে ঘায়েল হয়ে প্রতিবার তাদের পিছু হটতে হল। দু-দিকের বাহিনীই আক্রমণ জারি রাখল। তাতাররা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল বেশি। তবু ভাবছিল, পেছন থেকে মূল বাহিনী এসে হয়তো তাদের সহযোগিতা করবে। আতরারের মুসলিম সিপাহিদের আক্রমণও হয়ে উঠেছিল জোরদার।

অবরুদ্ধ সময় ক্রমেই দীর্ঘায়িত হতে থাকে। ওদিকে খাওয়ারিজম শাহ ভাবেন—আতরারের এই যুদ্ধটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ফলে তিনি ১০ হাজার সিপাহিসজ্জিত একটি বাহিনী সেনা-অফিসার কেরাছার নেতৃত্বে আতরারের অবরুদ্ধ সৈন্যদের সাহায্যে পাঠান। কঠিন অবরোধের মধ্যেও শহরের ভেতর ঢুকতে সফল হয় অফিসার কেরাছা। ইয়ান্নাল খানের তখন আনন্দের সীমা ছিল না। তিনি ভাবতে উদ্বুদ্ধ হন যে, অপ্রত্যাশিত এই গায়েবি সাহায্য হয়তোবা এই যুদ্ধে তাতারদের পরাজয়ের উসিলা।

আফসোস, শত আফসোস, অফিসার কেরাছা ছিল কাপুরুষ। মৃত্যু-ভয়ে নিজের ভেতর গুটিয়ে গিয়েছিল সে। তার মাথায় ছিল ভিন্ন চিন্তা। কয়েক দিন আতরার প্রাচীরের সম্মুখে তাতারদের হিংস্র উল্লম্ফন দেখে সে ভাবল—এদের সাথে মোকাবেলা করা কখনও সম্ভব নয়;এই অবস্থায় যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়াটা হবে অনর্থক।

তাই সে সন্ধিচুক্তির কারণ হয়ে ওঠে। ইয়ান্নাল খানকে পরামর্শ দেওয়ার ঢঙে বলে—যুদ্ধ থামিয়ে ওদের সাথে সন্ধি করে ফেলুন। তাতারদের ধারালো তলোয়ার থেকে আতরারের বাসিন্দারা বেঁচে যেতে পারবে।

অন্যদিকে চার মাসের দীর্ঘ অবরোধে শহরের খোরাকি প্রায় শেষ হয়ে আসছে। অচিরেই হয়তো দেখা দেবে দুর্ভিক্ষ। তাতাররা না-হয়ে শত্রুবাহিনী যদি হতো অন্য কোনো জাতি, ইয়ান্নাল খান হয়তো সন্ধির কথা ভাবতেন। কিন্তু তাতার-জাতির চতুরতা ও প্রতারণা সম্পর্কে খুব ভালোভাবেই অবগত ছিলেন তিনি। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—সন্ধিতে শহরের ফটক খুলে দেওয়ার জন্য ওরা যে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি

---

[১৬৫] জাহাঁকুশা ২/৭৩; রওজাতুস সফা ৫/২৯

দেবে, ভেতরে ঢুকতেই ভুলে বসবে সব। তাদের রক্তের উন্মত্ততা থেকে বাঁচতে পারবে না কেউ। তিনি জানতেন—তাতার-বাহিনী তার প্রতি কতটা ক্ষোভ জমিয়ে রেখেছে। এরা যে তাকে জীবিত ছেড়ে দেবে, সেই প্রশ্নই তো ওঠে না। শহরের আমজনতাকেও এরা নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

অফিসার কেরাছার গাদ্দারি

কেরাছা যখন ইয়ান্নাল খানকে বুঝিয়ে উঠতে পারেনি, তখন শহরবাসীকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজের পক্ষে আনবার চেষ্টা চালাল। তাতাররা এখানে দীর্ঘ চার মাস মাথা কুটে মরেছে। তাদের পাথর প্রক্ষেপণের কামানগুলি এই চার মাসে শহরপ্রাচীরে ততটা আঘাত হানতে পারেনি, যতটা আঘাত হেনেছিল সেনাপতি কেরাছার স্রেফ একরাতের গাদ্দারি! একদল শহরবাসী চলে এল কেরাছার পক্ষে।[১৬৬] এই জনশক্তি নিয়ে ইয়ান্নাল খানের উপর প্রভাব সৃষ্টি করতে চাইল সে। কিন্তু ইয়ান্নাল নিজ সিদ্ধান্তে অবিচল। হাতিয়ার ফেলে কিছুতেই তিনি কাপুরুষের মতন মরতে চান না।

শেষমেশ অফিসার কেরাছা তাকে বশ করে উঠতে না-পেরে নিজেই শহরের ফটক খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। তাতারদের সঙ্গে গোপনে কথা বলে তাদের প্রতিশ্রুতিও সে নিয়ে এল।

কেরাছা তাতারদের আগে থেকেই তৈরি কোনো গাদ্দার নয়; কিন্তু যেখানে কাপুরুষত্বের কালো ছায়া ঢেকে ফেলে সবকিছু, সেখানে গাদ্দার তৈরি হতে কতক্ষণ!

একরাতে শহরবাসী গভীর ঘুমে ডুবে আছে। পরিকল্পনামতো আপন চ্যালাচামুণ্ডাদের নিয়ে বিড়ালের সাবধানতায়, আলতো পায়ে, ফটকের কাছে গেল অফিসার কেরাছা। চোরের মতন আশপাশে একটুক্ষণ তাকিয়ে নিয়ে খটাস করে খুলে দিল ফটক। এই সংবাদ পেতে ইয়ান্নাল খানের অনেক দেরি হয়ে গেল। ততক্ষণে তাতার-বাহিনী ঢুকে পড়েছে শহরের ভেতর। কামান থেকে গোলা আর ধনুক থেকে তির বেরোচ্ছে লাগাতার। শেষচেষ্টা হিসেবে ইয়ান্নাল খান দ্রুত পরিবার ও প্রিয় সহচরদের দুর্গে একত্র করলেন। শক্তভাবে এঁটে দিলেন দুর্গের দরজা। তখন তার হাতে আছে শুধু ২০ হাজার সিপাহি।[১৬৭]

শহরের বাসিন্দাদের রক্তে পুরো শহর লাল হয়ে উঠতে দেখল পরদিন ভোরের সূর্য। যুবকরা তো মারা পড়লই; নারী, বৃদ্ধ, এমনকি ছোট ছোট বাচ্চাকাচ্চা—তাতারদের রোষানল থেকে কেউ রক্ষা পায়নি। ইয়ান্নাল খানের সেই ধারণাই তবে সঠিক প্রমাণিত হল!

---

[১৬৬] রওজাতুস সফা ৫/২৭; জাহাঁকুশা ১/৬৪

[১৬৭] তারিখে গুযিদাহ ৬২-৬৬; তারিখে খাওয়ারিজম শাহি ১০২

সেনাপতি কেরাছাকে উকতাইয়ের খেদমতে নিয়ে যাওয়া হল। সে ভাবছিল তাকে পুরস্কৃত করা হবে। হাত কচলে কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে উকতাইয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। মুখে গাদ্দারিসুলভ মৃদু তেলতেলে হাসি। কিন্তু আচমকা উকতাইয়ের শক্ত হয়ে-ওঠা চোয়াল দেখে চান্দি ঘামতে আরম্ভ করল তার। মুখ শুকিয়ে হলদেটে হয়ে গেল। উকতাই তাকে রক্তবর্ণ চোখে খুব ধমকাল স্বজাতির সাথে গাদ্দারি করার কারণে। পুরস্কার দেওয়ার বদলে করল তিরস্কার! এক সিপাহিকে কর্কশ কণ্ঠে হুকুম দিল—গাদ্দারটার কল্লা ফেলে দাও হে!

স্বগোত্রের সঙ্গে গাদ্দারি করা ছিল তাতারদের কাছে খুবই জঘন্য কাজ। অবশ্য সুযোগ মতো তারা দুশমনের গাদ্দারদের থেকে প্রচুর ফায়দা নিয়েছে, কিন্তু কাজ সমাধা হতেই তাদের হত্যা করে ফেলেছে।

নৈশ হামলা

দুর্গে আবদ্ধ থেকেও তাতারদের উপর রাত্রিবেলা অতর্কিত আক্রমণ করতে শুরু করলেন ইয়ান্নাল খান। প্রতিরাতে দুর্গ থেকে বেরিয়ে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়তেন তাদের একেকটি তাঁবুতে। জান-মালের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে নিরাপদে পালিয়েও যেতেন। বাধ্য হয়ে তাতাররা আরও কঠিনভাবে নিযুক্ত করল রাতের প্রহরা। তবু অব্যাহত রইল মুজাহিদদের অতর্কিত আক্রমণ। দিন-দিন মুসলিমদের বড় একটি দলও শহিদ হতে লাগল। ইয়ান্নাল খান এতে কোনো পরোয়া করেননি। খাদ্যসংকটের কারণে দুর্গে তখন দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে গেছে। এমনিতেই মৃত্যু সর্বক্ষণ চোখের সামনে দিয়ে হাঁটছিল।

এই নৈশ আক্রমণ জারি থাকল একমাস পর্যন্ত। প্রতিরাতে মুজাহিদরা জীবনোৎসর্গ করছিলেন। অবরোধের পাঁচ মাস কেটে গেলেও জীবনবাজি রেখে তারা দুশমনকে শহর অতিক্রম করে দুর্গে প্রবেশের সুযোগ দেননি।

তবে শেষ পর্যন্ত সবাই শহিদ হয়ে গেলেন। বাকি রইলেন শুধু আতরারের হাকিম ইয়ান্নাল খান। সঙ্গে দুই সিপাহি ও দুর্গে লুকানো খানদানের কিছু নারী ও শিশু।

ইয়ান্নাল খান গ্রেফতার

তাতাররা দুর্গের শক্ত প্রাচীর ভাঙতে না-পেরে ভেঙে ফেলল দুর্গের দরজা। ইয়ান্নাল খান একগাদা তির ও পাথর নিয়ে দুর্গের চূড়ায় উঠে গেলেন। সঙ্গী দুই সেনাকেও তাতাররা শহিদ করে ফেলল। চেঙ্গিজ খান দৃঢ়ভাবে বলে দিয়েছিলেন—ইয়ান্নাল খানকে যেন তার কাছে জীবিত ধরে নেওয়া হয়। সে-কারণে দূর থেকে হত্যার সর্বোচ্চ সুযোগ পেয়েও তাতাররা তাকে ছেড়ে দিচ্ছিল। ইয়ান্নাল খান ক্ষুধায়-পিপাসায় কাহিল হয়ে গেলেন। তবু সর্বশেষ তির ও পাথরটি পর্যন্ত লড়ে গেলেন

তিনি। একসময় যখন একেবারে দুর্বল ও অক্ষম হয়ে পড়লেন, চূড়ায় উঠে তাতাররা তাকে ধরে ফেলল।

ইতিপূর্বে চেঙ্গিজ খানের প্রেরিত কাফেলাকে এই আতরারেই হত্যা করা হয়েছিল। সেই প্রতিশোধের নেশায় এখন আতরারের প্রাচীর, দুর্গসহ বিভিন্ন স্থান পুরোপুরিভাবে তছনছ করে দিয়ে যেতে লাগল তাতাররা।[১৬৮] তাতারদের এই বাহিনী শুরু থেকেই চেঙ্গিজ খানের মূল সৈন্যদল থেকে পৃথক হয়ে কাজ করছিল। আতরার অভিযান থেকে ফারেগ হয়ে এবার তারা রওনা দিল সমরকন্দ অভিমুখে। এর কিছুদিন পরেই সমরকন্দ শহরও অবরোধ করে ফেলেন চেঙ্গিজ খান।[১৬৯]

এই তাতার দলটি সমুদ্রতীরের আরও বহু শহর থেকে অসংখ্য নারী-পুরুষকে বন্দি করে পশুপালের মতো হাঁকিয়ে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। রাস্তায় তাদের বিভিন্নভাবে অপদস্থ করছিল। এই বন্দিদের ভেতর ইয়ান্নাল খানও ছিলেন। চেঙ্গিজ খানের ছেলেরা সারা পথ তাকে ধমকধামক দিয়ে ক্রীতদাসের মতো পিটাতে পিটাতে নিয়ে যাচ্ছিল।

---

[১৬৮] জাহাঁকুশা ১/৬৫

[১৬৯] রওজাতুস সফা ৫/২৭-২৮

নবম অধ্যায়

বোখারা ও সমরকন্দের পতন

إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَّ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ

যদি তোমরা জিহাদে বের না-হও, আল্লাহ তোমাদের কঠিন শাস্তি দেবেন। এবং তোমাদের পরিবর্তে সৃষ্টি করবেন অন্য কোনো জাতি।[১৭০]

তাতার-বাহিনী বোখারা অভিমুখে

চেঙ্গিজ খান ছোট ছেলে তুলি খানকে সাথে নিয়ে এক অচেনা পথ ধরে নিশ্চুপে সাইহুন-নদী পার হয়ে সুবিস্তীর্ণ মরুভূমির ভেতর ঢুকে পড়লেন। খাওয়ারিজমি এলাকাগুলো ছেড়ে এলেন হাতের বাঁ-দিকে। তখন খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য থেকে কয়েকশ মাইল দূরে অরাল সাগরের মরু-অঞ্চলে পরিভ্রমণ করছিলেন তিনি। খানিক বাদেই কাজালকুম মরুভূমি পেরিয়ে উত্তর-পশ্চিমে বোখারা অভিমুখে রওনা দিলেন।

তাতার-বাহিনী পূর্বদিক থেকেই ধেয়ে আসবে ভেবে বেখবর মুসলমানরা ওদিকে পূর্বাঞ্চলেই ঘাঁটি গেড়ে বসে ছিল। পূর্বদিকও অবশ্য তাতারমুক্ত ছিল না; জোচি ও অন্য দুই শাহজাদা সাইহুনের আশপাশের শহরগুলো জয় করার পর পূর্বদিক থেকে আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। অন্যদিকে জুবি নৈয়ান সমরকন্দের দুইশ মাইলের ভেতর এসে গিয়েছিল বহু আগেই। মুসলিম-বাহিনী-সমেত খাওয়ারিজম শাহ এবার তিন দিক থেকে তাতারদের আক্রমণের মুখে পড়তে চললেন। এই ত্রিমুখী আক্রমণের অপেক্ষায় ছিল সমরকন্দ ও বোখারার মতো বিশাল দুই শহর।[১৭১]

চেঙ্গিজ খানের ঘোড়া মরুভূমি থেকে বেরিয়ে বিজলির বেগে লাফাতে লাফাতে বোখারার দিকে এগোচ্ছিল। চেঙ্গিজ খান এসে সর্বশক্তিতে ফেটে পড়তে চাচ্ছিলেন বোখারায়। মাঝেমধ্যে কোনো গ্রাম অথবা বস্তিতে থামছিলেন বটে; শুধু ঘোড়া ও সিপাহিদের পানি পানের জন্য। তা ছাড়া অন্য কোনো কাজে সেনাবাহিনীর মুহূর্তখানিক অবস্থানেরও সুযোগ ছিল না।[১৭২] চেঙ্গিজ খান ভাবছিলেন—এই মুহূর্তে পুরো সেনাশক্তি নিয়ে সমরকন্দ-বোখারার দিকেই হয়তো আছে খাওয়ারিজম শাহ।

খান তাকে চিরতরে ভূলুণ্ঠিত করে দিতে প্রথমেই সরাসরি তার সাথে মোকাবেলা করতে চাচ্ছিলেন। সেজন্য রাজধানী আরগেঞ্চ ছেড়ে তিনি এতটা পথ পাড়ি দিয়ে বোখারায় এলেন। তিনি জানতেন সমরকন্দ-বোখারাতেই খাওয়ারিজম শাহের চূড়ান্ত পতন ঘটবে। তারপর রাজধানী দখল করতে তেমন বেগ পেতে হবে না তার।

---

[১৭০] সুরা তাওবা, আয়াত ৩৯

[১৭১] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১৫, পৃষ্ঠা ১১৩

[১৭২] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১৫, পৃষ্ঠা ১১৪-১১৫

সমরকন্দে আতঙ্কিত খাওয়ারিজম শাহ

সমরকন্দ ছিল সে-সময়কার এক শক্ত সমুন্নত প্রাচীরবেষ্টিত শহর। তাঁবুর ভেতর ক্লান্ত ভঙ্গিতে বসে ছিলেন খাওয়ারিজম শাহ। মনে আগত যুদ্ধের এলোমেলো ভাবনা। কীভাবে কী করবেন কূলকিনারা করে উঠতে পারছিলেন না। এমন সময় হঠাৎ সংবাদ পেলেন—পশ্চিম থেকে বোখারার দিকে অগ্রসর হচ্ছে চেঙ্গিজ খান।

খাওয়ারিজম শাহের মনে প্রচণ্ড ভয় ধরে গেল—পূর্ব থেকে আসছে জুবি নৈয়ান আর পশ্চিম থেকে স্বয়ং চেঙ্গিজ খান! তার মনে হতে লাগল, শক্ত কোনো জালের ভেতর আটকে গেছেন তিনি। সন্ত্রস্ত হয়ে দ্রুত বাহিনীকে আরও কয়েকভাগে বিভক্ত করে ফেললেন। কিছু পাঠালেন বোখারায়, একদল নিযুক্ত করলেন সমরকন্দের সিপাহিদের সহযোগিতার জন্য। বলখ ও কুন্দুজ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত করলেন আতাবেগদের। শেষমেশ সমরকন্দ থেকে নিজে কেটে পড়ার প্রস্তুতি নিলেন।[১৭৩] সমরকন্দের আমির ও রাজসদস্যদের তখন বোঝালেন—শোনো, অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, সমরকন্দে চূড়ান্ত সফলতার আশা করা বোকামি। আমি এখন খোরাসান চলে যেতে চাচ্ছি। তোমরা শহর-প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করো। শিগগির একটি সাহসী বাহিনী গঠন করে ওখান থেকে আমি ফিরে আসব।[১৭৪]

শাহের এই বক্তব্য শুনে দুঃসাহসী সেনাপতিদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। লাখো মুসলিম সিপাহির রক্ত ঝরেছে। সবাই অস্থির প্রতীক্ষায় আছে—সমরকন্দ-প্রাচীরের সামনে এবার তাতারদের লাশের পিরামিড বানিয়ে ছাড়বে, হেঁকে উঠবে বিজয়ের তাকবিরধ্বনি। অথচ কী আশ্চর্য, খাওয়ারিজম শাহ এই হায়নাদের হাতে প্রজাদের ছেড়ে নিজেই বেছে নিচ্ছেন পালাবার পথ? সমরকন্দের দুর্গপতি আলপ খান ছিল দুর্ধর্ষ সাহসী। বালাখান ও আলবাজ খানেরাও ছিল বাহাদুর। শত্রুসেনাদের খুব সহজে তাদের সামনে টিকতে পারার কথা ছিল না।

পলায়ন

বিশেষ কিছু সহচর ও দেহরক্ষী নিয়ে সমরকন্দ থেকে বেরোচ্ছেন খাওয়ারিজম শাহ। নগরের দৈত্যাকৃতির ফটক খুলে দেওয়া হয়েছে। সমরকন্দের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ, আমির ও সেনাপতিরা শাহকে বিদায় দিতে পেছনে পেছনে আসছেন। সারা শহরে আজ বিরাজ করছে এক অদ্ভুত নীরবতা। ফটক থেকে বেরোতেই প্রাচীরের মুখে গভীর একটা খন্দক। এই খন্দকের পারে এসে হঠাৎ করেই পা থামিয়ে দিলেন খাওয়ারিজম শাহ। তার মনে উথলে উঠতে লাগল রকমারি ভাবনা।... আহা, এ তো সেই সমরকন্দ, ১০ বছর পূর্বে তুর্কানেখাতার হাত থেকে যাকে মুক্ত করেছিলেন দুর্ধর্ষ

---

[১৭৩] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১৫, পৃষ্ঠা ১১৬

[১৭৪] ইবনুল আসির ৭/৫৭৫

বিজেতা আলাউদ্দীন মুহাম্মদ (তিনি নিজেই)! এ তো সেই শহর, বহু শতাব্দী ধরে যা মুসলিম সভ্যতা-সংস্কৃতি, ইসলামি জ্ঞান ও শাস্ত্রের প্রাণকেন্দ্র, উম্মাহর হাতে প্রথম যাকে সোপর্দ করেছিলেন তুর্কিস্তান-বিজেতা কুতাইবা ইবনে মুসলিম। উম্মাহও কুতাইবার সেই পবিত্র আমানত রক্ষা করে গেছে বহু শতাব্দীকাল। পরে তুর্কানেখাতা মুসলিমদের থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল এ শহর। শুরু করেছিল অকথ্য জুলুম-নিপীড়ন। তার ৭১ বছর পরে কবুল হল নিষ্পিষ্ট মজলুমদের অশ্রুভেজা বিরামহীন দোয়া। ফলে প্রবল বিক্রমে এ শহর-অভিমুখে ঘোড়া ছুটিয়েছিলেন সুলতান আলাউদ্দীন খাওয়ারিজম শাহ। রবের প্রেরিত ক্রোধাগ্নি হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তুর্কানেখাতার উপর। অনন্য বীরত্ব ও শক্তিমত্তায় ফের নতুন জীবন ফিরে পেয়েছিল সমরকন্দ!!

কী আশ্চর্য, মাত্র ১০ বছরের ভেতর এই মহাপুরুষটির উদ্দামতায় এতটাই শৈথিল্য এসে গেল? কুতাইবা ইবনে মুসলিমের পবিত্র আমানত এখন ছেড়ে যাচ্ছেন তিনি দুশমনের হাতে। ১০ বছর পূর্বের সাহসী সুলতান আলাউদ্দীন এবং আজকের মনোবলহীন খাওয়ারিজম শাহের ভেতর কী বিপুল পরিবর্তনই না ঘটে গেছে!

এইসব ভাবনায় জর্জরিত হতে হতে খন্দক পেরোনোর ব্রিজটায় উঠে এলেন খাওয়ারিজম শাহ। ব্রিজ পেরোবার কালে হঠাৎ চোখ পড়ে নিচে, খন্দকের গভীরতায়। তিনি দ্বিতীয়বারের মতো থমকে ওঠেন। কল্পনায় ভেসে ওঠে—ঘূর্ণিঝড়ের মতো সমরকন্দের দিকে ছুটে আসছে এক বাহিনী। মরুর সমস্ত বালিকণা ও সমুদ্রের সমস্ত জলকণার চেয়েও অধিক তাদের সিপাহি। তারা চারপাশ অন্ধকার করে ছুটে আসছে এদিকেই। আচমকা খাওয়ারিজম শাহ আরেকটু কেঁপে উঠলেন। তার মুখ ফসকে বেরিয়ে এলো—জানো, এই আক্রমণকারী বাহিনী এত বিশাল যে, তাদের হাতের চিকন চিকন চাবুকগুলোও যদি এই খন্দকে তারা নিক্ষেপ করে, মুহূর্তে পার পর্যন্ত ভরে উঠবে পুরো খন্দক!

সমরকন্দের আমিরগণ তো বিস্ময়ে থ বনে গেলেন। অবাক চোখে ডানে-বায়ে তারা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। চোখের ভাষায় যেন একে অপরকে বলছিলেন—'আচ্ছা, খাওয়ারিজম শাহের আজ হলটা কী?' তার কাপুরুষোচিত কর্মকাণ্ডে ও হতাশাপূর্ণ কথাবার্তায় তারা হতভম্ব হয়ে পড়ে। তাদের তখন আরো দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা। তাতারদের আগ্রসনের বিভিন্ন কথা শুনে শুনে আগে থেকেই তো সবাই ভীত হয়ে উঠেছিলেন; তার উপর এখন নতুন করে তাদের মধ্যে সংক্রমিত হল শাহের আতঙ্ক।[১৭৫]

সমরকন্দের বিদায় দিতে-যাওয়া নেতারা ফিরে এলেন বাসস্থানে। খাওয়ারিজম শাহ কাফেলা নিয়ে উঠে পড়লেন খোরাসানের পথে। তার চেহারাজুড়ে ভয়, অনিশ্চয়তা ও হীনম্মন্যতার গভীর কালো ছায়া।

---

[১৭৫] জাহাঁকুশা ২/১০৫; রওজাতুস সফা ৪/৮২৪

বোখারা অবরোধ

অনতিক্রমণীয় প্রাচীর ও শক্ত প্রতিরোধ-ব্যবস্থার কারণে পুরো বোখারাকে হিসনে হাসিন (শক্তিশালী দুর্গ) বলে ডাকত তখনকার মুসলিমবিশ্বের সবাই। নগরপ্রাচীরের দৈর্ঘ্য ছিল ১২ ফারসাখ (৩৬ মাইল)।[১৭৬] শহরের মাঝখান দিয়ে বয়ে গিয়েছিল কাচের মতো স্বচ্ছ জলের এক চমৎকার নদী। নদীটি লাখো অধিবাসীর জীবনধারা দু-দিকে বিভক্ত করে দিয়েছিল। এপার-ওপার, দু'পারেই ছিল অসংখ্য নয়নাভিরাম বাগিচা। ছায়া সুনিবিড় সব পাড়া-মহল্লা।[১৭৭]

মসজিদ-মাদরাসার শহর

মুহাদ্দিস, মুফাসসির, ফকিহ ও সুফিদের তীর্থভূমি এই বোখারা। এ মাটিতেই ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বোখারির মতো এক মহান আলেম ও মুহাদ্দিসের জন্ম। তার লিখিত 'আলজামিউস সাহিহ আলবুখারি' গ্রন্থটিকে সর্বযুগের মানুষই 'আল্লাহর কিতাবের পর বিশুদ্ধতম কিতাব' বলে স্বীকৃতি দিয়েছে।

৬১৭ হিজরি (মার্চ, ১২২০)। মহররম মাস পড়েছে কিছুদিন হল। তাতারদের এক বিশাল বাহিনী এসে ঘিরে ফেলল সারা বোখারা।[১৭৮] গভর্নর ইনাজ খান সহচরদের নিয়ে প্রাচীরের উপরে উঠে চোখের সামনে তাতারদের সুবিস্তৃত অবস্থান দেখতে লাগলেন। তাতে ভয়ে ও বিস্ময়ে হতভম্ব তিনি।[১৭৯] প্রাচীরের একদম গোড়া থেকে নিয়ে বহুদূর পর্যন্ত তাঁবু খাটিয়েছে তাতাররা। প্রাচীরের একেবারে সম্মুখভাগে টানানো হয়েছে চেঙ্গিজ খানের তাঁবু। সেটি অন্যগুলো থেকে উঁচু।

কিছুদিন আগেও সব রকমের আক্রমণ থেকে বোখারাকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত মনে করা হতো। কিন্তু পশ্চিম থেকে একের পর এক তাতারদের সৈন্যদল এসে যেভাবে ঘেরাও করছে বোখারাকে, আমজনতা ও হাকিমেরা তাতে চরম দ্বিধা ও ভয়ের মধ্যে পড়ে গেছে। শহরজুড়ে বিরাজ করছে চাপা উত্তেজনা। অবশ্য বহু আগে থেকেই বোখারার সাহায্যে খাওয়ারিজম শাহের ৩০ হাজার সিপাহি এসে এখানে বসে ছিল। ইনাজ খানের নেতৃত্বে জড়ো হয়েছিল তুর্কি ও ইরানি যোদ্ধারাও। কিন্তু তাদের সকলের তুলনায় দুশমনের সংখ্যা তখন কয়েক গুণ বেশি!

শহরের সবক'টি প্রাচীর খুবই মজবুত ছিল। যদি আমজনতা ও সরদারগণ একজোট হয়ে প্রতিরোধের জন্য তৈরি হয়ে যেত, আরও কয়েক মাস টিকে থাকত বোখারা; এত দ্রুত ভূলুণ্ঠিত হতো না। কিন্তু সীমান্ত এলাকার অনেক বস্তি থেকে নীচ

---

[১৭৬] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১৫, পৃষ্ঠা ১১৫

[১৭৭] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১৫, পৃষ্ঠা ১১৫

[১৭৮] জাহাঁকুশা ১/৭৮

[১৭৯] ইবনে খালদুন ৫/১১০

মানসিকতার কিছু লোক বোখারায় এসে আশ্রয় নিয়েছিল। তারা তাতারদের পাশবিকতার গল্প শুনিয়ে শুনিয়ে শহরবাসীকে চরম ভীত করে তুলেছিল। সেটির প্রভাব শহরের আমির-সরদারদের উপরেও পড়েছিল। তারা তাই ভাবতে শুরু করে দিয়েছিল, চেঙ্গিজ খানের সাথে কোনোভাবে সন্ধি স্থাপন করে ফেলব।

মুসলিমদের আক্রমণ ও পরাজয়

বোখারার গভর্নর ইনাজ খান ছিলেন একজন সাহসী পুরুষ। তিনি ও কয়েকজন সেনাপতি অস্ত্র ফেলতে প্রস্তুত ছিলেন না। সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন শেষরক্তবিন্দু পর্যন্ত তারা যুদ্ধ করে যাবেন। একরাতে ইনাজ খান, কুক খান, কুশলি খান, খামিদবুর ও সুঁজ খান ৩০ হাজার অশ্বারোহী ও ২০ হাজার পদাতিক সৈন্যকে নিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে আসেন। ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত। দুশমনের তাঁবুর বাইরে মাঝেমধ্যে দুয়েকটা মশাল জ্বলছে। মশালের আগুনের তীব্রতাও খুব একটা নেই। দুশমন হয়তো ঘুমে অচেতন তখন। মুসলিমবাহিনী চুপি চুপি এসে প্রচণ্ড শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাতারদের উপর। কিন্তু আশ্চর্যজনক কথা হল—সে রাতে তাতারদের কেউ-ই মূলত ঘুমিয়ে ছিল না। বোধহয় আগেভাগেই সংবাদ পাচার করে দিয়েছিল কোনো গাদ্দার। মুসলিমদের পরিকল্পনা জেনে গিয়ে পুরোপুরি সতর্ক হয়ে ছিল তারা। মুসলিমদের হামলার সঙ্গে-সঙ্গে তলোয়ার-খঞ্জর নিয়ে তারাও আক্রমণোদ্যত হয়ে ওঠে। তরবারির এলোপাথাড়ি ঘাত-প্রতিঘাতে কয়েকজন ব্যতীত বাকি সবাইকে শহিদ করে ফেলে।[১৮০]

আন-নাসাবি অবশ্য এই সংঘর্ষ সম্পর্কে ভিন্নকথা বলেছেন। তার বর্ণনা হল—মূলত বোখারার আমিরদের উদ্দেশ্য ছিল দুশমনের অবরোধ ভেঙে পালিয়ে যাওয়া। সেজন্য অতর্কিত হামলায় দুশমনের ঘেরাও ভেদ করে সামনে এগিয়েও গিয়েছিল তারা। তাতাররা সাময়িকভাবে পরাজিত হয়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু, মুসলিমবাহিনী যখন পেছন ঘুরে বিক্ষিপ্ত তাতারদের উপর দ্বিতীয়বার আর আক্রমণ করল না, তাতাররা বুঝে গেল, এরা মূলত প্রাণ বাঁচাবার জন্য পালিয়ে যেতে চাচ্ছে। ফলে চেঙ্গিজ খান দ্রুতই পুরো বাহিনীকে সেনাপতিদের মাধ্যমে বিন্যস্ত করিয়ে ফেলেন। দ্বিগুণ শক্তি জমিয়ে পলায়নপর মুসলিমদের ধাওয়া করেন। হাঁকাতে হাঁকাতে তাদের আমুদরিয়া পর্যন্ত নিয়ে যান এবং প্রায় সবাইকে হত্যা করে ফেলেন। ইনাজ খানসহ অল্পকিছু সিপাহি কোনোরকম নদীটা পেরোতে সক্ষম হন।[১৮১]

---

[১৮০] রওজাতুস সফা ৫/২৭; জাহাঁকুশা ১/৮০

[১৮১] নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৮২

শয়তানদের রাজত্ব

মুসলিম-বাহিনীর সবচেয়ে বড় শক্তিটি তখন নিঃশেষ হয়ে গেল। শহরবাসীর মনে প্রতিরোধের কোনো আশাই বাকি ছিল না। পরদিন তারা আল্লামা বদরুদ্দীন কাজিখানের নেতৃত্বে চেঙ্গিজ খানের কাছে একটি প্রতিনিধিদল পাঠাল। তারা চেঙ্গিজের কাছে প্রাণভিক্ষা চেয়ে শহরের ফটক খুলে দিতে সম্মত হল।[১৮২] চেঙ্গিজ খানও আমজনতার ইজ্জত-সম্ভ্রম হেফাজতের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিলেন। তার হাতে তুলে দেওয়া হল শহরের চাবি। খোলা হল ফটক। চেঙ্গিজ খান সয়লাবের মতো বিশাল সৈন্যবহর নিয়ে বোখারায় ঢুকে পড়লেন। গভর্নর ইনাজ খান শহর ছেড়ে পূর্বেই বেরিয়ে গেছেন। গভর্নরের বেরিয়ে যাবার সময় দুর্গরক্ষক কুক খান ৪০০ সিপাহি নিয়ে দুর্গের মধ্যেই লুকিয়ে পড়েছিল।[১৮৩]

বোখারাবাসী হতভম্ব চোখে মানুষ নামের এই শয়তানদের দেখতে লাগল। শহরের সব প্রশস্ত রাজপথ ও সরু সরু গলি তাতার-বাহিনীর সয়লাবে ভরে গেল। এদের চেহারার মতো ভীতিকর কিছু বোখারাবাসী ইতিপূর্বে দেখেনি। মনে হচ্ছিল—তাতাররা এই গ্রহের কোনো বাসিন্দা নয়। সবার গায়ে আজানু প্রলম্বিত ছাইরঙা পোশাক। মাথায় বসানো শিংওয়ালা মুকুটের মতো কিছু-একটা। দেখতে একদম ভূতের মতো লাগছিল। তাদের উঁচু আওয়াজের কথাবার্তা কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। খানিক উদাস ভঙ্গিতে বেসুরো গলায় গান গাইতে গাইতে তারা শহরে প্রবেশ করছিল। এ দেখে বোখারাবাসীর বুঝতে বাকি ছিল না যে, এই তাতারদের থেকে অনুগ্রহের আশা করা নিছক বোকামি।

চেঙ্গিজ খান সেনাবাহিনীর কোনো কাজেই বাধা দিচ্ছিলেন না। রক্ষীবাহিনীকে নিয়ে তিনি প্রশস্ত সড়কে ঘোড়া ছুটিয়ে শহরের নয়নাভিরাম ও হৃদয়গ্রাহী সব দৃশ্যপট দেখতে দেখতে আসছিলেন। ছোট ছেলে তুলি খানও তার সঙ্গে ছিল।[১৮৪] সড়কের দুপাশে ও বাড়িঘরের ছাদে দণ্ডায়মান বিমূঢ় জনগণ আন্দাজ করে ফেলেছিল এদের পাশবিকতা ও নির্যাতনের ভয়াবহতা। তাতারদের চোখে-মুখে দয়ামায়ার চিহ্নমাত্র ছিল না। চামড়ার কালো পোশাকে, টুপিতে এদের ভীষণ ভয়ানক লাগছিল।[১৮৫]

জামিউল কাবিরে চেঙ্গিজ খান

বোখারার দৃষ্টিনন্দন জামে মসজিদ জামিউল কাবিরে চেঙ্গিজ খানের চোখ পড়ে। অপূর্ব নির্মাণশৈলী ও কারুকার্যে মুগ্ধ হয়ে মসজিদের বিশাল গেটের মুখে ঘোড়ার

---

[১৮২] ইবনুল আসির ৭/৫৮৫

[১৮৩] ইবনুল আসির ৭/৫৭৫

[১৮৪] জাহাঁকুশা ১/৮০

[১৮৫] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১৫, পৃষ্ঠা ১১৬

লাগাম টেনে ধরেন তিনি। উচ্চ গলায় আশপাশের লোকদের ডেকে বলেন—এটা কি খাওয়ারিজমের মহল?

'না খানে আজম, এটা আল্লাহর ঘর মসজিদ।' জবাবে তুলনামূলক খাটো গলায় বলে লোকজন।[১৮৬]

চেঙ্গিজ খান কিছু বললেন না। পা দিয়ে ঘোড়ার তলপেটের কাছে শক্ত গুঁতো মারলেন। চিহিঁ শব্দ করে লাফিয়ে মসজিদের চওড়া বারান্দায় উঠে পড়ল ঘোড়া। মিম্বারের কাছে গিয়ে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামলেন চেঙ্গিজ। মিম্বারের উপর কুরআন মাজিদের একটি বড় নোসখা রাখা ছিল। হিংস্র চেঙ্গিজের তাতে কীসের পরোয়া? তিনি জুতো নিয়েই মিম্বারে উঠে গেলেন। দূরে দাঁড়িয়ে সন্ত্রস্ত চোখে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতে লাগল লোকজন। চেঙ্গিজ খান শক্ত হয়ে লোহার কাঠিন্য নিয়ে দাঁড়িয়ে হাঁক দিয়ে উঠলেন—এখানে আমি তোমাদের বলতে এসেছি, শিগগির তোমরা আমার বাহিনীর জন্য খাদ্য-খোরাকির ব্যবস্থা করো। এরা বড় কষ্ট করে এসেছে। আশপাশের কোথাও কোনো খাদ্য জোটাতে পারেনি। আনাজপাতির সব ভান্ডার তাদের জন্য খুলে দাও। ঘোড়াগুলোর জন্য ঘাস-পাতার ব্যবস্থা করো। এই মসজিদের মতো সুবিশাল যত অট্টালিকা আছে, আস্তাবল হিসেবে খালি করে দাও।[১৮৭]

চেঙ্গিজ খান মসজিদ থেকে তখনও বার হননি। তার আগেই তাতার-বাহিনী আনাজপাতির সব গুদামে গিয়ে ঝাপটে পড়ে। খানে আজমের অনুমতি যখন মিলে গেছে, একমুহূর্ত বিলম্ব সইবে কেন? এদিকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় মুসলমানরাও নিমেষে তাতারদের সামনে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য ও ঘাসকুটো এনে স্তূপীকৃত করে ফেলল।

জামে মসজিদ ও অন্যান্য মসজিদ-মাদরাসার ভেতর বেঁধে রাখা হল ঘোড়ার পাল। সেসবের রাখালির জন্য বড় বড় আলেম ও ফকিহদের বাধ্য করা হল। আলমারিগুলো থেকে পবিত্র কুরআনের নোসখাসহ বিভিন্ন কিতাবপত্র মেঝেতে যত্রতত্র ছুড়ে ফেলল তাতাররা। সেসবের উপর ঘোড়াগুলোকে ঘাস খেতে দিল। তাদের ও ঘোড়ার পালের নাপাক পায়ের তলায় দুমড়েমুচড়ে যেতে লাগল পবিত্র পাতারা। অনেক মসজিদকে করে তুলল মদ্যপানের আড্ডাখানা। সেখানে বোখারার নর্তকীরা তাতারদের তলোয়ারের ইশারায় নাচানাচি আরম্ভ করল। মসজিদের এই অমর্যাদাকর দৃশ্য বড় করুণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগল বোখারাবাসী। কিন্তু কিছুই তাদের করার রইল না।[১৮৮]

---

[১৮৬] রওজাতুস সফা ৫/২৭

[১৮৭] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১৫, পৃষ্ঠা ১১৬

[১৮৮] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১৫, পৃষ্ঠা ১১৬; তারিখে খাওয়ারিজম শাহি ১০৭

ইমামজাদা রোকনুদ্দীনের জবাব

প্রবীণ আলেম ও ফকিহরা মসজিদের সামনের যে চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণে ছাত্রদের দরস দিতেন, চেঙ্গিজ খান মসজিদ থেকে বের হয়ে তা অতিক্রম করে এলেন। আলেমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হতভম্বের মতো তাকে দেখছিলেন। সবার হাত-পা ও মস্তিষ্ক যেন বিকল হয়ে গেছে তখন। মা-ওয়ারাউন-নাহারের সরদারদের প্রাণপুরুষ সাইয়েদ জালালুদ্দীন আলি বোখারার বিখ্যাত ইমামজাদা রোকনুদ্দীনকে ফিসফিসিয়ে বললেন—এসব কী হচ্ছে, হজরত? আমরা কি জেগে আছি, না স্বপ্ন দেখছি?

ইমামজাদা রোকনুদ্দীন শীতল কণ্ঠে বললেন—কিছু জিজ্ঞেস করো না আজ। এ হচ্ছে আল্লাহর ক্রোধ, আমাদের উপর নাজিল হয়েছে। সামান্য চু-চেরা করারও সুযোগ নেই।[১৮৯]

হুকুমনামা

এ তো গেল আক্রমণের প্রথম ঝলক। কিন্তু, চেঙ্গিজ খানের পরবর্তী প্রতিটি হুকুম ছিল এর চেয়ে অনেক বেশি কঠিন। নিষ্ঠুর চেঙ্গিজ খান একদিন বোখারার বিশাল ঈদগাহে গেলেন। জনসাধারণকে আগেই সেখানে জড়ো হতে আদেশ দিয়ে রেখেছিলেন। মাঠভর্তি মুসলিম জনতার চোখে-মুখে চমকাচ্ছিল আতঙ্ক। তাদের অভ্যন্তর থেকে উঠে আসছিল ভয়কাতুরে ফিসফাস আওয়াজ।

বিজিতদের ভেতর মুহূর্তে ত্রাস ছড়িয়ে দিতে খুবই পারঙ্গম ছিলেন চেঙ্গিজ খান। তিনি মিম্বারে উঠে উচ্চ গলায় খাওয়ারিজম শাহের দুর্ভাগ্য ও নিজের আক্রমণের কারণ বর্ণনা করতে লাগলেন। বললেন—হে বোখারাবাসী, আমি অনন্ত আকাশের ক্রোধ হয়ে নেমে এসেছি, যে আকাশওয়ালার ক্ষমতা সৃষ্টিজগতের প্রতিটি কোনায় বিরাজমান। খাওয়ারিজম শাহ শক্ত পাপে লিপ্ত হয়েছে। সেজন্য আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিতে এসেছি। অন্যান্য বাদশাহকে যেমন পিষে ফেলেছি আমি, ওকেও ঠিক তেমনভাবে ধ্বংস করব।[১৯০] হে লোকসকল, তোমরা অনেক বড় বড় গুনাহ করেছ। এই অপরাধ তোমাদের নেতারা করেছে। জিজ্ঞেস করতে পারো কেন আমি বলছি তোমরা গুনাহগার। কারণ, আমি আল্লাহর ক্রোধ ও আজাব। তোমরা যদি বড় বড় গুনাহে লিপ্ত না-হতে, এই আজাব নেমে আসত না তোমাদের উপর। খবরদার, খাওয়ারিজম শাহকে সহযোগিতা করবে না কেউ। দুর্গের ভেতর যেই সেনারা লুকিয়েছে, তাদের সাথে সব সম্পর্ক ছিন্ন করো। পারলে শহর থেকে বের করে দাও তাদের। আমার বাহিনীর জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করে তোমরা খুব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছ। যদি প্রাণে বাঁচতে চাও, তাদের জন্য খুলে দাও নিজ নিজ বাসস্থানের দরজা।

---

[১৮৯] জাহাঁকুশা ১/৮১

[১৯০] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১৫, পৃষ্ঠা ১১৭

সামনে পড়ে-থাকা সামানপত্র অবশ্য তারা নিজেরাই তুলে নেবে। তোমাদের এগিয়ে দেওয়ার দরকার হবে না। অবশ্যই স্বর্ণ-রৌপ্য ও জমিনে প্রোথিত গুপ্তধনের ঠিকানা আমাদের বলে দেবে।[১৯১]

দুর্গে আক্রমণ

চেঙ্গিজ খান আমজনতাকে দুর্গের সৈন্যদের বহিষ্কার করার নির্দেশ দিয়েছেন ঠিকই; কিন্তু দুর্গপ্রাচীর ছিল খুবই উঁচু ও মজবুত। টপকে গিয়ে সৈন্যদের তাড়াবার শক্তি তাদের ছিল না। ফলে একরকম কেটে যেতে লাগল দিন। কখনও-কখনও দুর্গ থেকে সিপাহিরা নেমে এসে তাতারদের উপর আক্রমণ করে তাদের অস্থির করে তুলেছিল। অতিষ্ঠ হয়ে চেঙ্গিজ খান দুর্গের প্রাচীর ভাঙতে নেমে যান। শহরজুড়ে ঘোষণা করা হয়—সবাইকে দুর্গ আক্রমণে শরিক হতে হবে। কেউ না এলে তাকে হত্যা করে ফেলা হবে।

এমনতরো ঘোষণায় মুসলিমদের একটি বড় দল এসে জড়ো হয়ে গেল দুর্গের কাছে। আগে প্রাচীরের সামনের খন্দকটা ভরাট করতে হবে। চেঙ্গিজ খানের নির্দেশে তারা পাথর, মাটি, বৃক্ষকাণ্ড, মসজিদের মিম্বার, বইপত্রের আলমারি—হাতের কাছে যে যা পেল, উঠিয়ে এনে ছুড়ে ফেলতে লাগল খন্দকের ভেতর। ধীরে-ধীরে ভরে উঠতে লাগল খন্দক। যখন পুরোপুরি ভরে উঠল, আক্রমণের আদেশ দিলেন চেঙ্গিজ খান। তখন অসংখ্য তাতার ও বোখারাবাসী একযোগে দুর্গে আক্রমণ করল।

কুক খান ৪০০ জানবাজ মুজাহিদ নিয়ে অসামান্য শক্তিমত্তার পরিচয় দিতে থাকেন। ১২ দিন পর্যন্ত এ সংখ্যাবিহীন হামলাকারীদের দুর্গে প্রবেশের কোনো সুযোগই দিলেন না। মুষ্টিবদ্ধভাবে কত আর লড়বেন, ক্ষুধায়-পিপাসায়-আরামহীনতায় মুজাহিদদের তখন বিপর্যস্ত অবস্থা। আখেরে তাতাররা প্রাচীরে আংটা লাগিয়ে লাফ দিয়ে দুর্গের অভ্যন্তরে গিয়ে পড়ে। অত্যন্ত নির্মমভাবে শহিদ করে ফেলে মুজাহিদদের।[১৯২]

জুলুমের দ্বিতীয় অধ্যায়

দুর্গবিষয়ক ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্ত হয়ে চেঙ্গিজ খান পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করলেন ধনদৌলত লুটপাটের কাজে। শুরু হল জুলুমবাজির দ্বিতীয় অধ্যায়ের। তাতার-সেনাদের প্রকাশ্যে লুটপাটের অনুমতি মিলে গেল। তারা বেধড়ক বাড়িঘরে ঢুকে সবকিছু লুট করে নিয়ে আসতে লাগল। কেউ বাধা দিতে এলে তলোয়ারের আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করে দিতে লাগল। তাই নয় শুধু, প্রকাশ্যে লুটে নিতে লাগল ঘরের পবিত্র

---

[১৯১] জাহাঁকুশা ১/৮১; চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১৫, পৃষ্ঠা ১১৭

[১৯২] ইবনুল আসির ৭/৫৭৫; জাহাঁকুশা ১/৮২

নারীদের সম্ভ্রম। বাধা দেওয়ার মতো কেউ ছিল না। কেউ সংঘর্ষ বাধাতে চাইলে এক কোপে উড়ে যাবে মস্তকের খুলি। বোখারা দখলের পরপরই নগরের আমির ও ব্যক্তিত্ববান লোকদের তাতারদের প্রহরায় নিয়ে যাওয়া হল। তাদের ঘাড়ের উপর ঝুলছিল সার্বক্ষণিক তলোয়ার। খানিক নড়নচড়নেরও সুযোগ ছিল না। তাদের সমস্ত সম্পত্তি ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তবু সারাক্ষণ তাতাররা তাদের অকথ্য নির্যাতন করে জিজ্ঞেস করছিল—দৌলতের যে গোপন ভান্ডার তোমরা লুকিয়ে রেখেছ, শিগগির আমাদের হাতে সোপর্দ কর।[১৯৩]

সব ছিনিয়ে নিয়েও স্রেফ সন্দেহের ভিত্তিতে জানতে চাচ্ছিল আর-সব ধনদৌলত কোথায় লুকানো? নিরুপায় তারা কী বলবেন তখন? অত্যাচার সয়ে সয়ে পুরোপুরি নেতিয়ে পড়েছেন। বেশিরভাগের চোখে অসহায় বাষ্প। কিছু বলছেন না দেখে তাতার-বাহিনী চাবুক দিয়ে তাদের বেদম পেটাতে লাগল। অনেককে শক্ত জালের ভেতর প্যাঁচিয়ে ফেলে রাখল দীর্ঘক্ষণ। অনেকের গায়ে জ্বলন্ত আগুনের সেঁক দিতে লাগল। সারা শরীর পুড়ে হয়ে গেল দগদগে ঘা। শেষে এই অমানবিক নির্যাতনের ভেতরেই তারা মারা গেলেন। উন্মত্ত তাতাররা ধনদৌলতের নেশায় সমস্ত মহল্লার বড় বড় দেয়ালের নিচে পর্যন্ত খোদাই করল। গুঁড়িয়ে দিল সমস্ত অট্টালিকা। তল্লাশি চালাল শহরের প্রতিটি কুয়ার ভেতর। শেষে যখন বুঝল—শহরবাসীর অস্থিমজ্জার শেষবিন্দুটুকু তারা চুষে নিয়েছে, তখন শুরু হল জুলুমবাজির তৃতীয় ও শেষ-অধ্যায়।

আজাবের দিন

বোখারার নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-শিশু সবাইকে তারা হাঁকিয়ে হাঁকিয়ে একটি বড় ময়দানে নিয়ে গেল। সেই ময়দানের ডানে-বামে, সামনে-পেছনে, চারদিকে, তলোয়ার উঁচিয়ে রেখেছে অসংখ্য তাতার-সিপাহি। কোনো দিক থেকে কারুর কেটে পড়ার সুযোগ নেই। বোখারাবাসীর বিশ্বাস জন্মে গেছে—আজকেই ঘটে যাবে শেষপরিণতি। নারী-শিশুদের কলজে-ফাটা আর্তনাদে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। স্ত্রীরা স্বামীদের এবং বাচ্চারা মায়েদের জাপটে ধরে আছে। প্রিয়জনের ভেতর তারা শেষ-আশ্রয় খোঁজে। কিন্তু সেই প্রিয়জনই যে আজ আশ্রয়বিহীন! তাতাররা চুল ধরে টেনে টেনে তাদের আলাদা করছে। পুরুষেরাও দুর্বল; কারণ, ঘাড়ের কাছে তারা চকচকে তরবারি চমকাতে দেখছে। আতঙ্কে তাদের মুখ নীল। কখন যে দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, বলা যায় না। পর্দানশিন সম্ভ্রমশীলা নারীজাতির পবিত্রতায় ফেরেশতারাও তো ঈর্ষাকাতর হয়ে ওঠে! সেই তারা আজ জংলি পশুদের খপ্পরে পড়েছে। পর্দাবৃত এই মা জাতিটির কেউ স্বামীর সামনে, কেউ ভাই কিংবা পুত্রের সামনেই হারাচ্ছে সম্ভ্রম।

---

[১৯৩] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১৫, পৃষ্ঠা ১১৮; রওজাতুস সফা ৫/২৭; খাওয়ারিজম শাহি ১০৭

কাজি সদরুদ্দীন খান, ইমামজাদা রোকনুদ্দীন ও তদীয় পুত্র হৃদয় মুচড়ে-দেওয়া এসব দৃশ্য দেখে নিজেদের আর ধরে রাখতে পারলেন না। ঈমানি আবেগে জর্জরিত হয়ে প্রচণ্ড হুংকার দিয়ে ওঠেন। আল্লাহু আকবারধ্বনিতে তাতারদের সঙ্গে লড়তে লড়তে শহিদ হয়ে যান। দেখাদেখি আরও অনেকেই হেঁকে ওঠে নারায়ে তাকবির। অঙ্গ কেটে ফেলা হবে কিনা সেই পরোয়া না করে, অসংখ্য ধারালো তলোয়ারের অবরোধের মধ্যেই নারীদের সম্ভ্রম লুণ্ঠনকারী তাতারদের উপর গিয়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে। কয়েকজন ধস্তাধস্তি করে দু-চারটে তাতার থেকে অস্ত্র কেড়ে নিতে সক্ষম হয় এবং সর্বশক্তি নিয়ে বেহুঁশের মতো আঘাত করতে থাকে লাগাতার। হত্যা করে ফেলে কিছু দুশমনকে, একসময় নিজেরাও শহিদ হয়ে যায়।[১৯৪] তা দেখে চারদিকের শৃঙ্খলাবদ্ধ তাতার-বাহিনীও নড়েচড়ে ওঠে। ক্রোধে অন্ধ হয়ে তারা বন্দিদের ভেতর নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালায়।

কাজি মিনহাজুস সিরাজের বক্তব্য—ইমামজাদা রোকনুদ্দীন নিচের কবিতাটি পড়তে পড়তে শাহাদাত বরণ করেছিলেন। কবিতার অনুবাদটি নিচে দেওয়া হল :

আমি মাহবুবকে বললাম, হায় আমার দিল গেল!

মাহবুব বললেন, এ হৃদয় তো আমার মাধ্যমেই আজ নিহত।

আমি বললাম, আর আমার জান!

বললেন, তা তো আমার মুঠোর ভেতর লুকিয়ে আছে।

বললাম, আপনার এই অবাধ্য কুকুরগুলি আমাদের উপর হামলা করেছে কেন?

বললেন, চুপ থাকো! কেননা এদেরকে আজ ছেড়েছি আমিই!![১৯৫]

দিনের তৃতীয় প্রহর এখন। এখনও ময়দানজুড়ে কবর-কাফনবিহীন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে লাখো শহিদের লাশ। খুলির পিরামিড ও লাশের উঁচু পাহাড় যেন আকাশের সাথে আজ চুপিচুপি কথা বলছে। প্রতিশোধের শেষ-উৎসব পালন করতে তাতাররা সারা শহরে আগুন লাগিয়ে দিল। অধিকাংশ বাসস্থান ছিল লাকড়ি দিয়ে বানানো। ফলে অল্পক্ষণেই তাতে আগুন ধরে গেল। বোখারার ভেতর থেকে কুণ্ডলি পাকিয়ে আকাশের দিকে উঠতে লাগল মেঘকৃষ্ণ ধোঁয়া। সেই ধোঁয়ার আবডালে হারিয়ে গেল আকাশের জাজ্বল্যমান সূর্য।[১৯৬]

বেছে বেছে নির্দিষ্ট কিছু নারী-পুরুষকে হত্যা না-করে বন্দি করে রাখল তাতাররা। চেঙ্গিজ খানের জুলুম যে কতটা কঠিন, তার প্রতীক হিসেবে তাদের হাঁকিয়ে নিয়ে চলল সমরকন্দ অভিমুখে। এই দুর্বল পদাতিক বন্দিদের অনেকেই

---

[১৯৪] ইবনুল আসির ৭/৫৭৬

[১৯৫] তাবাকাতে নাসিরি ১/৩৬৮

[১৯৬] তাবাকাতে নাসিরি ১/৩৬৮; চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১৫, পৃষ্ঠা ১১৮; ইবনুল আসির ৭/৫৭৬

তাতারদের ঘোড়ার গতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারছিল না। ফলে চলতে কেউ অক্ষম হয়ে গেলে তাতার-বাহিনী তাকে হত্যা করে কাগজের ঠোঙার মতো ছুড়ে ফেলে চলে যাচ্ছিল।[১৯৭]

সমরকন্দ ট্রাজেডি

আয়তনে খাওয়ারিজমের সবচেয়ে বড় শহর ছিল সমরকন্দ। এ ছিল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি এবং বসবাসের এক মনোরম এলাকা। এ শহরের পরিচিতি প্রদান করতে গিয়ে জনৈক কবি লিখেছিলেন, 'যদি কেউ বলে আমি পৃথিবীতে জান্নাত দেখেছি, তবে জেনো, সমরকন্দই হচ্ছে সেই জান্নাত।'

এখানকার বাতাস ও পানি ছিল খুবই স্বাস্থ্যকর। তখনকার মুসলিমবিশ্বের জ্ঞানচর্চা, বাণিজ্য ও শিল্পকারখানার এক অনন্য নগরী সমরকন্দ।

প্রতিরোধ-ব্যবস্থা

সমরকন্দের প্রতিরোধ-ব্যবস্থা সর্বদিক বিবেচনায় অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। এখানকার গভর্নর ছিলেন সুলতান আলাউদ্দীন মুহাম্মদের মামা তুগান খান। সিপাহিদের ভেতর ১ লক্ষ ১০ হাজার ছিল যুবক। তাদের মধ্যে ৬০ হাজার ছিল তুর্কি, বাকি ২৫ হাজার ঘুরি ও তাজেক। সবাই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।

শহরের বাইরে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত বাগিচার সারিকেও নগরপ্রাচীরে অন্তর্ভুক্ত করতে খাওয়ারিজম শাহের নির্দেশে ৬০ হাজার শক্তিশালী সৈন্য এক নতুন প্রাচীর নির্মাণে দিনরাত মশগুল ছিল। নকশা অনুযায়ী প্রাচীরের দৈর্ঘ্য ছিল ৩৬ মাইল। খাওয়ারিজম শাহের ধারণা ছিল—তাতাররা এখানে শতবার মাথা কুটে মরেও ভেতরে ঢুকতে না-পেরে শেষে ব্যর্থমনোরথে ফিরে যাবে।[১৯৮] কিন্তু চেঙ্গিজ খান হঠাৎ বোখারা জয় করে নেওয়ায় এই প্রাচীরের কাজ সম্পন্নতা পায়নি। তবে পুরোনো প্রাচীরই ছিল যথেষ্ট মজবুত। এর কাঠিন্য ও উচ্চতা দেখে সাধারণভাবে মনে হতো—আক্রমণকারী বাহিনী এক বছর নাগাদ অবরোধ করে রাখলেও শেষ পর্যন্ত টপকাতে পারবে না। প্রাচীরের বিভিন্ন দিক থেকে ছিল লোহার ১২টি মজবুত ফটক। তিরন্দাজির জন্য বিশেষ টেকনিকে সর্বোচ্চ সুরক্ষিত গম্বুজের মতো বানানো হয়েছিল উপরে। ওখান থেকে তির ছুড়ে ছুড়ে আক্রমণকারীদের অনেক দূরে ঠেকিয়ে রাখার ব্যবস্থা ছিল। আবার খোলা ময়দানে দুশমনকে ধরাশায়ী করার জন্য যুদ্ধের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দৈত্যাকৃতির ২০টি ভয়ানক হাতিও ছিল।[১৯৯]

---

[১৯৭] ইবনুল আসির ৭/৫৭৬

[১৯৮] রওজাতুস সফা ৪/৮২৪; নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৬১

[১৯৯] রওজাতুস সফা ৫/২৯; চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১৫, পৃষ্ঠা ১১৮

ত্রিমুখী আক্রমণ

এতসব ব্যবস্থাপনা সত্ত্বেও তাতারদের পরবর্তী যুদ্ধযাত্রা হয়ে উঠেছিল আরও ভয়ানক ও বিস্ময়কর। সমরকন্দ-বাহিনীর সংখ্যাধিক্য এবং দুর্গ ও প্রাচীরগুলোর কাঠিন্য দেখে চেঙ্গিজ খানের ধারণা হয়েছিল—এখানে শক্ত সংঘর্ষ বাধবে। তাতে দুপক্ষের সৈনিকদেরই বাঁচা-মরার আশঙ্কা আছে। এই চিন্তায় পৃথক পৃথক সব সেনাদলকে বিভিন্ন দিক থেকে সমরকন্দে পৌঁছার আদেশ দিয়ে রাখলেন তিনি। আশপাশের কোনো এলাকায় সংঘর্ষ করে সময় নষ্ট করেননি চেঙ্গিজ খান। আসার পথে একবারও থামেননি কোথাও। পথিমধ্যে যেসব এলাকা আত্মসমর্পণ করেছে, সেখানে কোনো হামলা করেননি। কোথাও কেউ সংঘর্ষ করতে চাইলে মোকাবেলার জন্য কিছু সৈন্য সেখানে রেখে চলে এসেছেন।[২০০]

ইতিপূর্বে পড়েছেন—সাইহুন-নদীর তীরবর্তী আতরার এলাকাই ছিল সেই সর্বশেষ ঘাঁটি, তাতার শাহজাদার সাথে যা কয়েক মাস পর্যন্ত লড়েছিল। ইতিহাস বলে—আতরার আক্রমণের ঘটনা বোখারা অভিযানের দু-মাস আগে ঘটেছিল। কিন্তু বোখারার যুদ্ধ দুই সপ্তাহও স্থায়ী হয়নি। ওদিকে আতরারবাসী কয়েক মাস পর্যন্ত বীরবিক্রমে লড়ে গেছে। বোখারা ধ্বংসের কিছুকাল পরেই তাতার শাহজাদা আতরার কবজা করে ইয়ান্নাল খানকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছিল। তারপর, চেঙ্গিজ খানের সুদৃঢ় নির্দেশে সাইহুনের আশপাশে যত তাতার-সেনা ছিল, সবাই একত্র হয়ে বন্দিদের উত্তর-পূর্বদিক থেকে হাঁকাতে-হাঁকাতে সমরকন্দ অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিল। এই পুরো বাহিনী ছিল মূলত চেঙ্গিজ খানের যুদ্ধের দক্ষিণহস্ত। নানারকম কল্যাণচিন্তায় আলাদা করে রাখা হয়েছিল তাদের।

সমরকন্দ অবরোধ : ইয়ান্নাল খান হত্যা

৬১৭ হিজরির রবিউল আউয়াল মাস (মে, ১২২০)। তাতার-বাহিনীর এক বিরাট বহর সমরকন্দ প্রাচীরের সামনে এসে পৌঁছেছে।[২০১] সৈন্যবহরের এ-মাথা থেকে সহজে চোখে পড়ে না ও-মাথা। অসংখ্য হিংস্র তাতার পিঁপড়ের মতো পিলপিল করে এগোচ্ছে। চেঙ্গিজ খান দুশমনের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য অশ্বারোহীদের ফ্রন্ট লাইনে রেখেছেন। পদাতিক ও রসদ সংরক্ষণকারী দল এবং কয়েদিদের রেখেছেন ধারাবাহিকভাবে পেছন পেছন। প্রতি দশজন কয়েদিকে হাঁকিয়ে নিয়ে চলেছে একজন করে তাতার। ফলে এই সূক্ষ্ম সংমিশ্রণে বাহ্যিকভাবে বন্দিদেরকেও সৈন্যদলের অংশ বলেই মনে হচ্ছে।[২০২]

---

[২০০] রওজাতুস সফা ৫/২৯; জাহাঁকুশা ১/৯৩

[২০১] জাহাঁকুশা ১/৯৬,

[২০২] ইবনুল আসির ৭/৫৭৬

সমরকন্দবাসী নগরপ্রাচীরের উপর থেকে রুদ্ধশ্বাসে দেখছিল এই দৃশ্য। সমরকন্দ-প্রাচীরের সামনে এসে তাতার-বাহিনী উল্লম্ফন শুরু করে দিল। দুর্গের বিপরীত দিকে কুকসরা নামের একটি টিলায় চেঙ্গিজ খানের তাঁবু স্থাপন করা হল।[২০৩] একটু পরে, সাইহুনের তীরবর্তী এলাকাগুলোর মিশন থেকে সবে যে তাতাররা অবসর হয়েছে, তারাও অসংখ্য বন্দিকে নিয়ে সমরকন্দ অবরোধে এসে শরিক হল। সেই বন্দিদের ভেতর ইয়ান্নাল খানও ছিলেন। ইয়ান্নাল খানকে সরাসরি টিলার উপর চেঙ্গিজ খানের সামনে উপস্থিত করা হল। ক্রোধে চেঙ্গিজ খানের লাল চেহারা তখন দ্বিগুণ রক্তিম হয়ে উঠেছে। যেন-বা চামড়া ফেটে এক্ষুনি ছিটকে পড়বে টকটকে রক্ত। নীল হয়ে ফুলে উঠেছে গলার দু-ধারের শিরাগুলো। রাগে ইয়ান্নাল খানের চোখে ও কানে তিনি গলিত তামা ঢেলে দেন। যন্ত্রণায় সেখানেই তড়পাতে তড়পাতে শহিদ হয়ে যান ইয়ান্নাল খান। তাকে এমন নৃশংসভাবে হত্যা করার কারণ—ইতিপূর্বে ইয়ান্নাল খান চেঙ্গিজ খানের বণিকদের রৌপ্য কেড়ে নিয়েছিলেন[২০৪]

সমরকন্দের আমিরদের পরামর্শ

ক'দিন ধরে চেঙ্গিজ খান প্রাচীর ও শহরের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিলেন। একেবারে প্রথমেই কাউকে আক্রমণ করে বসতে বলেননি। তলোয়ার ও বর্শার ছায়ায় বন্দিদেরকে দিনরাত তাতারদের সেবা করতে বাধ্য করলেন। তখনও দলে এসে শরিক হচ্ছে নতুন নতুন ঝাঁকবদ্ধ তাতার সৈন্য। চেঙ্গিজ খান প্রাচীরের বাইরে কিছু খন্দক খননের আদেশ দিলেন। তা দেখে সমরকন্দের আমিরেরা বুঝে গেলেন—তাতার-বাহিনী শক্তভাবে দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাতারদের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে দেখে মানসিকভাবে তারা পুরোপুরি ভেঙে পড়লেন। তাদের দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত ছিল কেবল আগত তাতারদের সুদীর্ঘ বহর। আমিরেরা খুব আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। ভাবেন—কয়েক দিনের মধ্যে তাতার-বাহিনী আশপাশের সমস্ত পাহাড় ও জঙ্গল কবজা করে ফেলবে। ফলে কোনোখান থেকেই কোনো সাহায্য আসার সম্ভাবনা থাকবে না।

এসব ভেবে সেনাপতিরা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন যুদ্ধের।[২০৫] কিছু কিছু ইতিহাসবিদের বর্ণনায় পাওয়া যায়—যুদ্ধ করতে সেনাপতিদের সবাই একমত ছিল না। লড়াইয়ের জোশ ও জজবা বেশি ছিল ঘুরি গোত্রগুলির ভেতর। আবার তুর্কি সেনাপ্রধানরাও মোকাবেলার পক্ষে ছিল না। তারা ধারণা করেছিল—আমরাও তুর্কি, তাতাররাও তুর্কি বংশোদ্ভূত। তাই যুদ্ধ করার দরকার নেই। আমরা নিরাপত্তা পেয়েই যাব।[২০৬]

---

[২০৩] রওজাতুস সফা ৫/২৯

[২০৪] জাহাঁকুশা ১/৬৬; ইবনে খালদুন ৫/১১০

[২০৫] জাহাঁকুশা ১/৯২; জামিউত তাওয়ারিখ ৩৬২

[২০৬] নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৮৩

যুদ্ধের প্রথম দিন

সমরকন্দ অবরোধের আজ তৃতীয় দিন। শহরের প্রধানফটক খোলা হল। খাওয়ারিজমি সিপাহিরা শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে বালাখান ও আলবায খানের নেতৃত্বে বাইরে বেরোল। একমুহূর্তও অপেক্ষা না-করে নারায়ে তাকবিরধ্বনিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল দুশমনের উপর। তাতাররাও যেন লড়াইয়ের জন্য কোমর কষে ছিল। ফলে দুপক্ষে বেধে উঠল পালটাপালটি আক্রমণ। অসামান্য শক্তিতে তলোয়ার ও বর্শা চালনায় আর তিরন্দাজিতে মেতে উঠেছে দুইদল। তাতারদের সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও মুসলিমরাই অধিক পৌরুষ ও বীরত্বের প্রমাণ দিচ্ছে। দুশমন তাদের আক্রমণ ঠেকাতে পারছে না। বারবার তাতারদের জোর বেড়ে গেলেও পরক্ষণেই পিছু হটতে হচ্ছে তাদের। কয়েকবার লড়াই চালিয়ে তাতাররা প্রাচীরের খুব কাছাকাছি এসে গিয়েছিল। কিন্তু মুসলিমদের অবিরাম তির-বর্ষণে পড়ে গেল তাদের শত শত লাশ। তারা পিছু হটতে বাধ্য হল। সন্ধ্যা পর্যন্ত অব্যাহত রইল এই পালটাপালটি যুদ্ধ। বহুসংখ্যক তাতার-সেনা মারা পড়ল। অনেকে মুসলিমদের হাতে বন্দি হল। মুসলিম-বাহিনীর অনেকে শহিদ হল।[২০৭]

দ্বিতীয় দিন

প্রথম দিনের অভিজ্ঞতায় চেঙ্গিজ খান হতভম্ব। তিনি পুত্র ও সহচরদের একান্তে ডেকে বোঝালেন নিজেদের কোন কোন দিক দুর্বল। তারপর যুদ্ধের নতুন পরিকল্পনা সাজালেন। পরেরদিন ঘোড়সওয়ার হয়ে তিনি নিজেই বাহিনীকে কমান্ড করেন। পূর্বের তুলনায় আরও প্রবল শক্তি নিয়ে আচানক আক্রমণ করে বসেন। সমরকন্দবাসী বাইরে বের হয়ে লড়বার সুযোগ পেল না। দিনভর অব্যাহত রইল তাতারদের দাপট। প্রতিমুহূর্তে মুসলিমদের মনে একটাই শঙ্কা কাজ করতে লাগল, এই-না প্রাচীর ভেদ করে ভেতরে ঢুকে পড়ে চেঙ্গিজ খান! প্রথমদিন যে পরিমাণ আশান্বিত হয়ে উঠেছিল সমরকন্দবাসী, দ্বিতীয় দিনের দুর্দশায় তার চেয়ে অধিক মনোবলহীন হয়ে পড়ে তারা। দ্রুত তাদের পরামর্শসভা বসে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও কয়েকজন সেনাপতি খেয়াল ব্যক্ত করেন—মর্যাদাপূর্ণ শর্তের ভিত্তিতে এক্ষুনি সন্ধি করে ফেলা উচিত।

কিন্তু উন্নত সাহসী জেনারেলরা কখনও তা করতে প্রস্তুত নন। তাদের খেয়াল হচ্ছে—চেঙ্গিজ খানের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস রাখা আত্মপ্রবঞ্চনার শামিল। ফলে নিজেদের মধ্যে মতপার্থক্য ঘটে গেল। এবং তা এত বেড়ে গেল যে, পরামর্শসভা মুহূর্তে হয়ে উঠল ঝগড়ার বাজার। শহরজুড়ে ছড়িয়ে পড়ল গৃহযুদ্ধের আতঙ্ক। বিদ্রোহী দল যেকোনো মূল্যে চেঙ্গিজ খানের সাথে সন্ধিচুক্তি করতে প্রস্তুত। শেষমেশ

---

[২০৭] জাহাঁকুশা ১/৯২-৯৩; জামিউত তাওয়ারিখ ৩৬৩

৩০ হাজার তুর্কি সৈন্যের সরদার বার্শমাশ খান (সে-ই সন্ধির জন্য বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছিল) রাতারাতি চেঙ্গিজ খানের সাথে সম্পর্ক তৈরি করে ফেলল। নিজ নিরাপত্তাকর্মী, অফিসার, সরদার ও তৎসম্পৃক্তদের জান-মালের সুরক্ষার শর্তে চেঙ্গিজ খানের হাতে শহর সোপর্দ করার ওয়াদা করে এল সে।[২০৮]

যুদ্ধের তৃতীয় দিন : গাদ্দারি ও পরাজয়

যুদ্ধপ্রিয় সেনাপ্রধান ও মুজাহিদবাহিনী এই গোপন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তখনও কিছু জানতে পারেননি। তারা আসন্ন যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। চলছিল অবরোধের ২৫তম দিন। সমরকন্দের জানবাজ মুজাহিদরা আরও একবার খোলা ময়দানে নেমে আসেন। সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে দুশমনের উপরে শক্ত আক্রমণ করে বসেন। ঝনঝন করে বেধে যায় প্রবল যুদ্ধ। দ্বিপ্রহরে যুদ্ধ সর্বোচ্চমাত্রায় ওঠে। মুসলিম ও কাফের, ভয়ানকভাবে একে অপরকে আঘাত করতে থাকে সবাই। তলোয়ারের ঘূর্ণনে ছিটকে ছিটকে পড়ে আগুন।

তাতাররা হঠাৎ এক নতুন কৌশল অবলম্বন করে বসে। ধীরে-ধীরে ময়দান ছেড়ে তারা পিছপা হতে থাকে। মুসলিমরা জোশ সামলাতে না পেরে পেছন-পেছন শহরের বাইরে অনেক দূর পর্যন্ত তাতারদের ধাওয়া করে নিয়ে যায়। ওদিকে শহর-সীমান্তে ঘাপটি মেরে বসে ছিল হাজারও তাতার-সেনা। তারা গোপন ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে এসে মুসলিমদের পেছন থেকে ঘিরে ফেলল। তখন সম্মুখের পলায়নপর তাতাররাও ঘুরে দাঁড়াল। ফলে দুইদিক থেকে দুশমনের বেড়ের মধ্যে পড়ে গেল মুসলিমবাহিনী। এমন সময় এই ঘেরাও ছিন্নভিন্ন করতে স্বগোত্রীয় মুসলিম যোদ্ধাদের সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এই নাজুক সময়ে সমরকন্দের বিদ্রোহী সিপাহিরা ৩০ হাজার সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ থেকে আলাদা হয়ে গেছিল। মুজাহিদবাহিনী সকাল থেকে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত লড়তে লড়তে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তা ছাড়া, এই রকম পরিস্থিতিতে সরদারদের গাদ্দারি? সবার চোখে স্পষ্ট ভাসছিল পরাজয়ের দৃশ্য।

ক্লান্তিতে মুজাহিদদের অনেকে অস্ত্রহাতে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারছিল না। অধিকাংশই বীরবিক্রমে লড়তে লড়তে শহিদ হয়ে গিয়েছিল। মুজাহিদবাহিনীর সংখ্যা ছিল ৭০ হাজার। ৪০-৫০ হাজার ছিল প্রথম সারিতে, বাকিরা পেছন দিকে।[২০৯] যুদ্ধ চলাকালে সমরকন্দের ব্যক্তিত্ববানদের একটি বড় প্রতিনিধিদল চেঙ্গিজ খানের দরবারে এসে পৌঁছে। চেঙ্গিজ খান খুবই আবেগমথিত ভঙ্গিতে তাদের অভ্যর্থনা জানান। চেঙ্গিজের কাছে তারা শহরবাসীর জন্য সাধারণ ক্ষমার আবেদন করে। সেই আবেদনও মঞ্জুর করেন প্রতারক চেঙ্গিজ।[২১০]

---

[২০৮] জাহাঁকুশা ১/৯৩

[২০৯] নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৮৩

[২১০] জাহাঁকুশা ১/৯৩; জামিউত তাওয়ারিখ ৩৬৩

ইশার নামাজ সবে পড়ে উঠেছে সমরকন্দের মুসলমান। এর মধ্যেই আত্মপ্রবঞ্চিত লোকগুলি প্রাচীরের ফটক খুলে দিল। তাতার-বাহিনী উচ্চ গলায় জয়ধ্বনি দিতে দিতে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়তে লাগল ভেতরে। চেঙ্গিজ খানের নির্দেশে প্রথমে প্রাচীর, তারপর প্রতিটি ঘাঁটিসহ সবক'টি প্রতিরোধকেন্দ্র গুঁড়িয়ে দেওয়া হল। প্রতিরোধকেন্দ্রগুলো আগে বিধ্বস্ত করার কারণ—সেখান থেকে যেন আচমকা কেউ বিদ্রোহ করে উঠতে না পারে। তাতাররা এই অভিযানে অসংখ্য বন্দিকে নিয়ে নেমেছিল। কী আশ্চর্য, একদিন-একরাতের মধ্যেই তারা সমরকন্দের ইস্পাতকঠিন প্রাচীর পুরোপুরি ধুলোয় মিশিয়ে দিল।

তারপর? যা আশঙ্কা করা হয়েছিল, তা-ই ঘটল। সাধারণক্ষমার প্রতিশ্রুতি চেঙ্গিজ খান বেমালুম ভুলে গেলেন। সমরকন্দবাসীর জান-মাল, ইজ্জত-সম্ভ্রম কিছুই রক্ষা পেল না। তাতাররা ঘোষণা করল—শহরের ভেতর থেকে মুহূর্তে বেরিয়ে আসো সবাই। কেউ থেকে গেলে তাকে নিশ্চিত হত্যা করে ফেলা হবে।

ঘোষণা দিয়েই তির-বেগে তাতার সেনারা শহরে ঢুকতে লাগল। নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ—সবাইকে টেনে-হিঁচড়ে শহরের বাইরে এনে জড়ো করতে লাগল। তাদের মধ্য থেকে কুশলী ও শক্তিশালী লোকদেরকে সৈন্যদলের সেবায় নিযুক্ত করল। সুন্দরী নারীদের ভোগ-বিলাসের জন্য রেখে দিল জীবিত। এই জিল্লতি থেকে বাঁচতে অনেক লোক প্রাসাদের মধ্যে লুকিয়ে পড়েছিল। চতুর চেঙ্গিজ খান ঘোষণা দিলেন—যেখানেই যারা লুকিয়েছ, বেরিয়ে আসো। নাহয় শিগগির হত্যা করে ফেলা হবে।

এই ধমকি শুনে ভয়ে অনেকে বেরিয়ে এল। এভাবে বুদ্ধি খাটিয়ে আত্মগোপনকারীদের বের করে আনতে সক্ষম হলেন চেঙ্গিজ খান। অবশ্য শহরের কাজি, শায়খুল হাদিস, সন্ধিচুক্তির প্রতিনিধি ও তাদের নিকটাত্মীয়দের আলাদা রাখা হয়েছিল। তাদের তেমন কিছু করা হচ্ছিল না। এই সাময়িক নিরাপত্তাপ্রাপ্ত লোকের সংখ্যা ছিল ৫০ হাজার।[২১১]

খাওয়ারিজমি সিপাহিদের যোদ্ধা হাতিগুলোও তাতারদের হাতে এসে পড়েছিল। ক্ষুধায় উন্মাদ হয়ে গেছিল হাতিগুলো। ঘাস-পাতার ব্যবস্থার জন্য মাহুত এসে চেঙ্গিজ খানের কাছে হাজির। চেঙ্গিজ খান দেখলেন—তার প্রলয়ঙ্করী যুদ্ধে এইসব ভারী হাতির বিশেষ কোনো কাজ নেই। উলটো উটকো ঝামেলা। তিনি বেপরোয়া ঢঙে বললেন—এগুলো মরুভূমির ভেতর নিয়ে ছেড়ে এসো। নিজেদের ঘাস নিজেরাই খুঁজে নিক।

---

[২১১] জাহাঁকুশা ১/৯৩-৯৪

শুষ্ক মরুর ভেতর হাতিগুলোকে ছেড়ে আসা হল। কে না জানে—মরুবালুতে কোনো ঘাস জন্মে না! বিশাল-বিস্তৃত সেই গোধুম-রঙা মরুভূমিতে ঘাস-পানি না পেয়ে শেষ পর্যন্ত তড়পাতে তড়পাতে মারা গেল হাতিগুলো।[২১২]

রক্তের হোলিখেলা

শহরের তুর্কি-সৈন্যরা জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে তাতারদের দলে ভিড়ে গিয়েছিল। এদের মনে তখনও সুধারণা ছিল—তাতাররা আমাদের মতোই তুর্কিজাতি। আমাদের প্রতি তাই খানিক লেহাজ করবে তারা।

তাতাররা তাদের বলল—তোমরা তোমাদের হাতিয়ার, বাহনজন্তু ও ধনসম্পত্তি আমাদের কাছে সমর্পণ করো। তা হলে তোমাদের জীবিত রাখা হবে। মর্জি-মোতাবেক তোমাদের সুরক্ষিত কোনো এলাকায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

একথা শুনে এই তুর্কি সৈন্যরা সবকিছু দিয়ে দিল। আর তখনই তাতাররা প্রতিশ্রুতি ভেঙে, তলোয়ার দিয়ে কর্তিত ফসলের মতো দ্বিখণ্ডিত করে দিতে লাগল তাদের।[২১৩] যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনে শহরজুড়ে তাতাররা গণহত্যা চালাল। আল্লাহর লক্ষ লক্ষ বান্দার লাশের সারি সমরকন্দের বাজার, গলি, উপগলি, শাখাগলি ও বিস্তৃত ময়দানজুড়ে বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে রইল। তাতাররা তাদের মস্তক কেটে কেটে একদম পিরামিড বানিয়ে ফেলল।

দুর্গপতি আলপ খান তখনও সিপাহিদের নিয়ে লুকিয়ে আছেন দুর্গের ভেতর। হঠাৎ একবার বেরিয়ে এসে তাতারদের উপর হামলা করে বসেন তিনি। খুব তেজোদ্দীপ্তভাবে মেরে-কেটে তিনি শহর থেকে বেরিয়ে পড়েন এবং খাওয়ারিজম শাহের কাছে গিয়ে পৌঁছতে ঘোড়া ছোটান দক্ষিণ দিকে।

পরদিন তাতাররা দুর্গের একটি দেয়াল ভেঙে শেষপ্রতিরক্ষার সেই দুর্গটিও কবজা করে ফেলে। একটি মসজিদে হাজারের মতো মুসলমান আশ্রয় নিয়েছিল। আগ্রাসী তাতার-বাহিনী শহরের দ্বিতীয় দিক থেকে ফারেগ হয়ে এই মসজিদে এসে ঝাপটে পড়ে। আল্লাহর পবিত্র ঘরে তারা আগুন ধরিয়ে দেয়। সেই আগুনে পুড়ে শহিদ হয়ে যায় আশ্রয়গ্রহণকারী সকল মুসলমান।[২১৪]

গাদ্দারির ফল

তাতাররা বার্শমাশ খান ও অন্যান্য গাদ্দার সরদারদের দুয়েকদিন খুব খাতির-যত্ন করল। তাদের ৩০ হাজার সিপাহিকে তাতার সেনাবাহিনীতে ভর্তি করে নেওয়া হল। এই সিপাহিরা ছিল কানকলিসহ বিভিন্ন তুর্কি গোত্রের লোক। গাদ্দারগুলো নিজেদের

---

[২১২] জাহাঁকুশা ১/৯৪

[২১৩] নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৮৩; ইবনুল আসির ৭/৩৭৬

[২১৪] জাহাঁকুশা ১/৯৫-৯৬; রওজাতুস সফা ৫/২৯-৩০; চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১৫, পৃষ্ঠা ১১৯

নিমকহারামির মূল্য উসুলের জন্য তখন পাগল হয়ে উঠেছে। তাদের আশা ছিল—চেঙ্গিজ খান তাদের পুরস্কৃত ও সম্মানিত করবেন। চেঙ্গিজের মতো সুচতুর লোক শত্রুপক্ষের গাদ্দারদের উপর নির্ভর করবার মতো ভুল করতে পারেন না। তিনি জানতেন—এই দৌলত ও পদলোভীরা পূর্বমনিবের বিরুদ্ধে যেভাবে বিদ্রোহ করেছে, যেকোনো সময় আমার সাথেও তেমন গাদ্দারি করতে পারে।

একরাতে বার্শমাশ খান ও তার সঙ্গীরা গভীর ঘুমে বিভোর। চেঙ্গিজ খানের নির্দেশে, তাতার-বাহিনী নিঃশব্দে এসে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভোরে উঠে দেখা গেল—স্রোতেলা রক্তে মাখামাখি হয়ে পড়ে আছে ৩০ হাজার সিপাহির লাশ।[২১৫]

খাওয়ারিজমিদের সহযোগী বাহিনীর ব্যর্থতা

আল্লামা ইবনুল আসির লিখেছেন—খাওয়ারিজম শাহ (সমরকন্দ হামলার পূর্বে যিনি দক্ষিণে চলে গিয়েছিলেন) সমরকন্দ অবরোধের সংবাদ শুনে দক্ষিণাঞ্চল থেকে সহযোদ্ধা হিসেবে ১০ হাজার সিপাহি প্রেরণ করেন সমরকন্দে। কিন্তু তাতারদের শক্ত অবরোধ ভেদ করে তারা শহরে পৌঁছতে পারেনি। ফের দ্বিতীয়বার ২০ হাজার সৈন্য পাঠান। কিন্তু দুঃখের কথা হল—কোনো পথ খুঁজে না পেয়ে এরাও আবার দক্ষিণে ফিরে যায়।[২১৬]

পাথরদিল খলিফা ও মুসলিম গভর্নর

তাতার কর্তৃক খাওয়ারিজমি মুসলিমদের নির্বিচার গণহত্যায় আশপাশের অন্যসব মুসলিম সরকার নীরব দর্শক সেজে রয়েছিলেন। হাত গুটিয়ে কেবল তামাশা দেখছিলেন তারা। খাওয়ারিজমিদের একের পর এক পরাজয় ও মুসলিম জনসাধারণের রক্তের ধারাস্রোত দেখেও নিজেদের উপর জিহাদ ফরজ হয়ে গেছে বলে মনে করেননি তখনও। এই মজলুমদের সহযোগিতায় তলোয়ার হাতে নেমে আসেননি কোনো মুসলিম শাসক। আব্বাসি খলিফা নাসিরের দায়িত্ব ছিল—খাওয়ারিজমি মুসলিমদের প্রতিরক্ষায় পুরো মুসলিমবিশ্বে নাফিরে আমের ঘোষণা করে দেওয়া। তা না করে নির্লজ্জলতা ও নেফাকির জঘন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন তিনি। মেতে উঠেছিলেন রঙ-তামাশায়।

একবারের কথা। সমরকন্দ ও বোখারার মুসলিম-নিধনের করুণ কাহিনি শুনে আচমকা ভেতর থেকে প্রবলভাবে ছলকে ওঠেন খলিফার এক মন্ত্রী। ব্যথাতুর হৃদয়ে খলিফার দরবারে এসে ভারী গলায় হেঁকে ওঠেন—আহ, হে আমাদের নেতা, তাতাররা তো ইসলামি শহরগুলো কবজা করে ফেলছে! নির্বিচারে হত্যা করছে মুসলিমদের!!

---

[২১৫] রওজাতুস সফা ৫/২৯

[২১৬] ইবনুল আসির ৭/৫৭৭

উজিরের এই কলজে-চেড়া আর্তনাদেও হৃদয়হীন খলিফার মধ্যে একটুখানিও ভাবান্তর ঘটল না। অদ্ভুত বেপরোয়া ভঙ্গিতে তিনি বললেন—ছাড়ো সে-কথা। তার চেয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে নাজেহাল হয়ে আছি আমি। আমার সাদাকালো ডোরাকাটা পাখিটা যে কোথায় গেল! তিন দিন হয়ে গেল দেখছি না![২১৭]

খাওয়ারিজমি মুসলিমদের হিজরত

খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যে তাতার-আগ্রাসনের শুরুর দিকেই, সীমান্তবর্তী শহর ও গ্রামগুলোর অসংখ্য লোক প্রাণ বাঁচাবার জন্য হিজরত করে রাজ্যের মধ্যখানের শহরগুলোতে এসে আশ্রয় নিচ্ছিল। তাদের অধিকাংশের ধারণা ছিল—শহর-সীমান্তেই তাতারদেরকে আটকে ফেলবেন খাওয়ারিজম শাহ। ফলে মধ্যবর্তী শহরগুলো তাদের আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকবে।

বোখারা-সমরকন্দের পতন ও মা-ওয়ারাউন-নাহারের অন্যসব শহরের গণহত্যা দেখে তাদের এই ধারণা একদম উবে গেল। বাদশাহর হীনম্মন্যতা, বাহিনীর একের-পর-এক পরাজয় ও ভিনদেশি আগ্রাসী শক্তির নির্বিঘ্ন অগ্রযাত্রায় তাদের উপর নেমে এল ভয় ও হতাশার কালো ছায়া। লোকজন তখন প্রাণটা কোনোভাবে বাঁচিয়ে দূরদূরান্তের বিভিন্ন শহরে ভাগতে লাগল। পাড়া-মহল্লাগুলো একেবারে খালি হয়ে গেল। এই কিংকর্তব্যবিমূঢ় মুহাজিররা বহুদূর কোথাও পালিয়ে যেতে চাচ্ছিল। অথচ জানত না—কোথায় তারা যাবে? কোন শহর হবে তাদের নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র? তাদের ভেতর অশীতিপর বুড়োরাও ছিল। ছিল অনেক রুগ্‌ণ মানুষ। কখনও ঘরের বাইরে পা ফেলেননি, এমন পর্দানশিন পবিত্র নারীকুলও এই মহা মুসিবতে পড়ে গিয়েছিলেন সেদিন। কান্নার রোল পড়ে গেছিল অসংখ্য নিষ্পাপ শিশুর মাঝে। অধিকাংশ মুহাজিরের কাছেই কোনো সওয়ারি ছিল না। ছিল না উপযুক্ত পাথেয়।

ক্ষুধায়-পিপাসায় রোজ তারা ছুটে চলছিল অজানা গন্তব্যের সন্ধানে। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্তিতে ভেঙে আসছিল পা। হঠাৎ দূরে কোথাও বসতির মতো কিছু দেখে চকচক করে উঠত চোখ। তখন, শুকনো গলায় ঢোক গেলার চেষ্টারত ওরা সামনে এগোত দ্বিগুণ উত্তেজনায়। এই বুঝি কোনো নিরাপদ আশ্রয় মিলে গেল! কিন্তু না, পথ চলতে চলতে বিবশ হয়ে যেত তাদের পা, ক্লান্তিতে সওয়ারি পশুগুলো পিঠের আরোহীকে নিয়েই বসে পড়ত পথে, তবু দূর-সুদূর পর্যন্ত মিলত না কোনো বসতির দেখা।

ক্ষুধায়-পিপাসায় ও আবহাওয়ার প্রতিকূলতায় অনেক মুহাজিরের তখন দমবন্ধ অবস্থা। দুর্বল ও মাজুরশ্রেণির লোকেরা কাফেলার সাথে তাল মিলিয়ে এগোতে না পেরে অনেক পেছনে পড়ে যেত। কাফেলা থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে কেউ পেছনে তাকালে বিন্দুর মতো কিছু-একটা ভাসত কেবল।

---

[২১৭] আন-নুজুমুয যাহিরাহ ৬/২৬২

এভাবে এদিক-সেদিক একা পড়ে গিয়ে মরুভূমির হিংস্রতায় কতজন যে প্রাণ হারালো? কেউ কেউ পথিমধ্যেই তাতারদের হাতে পড়ে গেল—জীবন বাঁচাতে এসেই তারা হারালো জীবন।

মুহাজিরদের অনেকে ছিল ধনবান। এরা সবকিছু গোছগাছ করে তাতার-আগ্রাসনের শুরুর দিকেই ঘোড়া ও উটের কাফেলার সাথে হিন্দুস্থান, আরব ও আনাতোলিয়ায় পাড়ি জমিয়েছিল। আবার তাদের একটা বড় দল দক্ষিণের শহর হেরাত এবং পশ্চিমের মার্ভ ও নিশাপুরের প্রাচীর-বেষ্টিত শহরগুলোতে পৌঁছে নিরাপদ বোধ করছিল। কয়েক মাসের ভেতর এই শহরগুলোতে আসা মুহাজিরের সংখ্যা ছাড়িয়ে গিয়েছিল কয়েক লক্ষ।

দশম অধ্যায়

বিরানভূমির মুসাফির

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ ○ وَ مَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗٓ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ۭ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ

হে মুমিনগণ, তোমরা যখন কাফেরদের মুখোমুখি হবে বিশাল বাহিনী নিয়ে, তখন তাদের থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না। আর যে ব্যক্তি সেদিন তাদের থেকে পশ্চাদপসরণ করবে—অবশ্য যে যুদ্ধের কৌশল পরিবর্তনকল্পে কিংবা যে নিজ সৈন্যদের নিকট আশ্রয় নিতে আসে সে ব্যতীত—অন্যরা আল্লাহর গজব সাথে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। আর তার ঠিকানা হল জাহান্নাম। বস্তুত সেটা হল নিকৃষ্ট অবস্থান।[২১৮]

দক্ষিণের সফর

আলাউদ্দীন খাওয়ারিজম শাহ সমরকন্দ থেকে বেরিয়ে সাধারণ এক বণিকের বেশে দক্ষিণের পথে রওনা দিয়েছিলেন। সে-সময় আশপাশের সমস্ত এলাকা থেকে তাতার-সেনারা সমরকন্দে এসে জড়ো হচ্ছিল। সেজন্য রাস্তায় তাতারদের সংঘর্ষ থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন তিনি। তার সামনে নির্দিষ্ট কোনো গন্তব্য ছিল না। সমরকন্দ থেকে বেরোবার সময় তিনি এই ইচ্ছেটুকুই শুধু ব্যক্ত করেছিলেন যে, বিরাট বাহিনী গঠন করতে যাচ্ছেন তিনি। অথচ এ ছিল তার সম্পূর্ণ অলীক ভাবনা।

শাহজাদা জালালুদ্দীনের প্রচেষ্টা

ওদিকে নতুন সেনাবাহিনী গঠন করতে সাম্রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলে শাহজাদা জালালুদ্দীন পুরোদমে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।[২১৯] কিন্তু রাজ্যে ঘটে-যাওয়া ভয়ানক ধ্বংসযজ্ঞের কারণে তেমন শক্তি যোগাতে পারছিলেন না যে, তিনি সরাসরি তাতারদের মোকাবেলায় নামবেন। বলা যায়—তখনকার চেষ্টা অনুপাতে কোনো ফলই পাননি তিনি।

কারণ, রাষ্ট্রের উপর থেকে মানুষের ভরসা উঠে গিয়েছিল। যে-শাসক রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলি এত সহজে তুলে দিতে পারে দুশমনের হাতে, তার অধীনে আর যা-ই হোক, যুদ্ধ করে সফলতা লাভের আশা করা যায় না।

---

[২১৮] সুরা আনফাল, আয়াত ১৫, ১৬

[২১৯] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১৪, পৃষ্ঠা ১১১

দরবারি জ্যোতিষীদের পরামর্শ

জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি সুলতান আলাউদ্দীনের বড় টান ছিল। তার কাছে অনেক মূল্যবান ছিল জ্যোতিষীদের একেকটি কথা। দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার সেই দিনগুলিতে একদিন এক জ্যোতিষীর কাছে পরামর্শ কামনা করলেন তিনি। দীন ও ঈমানবিধ্বংসী সেই নরাধম জ্যোতিষী সুলতানের মনের দোলাচল ও সংশয়কে দৃঢ় বিশ্বাসে রূপান্তরিত করে দিল। চটজলদি বলল—সরকার, আপনার ভাগ্যতারকা এখন বদনসিবির মধ্যে আছে। অশুভ লক্ষণ থেকে যতক্ষণ বেরিয়ে না-আসবে, আপনার জন্য উচিত হবে না তাতারদের মোকাবেলায় নামা।

সম্ভাবনা আছে—এই ঘটনার পূর্বে খাওয়ারিজম শাহের ভেতর সামান্য হলেও সাহস কিংবা আত্মবিশ্বাস ছিল; কিন্তু এই ফেরেববাজের কথায় আর একবিন্দুও রইল না। তিনি নিরাশায় সম্পূর্ণ হারিয়ে গেলেন।[২২০]

কোনো কোনো ইতিহাসপ্রণেতা লিখেছেন—একবার খাওয়ারিজম শাহ স্বপ্নে দেখলেন বসে বসে কিছু লোক বিলাপ করছে। তাদের মাথার চুল ও গায়ের পোশাক এলোমেলো। এই স্বপ্নের ব্যাখ্যায় তিনি ভেবে নিলেন—অনতিকালের মধ্যে মুসলিমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। চারদিকে শুরু হবে মাতম ও হা-হুতাশের জামানা।

আরেকবার আফগানিস্তান সফরকালে হঠাৎ দেখতে পেলেন দুটো বিড়াল ঝগড়া করছে। একটা কালো, অন্যটা সাদা। কালো বিড়ালটা সাদাকে মেরে ভাগিয়ে দিল। এ থেকে খাওয়ারিজম শাহের ভেতর বদধারণা ঢোকে যে, তাতাররা খাওয়ারিজমি মুসলিমদের উপর এভাবেই কর্তৃত্ব খাটাবে।[২২১]

এই কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য—এজাতীয় কুসংস্কার কিংবা খারাপ ধারণার কারণে সময়ের বহু আগেই মনোবল হারিয়ে ফেলেছিলেন তিনি।

আমুদরিয়ার পারে

তিরমিজ অতিক্রম করে আমুদরিয়াও পেরিয়ে যান খাওয়ারিজম শাহ। নিজেকে তখন বিপদমুক্ত ভাবতে শুরু করেন তিনি। নদীর পারে উঠে সেখানে তাঁবু খাটান। বোখারার গভর্নর ইনাজ খান সওয়ারি নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছিলেন উদ্দেশ্যহীন। চলতি পথে তার মনে বাজছিল প্রবল শঙ্কা; তাতারদের হাতে আচমকা ধরা পড়বার ভয়। এদিক-ওদিক ছুটতে ছুটতেই একদিন তিনি খাওয়ারিজম শাহের তাঁবুর কাছে এসে উপস্থিত হন। শাহ তার নিকট বোখারা ধ্বংসের প্রত্যক্ষদর্শনের বর্ণনা শোনেন।[২২২] এর ভেতর আরেকটি সংবাদ আসে—আতরার বিজয়ের পর উত্তর-পূর্বাঞ্চলে তাতার-বাহিনী

---

[২২০] জাহাঁকুশা ২/১০৫

[২২১] আফগানিস্তান দর মাসিরে তারিখ ১৪০

[২২২] ইবনে খালদুন ৫/১১০

নাকি সমরকন্দকেও ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। এইবার ধ্বংসদানবেরা খুব দ্রুত সামনে এগোতে থাকবে।[২২৩]

খাওয়ারিজম শাহকে চূড়ান্ত হতাশ ও নিঃশক্তি বানিয়ে ফেলে এই সংবাদ। তিনি ভাবতে থাকেন—তাতাররা সমরকন্দ যখন জয় করে ফেলেছে, তাদের সামনে তা হলে খুলে গেছে পুরো মা-ওয়ারাউন-নাহার দখলের পথ। অবস্থা এত গম্ভীর ও ভয়ানক হয়ে ওঠে যে, উত্তরণের কোনো সম্ভাবনাই দেখছিলেন না শাহ। কোনো ধরনের প্রতিরোধ কিংবা সংঘর্ষের ব্যাপারে নিরাশ ছিলেন তিনি। কিন্তু, তাকে একটি সিদ্ধান্ত নিতে রাজি করিয়ে ফেলে কিছু সহচর। বলে—আলামপনা, সকল সেনা-অফিসারকে একত্র করে দ্রুত একটি পরামর্শসভায় বসুন। পরবর্তী কর্মপদ্ধতি ঠিক কী হতে পারে তাদের মত নিন।

পরামর্শসভা

সব সেনাপতি ও আমির-সরদার নির্ধারিত তারিখে খাওয়ারিজম শাহের দরবারে উপস্থিত হন। পরামর্শসভায় ছিলেন শাহজাদা জালালুদ্দীনও। অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা চলল। শুরার সকল সদস্য অভিমত ব্যক্ত করল নিজেদের। স্বাভাবিকভাবেই সদস্যরা দুইদলে বিভক্ত ছিল। অভিজ্ঞ সেনা-অফিসাররা বললেন—ফিলহাল মা-ওয়ারাউন-নাহারে শত্রুকে প্রতিরোধ করার কোনো মাধ্যমই নেই। ওখানে মোকাবেলা করতে যাওয়াটা বোকামি। ওখানে সবকিছু ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। এখন, ইরান ও খোরাসানের অঞ্চলগুলোর প্রতিরক্ষার জন্য আমাদের অবশিষ্ট শক্তি প্রস্তুত করা উচিত। সব শহর ও গোত্রের সেনাদলকে দ্রুত একত্র করতে হবে। জাইহুন-নদীটাকে খন্দক ও অবরোধের কাজে লাগাতে হবে। নদীর কিনারে স্থাপন করতে হবে শক্ত ঘাঁটি। কোনোভাবেই দুশমনকে জাইহুন পেরোবার সুযোগ দেওয়া যাবে না।

যোদ্ধা আমিরদের এই অভিমত ছিল খুবই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু কিছু আত্মমগ্ন কাপুরুষ তাতে বাধ সেধে বসল। বলল—জাহাঁপনা, আমাদের জন্য এখন উত্তম হচ্ছে হিন্দুস্থানের পথে যাত্রা করা। পথিমধ্যে গজনিতে যদি বাহিনী গঠন করে ফিরে এসে শত্রুপক্ষকে দাঁতভাঙা জবাব দেওয়া যায়, তবে তো ভালো। অন্যথায় ওদিকে সুবিস্তৃত হিন্দুস্থান সাম্রাজ্যে আশ্রয় নিয়ে নেব আমরা।[২২৪]

হিন্দুস্থান অভিমুখে

বিভিন্ন অভিমত ও কুমন্ত্রণায় খাওয়ারিজম শাহ দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিলেন। বুঝে উঠতে পারছিলেন না তার সঠিক করণীয়। শেষমেশ হিন্দুস্থানের পথেই রওনা দিলেন তিনি।

---

[২২৩] ইবনে খালদুন ৫/১১০

[২২৪] জাহাঁকুশা ১/১০৬

ত মহিলা মাদরাসা ও মসজিদ কমপ্লেক্স
স্থাপিতঃ ২০২০ইং

সুযোগসন্ধানী তোষামুদে পরামর্শদাতারা তো এ-পথই তাকে দেখিয়েছিল। খাওয়ারিজম শাহ অস্বাভাবিক দ্রুতবেগে এগোচ্ছিলেন। এতই দ্রুত যে, বলখ শহরে পৌঁছার আগে পথিমধ্যে তিনি থামেননি কোথাও।

শাহজাদা রোকনুদ্দীনের সফর

ষষ্ঠ অধ্যায়ে পড়ে এসেছেন—খাওয়ারিজম শাহের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র ছিল শাহজাদা রোকনুদ্দীন। শাহ তাকে উত্তর ইরান ও ইরাকের পাহাড়ি এলাকার গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। এই এলাকাগুলো তখনও তাতারমুক্ত ছিল। হঠাৎ পিতার বর্তমান দুর্দশার কথা জানতে পারে রোকনুদ্দীন। দ্রুত খাওয়ারিজম শাহের এক বিশ্বস্ত মন্ত্রী ইমাদুল মুলক সাউজিকে শাহের দরবারে পাঠিয়ে দেয় সে, যাতে সুলতানকে কোনোভাবে রাজি করিয়ে ইরাকে নিয়ে আসতে পারে ইমাদুল মুলক। ইমাদুল মুলক তখন রোকনুদ্দীনের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছিল।

তখনও বলখ শহরেই ছিলেন খাওয়ারিজম শাহ। ইমাদুল মুলক মূল্যবান কিছু উপঢৌকন নিয়ে শাহের দরবারে এসে উপস্থিত হয়। দ্বিধাগ্রস্ত শাহকে সে পরামর্শ দেয়—'দুশমনের এই শক্তিমত্তা ও বিজয়ের কালে ইরাকে চলে যাওয়াই হবে আপনার জন্য কল্যাণকর, জাহাঁপনা। দুশমনের নাগাল থেকে বহুদূরে ওখানে আপনি নিরাপদে থাকতে পারবেন। ওখানে শক্তিশালী বাহিনী গঠন করে তাতারদের শক্ত পরাজয় খাওয়ানোর প্রস্তুতিও নিতে পারবেন।'

খাওয়ারিজম শাহ হিন্দুস্থানে যাচ্ছিলেন ঠিকই; কিন্তু ভেতরে-ভেতরে স্বদেশপ্রেমের এক দারুণ অস্থিরতায় কাতরাচ্ছিলেন। তার বুকের ভেতর ছিল একধরনের পিছুটান। হিন্দুস্থানের পথে সবে রওনা দিয়েছেন তিনি। রোকনুদ্দীনের উজিরের এই পরামর্শে শুরুতেই এবার দ্বিধায় পড়ে গেলেন—কোন দিকে যাবেন, কোথায় গেলে ভালো হয়, ইরাক নাকি হিন্দুস্থান?

এই নতুন পরামর্শ শোনার পর, খানিকক্ষণ ভেবেটেবে ইরাক যেতেই সম্মত হলেন তিনি। না, কোনো ধরনের প্রতিরোধ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে না, মূলত যাচ্ছিলেন প্রাণ বাঁচাবার আশায়।

শাহজাদা জালালুদ্দীনের ভাষণ

শাহজাদা জালালুদ্দীন সেই প্রথম থেকেই পিতার সাথে সাথে ছিলেন। তাৎক্ষণিক গৃহীত এই সিদ্ধান্তে তিনি চুপ থাকতে পারলেন না। আদব-লেহাজ পুরোপুরি ঠিক রেখেই দরদপূর্ণ ভাষায় তিনি বলে ওঠেন—জাহাঁপনা, যে-পরিমাণ সৈন্যই হোক, এখানেই বাহিনী গঠন করে অতি দ্রুত শত্রুপক্ষের মোকাবেলায় নামতে হবে।[২২৫]

---

[২২৫] জাহাঁকুশা ২/১০২

সেপাইদের বিক্ষিপ্ত করে ফেলা কিংবা তাদের শত্রুর মুখে ছেড়ে যাওয়া মনোবলহীন অক্ষমদের কাজ। আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন বাদশাহরা তা করতে পারেন না কখনও। ঠিক এক্ষুনি উঠে না-দাঁড়ালে, পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। ইতোমধ্যে চলে গেছে যা যাবার। এক্ষুনি সঠিক সিদ্ধান্তটি না নিতে পারলে, সামনে স্রেফ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে থাকা ছাড়া আমাদের কিছুই করার থাকবে না। চিরকালের জন্য পৃথিবীর সমস্ত সম্প্রদায়ের কাছে এক অক্ষম ও দুর্বল জাতিতে পরিণত হবো আমরা। সবার তিরস্কারের সুতীক্ষ্ণ তির এসে আমাদের উপর নিক্ষিপ্ত হবে। অপমান, অপদস্থতা ও লজ্জার গভীর সমুদ্রে আমরা ডুবে যাব। এই পরিস্থিতি সামলে উঠতে এক্ষুনি আমাদের প্রতিরোধের জন্য দাঁড়িয়ে যাওয়া উচিত। বলি কি—বরং আবশ্যক।[২২৬]

সুলতান, আপনি যদি এতে সম্মত না-ও হন, ইরাক যাওয়ার সিদ্ধান্তই যদি চূড়ান্ত করে ফেলেন, তবে যান, শতবার যান। কিন্তু এই বাহিনীটি আমার কমান্ডে রেখে যান। বাহিনী নিয়ে আমি জাইহুন-নদীর কিনারে গিয়ে শক্ত ঘাঁটি স্থাপন করব। শত্রুকে নদী অতিক্রমের একটুও সুযোগ দেব না।

روم خیمہ بر طرف جیحون زنم

باد شمناں دست در خوں زنم

আমি গিয়ে জাইহুনের পারে তাঁবু খাটাব, যুদ্ধে দুশমনের রক্ত ঝরাব।[২২৭]

শাহজাদা থামলেন না, পিতাকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে অত্যন্ত দরদি ভঙ্গিতে বলে চললেন—আলামপনা, ভাগ্য যদি আমাদের অনুকূলে থাকে, আল্লাহর তাওফিকে আমরা সফলতা লাভ করতেও পারি, ছুঁতে পারি আমাদের উদ্দেশ্যের কেন্দ্রবিন্দু। আর তার তাওফিক যদি শামিলে-হাল না-ও হয়, তবু তো আল্লাহর বান্দাদের অভিশাপ ও তিরস্কারের নিদর্শন হয়ে থাকতে হবে না আমাদের। কমপক্ষে রাজ্যের লোকজন এ কথা তো বলতে পারবে না যে, বাদশাহ আমাদের থেকে ট্যাক্স ও খেরাজ সব উসুল করেন। এখন নিদানকালে তিনিই কিনা আমাদের অসহায়ভাবে ছেড়ে যাচ্ছেন।[২২৮]

শাহজাদার সবক'টি শব্দ, প্রতিটি বাক্য হৃদয়ের উত্তাপ, জ্বলন্ত দরদ-ব্যথা, তীব্র আত্মমর্যাদাবোধ ও দীনরক্ষার অধীর-অসহিষ্ণু বাসনারই বহিঃপ্রকাশ ছিল। তার ভরাট কণ্ঠের এই বক্তব্য এতই ঈমানজাগানিয়া ছিল—হতাশার অতলে হারিয়ে-যাওয়া লোকের মধ্যেও তা জ্বালতে পারত আশার আলো। হীনম্মন্য মৃত আত্মায়ও ঘটাতে পারত নবজীবনের স্নিগ্ধ সঞ্চার।

---

[২২৬] জাহাঁকুশা ২/১২৭

[২২৭] জাহাঁকুশা ২/১০৭

[২২৮] জাহাঁকুশা ২/১০৭

কিন্তু খাওয়ারিজম শাহ? সেদিন তার বিচূর্ণ আত্মায় জোড়া লাগাবার সাধ্য কারুর ছিল না। সমরকন্দ ছেড়ে আসার সময় তার চেহারায় পরাজয় ও মনোবলহীনতার ঘনকৃষ্ণ যে ছায়া লেপটে ছিল, এবারেও ছিল সেই একই ছায়ার গভীর বিস্তার।

পুত্রের এ বক্তব্যকে তিনি দুঃসময়ের একটুখানি সান্ত্বনা ভেবেছিলেন। মনে করেছিলেন—এগুলো জালালের অতি জজবাতি কথাবার্তা। কিন্তু তবু, বারকয়েক পিতাকে একই বক্তব্য শুনিয়ে গেছেন শাহজাদা। আদব-সম্মানের গণ্ডির মধ্যে থেকে বারবার তিনি চেষ্টা করেছেন পিতাজিকে বোঝাবার। কিন্তু তার কোনো চেষ্টাই ফলপ্রসূ হয়ে ওঠেনি। সব কথার শেষে শাহের শুধু একটাই জবাব ছিল—পৃথিবীতে যত ধরনের বিপদই আসে, শেষ না-দেখে ওঠে না। পরিণতির আগে কোনোভাবেই সেই বিপদ রুখতে পারা সম্ভব নয়। রুখবার চেষ্টা-প্রচেষ্টা বরং সম্পূর্ণ অনর্থক কর্ম। লাফ দিলে কিন্তু আটকে যেতে হয় ফাঁদের ভেতর। তখন মুক্তির জন্য নিষ্ফলভাবে হাত-পা ছোড়া ব্যতীত কিছুই করার থাকে না।

শাহজাদা জালালুদ্দীন যখন তার সকল প্রচেষ্টা পণ্ড হতে দেখলেন, বেদনায় মুখ কালো করে চুপটি মেরে গেলেন তিনি। ইচ্ছে করলে তিনি বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারতেন। ভেতরে ছিল প্রতিশোধের জ্বলন্ত অঙ্গার। কিন্তু পিতার আদব রক্ষার্থে কিছুই করেননি। বাধ্য হয়ে পিতার সঙ্গে পূর্ববৎ আনুগত্যপূর্ণ সময় কাটাতে আরম্ভ করলেন। ইরাকের সফরসঙ্গী হিসেবে তাকেও রাখতে চাচ্ছিলেন খাওয়ারিজম শাহ। বাধ্য হয়ে ভগ্ন হৃদয়ে তাকে সেই হাজার মাইল দীর্ঘ পথে রওনা করতেই হয়েছিল।[২২৯]

ইমাদুল মুলকের পরামর্শে খাওয়ারিজম শাহ সেদিন পশ্চিম অভিমুখে রওনা দেন। উত্তর ইরানের কাছাকাছি যখন পৌঁছেন, চলার পথে সাম্রাজ্যের অবশিষ্ট দুর্গগুলোকে যথাসাধ্য প্রতিরক্ষা করার তাগিদ দিতে দিতে যাচ্ছিলেন। আমির উমরকে বামিয়ান, ইখতিয়ারুদ্দীনকে পেশোয়ার, হিসামুদ্দীন হুসাইনকে ঘুর ও শামসুদ্দীন জুরজানিকে হেরাত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন।[২৩০] তিনি চাচ্ছিলেন—এরা যেন সাম্রাজ্যের অবশিষ্ট অঞ্চলগুলো কোনোভাবে রক্ষা করতে পারে। অথচ তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন—একজন মনোবলহীন ভীতু বাদশাহর অধীনে আর যা-ই হোক, শক্ত পদক্ষেপে লড়ে যেতে পারে না কেউ।

বদরুদ্দীন আমিদের ষড়যন্ত্র

লাগাতার বিভিন্ন রণাঙ্গনে পরাজয় খেয়ে খেয়ে খাওয়ারিজমের সমস্ত সেনাশক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। চেঙ্গিজ খানের মাথায় তবু খেলতে লাগল—খাওয়ারিজম শাহ ইরান কিংবা আফগানিস্তানের কোনো অঞ্চলে গিয়ে গঠন করে ফেলতে পারে নতুন কোনো বাহিনী। যেকোনো সময় মুশকিল কিছু ঘটিয়ে বসতে পারে সে।

---

[২২৯] জাহাঁকুশা ২/১০৭-১০৮, ১২৭-১২৮

[২৩০] তারিখে খাওয়ারিজম শাহি ১১৩

এরইমধ্যে একদিন, খাওয়ারিজমিদের মাঝে ফাটল সৃষ্টি করতে চেঙ্গিজ খানের নিকট এল উম্মাহর এক নতুন গাদ্দার। তার নাম ছিল বদরুদ্দীন আমিদ। খাওয়ারিজম শাহের পক্ষ থেকে তাকে তাবারিস্তানের গভর্নর বানানো হয়েছিল। কিছুকাল আগে খাওয়ারিজম শাহ বদরুদ্দীনের পিতা ও চাচাকে কোনো কারণে হত্যা করেছিলেন। তখন থেকেই সে প্রতিশোধের একটা সুযোগ খুঁজছিল।

চেঙ্গিজ খান তখন সবে মা-ওয়ারাউন-নাহার কবজা করেছেন। হঠাৎ একদিন তার কাছে এসে উপস্থিত হল বদরুদ্দীন আমিদ। তাঁবুর ভেতর চেঙ্গিজ খানের সাথে একা সাক্ষাৎ করল সে। ওই তাঁবুতে চেঙ্গিজ খান ও বদরুদ্দীন ব্যতীত কেউ ছিল না। চেঙ্গিজের কাছে পূর্ণ আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা প্রকাশ করল বদরুদ্দীন। গলা খানিকটা খাদে নামিয়ে সে বলল—খানে আজম, এই পৃথিবীতে খাওয়ারিজম শাহের চাইতে বেশি অন্য কাউকে ঘৃণা করি না আমি। আমার পিতা ও চাচার হত্যাকারী সে। আমার যদি শক্তি থাকত, প্রাণ খুইয়ে হলেও এর প্রতিশোধ নিতাম। কিন্তু শাহের শক্তি আরও বহুগুণ বেশি। এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত হবেন না যে, ওর সৈন্যদল বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। শুনুন, এখনও তার হুকুমে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গড়ে উঠতে পারে বড় এক সেনাবাহিনী।

বদরুদ্দীনের এইসব কথাবার্তায় চেঙ্গিজ খান খুবই আগ্রহী হয়ে ওঠেন। নিশ্চিত সাফল্য কীভাবে পাওয়া যাবে, চেঙ্গিজ খানকে সেই বুদ্ধি দিতে গিয়ে বদরুদ্দীন বলল—খানে আজম, খাওয়ারিজম শাহ, তার মা এবং মায়ের যুদ্ধবাজ গোত্রের মধ্যে রাজব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রায়ই অনেক মতপার্থক্য ঘটে। যদি শাহ ও তার মাতুলগোষ্ঠীর এই মতভিন্নতাকে আরও গভীর করবার খানিক প্রচেষ্টা চালানো হয়, তাদের মাঝে পারস্পরিক বিশ্বস্ততার যে একটি দেয়াল রয়েছে, সেটা যদি ভেঙে ফেলা যায়, খাওয়ারিজমি সেনাদলের মাঝে দ্রুতই চিড় ধরে যাবে।

এভাবে দীর্ঘ সময় ধরে শলাপরামর্শ করে দুজন। প্রস্তাবিত এই পরিকল্পনার গায়ে বাস্তবতার পোশাক পরাতে বদরুদ্দীন বলল—খানে আজম, এজন্য আমাদের একটি নকল চিঠি লেখাতে হবে। তুর্কান খাতুনের নিকটাত্মীয় আমিররা হবে এই নকল চিঠির প্রেরক আর আপনি প্রাপক। চিঠিতে খাওয়ারিজম শাহের বিরুদ্ধে আমিররা আপনার নিকট সাহায্য কামনা করবে। এবং চিঠির উলটোপিঠে তাদের সহযোগিতা করবেন বলে হ্যাঁ-সূচক একটা জবাবও লিখে দেবেন আপনি।[২৩১]

চেঙ্গিজ খান এতে খুবই কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। দ্রুত নকল চিঠি লেখান তিনি। চিঠির বক্তব্য ছিল এমন—'আমরা হচ্ছি তুর্কি কবিলা। খাওয়ারিজম শাহকে স্রেফ তুর্কান খাতুনের বদৌলতে সবসময় সঙ্গ দিয়েছি আমরা। পৃথিবীর সব শাসকের বিরুদ্ধে তাকে সহযোগিতা করেছি। কিন্তু যখন সেই বড় বড় শাসক দুর্বল ও পরাজিত হয়েছে,

---

[২৩১] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৯২; নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৬২

শাহের সামনে ঝুঁকিয়ে দিয়েছে তাদের গর্দান, ঠিক তক্ষুনি অবাধ্য হয়ে ওঠে খাওয়ারিজম শাহ। আমাদের ঘোরতর বিরোধী হয়ে পড়ে সে। স্বীয় মায়ের প্রতি পোষণ করে বিরূপ মনোভাব। খানে আজম, আমরা এখন আপনার জন্য অপেক্ষমাণ।'

পরিকল্পনা-মাফিক এক লোককে দিয়ে এই চিঠি খাওয়ারিজম শাহের কাছে পাঠানো হল। লোকটি বাহ্যত খাওয়ারিজম শাহের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিল, কিন্তু ভেতর থেকে সে ছিল মূলত চেঙ্গিজ খানের গুপ্তচর। শাহের দরবারে এসে বলল—জাহাঁপনা, আপনার সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে কিছু আমির ঘৃণ্য চক্রান্তে মেতেছে। এই দেখুন তাদের চিঠি।

শাহ হতভম্ব হয়ে যান। দ্রুত চিঠি পড়া শুরু করেন তিনি। মুহূর্তে বদলে যায় তার পুরো মুখচ্ছবি। অনুভব করছিলেন, মাথায় যেন তার আকাশ ভেঙে পড়েছে। বিস্ময়ে চক্ষু চড়কগাছ। এই নাজুক পরিস্থিতিতে মাতুলগোষ্ঠী তার সঙ্গ ত্যাগ করে গিয়ে শত্রুদলের সাথে আঁতাত করবে, এর জন্য কোনোভাবেই তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। ফলে তুর্কান খাতুনের আত্মীয় আমিরদের চেঙ্গিজ খানের মিত্র ভেবে তিনি সংক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। ভেতরে-ভেতরে জমাতে থাকেন ঘৃণা।

জিঘাংসা

অথচ কিপচাক তুর্কি আমিররা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় ছায়ার মতো তার সাথে লেগেই ছিল তখনও। অবস্থার নাজুকতা তখন শাহ ও তার মায়ের মধ্যকার সমস্ত মতভিন্নতা দূর করে দিয়েছিল। জাতি ও সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা-চিন্তায় তুর্কান খাতুনের জানবাজ আমিররা খাওয়ারিজমি বাহিনীর প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।[২৩২] কয়েক রণাঙ্গনে শুধু শাহের হীনম্মন্যতা ও মনোবলহীনতার কারণে পরাস্ত হয়েছিল বাহিনী। ব্যাপারটা এই কিপচাক আমিরদের মনে শক্ত আঘাত হেনেছিল। খাওয়ারিজম শাহ তখন এক শহর থেকে অন্য শহরে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। তবু এই যোদ্ধা আমিররা তার সার্বক্ষণিক সঙ্গী হিসেবেই জুড়ে থেকেছে। স্রেফ তুর্কান খাতুনের আত্মীয়তার প্রতি লক্ষ করে এরা বিদ্রোহ করেনি।

কিন্তু এই চিঠি পাওয়ার পর খাওয়ারিজম শাহ যখন কিপচাক আমিরদের অপরাধী ঠাওর করতে লাগলেন, তখন ক্রোধের অন্ত রইল না তাদের। অগ্নিতপ্ত দ্রোহের গলায় তারা বলল—খাওয়ারিজম শাহ নিজেই এই চক্রান্তটা সাজিয়েছে!! ওকে আর ছাড়ব না। তারপর নিজেরা মিলে শাহকে হত্যা করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে তারা।

সে রাতে সুনসান ভূপৃষ্ঠে জমাট বেধে ছিল গাঢ় অন্ধকার। সফরকালে পথিমধ্যে খাওয়ারিজম শাহ অস্থায়ী তাঁবু গেড়েছিলেন। সঙ্গে থাকা সহচর, সেবায়েত, কিপচাক আমির ও অবশিষ্ট সবাই আশপাশে তাঁবু খাটিয়েছিল।

---

[২৩২] খাওয়ারিজম শাহের মা ছিলেন কিপচাক তুর্কদের বিয়ারুত গোত্রের ইয়ামাক শাখার অন্তর্গত ছিলেন।

রাতের প্রয়োজন সেরে নিজ নিজ তাঁবুর ভেতর শুয়ে পড়েছে সবাই। চারপাশে ঝিমধরা রাত্রির নীরবতা। কিপচাকরা তাঁবু থেকে বের হয়ে চুপিচুপি শাহের তাঁবুর কাছে গেল। মুহূর্তের মধ্যে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলল সেই তাঁবু এবং লাগাতার এমনভাবে তির নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করল যে, চালুনির মতো ফুটো-ফুটো হয়ে গেল পুরো তাঁবু। আমিররা নিশ্চিত হল শাহ মারা গেছে। ফলে নিশ্চুপে নিজেদের তাঁবুতে ফিরে এল।

ওদিকে খাওয়ারিজম শাহের এক গোয়েন্দা এ চক্রান্তের তথ্য আগেই পাচার করে দিয়েছিল। তাই রাতেই তাঁবু ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন শাহ। ফলে সকালবেলা কিপচাকরা যখন জানল খাওয়ারিজম শাহ বেঁচে গেছেন, সেনা-ক্যাম্পে তাদের পক্ষে একমুহূর্তও অবস্থান করা সম্ভব হল না। দ্রুতই চেঙ্গিজ খানের কদমবুসির জন্য তারা বেরিয়ে পড়ল।

এ ঘটনার পর খাওয়ারিজম শাহের নেতৃত্বে রয়ে গিয়েছিল মাত্র ২০ হাজার সিপাহি। তখন আর কারুর প্রতিই তার পরিপূর্ণ বিশ্বাস ছিল না। একদিকে ছিল তাতারদের হাতে পরাজয়, অন্যদিকে আপনজনদের গাদ্দারি। এই পরিস্থিতিতে পুরোপুরি ভেঙে পড়েছিলেন খাওয়ারিজম শাহ। চেঙ্গিজ খানের দুর্ধর্ষ জেনারেলরা কয়েক মাসেও যা করতে পারেনি, বদরুদ্দীনের ঘৃণ্য চক্রান্ত রাতারাতি তার চেয়ে অধিক শক্তি খর্ব করেছিল খাওয়ারিজমিদের।

এই চক্রান্তের ফলে কিপচাক আমিররা তো ক্ষুব্ধ হয়েছিলই, পুত্রের প্রতি সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন স্বয়ং তুর্কান খাতুন। ঠিক এই সুযোগটাতেই ফায়দা হাসিল করতে চাইলেন চেঙ্গিজ খান। মা-ছেলের মতপার্থক্য আরও বিস্তৃত করে তুলতে চাইলেন। এক গাদ্দার খাওয়ারিজমি আমিরকে (যে ছিল খুব ধুরন্ধর) তিনি পয়গাম দিয়ে তুর্কান খাতুনের দরবারে পাঠালেন। চিঠির ভাষ্য ছিল—'আমি জানতে পেরেছি, অবাধ্য পুত্রধন তোমার বিরোধী হয়ে গেছে। তার বিরুদ্ধে আমি সেনাবাহিনী প্রস্তুত করেছি। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো—'তোমার অধীনস্থ শহরগুলোর প্রতি আমার কোনো আগ্রহ নেই। খাওয়ারিজম ও খোরাসান থেকে আমুদরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে কেবল তোমারই রাজত্ব।'

এমন বক্তব্য প্রেরণের দ্বারা চেঙ্গিজ খানের উদ্দেশ্য ছিল—যতক্ষণ পর্যন্ত খাওয়ারিজম শাহকে তিনি খতম করতে না-পারবেন, এই চিঠি পেয়ে এদিকটায় শান্ত ও নীরব থাকবে তুর্কান খাতুন। ব্যতিক্রমী কিছু করবে না। তার বিরুদ্ধে জিহাদেও অংশ নেবে না। কিন্তু ইতিপূর্বে তুর্কান খাতুন তাতারদের রক্তপাতের লোমহর্ষক দৃশ্য দেখে উঠেছিলেন বলে চেঙ্গিজ খানের প্রতি কোনো ভরসা রাখতে পারলেন না তিনি। ফলে নিরিবিলি কোনো এলাকার সন্ধানে রাজধানী ছেড়ে চটজলদি পালিয়ে গেলেন।[২৩৩] বিস্তারিত সামনে আসবে।

---

[২৩৩] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৯৩; রওজাতুস সফা ৪/৮২৪, ৫/১৫২; জাহাঁকুশা ২/১০৯

সমরকন্দ দখলের পর খাওয়ারিজমের অবশিষ্ট অঞ্চলগুলো আয়ত্ত করতে নতুন কর্মপন্থা সাজান চেঙ্গিজ খান। তার এবারকার গুরুত্বপূর্ণ মিশন—সরাসরি খাওয়ারিজম শাহকে গ্রেফতার করতে হবে। এটি তার বহুদিনের লালিত বাসনা। অথচ একটিবারের জন্যও এখনও শাহের মুখোমুখি হতে পারেননি তিনি। এর ভেতর একের পর এক খাওয়ারিজম শাহের গাদ্দার আমিররা এসে তাতারদের সাথে জুড়ে যেতে শুরু করল। তুর্কান খাতুনের আত্মীয়বংশ কিপচাক ব্যতীত অনেকেই, এমনকি কুন্দুজের হাকিম আলাউদ্দীনও চেঙ্গিজ খানের অধীনস্থ হয়ে গেল। চেঙ্গিজ খান এদের মাধ্যমে জানতে পারলেন—খাওয়ারিজম শাহ খুব অসহায় অবস্থায় দক্ষিণদিকে পালিয়ে গেছেন। একথা শুনে চেঙ্গিজ খানের সন্দেহ হতে লাগল—কোথাও যদি খাওয়ারিজম শাহ নতুন শক্তি গঠন করে ফেলে! বিক্ষিপ্ত সেনাদের সহায়তা লাভ করে নতুন কোনো শঙ্কা সে তৈরি করেও ফেলতে পারে। যত দ্রুত পারা যায়, খাওয়ারিজম শাহের বর্তমান ঠিকানা জানা দরকার।

ফলে, চেঙ্গিজ খান যোগ্য দুই সরদার জুবি নৈয়ান ও সুবেদাইকে ৩০ হাজার দক্ষ অশ্বারোহী প্রদান করে খাওয়ারিজম শাহকে খুঁজতে পাঠালেন। ভরাট কণ্ঠে তিনি হুকুম দিলেন—চলো, তোমরা খাওয়ারিজম শাহের পেছনে ছোটো, জীবিত অথবা মৃত যেভাবেই পারো তাকে পাকড়াও করে দেখাও, যদিও সে ওই আকাশের শূন্যতায় গিয়ে লুকোয়।[২৩৪]

হুকুম পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘূর্ণিঝড়ের ন্যায় মরুবালি উড়িয়ে এই ৩০ হাজার সৈনিক দক্ষিণদিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। প্রতিদিন তারা ৮০ মাইল করে পথ অতিক্রম করতে লাগল। সন্ধ্যেবেলা কোথাও খানিক থেমে শুধু খাবারটা খেয়ে নিত, একটুক্ষণ জিরিয়ে তারপর আবার ছুটিয়ে দিত ঘোড়া। প্রত্যেক সৈন্যের কাছে কয়েকটি করে ঘোড়া ছিল। সারা দিনের সফরে ঘোড়াগুলির ক্লান্তি চলে আসত। সেজন্য বারবার তারা সওয়ারি বদলাত। ক্লান্ত ঘোড়ার পরিবর্তে অন্য কোনো তাজাদম ঘোড়া বেছে নিত।[২৩৫]

অল্পদিনের মধ্যেই তারা আমুনদীর পারে এসে উপস্থিত হল। নদীর পারে দাঁড়িয়ে ভাবল—'আমাদের আরও সম্মুখে অগ্রসর হতে হবে। এই খরস্রোতা নদী কি তা হলে আমাদের আটকে ফেলল? পরমুহূর্তেই এই গোঁয়ার তাতাররা ভাবল—না, কখনোই না। কোনো কিছুই আমাদের আটকাতে পারে না।' এই বলে তারা শক্ত করে ঘোড়াগুলির লাগাম বেঁধে নিল। অস্ত্রশস্ত্র ও সামানপত্র চামড়ার বড় বড় থলির মধ্যে ভরে বেঁধে দিল সওয়ারি ঘোড়ার সঙ্গে। এবার উন্মত্ত ঘোড়াগুলোকে তারা উদ্দাম স্রোতে হাঁকিয়ে দিল। ঘোড়াগুলো তাতারদের নিয়ে অকল্পনীয় তেজে নদীর প্রবল

---

[২৩৪] ইবনুল আসির ৭/৫৭৭; চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১৬, পৃষ্ঠা ১২০

[২৩৫] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১৬

স্রোত ভেঙে সামনে এগোতে লাগল। ওপারের কাছাকাছি যখন পৌঁছল—লাগাম ধরে লাফ দিয়ে তীরে ওঠে তাতার-বাহিনী। তারপর, তীরে দাঁড়িয়ে নদী থেকে ধীরে-ধীরে টেনে তোলে ঘোড়াগুলো।[২৩৬]

নদী পেরোনোর পর শুরু হয় নতুন সফর। বালুময় মরুপথে ঘোড়া হাঁকিয়ে বলখ শহরের কাছাকাছি চলে আসে তারা। বলখে উঠে বাহিনীর প্রথম সারিতে যারা ছিল, বলখের লোকদের থেকে তারা জেনে গেল, খাওয়ারিজম শাহ অনেক আগেই বলখ ছেড়ে পশ্চিম দিকে চলে গেছেন। ফলে তাতারদের এই ৩০ হাজার সিপাহি, শাহকে যেন খুঁজতে সুবিধা হয়, দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। দ্রুত রওনা দিল পশ্চিম-অভিমুখে। তাদের ধারণা ছিল খাওয়ারিজম শাহ মার্ভের দিকেই যাচ্ছেন।

মার্ভ ছিল জাইহুন-নদীর পশ্চিমদিকে খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের এক মজবুত প্রশস্ত শহর। তাতার-সেনারা ভাবল—এই মার্ভে গিয়ে প্রতিরোধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারেন খাওয়ারিজম শাহ। বিষয়টা পুরোপুরি যুক্তিযুক্ত। কিন্তু কিছুদিন পর তারা যখন অনতিক্রম্য সুদীর্ঘ মরুপথ পেরিয়ে মার্ভের নয়নাভিরাম বাগিচা ও শুভ্র শহর পানাহে এসে ওঠে, সেখানকার সংবাদদাতারা তাদের জানায়—খাওয়ারিজম শাহ এখানে নেই।[২৩৭]

নিশাপুরে খাওয়ারিজম শাহ

জনমানবশূন্য সব বসতি পেরিয়ে, উত্তর ইরানের পর্বতশ্রেণি অতিক্রম করে, আলাউদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহ নিশাপুর পৌঁছে গেলেন। তার ধারণামতে, অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছিলেন তিনি। মনে করছিলেন—তাতার-বাহিনীকে তো আমি ফেলে এসেছি সেই শত শত মাইল পেছনে। অথচ তিনি জানতেন না—শিকারি কুকুরের মতো গন্ধ শুঁকে শুঁকে তাতাররা তার পেছনে পেছনেই আসছে।

নিশাপুরে কয়েকদিন কাটল তার। তখন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ঘটে-যাওয়া রক্তপাত ও ধ্বংসযজ্ঞের সংবাদ আসতে শুরু করল তার কাছে। সে-সব ভীতিকর সংবাদ শুনে আমির ফখরুল মুলক নেজামুদ্দীন, জিয়াউল মুলক আরিজ জুজানি ও মুজিরুল মুলক কাখিকে ডেকে পাঠালেন তিনি। কড়াভাবে তাদেরকে নিশাপুরের প্রতি খেয়াল রাখার তাগিদ দিলেন। আর নিজে পশুশিকারের বাহানায় সেবায়েত ও সহচরদের নিয়ে নিশাপুর থেকে বেরিয়ে পড়লেন।[২৩৮]

জুবি নৈয়ান ও সুবেদাই যাত্রাপথে সব বস্তি ও জনপদ লুটপাট করতে করতে আসছিল। কেউ সংঘর্ষ বাধাতে চাইলে তাকে হত্যা করে ফেলত। তারা খাওয়ারিজম শাহের পিছু পিছু নিশাপুরের দিকেই আসছিল।

---

[২৩৬] ইবনুল আসির ৭/৫৭৭

[২৩৭] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১৬, পৃষ্ঠা ১২১

[২৩৮] জাহাঁকুশা ২/১১১; খাওয়ারিজম শাহি ১২৫; চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১৬, পৃষ্ঠা ১২১

এত এত রক্তপাত ও হত্যাযজ্ঞে বুদ্ধিশূন্য ছুটন্ত খাওয়ারিজম শাহ যেতে যেতে সব শহর ও বস্তির লোকদের তাগিদ করছিলেন—শোনো, নিজেকে বাঁচানোর চিন্তা করো সবাই। তাতারদের সাথে সংঘর্ষ করতে যেও না। ওরা ভয়ংকর। ওদের রক্তখেকো তলোয়ার দ্বিখণ্ডিত করে ফেলবে তোমাদের।[২৩৯]

প্রতিটি অঞ্চলের হাকিম ও দুর্গপতিদের কাছেও দূত-মারফত এজাতীয় সতর্কবার্তা পাঠিয়ে দেওয়া হল। খাওয়ারিজম শাহের এসব হীনম্মন্যতাপূর্ণ কথাবার্তায় আমজনতা ও গভর্নররা তাদের প্রতিরোধের শেষশক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলল। ফলে তাতাররা সমস্ত দুর্গ ও শহর বিনা সংঘর্ষেই জয় করে নিল। মুসলিম জনসাধারণ শত্রুর হাতে আপনা-আপনি সোপর্দ করে দিল নিজেদের।[২৪০]

শাহি হেরেমের হিজরত

নিশাপুর ত্যাগের পর খাওয়ারিজম শাহের বুকের ভেতর আচমকা ঘাই খেয়ে ওঠে এক প্রবল শঙ্কা। তিনি ভাবেন—আচ্ছা, তাতার-বাহিনী যদি রাজধানী আরগেঞ্চে হামলা করে বসে আচমকা, তা হলে তো অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যাবে!

ফলে, দ্রুতগতিসম্পন্ন অশ্বারোহীদের একটি ছোটখাটো বাহিনী চটজলদি আরগেঞ্চ পাঠিয়ে দিলেন তিনি; তারা যাতে তুর্কান খাতুনসহ শাহি খানদানের সমস্ত নারী-শিশু ও ধনভান্ডার নিয়ে শাহের নিকট চলে আসে। এই বাহিনী দিনরাত লাগাতার সফরের পর যখন রাজধানীতে গিয়ে পৌঁছে, তখন সেখানে তাতার-সেনাদের আক্রমণের ভীতিকর পরিবেশ বিরাজ করছে। ঝড় আসার খানিক আগের অবস্থার মতো থমথমে হয়ে গেছে চারপাশ।

তুর্কান খাতুন খানদানের বাকিসব লোকজন নিয়ে রাজধানী ছাড়ছেন আজ। আহা, এ তো সেই জায়গা, সুলতান তাকিশের সঙ্গে বিয়ের পর যেখানে তার প্রথম যৌবনের আনন্দঘন স্মৃতিময় দিনগুলো কেটেছে। একসময় এখানে তার নামে বেজে উঠত শাহি ডঙ্কা। প্রতিদিনকার চন্দ্র-সূর্য আকাশ থেকে হতভম্ব হয়ে দেখত সেই ভীতিকর দৃশ্য। তুর্কান খাতুনের একসময়কার প্রবল কর্তৃত্বের সুদীর্ঘ অধ্যায় দেখে উঠেছিল পৃথিবীর আকাশ।

আজ সেই সম্রাজ্ঞী দোর্দণ্ড দাপট ও আধিপত্যের এই মায়াবী শহর ছেড়ে এক অজানা গন্তব্যে পা বাড়িয়েছেন। তার জানা নেই—এই মায়াময় রাজধানীতে জীবনে আর কখনও ফেরা হবে কিনা!

শহর ত্যাগের কিছুদিন পূর্বের কথা। এক ভয়ানক রক্তপাত ঘটিয়ে বসেছিলেন তুর্কান খাতুন। রাজধানীতে শাহি খানদানের প্রায় ২০ লোকজন খাওয়ারিজম শাহ কর্তৃক আমির পদে নিযুক্ত ছিল। রাজধানী খালি পেয়ে এরা নিজেদের শাসক দাবি করে বসতে পারে—এই আশঙ্কায় তুর্কান খাতুন তাদের হত্যা করে ফেলেন।

---

[২৩৯] জাহাঁকুশা ২/১০৬

[২৪০] রওজাতুস সফা ৫/৩৫

এক বর্ণনায় আছে—এই আমিরদের আমুদরিয়ার গভীর জলে ডুবিয়ে মারা হয়েছিল। তাদের ভেতর ছিলেন সুলতান তুগরুলের দুই ছেলে, তুর্কিস্তানের হাকিম সিতকাকের দুই ছেলে, বলখের হাকিম ইমাদুদ্দীন, ওয়াখশের হাকিম জামালুদ্দীন উমর, তিরমিজের হাকিম বাহরাম শাহ, বামিয়ানের হাকিম আলাউদ্দীন, বুরহানুদ্দীন সদরে জাহান, তার ভাই ইফতেখার জাহান ও দুই পুত্র মালিকুল ইসলাম ও আজিজুল ইসলাম।

সম্রাজ্ঞী তুর্কান খাতুন যখন খাওয়ারিজম থেকে বেরোচ্ছিলেন, তখন ৬১৬ হিজরির শেষদিক চলছে। ইয়াজরের হাকিম উমর খান ছিল তার যাত্রাপথের রাহবার। এই লোক অসামান্য সহ্যশক্তির কারণে সবুর খান নামে প্রসিদ্ধ ছিল। তার ভাই ইয়াজর শহর কবজা করে রাজদরবারে তাকে অন্ধ বানিয়ে ফেলার সাজা ঘোষণা করেছিল। ভাইয়ের নির্দেশে তাকে অন্ধ বানাবার সমস্ত ব্যবস্থা সম্পন্ন হল। কিন্তু, চোখে গরম শিশা ঢালবার দায়িত্ব যাকে দেওয়া হয়েছিল, উমর খানের প্রতি তার মায়া হয়ে গেল। ফলে শিশা ঢালল না সে। ছেড়ে দিল। উমর খান তখন জালেম ভাইকে ধোঁকায় ফেলতে মিথ্যে করে একজন অন্ধ সেজে গেল। টানা ১১ বছর চোখ বন্ধ করে কাটাল জীবন। বছর পর ভাই মারা গেলে এই কঠিন দুর্দশা থেকে মুক্তি মেলে তার। বহু-বহুদিন পর তার চোখের সামনে রৌশন হয়ে ওঠে পৃথিবী। তখন থেকেই সে তুর্কান খাতুনের খেদমতে নিয়োজিত।

আরগেঞ্চ থেকে বেরোনোর সময় মনে মনে তুর্কান খাতুনের খেয়াল ছিল—প্রথমে তিনি উমর খানের শহর ইয়াজরে গিয়ে প্রাণভরে খানিক শ্বাস নেবেন। সফরকালে সারা পথ সম্রাজ্ঞীর খুব খেয়াল রাখল উমর খান। ইয়াজরের কাছাকাছি পৌঁছে হঠাৎ করে তুর্কান খাতুনের কেন যেন সন্দেহ হল—তাকে ছেড়ে চলে যাবে উমর খান। এ সন্দেহের বশে সম্রাজ্ঞী তখনই দড়ি দিয়ে তাকে বেঁধে ফেলার আদেশ দেন এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করান।[২৪১]

হয়তোবা, এইসব জুলুমের কারণেই পরবর্তীকালে তুর্কান খাতুনের এমন হৃদয়বিদারক পরিণতি হয়েছিল, যা দেখে অশ্রুস্নাত হয়ে ওঠে স্বয়ং প্রকৃতিও।

শাহজাদা রোকনুদ্দীনের সাথে সাক্ষাৎ

নিশাপুর ছেড়ে রায় নগরীতে এসে খাওয়ারিজম শাহ কিছুক্ষণ অবস্থান করলেন। পেছন থেকে তাতার-বাহিনীও নিশাপুর ছেড়ে রায়ের দিকে ধেয়ে আসছিল। খাওয়ারিজম শাহের মনে ঢিপঢিপ করে লাফাচ্ছিল আতঙ্ক। রোকনুদ্দীন ঘুরশাহ পিতার জন্য যেখানে অপেক্ষমাণ ছিল, শাহ অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে সেই দুর্গে গিয়ে ওঠেন। পিতার আগমনসংবাদ পেয়ে রোকনুদ্দীন এগিয়ে এসে তাকে অভ্যর্থনা

---

[২৪১] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ৯৪; জাহাঁকুশা ২/১০৬, ১৯৯

জানায়।[২৪২] রোকনের অধীনে ছিল ৩০ হাজার ইরাকি সৈনিক। তখন কুর্দিস্তানের হাকিম মালিক নুসরাত উদ্দীনও শাহের কদমবুসির জন্য দুর্গে এসে হাজির হন।

কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর নুসরাত উদ্দীনের কাছে পরামর্শ চান খাওয়ারিজম শাহ। নুসরাত উদ্দীন বলেন—জাহাঁপনা, এসময়ে এখানে অবস্থান করা আমাদের জন্য উচিত হবে না। লৌর ও পারস্যের মধ্যখানে তাঙ্গতাকু নামের এক অনতিক্রম্য উঁচু পাহাড়ি এলাকা আছে। আমার পরামর্শ হল—এখন আমাদের সেখানেই চলে যাওয়া উচিত। সেখানকার ঘাঁটিগুলোতে ১ লাখের কাছাকাছি পদাতিক ও অশ্বারোহী সিপাহি রয়েছে। তাদের সহযোগিতাও আমরা লাভ করতে পারব। ঘাঁটিগুলোতে প্রতিরোধক হিসেবে দুর্ধর্ষ সিপাহিদের নিযুক্ত করা যাবে। ওখানে তাতাররা পৌঁছে গেলে তাদের সাথে আমরা শক্ত সংঘর্ষ করতে পারব। আশা করা যায়—এইবার আমরাই বিজয়ী হবো। এতে করে যদি প্রকাশ পেয়ে যায় আমাদের প্রতিরোধশক্তি এবং তাতারদের ব্যর্থতা—মুসলিমদের সকল হতোদ্যম সিপাহি নতুন করে সাহসী হয়ে উঠবে।

খাওয়ারিজম শাহ অনেক আগেই চূড়ান্তভাবে নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন। যে-কারণে এই মূল্যবান পরামর্শও তিনি গ্রহণ করেননি। ফলে অভিমান করে কুর্দিস্তানের মনোক্ষুণ্ণ হাকিম নিজ এলাকায় ফিরে যান। খাওয়ারিজম শাহ তখন পথ ধরেন মাজেন্দ্রানের।[২৪৩]

শাহি খাজানার সুরক্ষা

খাওয়ারিজম শাহের মা তুর্কান খাতুন শাহি হেরেম ও শাহি খাজানা নিয়ে আপন পুত্রের কাছে এসে পৌঁছেন। শাহ ভাবেন—ভারী ভারী সিন্দুক ও খানদানের নারীদের নিয়ে পথ চলতে গেলে আমার জন্য অসুবিধা। আগের মতো দ্রুত এগোতে পারব না।

ফলে তিনি তাজুদ্দীন উমর বোস্তামি নামের এক বিশ্বস্ত আমিরের কাছে ধনভান্ডার হাওয়ালা করে দেন। বলেন—তুমি এগুলো রায় নগরীর পার্শ্ববর্তী আর্ধান দুর্গে নিয়ে রেখে এসো (আর্ধান ছিল ইরাকের একটি মজবুত দুর্গ)।

তাজুদ্দীন উমরের বর্ণনায় আছে—এই শাহি ধনভান্ডারে বড় বড় দশটি সিন্দুক ছিল। প্রত্যেকটি ছিল হিরা, মণিমুক্তা ও অন্যান্য দুর্লভ জহরতে ভর্তি। সেসবের মধ্য থেকে দুটো সিন্দুকের দিকে ইশারা করে খাওয়ারিজম শাহ বললেন—এ দুটিতে যে-সমস্ত হিরা রয়েছে, তার মূল্য সারা দুনিয়ার ট্যাক্সের সমান।

তাজুদ্দীন উমর আর্ধান দুর্গে গিয়ে শাহি ধনভান্ডার খাওয়ারিজম শাহের এক নায়েবের হাতে সোপর্দ করে দিলেন। ধনভান্ডার উসুলের একটা রশিদ এনে তুলে দিলেন শাহের হাতে।[২৪৪]

---

[২৪২] জাহাঁকুশা ২/১১৩

[২৪৩] জাহাঁকুশা ২/১১৪

[২৪৪] ইবনে খালদুন ৫/১১০; আবুল ফিদা ৩/১৪৮

ধ্বংসশালায় খাওয়ারিজম শাহ

খাওয়ারিজম শাহ মাজেন্দ্রানের দিকে এগিয়ে চলেছেন। মাজেন্দ্রানে রয়েছে অনতিক্রম্য উঁচু উঁচু সব পাহাড়সারি। শহরটি তাবারিস্তান সাগরের (কাসপিয়ান সাগর) পাশেই অবস্থিত। এখানকার দুর্গগুলি ছিল অত্যন্ত সুরক্ষিত; অজেয়।[২৪৫] শাহ আশা করেছিলেন—তাতারদের তাণ্ডব থেকে এখানে তিনি নিরাপদ থাকতে পারবেন। কিন্তু জানতেন না যে, পেছন থেকে প্রতিমুহূর্তে তার কাছাকাছি ধেয়ে আসছে তাতার-বাহিনী।

হঠাৎ একদিন, হামাদান হতে একটু সামনে তাতার-সেনারা এসে চারপাশ থেকে শাহকে ঘিরে ফেলল। তখনও শাহের দেহরক্ষীদের মধ্যে ছিল ২০ হাজার সিপাহি। কিন্তু তাতাররা আচমকা এমন প্রচণ্ড আক্রমণ করে বসল যে, দেহরক্ষীরা কোনো ধরনের প্রতিরোধের সুযোগই পেল না। তাদের একটা বিরাট অংশকে হত্যা করা হল। খাওয়ারিজম শাহের গায়েও এসে লাগল তিরের আঘাত। এই জখমসহই তিনি কিছু সহচর ও হেরেম নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেন।[২৪৬] মন্ত্রী ইমাদুল মুলকও এই হামলায় প্রাণ হারায়।[২৪৭]

মাজেন্দ্রানে একদিন

খাওয়ারিজম শাহ মাজেন্দ্রানে এসে পৌঁছলেন। এই নির্জন পাহাড়ি এলাকায় তার বোন শাহ খাতুন বসবাস করত। ভগ্নীপতি ইরদশির হাসান ছিল এক প্রান্তিক বস্তির হাকিম। ফলে, মাজেন্দ্রানে আত্মীয়দের পেয়ে সুরক্ষার খানিক আশা পেলেন শাহ। তিনি মাজেন্দ্রানের কারুন্দাজ দুর্গে অবস্থান করতে লাগলেন। একটা রাত শুধু কাটালেন। পরদিন ভোরে উঠে খানদানের বাচ্চাকাচ্চা ও বিশেষ কিছু লোককে দুর্গের ভেতরেই থাকতে আদেশ করেন। তুর্কান খাতুন, বেগম ও শাহজাদিদের আইলান নামক এক শক্ত দুর্গে নিয়ে রাখেন। নিজে রওনা দেন বাগদাদের পথে।

কারুন্দাজের দুর্গপতি তাকে এসে বাগদাদ যাওয়ার রাজপথ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল। সেখান থেকে খাওয়ারিজম শাহ কয়েক মাইল অগ্রসর হবার পর, ফের পেছন ঘুরে ঠিক সেখানেই ফিরে এলেন—যেখান থেকে দুর্গপতি প্রথমে তাকে বিদেয় দিয়েছিল। তারপর এখান থেকে চুপচাপ দিলিমের পার্বত্য এলাকার দিকে মোড় নিলেন তিনি। এটা ছিল খাওয়ারিজম শাহের একধরনের কৌশল। কৌশলটা অবশ্য কাজেও লেগেছিল। কিছুকাল পরে তাতাররা তার সন্ধানে মাজেন্দ্রানে এসে জানতে পারে—তিনি বাগদাদ চলে গিয়েছেন। দ্রুত তারাও ছোটে বাগদাদের রাজপথে। খুঁজতে খুঁজতে বহুদূর গিয়েও যখন শাহকে পায় না, ফিরে আসে বুকভরা ব্যর্থতা নিয়ে।[২৪৮]

---

[২৪৫] ইবনে খালদুন ৫/১১০
[২৪৬] জাহাঁকুশা ২/১১৪
[২৪৭] ইবনে খালদুন ৫/১১০
[২৪৮] জাহাঁকুশা ২/১১৫

সমুদ্রপারের বস্তিতে আত্মগোপন

দিলিমে পৌঁছে খাওয়ারিজম শাহ সিরাজাহা দুর্গে অবস্থান করতে লাগলেন। এখানে একটু নিরাপদ বোধ করছিলেন তিনি। তবে তার মনের স্থিতিশীলতা হারিয়ে গিয়েছিল। অনুতাপ, হতাশা, দোদুল্যমানতা, অস্থিরতা ও পরাজয়ের গ্লানিবোধে যেন তিনি এক অন্য মানুষে পরিণত হয়েছিলেন। একটুখানি সুখের শীতল ছোঁয়া ছিল না বুকের কোথাও।

এক সপ্তাহ পর সিরাজাহাকেও বিদায় জানাতে হল তার। গায়লানে রওনা দিলেন তিনি। তার বুকের অভ্যন্তরজুড়ে তখনও তাতার-ত্রাসের রাজত্ব। একদিন, নিদারুণ অস্থিরতায় এক সহচরকে তিনি বললেন—আচ্ছা, তুমি বলো তো, পৃথিবীতে এমন একটু জায়গা কি হবে, যেখানে বুকভরে আমি খানিক স্বস্তির শ্বাস নিতে পারব?

সহচরবৃন্দ পরামর্শ দিল—এক কাজ করুন, যতক্ষণ পুত্র জালালুদ্দীন ও সেনাপতিরা একটি শক্তিশালী সৈন্যদল গঠন করে না-উঠবে, আপনি কাসপিয়ান সমুদ্রের কোনো উপত্যকায় গিয়ে আত্মগোপন করে থাকুন।[২৪৯]

বোধশোধহীন খাওয়ারিজম শাহ কাপুরুষোচিত এই মন্তব্যটি সঙ্গে সঙ্গে লুফে নিলেন। বিশেষ কিছু সহচরের সাথে বেশ বদল করে, এক অচেনা বিস্ময়কর আকৃতিতে, কাসপিয়ান সমুদ্রের দিকে রওনা দিলেন তিনি।

অনতিক্রম্য পাহাড়ি চড়াই ও ঘোরানো-প্যাঁচানো রাস্তা পার হয়ে শাহের এই ছোট্ট কাফেলা সমুদ্রের পশ্চিম তীরবর্তী জেলেদের এক শান্ত-নীরব বস্তিতে গিয়ে ওঠে। খাওয়ারিজম শাহের অবস্থা তখন বড় নাজেহাল। বিরামহীনভাবে আপতিত শারীরিক ও মানসিক কষ্ট-যাতনা তাকে রুগ্‌ণ বানিয়ে ফেলেছে। দড়ি পাকিয়ে গেছে চেহারা। বস্তিতে যখন ওঠেন, সে-মুহূর্তে ধুলোয় ও ঘামে তার সারা শরীর চটচটে হয়ে উঠেছে। তাকে চিনে-ওঠাই ছিল দুষ্কর।

তবে, বস্তিতে এই পলাতক বাদশাহর জন্য তখন এক অচেনা আগন্তুকের মতো থাকলেই উত্তম হতো। সঙ্গীরাও তাকে এ পরামর্শই দিয়েছিল। কিন্তু, তাদের কথা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে এই অচেনা অঞ্চলে নিজেকে তিনি গোপন রাখলেন না। সর্বত্র প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করতে লাগলেন। মহল্লার মসজিদে জামাতের সাথে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতেন।[২৫০] আতঙ্ক ও অস্থিরতা থেকে মুক্ত হতে আল্লাহর জিকিরে নিবিষ্ট হতেন। নামাজ, তাসবিহ ও তাহলিলে নিমগ্ন হয়ে পেরেশানি ও গ্লানিবোধ থেকে উদ্ধার করতে চাইতেন নিজেকে। হৃদয়ে মাখতে চাইতেন প্রশান্তির আলো। কখনও পূর্বের শান-শওকত ও হারানো সাম্রাজ্যের কথা ভেবে খুব

---

[২৪৯] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১৬, পৃষ্ঠা ১২৩

[২৫০] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১৬, পৃষ্ঠা ১২৩

উদাস হয়ে পড়তেন। আপন কাঁধে যে অপদস্থ জীবন তিনি বয়ে বেড়াচ্ছেন, তা ভেবে বুক ভাসিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করতেন জারজার হয়ে।[২৫১] কখনও কৃত গুনাহের জন্য অনুতপ্ত বোধ করতেন তিনি। আল্লাহর কাছে শিশুদের মতো করে ওয়াদা করতেন—আল্লাহগো, দ্বিতীয়বার যদি সাম্রাজ্য ফিরে পেতে পারি আমি, পুরোপুরি ইনসাফের সাথে রাজত্ব করব। রাজ্য থেকে মিটিয়ে দেব জুলুমের নামনিশানা!

বহুদিনের শারীরিক ও মানসিক কষ্টে তার স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়েছিল। মাঝেমধ্যেই প্রচণ্ড বুকের ব্যথায় কাতরাতেন তিনি। তিনি যে মূলত কে—এরই মধ্যে ধীরে-ধীরে জেনে গেল বস্তির সবাই।[২৫২] কিন্তু তার এই সর্বৈব পরিচিতিই বিপদ ডেকে আনে। সেখানকার এক গাদ্দার শাহের বস্তিতে অবস্থানের কথা তাতারদের জানিয়ে দেয়। তাতার-বাহিনী রাত্রিদিন এক করে, শিকারি বাঘের রক্তনেশা নিয়ে, ইরান ও ইরাকের সমস্ত পাহাড়-পর্বতে পাতি-পাতি করে তাকে খুঁজছিল। এই সংবাদ যখন তারা পেল, সঙ্গে সঙ্গে উল্কাবেগে ছুট লাগাল এই জেলেপাড়ার দিকে।

তবে খাওয়ারিজম শাহের সৌভাগ্য যে, সময়ের আগেই তিনি তাতারদের আগমনের খবর পেয়ে গেছিলেন। ফলে সহচরদের নিয়ে চটজলদি বড় একটা নৌকায় উঠে সমুদ্রপথে ভেসে গেলেন। ঠিক তক্ষুণি ছুটতে ছুটতে উন্মত্ত তাতারেরা একেবারে সমুদ্রপারে চলে আসে। ততক্ষণে খাওয়ারিজম শাহের নৌকা প্রায় মাঝ-সাগরে ভেসে গেছে। তাতাররা পারে দাঁড়িয়ে, ক্রোধে-দুঃখে হতাশ দৃষ্টিতে দেখতে থাকে—সমুদ্রের ঢেউয়ে মৃদুভাবে দুলতে দুলতে এগিয়ে চলেছে শাহের নৌকা।

এত কাছে থাকা সত্ত্বেও শিকার ফসকে গেছে দেখে ধাই করে ক্রোধাগ্নি জ্বলে ওঠে তাতারদের মাথায়। তারাও আর থেমে থাকে না। নৌকার দিকে সাঁ সাঁ করে অনবরত তির ছুড়তে থাকে। কিছু গিয়ে সরাসরি নৌকার ভেতর পড়ে, আর কিছু আশপাশে পড়ে ছুপছুপ করে তলিয়ে যায় পানির ভেতর। কিন্তু খাওয়ারিজম শাহ দ্রুতই তাদের নাগালের বাইরে চলে যান।

কিছু উন্মত্ত তাতার ঘোড়সওয়ার অদ্ভুত এক কাণ্ড ঘটিয়ে বসে। নিজেদের আর সামলাতে না-পেরে ঘোড়া নিয়ে তারা ঝাঁপ মারে সমুদ্রে। আর সঙ্গে সঙ্গে গভীর জলে তলিয়ে মারা যায়।

নৌকা দুলতে দুলতে একেবারে মাঝসমুদ্রে চলে গেছে। সাম্রাজ্যের শেষসীমানাটুকুও পেরিয়ে যাচ্ছেন আলাউদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহ। দুশ্চিন্তা, হতাশা ও আক্ষেপে তার পুরো দেহ-মন বিবর্ণ। নিদারুণ অস্থিরতা ও ভারসাম্যহীনতায় মাঝেমধ্যেই চটাস করে নৌকার কাঠের সঙ্গে বাড়ি খাচ্ছেন তিনি। আর আফসোসের

---

[২৫১] ইবনে খালদুন ৫/১১০; সিয়ারু আলামিন নুবালা ২২/২৩৩

[২৫২] ইবনে খালদুন ৫/১১০

ঢঙে বলে উঠছেন—'সুবহানাল্লাহ, এই বিশাল সাম্রাজ্যের দু-গজ মাটিও আর রইল না আমার। আমার দাফনের জায়গাটুকু পর্যন্তও যে নেই! হ্যাঁ, আসলেই দুনিয়া চিরস্থায়ী ঠিকানা নয়!'[২৫৩]

তাতার-বাহিনী খাওয়ারিজম শাহকে গ্রেফতার করতে পারল না। এখন বাহ্যিকভাবে যদিও তিনি মুক্ত, কিন্তু তার এবারকার প্রতিটি মুহূর্ত মৃত্যুর চেয়ে আরও ভয়ানক হয়ে ওঠে। বিস্তৃত কাসপিয়ান সমুদ্রের মাঝখানে আবসুকুন উপত্যকার কিনারে এসে নোঙর ফেলে নৌকা। আত্মগোপনের জন্য শাহের সেবায়েতরা এই জায়গাটাই নির্বাচন করে দিয়েছিল। এই উপত্যকার ভেতরে ছিল এক প্রাচীন দুর্গ। দুর্গের দেয়ালজুড়ে এমনভাবে কালচে শেওলা পড়ে গেছিল যে, দেখে বোঝা যায় জায়গাটা বহুকালের পুরোনো; জনমানবহীন। চারপাশে ঝিম ধরে ছিল গা হিম-করা কেমন এক নৈঃশব্দ্য।[২৫৪]

এখানে এসে খাওয়ারিজম শাহের অস্থিরতা খানিকটা কমে এসেছিল।[২৫৫] ত্যকায় একটা ছোট্ট তাঁবুর ভেতর তিনি পড়ে থাকতেন। তিন পুত্র—জালালুদ্দীন মুনকাবিরাতি, কুতুবুদ্দীন আযলাক ও আক সুলতানও ছিল তার সঙ্গে। ওদিকে চতুর্থ ছেলে গিয়াসুদ্দীন নিজ শাসনাধীন অঞ্চলের কোনো-এক দুর্গে রয়ে গিয়েছিল। ছোট ছেলে রোকনুদ্দীনও আসতে পারেনি। তাকে নিয়ে শাহ খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। ছেলেটা কেমন আছে, ইরাকেই আছে, নাকি... এমনতরো অচেনা সব ভয়ভীতি এসে দলা পাকাত তার বুকের ভেতর।

তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হল—এই কঠিন ক্রান্তিকালেও সুলতানের শাহি মেজাজ এতটুকু কমেনি। অধীনস্থদের মাঝেমধ্যেই তিনি আজব ধরনের ফাই-ফরমাশ দিয়ে বসতেন। একদিন তার মনে বাসনা জাগল—হায়, আমার যদি একটি ঘোড়া থাকত! তাঁবুর আশপাশে এখন চরে বেড়াত। কী যে চমৎকার লাগত দেখতে!

ঘটনাক্রমে তাজুদ্দীন হাসান নামের এক সরদার তার সেই খায়েশ সম্পর্কে জানতে পারেন। এবং শাহের খেদমতে একটি লাল ঘোড়া হাদিয়া পাঠান।

আহা, ইনি তো সেই খাওয়ারিজম শাহ, কিছুদিন পূর্বেও যার সাম্রাজ্যে ৩০ হাজারেরও অধিক চারণভূমি ছিল। তখন তার ক্ষমতা ছিল—যদি তিনি একটামাত্র ইশারা করতেন, তবে এই এক ইশারায় চারণভূমিগুলোতে চরে-বেড়ানো লক্ষ লক্ষ ঘোড়া এনে তার দরবারে হাজির করতে বাধ্য ছিল রাখালশ্রেণি। আজ সেই খাওয়ারিজম শাহই কি-না এক সর্বহারা ভিখিরির মতো নিতান্ত সাধারণ সরদারের পাঠানো হাদিয়ার ঘোড়া কবুল করছেন!

---

[২৫৩] তারিখে কাবির লিয-যাহাবি ৬২/৬১৭; চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১৬

[২৫৪] ইবনুল আসির ৭/৫৭৭

[২৫৫] তারিখে কাবির লিয-যাহাবি ৬২/৬১৭

মাজেন্দ্রানের লোকজন শাহের যথাসম্ভব খাতির-আত্তি করেছিল। কেউ তার কাছে রকমারি খাবারদাবার নিয়ে এসে উপস্থিত হচ্ছিল। কেউ পূরণ করছিল তার ভিন্ন কোনো খায়েশ। শাহ তাদের এর প্রতিদান দিতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু তখন যে দেওয়ার মতো তার কিছুই ছিল না! তবে হ্যাঁ, স্থানীয় কেউ যখন শাহের খেদমতে কোনো কিছু পেশ করত, তাকে সাম্রাজ্যের বড় কোনো পদ কিংবা বিশাল জায়গির প্রদান করবেন বলে প্রমাণস্বরূপ তিনি একটা রশিদ লিখে দিতেন। কখনোসখনো রশিদ লিখবার মতো কেউ থাকত না। তখন প্রতিদানপ্রাপ্তব্য লোকটিকে বলতেন—আচ্ছা, তুমি নিজেই একটা রশিদ লিখে নাও তো!

রশিদের সঙ্গে শাহ তার ব্যবহারের কোনো জিনিস নিদর্শনস্বরূপ দিয়ে বলতেন—শোনো, অবস্থা যখন আমাদের অনুকূলে আসবে, রশিদপত্রের সাথে এই জিনিসটা দেখালেই এত পরিমাণ সম্পত্তি ও জায়গির নিয়ে নিতে পারবে।[২৫৬]

এভাবে মৃত্যুর পূর্বে ব্যবহারের ছোট-ছোট জিনিস, চাবুক, রুমাল, অতিরিক্ত পোশাক এবং চাদর পর্যন্তও তিনি বণ্টন করে দিচ্ছিলেন।

তবে জালালুদ্দীন ঠিকই এই সেবায়েতদের ভোলেননি। খাওয়ারিজম শাহের তো প্রতিশ্রুতি পূরণ করার নসিব হয়ে ওঠেনি। কিন্তু তার মৃত্যুর পর যখন সুযোগ এসেছিল, পিতার প্রতিশ্রুতি-মাফিক জালালুদ্দীন লোকদের প্রদান করেছিলেন বিভিন্ন পুরস্কার, সম্মাননা ও জায়গির।[২৫৭]

শাহি হেরেমের পরিণতি

তাতাররা ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে। আর আলাউদ্দীনকে ফেলে গিয়েছিল কাসপিয়ানের এক আধো অন্ধকার কোণে। রেখে গেছে জীবিত অবস্থায়; কিন্তু কঠিন মুসিবতে। ওদিকে মাজেন্দ্রানের সমস্ত দুর্গে আক্রমণ চালিয়ে একে-একে তারা সব জয় করে নিল। কারুন্দাজ দুর্গে খাওয়ারিজম শাহের কিছু সহচর ও খানদানের কিছু বাচ্চাকাচ্চা আশ্রয় নিয়েছিল। দুর্গ কবজা করে তাতাররা সেই সহচরদের হত্যা করে ফেলল। বাচ্চাদের গ্রেফতার করে পাঠিয়ে দিল চেঙ্গিজ খানের কাছে, সমরকন্দে। চেঙ্গিজ খান তরবারি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এক-এক করে সবকটা বাচ্চার মাথার খুলি উড়িয়ে দিলেন।[২৫৮] আর্ধান দুর্গে শাহি খানদানের গচ্ছিত সেই ধনভান্ডারও পেয়ে গেল তাতার-বাহিনী। সেগুলোর ছিল কল্পনাতীত মূল্যমান। স্বর্ণ-রৌপ্য-হিরা-জহরতের এই খাজানাও চেঙ্গিজ খানের দরবারে প্রেরণ করা হল।

---

[২৫৬] নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৬৩; আবুল ফিদা ৩/১৪৯; তারিখে কাবির লিয-যাহাবি ৬২/৬১৭

[২৫৭] ইবনে খালদুন ৫/১১০-১১১

[২৫৮] জাহাঁকুশা ২/১৯৯-২০০

আয়লান দুর্গে তুর্কান খাতুন, শাহি বেগম, শাহজাদি, কিছু বাচ্চাকাচ্চা ও মন্ত্রী নেজামুল মুলক মুহাম্মদ বিন সালেহ আশ্রয় নিয়েছিলেন। চার মাস অবরোধের পরও তাতাররা এই দুর্গের প্রাচীর টপকাতে পারেনি। কিন্তু তাকদিরের লিখন কি আর খণ্ডন করতে পারে কেউ? নির্ধারিত সময়ে তা নিশ্চিত পূর্ণতা পায়ই।

আয়লান এলাকাটি অপরূপ সুন্দর ঝরনাধারা ও বৃষ্টিপাতের কারণে আর্দ্র ও সিক্ত হয়ে থাকত সারা বছর। কিন্তু অবরোধের ভেতর ধীরে-ধীরে দেখা দিল পানির সংকট। বৃষ্টি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল। দুর্গের ভেতর জমিয়ে রাখা পানিও নিঃশেষ হয়ে এল। অবরুদ্ধ লোকেদের প্রাণ হয়ে উঠল ওষ্ঠাগত; এখন যায় তখন যায় অবস্থা। তখন তাদের সর্বান্তঃকরণে শুধু দু-ফোঁটা বৃষ্টির আকুতি। একটুখানি জলধারাই তাদের নতুন জীবন ফিরিয়ে দিতে পারত।

কিন্তু আল্লাহর ফয়সালা অনুযায়ী বৃষ্টি যে হওয়ারই ছিল না! ১০-১৫টা দিন জীবন-মৃত্যুর অভূতপূর্ব সন্ধিক্ষণে কাটিয়ে আখেরে তারা দুর্গের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল। নিজেদের অসহায়ভাবে ছেড়ে দিল দুশমনের হাওয়ালায়।

আর কী আজিব ব্যাপার, ভেতর থেকে তারা যখন বাইরে বের হল, ঠিক তক্ষুনি আকাশে গুড়গুড় করে ডেকে উঠল মেঘমালা। পরমুহূর্তে মুষলধারে আরম্ভ হল বৃষ্টিপাত। চারপাশে জমে গেল থৈ থৈ পানি। এমনকি দুর্গের দরজা দিয়েও বন্যার ধারাস্রোতের মতো ভকভক করে পানি বেরিয়ে আসতে দেখা গেল।[২৫৯]

فاعتبروا يا اولى الابصار

হে চক্ষুষ্মানেরা, তোমরা শিক্ষাগ্রহণ করো।

কয়েদিদেরকে হাতে-পায়ে শৃঙ্খল জড়িয়ে চেঙ্গিজ খানের কাছে সমরকন্দে প্রেরণ করা হল। মন্ত্রী নেজামুল মুলকের ইলমি দক্ষতা দেখে অর্থনৈতিক বিভিন্ন আলোচনা-পরামর্শের জন্য তাকে নিজের কাছে রেখে দিলেন চেঙ্গিজ খান।[২৬০]

বন্দিদের সমস্ত বাচ্চাকাচ্চাকে হত্যা করা হল। বেগম ও শাহজাদিদেরকে কিছু সরদার ও তাতার শাহজাদারা নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নিয়ে নিল। বেচারি শাহজাদি খান সুলতান পড়েছিল জোচি খানের ভাগে। ওদিকে চেঙ্গিজ খানের কাছে তুর্কান খাতুনও অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ও লাঞ্ছনার শিকার হচ্ছিলেন।

বন্দিত্বকালে বদরুদ্দীন হেলাল নামের এক খাদেম ছিল তুর্কান খাতুনের সঙ্গে। সে পরিকল্পনা সাজাল পালিয়ে যাওয়ার। তুর্কান খাতুনকে বলল—'চলুন আমার সাথে, গোপনে পালিয়ে শাহজাদা জালালুদ্দীনের কাছে চলে যাব আমরা। জালালুদ্দীনের শক্তিমত্তা ও বিজয়ের সুসংবাদ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে।'

---

[২৫৯] রওজাতুস সফা ৪/৮২৫; জাহাঁকুশা ২/১৯৮-১৯৯; নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৬২

[২৬০] কিছুকাল পরে কারো অভিযোগে প্রভাবিত হয়ে উজিরকেও হত্যা করে ফেলেছিলেন। দেখুন : ইবনে খালদুন ৫/১১১

কিন্তু সেই ক্রান্তিকালেও তুর্কান খাতুনের ঘৃণা ও হিংসা পূর্ববৎ বহাল ছিল। জালালুদ্দীনের প্রতি তার ঘৃণা তখনও কমেনি এতটুকু। ঘৃণায় নাক-মুখ কুঁকড়িয়ে তিনি বললেন—'সর্বনাশ হোক জালালুদ্দীনের। এখনও এতটা নিচে নেমে যাইনি যে, আমার সন্তানদের (কুতুবুদ্দীন আযলাক ও আক শাহ) পরিবর্তে হিন্দুস্থানি পুত্রবধূর এক নগণ্য পুত্রের অনুগ্রহের পাত্র হবো, জীবন কাটাব তার ছায়ায়। তা কখনও হবার নয়! তার চেয়ে এই অপমান-অপদস্থতার ভেতর চেঙ্গিজ খানের কয়েদি হয়ে থাকাই ঢের ভালো।'

আহা, কতটা ঘৃণা পুষে রাখতে পারে মানুষ!

বন্দিদের মধ্য থেকে শাহি খানদানের একটি নিষ্পাপ শিশুকে শুধু জীবিত রাখা হয়েছিল। তুর্কান খাতুনের বন্দিত্বের দিনগুলো কাটছিল তার সাথে। শিশুটাকে খুবই আদর-সোহাগ করতেন তুর্কান খাতুন। একদিন ওর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন—'আমার-না আজ খুব বেশি ভয় হচ্ছে! ইতিপূর্বে কখনও এমন হয়নি!'

আর ঠিক সেইসময় চেঙ্গিজ খানের প্রেরিত এক সিপাহি এল তার কাছে। শিশুটাকে কেড়ে নিয়ে গেল এবং চেঙ্গিজের হুকুমে ওকে হত্যা করে ফেলল। তারপর থেকে তুর্কান খাতুন পুরোপুরি একা হয়ে গেলেন।

কুরুলতাইয়ে অবস্থানকালে, বৃদ্ধ তুর্কান খাতুনের হাতে-পায়ে জিঞ্জির পেঁচিয়ে ভরা মজলিশে ডেকে আনতেন চেঙ্গিজ খান। অপমানকর এই দৃশ্যে বিজয়ের দম্ভে তিনি হো হো করে হেসে উঠতেন। তার হাসি যেন থামতেই চাইত না।[২৬১]

একসময়কার প্রভাবশালী এই সম্রাজ্ঞীকে তখন ক্ষুধিত পেটের আগুন নেভাতে চেঙ্গিজ খানের রন্ধনশালায় হাজিরা দিতে হতো। কিছুই পেতেন না, বুভুক্ষুর মতো শুধু কিছু এঁটোকাঁটা, উচ্ছিষ্ট নিয়ে ফিরে আসতেন।[২৬২]

মহাকাল কি তখন পুরো আকাশ-পৃথিবী গুঞ্জরিত করে গেয়ে উঠত এই সত্য পয়গাম :

جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے
یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے

দুনিয়া রং-তামাশার জায়গা নয়, শিক্ষাগ্রহণের জায়গা

---

[২৬১] চেঙ্গিজ খান, পৃষ্ঠা ১৫৯

[২৬২] ইবনে খালদুন ৫/১১১

একাদশ অধ্যায়

পশ্চিমা তাতারদের রক্তোন্মত্ততা

'এই সম্প্রদায় চীন-সীমান্ত পেরোনোর এক বছর পূর্ণ হবার আগেই আর্মেনিয়ার সীমান্ত অতিক্রম করে ফেলে। ইরাকের দিকে হামাদান ছাড়িয়ে এগিয়ে যায় আরও বহুদূর। আল্লাহর কসম, আমার এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, পরবর্তীকালের লোকেরা যখন এই ঘটনাগুলো বইয়ের পাতায় পড়ে উঠবে, তাদের কাছে এগুলো মিথ্যে এবং যুক্তিবিবর্জিত মনে হবে।'[২৬৩]

'তাতার-আগ্রাসন ছিল মুসলিমবিশ্বে নেমে-আসা এক মহাবিপর্যয়। সেই বিপর্যয়ে ইসলামিবিশ্বের কঠিন অস্তিত্বসংকট দেখা দিয়েছিল। সন্ত্রস্ত ও ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিল মুসলমান। এক সীমান্ত থেকে অন্য সীমান্ত পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল আতঙ্কে ও হতাশায় ছেয়ে গিয়েছিল। তাতারদের নিরঙ্কুশভাবে অপ্রতিরোধ্য ও অপ্রতিহত ভাবা হতো—যেন কোনোভাবেই তাদের সাথে মোকাবেলা করে ওঠা সম্ভব না। তারা পরাজিত হতে পারে এটা কারুর যুক্তিতেই ধরত না। এমনকি প্রবাদবাক্য হিসেবে মুখে মুখে এই পঙক্তি ছড়িয়ে পড়েছিল, কেউ যদি তোমাকে বলে, তাতাররা কোথাও পরাজিত হয়েছে, একদম বিশ্বাস করো না।'[২৬৪]

শাহজাদা রোকনুদ্দীনের শাহাদাত

রাখালের অনুপস্থিতিতে ভেড়ার পাল যেমন চারপাশে অসহ্য উৎপাত শুরু করে দেয়, খাওয়ারিজম শাহ নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার পর সাম্রাজ্যের অবস্থাও হয়ে পড়েছিল ঠিক তেমন। তবে শত দুর্বলতা ও নিরাশার মধ্যেও শাহি খানদানের একজন সাহসী পুরুষ তরবারি হাতে তাতারদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিলেন। তিনি খাওয়ারিজম শাহের ১৬ বছর বয়সি পুত্র রোকনুদ্দীন ঘুরশাহ। খুবই সুদর্শন ছিলেন তিনি। ইলমের জগতে অল্প বয়সেই অসামান্য ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছিলেন। তার শিষ্টাচারও ছিল দারুণ প্রশংসনীয়। এই গুণী নওজোয়ান এবার যুদ্ধ-ময়দানেও তার যোগ্যতার ঝলক দেখাতে লাগলেন।

খাওয়ারিজম শাহের আত্মগোপনের পর ঘুরশাহ সর্বপ্রথম ইস্পাহান ও হামাদানের সেই আমিরদের মেজাজ শুদ্ধ করতে চাচ্ছিলেন, সিংহাসন খালি দেখে যারা বিদ্রোহ করে বসেছিল। এবং তাতারদের মিত্র ও স্বাধীন সাম্রাজ্য গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখছিল। সঙ্গে হাসান ইবনে সাব্বাহর অধীনস্থদের মুখেও লাগাম পরাতে চাচ্ছিলেন। সুযোগ পেয়ে এরাও নানান উৎপাত শুরু করে দিয়েছিল।

---

[২৬৩] আল্লামা ইবনুল আসির জাযারি রহ.

[২৬৪] তারিখে দাওয়াত ওয়া আজিমাত, প্রথম খণ্ড, সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদবি রহ.

কিন্তু দুর্ভাগ্য হল—এই অভিযান সম্পন্ন করে ওঠার মতো সময় মেলেনি তার। একদিন তিনি সংবাদ পেলেন—তাতারদের একটি বাহিনী নাকি এদিকেই এগুচ্ছে।

সংবাদটা পেতেই ফিরোজকুহ নামের এক মজবুত দুর্গে পরিপূর্ণ প্রতিরোধ-ব্যবস্থা নিয়ে অপেক্ষমাণ রইলেন তিনি। দুর্গে প্রবেশের কারণ—অল্পকিছু সিপাহি নিয়ে তাতারদের একটি ভারী দলের সাথে খোলা ময়দানে লড়বার সামর্থ্য তার ছিল না।

ফিরোজকুহে শক্ত মোর্চা স্থাপন করে তির ও পাথরবর্ষণের মাধ্যমে লাগাতার ছয় মাস পর্যন্ত তাতারদের এই বিশাল বাহিনীর অগ্রসরতা রুখে দিতে সক্ষম হন শাহজাদা রোকনুদ্দীন। তার স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও দুর্ধর্ষ সাহসিকতায় হামলাকারীদের অবস্থা হয়ে যায় নাজেহাল। শেষ পর্যন্ত বাহির থেকে কোনো সহযোগিতা না-আসায় আপন শক্তিতেই তিনি প্রতিরোধ করে যান। কিন্তু তাতাররা একসময় দুর্গ কবজা করে ফেলে। গ্রেফতার করে ফেলে তাকে ও তার সঙ্গীদেরকে। সবাইকে পেশ করা হয় তাতার-বাহিনীর সিপাহসালারের দরবারে। জোর কণ্ঠে হুকুম দেওয়া হয়—সিপাহসালারকে সম্মানপ্রদর্শন করো! তার সামনে নতজানু হও!

কিন্তু রোকনুদ্দীনের প্রচণ্ড আত্মমর্যাদাবোধ ও ঈমানি চেতনা তাকে জালেমের সামনে নতজানু হতে দেয়নি। তাতাররা তাকে অনেক ভয় দেখাল। কড়া ধমকধামক দিল। এমনকি বেদম মারপিটও করল। তবু তার এই দৃঢ় সংকল্প তারা টলাতে পারেনি। শেষমেশ ক্রুদ্ধ হয়ে তাতাররা তাকে ও তার সঙ্গীদের অত্যন্ত নির্মমভাবে শহিদ করে ফেলল।[২৬৫]

রায় শহরে তাতার তাণ্ডব

শাহজাদা রোকনুদ্দীনের শাহাদাতের পর একটি বড় বাধা থেকে তাতারদের নিষ্পত্তি ঘটে যায়। সোল্লাসে তারা ভাবে—খাওয়ারিজম শাহি খানদানের কোনো লোক এখন আর আমাদের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে পারবে না।

রোকনুদ্দীনের পাট চুকিয়ে দেবার পর রায় নগরীর দিকে এগোতে লাগল তাতার-বাহিনী। রায় হচ্ছে খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের ইরাকসংলগ্ন জেলাগুলির একটি। বহু শতাব্দী ধরে ঘনবসতিপূর্ণ প্রশস্ত এই শহরটি ছিল ইলমে দীনের এক প্রাচীন মারকাজ। এ মাটিতেই ইমাম আবু বকর জাসসাস রাজি, শায়েখ আবদুল কাদির রাজি, ইমাম ফখরুদ্দীন রাজির মতো পৃথিবীবিখ্যাত ব্যক্তিত্বের জন্ম।

রায় শহরে আচানকভাবে ঘটে গেল তাতারদের হামলা। ফলে শহরবাসী বিক্ষিপ্ত হয়ে প্রতিরোধের তাবৎ আশা হারিয়ে ফেলল। এই ঘোর হতাশার মধ্যেও মাত্রাতিরিক্ত আহাম্মকির পরিচয় দিয়েছিল কিছু মুসলমান। তাতে একদম সহজ হয়ে গিয়েছিল তাতারদের অভিযান।

---

[২৬৫] ইবনে খালদুন ৫/১১৭; জাহাঁকুশা ২/৩০৯

চূড়ান্ত বিচ্ছিন্নতা : ভয়ানক পরিণাম

ঘটনা হল—রায় আক্রমণের দিনগুলোতেও সেখানকার মুসলিম বাসিন্দারা পারস্পরিক মতভিন্নতার চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে। চারদিকে যখন ছড়িয়ে পড়েছিল তাতার-তাণ্ডবের সংবাদ, ব্যাপারটাকে একদল নাদান মুসলমান স্বজাতীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের থেকে মুক্তিলাভের নিদারুণ উপায় ভেবে বসেছিল। তাতারদের মাধ্যমে বিরোধীপক্ষকে খতম করে ফেলবে—এমন একটা মনোভাব কাজ করতে লাগল তাদের ভেতর। তারপর তাতার-বাহিনী যখন দোরগোড়ায় এসে উপনীত হল, এই নাদান শ্রেণি এগিয়ে গিয়ে তাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল। তাতার-সেনাপতি সুবেদাই ও জুবি নৈয়ানের কাছ থেকে নিয়ে নিল নিজেদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি। পাশাপাশি মুসলিম ভাইদের বিরুদ্ধে তাদের উৎসাহ দিল যে, ওই দলটাকে ছেড়ে দেবেন না কখনও।

ফলে তাতারদের কোনোপ্রকার বাধা-বিঘ্নেরই সম্মুখীন হতে হল না। নির্দ্বিধায় তারা ঢুকে গেল শহরের ভেতর। যতক্ষণ অন্য দলের মহল্লার ভেতর তারা হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে, গাদ্দারগুলো ততক্ষণ নিরাপদ থেকেছে। কিন্তু এই নিরাপত্তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। এক হত্যাযজ্ঞ থেকে ফারেগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাতাররা এই গাদ্দারদের ভেতরেও চালালো তাদের দ্বিতীয় হত্যাযজ্ঞ।

কত বড় দুর্ভাগা এই মুসলমানরা, সেই কঠিন মুসিবতের মধ্যেও চূড়ান্ত মতভিন্নতা ও স্বজনপ্রীতিতে মেতে উঠেছিল। তাদের অজ্ঞতাপ্রসূত মতভিন্নতায় পরস্পরে যে-বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়েছিল, সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে প্রতিটি রণাঙ্গনেই কামিয়াব হয়েছিল শত্রুবাহিনী। রায় শহর কবজা করার পর তাতাররা তাদের রীতি অনুযায়ী সমস্ত ধনদৌলত ও রসদপত্র লুটে নিল, নারী ও শিশুদের একটি বিরাট দলকে বন্দি করল, তারপর বাকি অধিবাসীদের তারা হত্যা করে ফেলল।[২৬৬]

ইমাম নাজমুদ্দীন রাজি রহ. (মৃত্যু : ৬৫৪ হিজরি) মিরসাদুল ইবাদ গ্রন্থের ভূমিকায় নিজের জন্মভূমির এই ধ্বংসচিত্র আঁকতে গিয়ে লিখেছেন—এই এক রায় নগরী, যেখানে আমার জন্ম ও বেড়ে-ওঠা, কাফেরদের হাতে এমনভাবে ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে, আনুমানিক ৭ লাখের বেশি মানুষ হয়েছে শহিদ এবং বন্দি।[২৬৭]

হামাদানের গভর্নরের সন্ধি

তাতার-বাহিনী যখন হামাদানে পৌঁছল, সেখানকার গভর্নর আগেভাগেই তাদের হাতে অজস্র ধনদৌলত সমর্পণ করে আনুগত্য স্বীকার করে নিল। ফলে, তাতাররা সেখানে তাদের এক তাতার পরিচালক নিযুক্ত করে সম্মুখে রওনা দিল।[২৬৮]

---

[২৬৬] রওজাতুস সফা ৫/৩০-৩১; ইবনুল আসির ৭/৫৭৯

[২৬৭] মিরছাদুল ইবাদ, পৃষ্ঠা ৮

[২৬৮] ইবনুল আসির ৭/৫৭৯

কাজবিন আক্রমণ

রায় নগরীর পরে এল কাজবিনের পালা। কাসপিয়ান সাগরের দক্ষিণ-পশ্চিমদিকের পর্বতসারির ভেতর নয়নাভিরাম এক ছোট্ট শহর কাজবিন। শহরবাসী প্রাচীরের ভেতর আবদ্ধ থেকেও জবরদস্ত মোকাবেলা করে গেল কয়েক দিন। শেষ পর্যন্ত তাতাররাই বিজয়ী হল। তারা স্রেফ তলোয়ারের জোরে জয় করে নিল কাজবিন। প্রচণ্ড বিক্রমে একছুটে তারা ঢুকে পড়েছিল শহরে। রেলগাড়ি যেভাবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী গতিতে পলকের ভেতর এগিয়ে যায় অনেক দূর, তাতারদের গতিও ছিল বলতে গেলে অনেকটা সে-রকম। শহরের বাসিন্দারা অলিতে-গলিতে, হাটেবাজারে—সবখানে খঞ্জর হাতে তাতারদের বিরুদ্ধে মোকাবেলায় মেতে উঠল। প্রচণ্ড শক্তিতে লড়তে লড়তে একে-একে শহিদ হয়ে গেল সবাই।

কাজবিন জয়ের পর তাতাররা শহরের ভেতর থেকে খানিকটা ক্লান্ত ভঙ্গিতে বেরিয়ে আসছিল। তাদের যুদ্ধশেষের শ্রান্ত অবয়বে চিকচিক করছিল একধরনের হিংস্র জয়োল্লাস। বিধ্বস্ত চেহারায় নেচে উঠছিল একটা রক্তখেকো পরিতৃপ্তি। কাতার বেঁধে বেরিয়ে আসছিল তারা। তাদের তলোয়ার ও বর্শার ফলা বেয়ে টপটপ করে তখনও রক্ত পড়ছিল। এবং পেছনে—শহরের ভেতর—বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে ছিল ৪০ হাজারেরও অধিক শহিদের লাশ।[২৬৯]

ইরবিল ট্রাজেডি

কাসপিয়ান সমুদ্রের পশ্চিমদিকে বিপুল জনসংখ্যা নিয়ে গড়ে-ওঠা এক শহরের নাম ইরবিল। তাতারদের তাণ্ডব থেকে রক্ষা পায়নি এ শহরও। বিখ্যাত ভূগোলবিদ ইয়াকুত আল-হামাবি এখানকার আক্রমণের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন—এই ইরবিল শহরে তাতাররা আক্রমণ করল। শহরবাসী ও তাদের মধ্যে পরপর কয়েকবার সংঘর্ষ বাধল। শহরবাসী অসামান্য সাহসিকতায় তাতারদের প্রতিরোধ করে গেছে। তাতারদের পিছু হটতে বাধ্য করেছে দু-দুবার। কিন্তু তৃতীয়বারের আক্রমণে ইরবিলবাসী দুর্বল হয়ে পড়ে। তাতাররা তখন শক্তিবলে কবজা করে ফেলে শহর। মুসলিমদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কঠিন গণহত্যা চালায়। চোখে যে-ই পড়ে, কোনো কথা নেই, সরাসরি তাকে হত্যা করে ফেলে। তবে যারা কোথাও লুকোতে পেরেছিল, তারা সেদিন বেঁচে গিয়েছিল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত কেউ জীবিত বাঁচতে পারেনি। তাতাররা সারা শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে বেরিয়ে পড়ে নতুন সাম্রাজ্যের সন্ধানে।

---

[২৬৯] ইবনুল আসির ৭/৫৮০

সারাও

ইরবিলের পরে সারাও শহরও তাতারদের হাতে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ইরবিল থেকে তিন মনজিল দূরে ছিল সারাও। ইয়াকুত হামাবির বর্ণনায় আছে—তাতাররা ৬১৭ হিজরিতে ধ্বংস করে এই শহর। এখানকার সকল জনগোষ্ঠীকে তারা হত্যা করে ফেলে।[২৭০]

তিবরিজবাসীর সন্ধিচুক্তি

সারাওয়ের পর তাতার-বাহিনী রওনা দেয় তিবরিজ-অভিমুখে। তিবরিজের হাকিম ছিল উজবুক মুজাফফর উদ্দীন ইবনে বাহলওয়ান। সে চরম প্রবৃত্তিপূজারি, আরামপ্রিয় ও বিলাসী ছিল। মদ্যপান ও নাচগান ব্যতীত কোনো কিছুতেই তার আগ্রহ ছিল না। তাতার-বাহিনীর আগ্রাসনের সংবাদ পেয়ে আত্মগোপন করে রইল সে। এই ফাঁকে তার এক স্থলাভিষিক্ত তাতারদের বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদ প্রদান করে তাদের সাথে সন্ধিচুক্তি করে ফেলল।[২৭১]

বিধ্বস্ত বিলকান

তিবরিজের পর বিলকান শহরের সীমানা-প্রাচীরের কাছে এসে পৌঁছে তাতার-বাহিনী। আলোচনার জন্য অধিবাসীদের কাছে একজন দোভাষীকে পাঠায়। দোভাষী বিলকানে ঢুকতেই শহরবাসী তাকে হত্যা করে ফেলে। ফলে চূড়ান্তে ওঠে তাতারদের উন্মত্ততা। তলোয়ারের জোরে তারা দখল করে নেয় শহর। অধিবাসীদের নির্বিচারে হত্যা করতে থাকে। এই নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ থেকে শিশু-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ কেউ-ই বাদ পড়েনি। তারা পাশবিকতার এমন কিছু ভয়াবহ দৃশ্যের অবতারণা ঘটায়, যা বর্ণনা করতে গেলেও শিউরে ওঠে গা। ধরে ধরে একের পর এক নারীদের সম্ভ্রম লুটে নিতে থাকে। সম্ভোগ শেষে ধারাবাহিকভাবে এক-এক করে হত্যা করে ফেলে তাদের। ধারালো তলোয়ার দিয়ে একটানে কেটে ফেলে গর্ভবতী মায়েদের পেট। তাদের জরায়ুর ভেতর থেকে অপরিণত ভ্রূণ বের করে সেটাকেও জবাই করে ফেলে। পৃথিবীর বাসিন্দা হবার আগেই এইসব জান্নাতি গিলমানকে মুখোমুখি হতে হয় পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম নৃশংসতার!![২৭২]

মারাগেহ

বিলকানের পর তারা অবরোধ করে মারাগেহ শহর। মারাগেহবাসী কয়েক দিন পর্যন্ত নগরপ্রাচীরের ভেতরে থেকে তাতারদের রুখে দিতে সক্ষম হয়। বাধ্য হয়ে তাতাররা

---

[২৭০] ইবনুল আসির ৭/৫৮৫

[২৭১] ইবনুল আসির ৭/৫৮৫

[২৭২] ইবনুল আসির ৭/৫৮৬

শহরের আশপাশে কামান স্থাপন করে পাথর নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করে। তাতাররা তাদের রীতি অনুযায়ী আশপাশ থেকে বন্দি করে আনা লোকদেরও প্রাচীর ভাঙার কর্মযজ্ঞে লিপ্ত হতে বাধ্য করে। কয়েদিদের সামনে-পেছনে মৃত্যু ছাড়া তখন দ্বিতীয় কিছু নেই। আক্রমণের সময় ঢালস্বরূপ এই বন্দিদের প্রথম সারিতে রাখে তাতাররা। তারা চাচ্ছিল—আর কিছু না হোক, অন্তত নিজেদের জানটা হলেও তো বাঁচবে।

মারাগেহ শহরের এই যুদ্ধ কয়েক দিন পর্যন্ত জারি ছিল। অধিবাসীরা একসময় দুর্বল হয়ে পড়ে আপনা-আপনি। তাতাররা শহর আয়ত্ত করে রীতিমতো সবাইকেই হত্যা করে ফেলেছিল। নিহতদের সংখ্যা ছিল অসংখ্য। তবে, প্রাণভয়ে কেউ কেউ লুকিয়ে পড়েছিল প্রাসাদের ভেতর। তাতাররা কয়েদিদের মাধ্যমে গলিতে-গলিতে ঘোষণা করিয়ে দিল—শোনো, কে কে আছ, তাতার-বাহিনী চলে গেছে, তোমরা বেরিয়ে এসো!

ঘোষণা শুনে আত্মগোপনকারী লোকজন বাইরে বেরিয়ে এল। আর তখন, তাতাররা তাদের ধরে ধরে কল্লা উড়িয়ে দিল।

ইউরোপ আক্রমণ

তাতার-বাহিনী পলাতক আলাউদ্দীনের পেছন-পেছন ছুটতে ছুটতে একদম ইরানের সুবিস্তৃত কাসপিয়ান সমুদ্রের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। এই সুদীর্ঘ অগ্রাভিযানে ধ্বংসদূতেরা একটিবারের জন্যও থামেনি কোথাও। সয়লাবের মতো একদিক থেকে ঢুকে তারা বেরিয়ে গিয়েছিল অন্যদিকে। শাহ হাতছাড়া হয়ে গেলেও তারা কিন্তু বসে থাকেনি। জয় করে নিয়েছিল মাজেন্দ্রান দুর্গ। শাহি হেরেম ও ধনভান্ডারও কবজা করে নিয়েছিল। হ্যাঁ, এই অভিযান থেকে ফারেগ হয়ে এরা ফিরে আসতে পারত নিজেদের ডেরায়।

কিন্তু, তা না করে তারা কাসপিয়ান সাগরের উত্তরদিকে অগ্রসর হতে লাগল। সুবেদাই ও জুবি নৈয়ান তখনও এই বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছিল। তারা জর্জিয়ার যোদ্ধাজাতিকে ধ্বংস করে কাসপিয়ান সাগরের অন্যপারে উত্তরে গিয়ে উঠল।

সুবেদাই ও জুবি নৈয়ানের নেতৃত্বে তাতারদের এই বাহিনী যেহেতু মুসলিমবিশ্বের পশ্চিমেদিকে অগ্রসর হয়েছিল, সেজন্য আরব ঐতিহাসিকগণ ইতিহাসে এদের পশ্চিমা তাতার নামে উল্লেখ করেছেন।[২৭৩]

তাতার-আগ্রাসনের বছরপূর্তি : ইবনুল আসিরের মূল্যায়ন

তখন ভূপৃষ্ঠে তাতার-আগ্রাসনের মাত্র এক বছর পূর্ণ হতে চলছিল, আর কালের ইতিহাসকাররা বিস্ময়কর এই হামলার বর্ণনা প্রদানের জন্য খুঁজছিলেন যথোপযুক্ত শব্দভান্ডার।

---

[২৭৩] ইবনুল আসির ৭/৫৮৬

ইবনুল আসির লিখেছেন—'পৃথিবীর প্রাচীন ও আধুনিক, কোনো ইতিহাসেই এই তাতার-জাতির আগ্রাসনের কোনো নজির খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ জাতি চীন-সীমান্ত পেরোনোর এক বছর পূর্ণ হবার আগেই অতিক্রম করে ফেলে আর্মেনিয়ার সীমান্ত। ইরাকের দিকে হামাদান ছাড়িয়ে এগিয়ে যায় আরও বহুদূর। আল্লাহর কসম, আমার এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই—পরবর্তী যুগের লোকেরা যখন এই ঘটনাগুলো বইয়ের পাতায় পড়ে উঠবে, তাদের কাছে এগুলো সম্পূর্ণ মিথ্যা ও যুক্তিবিবর্জিত মনে হবে। অর্থাৎ, এই ঘটনাগুলোকে অতিরঞ্জিত কিছু বলতে বাধ্য হবে তারা। তারা যখন একে সুদূরপরাহত কোনো বিষয় বলে ভাববে, তখন এ রচনার প্রতিও যেন দৃষ্টি বুলিয়ে নেয় যে, আমরা আগেই এমন কিছুর আশঙ্কা করেছিলাম এবং তা লিখেও গিয়েছিলাম।

আমাদের কালের যে-সমস্ত লেখক রচনা করে যাচ্ছেন নিখুঁত ইতিহাস; এই বিপর্যয়ের খুঁটিনাটি তারা জানেন। আল্লাহ তায়ালা ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য এমন কাউকে মিলিয়ে দিক, মুসলিমদের হেফাজত ও প্রতিরক্ষার জন্য যিনি মুষ্টিবদ্ধভাবে যুদ্ধে নেমে আসবেন। মিল্লাত এখন যে শত্রুর মুখোমুখি হয়েছে, নিঃসন্দেহে তারা অসামান্য শক্তিশালী। ওদিকে মুসলিম বাদশাহদের সমস্ত চিন্তাভাবনা শুধু উদরপূর্তি ও গোপনাঙ্গের ভোগ-বিলাসের প্রতি নিবদ্ধ।'[২৭৪]

মুসলিমবিশ্বে আপতিত এই ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ লোকদের সম্পূর্ণ অনুভূতিশূন্য ও হিম্মতহারা করে দিয়েছিল। ভয় ও বিমূঢ়তার ভেতর তাদের সর্বসত্তা হয়ে পড়েছিল পক্ষাঘাতগ্রস্ত। তাতারদের সাথে লড়তে নামাকে একেবারে অসম্ভব ভাবতে লাগল তারা।

একবার, সিরিয়ার হাকিম আল-মালিকুল আশরাফের মজলিশে তাতারদের নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। এই ভয়ানক ফেতনা থেকে উত্তরণের পন্থা কী—জিজ্ঞেস করা হল তাকে। তিনি হতাশ ভঙ্গিতে বললেন—'আমি এই জাতিকে নিয়ে কী আর বলব, আজও পর্যন্ত যাদের কোনো লোকই জীবিত গ্রেফতার হয়নি? এরা দুশমনের বেড়ের মধ্যে পড়ে গেলেও হাতিয়ার ফেলে না। কী অদম্য সাহস! শেষনিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়তে লড়তে মরে যায়, নাহয় জীবিতই ফেরে।'

لايقال كم قتل من بلد كذا، وانما يقال كم بقى

একথা জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই যে, এ শহরে তাতাররা কতজনকে হত্যা করেছে। জিজ্ঞেস করো যে, শহরের কতজন বেঁচে ফিরতে পেরেছে।

ইতিহাসবিদগণ বলেন—নিহতের সংখ্যা ঠিক কত, কোনোভাবেই তা অনুমান করে ওঠা সম্ভব না। কারণ, লাশ গণনাকারী ব্যক্তি যখন লাশ গুনতে গুনতে ক্লান্ত হয়ে যেত, ঠিক তখনই দেখতে পেত, চোখের সামনে এখনও পড়ে রয়েছে পূর্বের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি মরদেহের স্তূপ।[২৭৫]

---

[২৭৪] ইবনুল আসির ৭/৫৮১

[২৭৫] তারিখে কাবির লিয-যাহাবি ৬২/৬১৭

এই ধ্বংসযজ্ঞ শুধু অস্ত্রের রক্তপাত পর্যন্তই সীমিত থাকেনি; বরং তাতাররা সত্য সত্যই রক্তও পান করেছে।

মুওয়াফফিক বাগদাদি একবার সিরিয়া গেলেন। হালবে এক বিপদগ্রস্ত সাহসী নারীর সঙ্গে দেখা হল তার। তাতাররা তাকে স্বামী-সন্তানসহ গ্রেফতার করে নিয়ে গিয়েছিল।

মহিলাটি মুওয়াফফিক বাগদাদিকে নিজের জীবনবৃত্তান্ত শোনাল—'এক তাতার আমাদের চোখের সামনে আমাদের ছেলেকে জবাই করল। তারপর কুকুরের মতো জিভ দিয়ে চেটে চেটে পান করে নিল তার রক্ত। একসময় সেই পশুটা ঘুমাতে গেল। ঘুমের ভেতর আমি তাকে হত্যা করে স্বামীসহ পালিয়ে এলাম।'[২৭৬]

প্রচণ্ড ভয় ও অনুভূতিশূন্যতায় লোপ পেয়েছিল মানুষের স্বাভাবিক বোধবুদ্ধি। স্রেফ নিজেদের জান বাঁচানো ছাড়া কিছু ভাববার সময় তাদের ছিল না।

মুওয়াফফিক বাগদাদি লেখেন—ওয়াসেতের এক বণিকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল একবার। সে তাতারদের চোখ ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে পাহাড়ে গিয়ে লুকিয়েছিল। সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছিল কয়েক দিন পর। সে বলল, 'জমিনে অজস্র মৃত লাশ পড়ে থাকায় পা ফেলবার জায়গাটুকু পর্যন্ত ছিল না। মহিষের পাল ও লুটপাটের মাল-সামানায় ভরে গিয়েছিল বিশাল সব প্রান্তর। আমরা দশজন জীবিত পালিয়ে আসতে পেরেছিলাম। তখন যদি আমাদের হুঁশ থাকত, এত বিপুল সম্পত্তি জমিয়ে ফেলতাম যে, আমাদের জীবনের সকল আশা পূর্ণ হয়ে যেত। কিন্তু অন্য কিছু আমাদের ধারণাতেই আসেনি তখন। শুধু একটি উটের উপর আটার কিছু গাঁটরি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম আমরা।'[২৭৭]

আল্লামা ইবনুল আসির এই শহরগুলির লোমহর্ষক দাস্তানে লিখেছেন—এক তাতার মহিলা একটি মুসলিম পরিবারে ঢোকে। ঘরের সবাইকে হত্যা করে চলে আসে সে। লোকজন তাকে তাতার সিপাহি ভেবে হাত ওঠাবার হিম্মত করেনি। কিন্তু হত্যাকাণ্ড থেকে ফারেগ হয়ে মহিলাটি যখন হাতের অস্ত্র ফেলে দিল, এক পুরুষ তাকে চিনে ফেলল যে, সে মহিলা। তারপর লোকটি তাকে ধরে হত্যা করে ফেলল।

আরও লিখেছেন, 'একাকী এক তাতার সিপাহি একটি গলির ভেতর ঢোকে। সেই গলিতে ছিল শ-খানেক লোক। তাতার-সেনাটি একে-একে সবাইকে হত্যা করে চলে গেল। শত লোকের একজনও বাঁচতে পারেনি সেদিন। আশ্চর্য, তাদের কারুরই হিম্মত হয়নি এই সিপাহির উপর হাত তোলার।'[২৭৮]

গভীর দৃষ্টিতে এ সমস্ত বিষয় পর্যবেক্ষণ করে মুসলিমবিশ্বের অনন্য চিন্তক মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদবি লিখেছেন—মুসলিমবিশ্বের জন্য

---

[২৭৬] তারিখে কাবির লিয-যাহাবি ৬২/৬১৭

[২৭৭] তারিখে কাবির লিয-যাহাবি ৬২/৬১৭

[২৭৮] ইবনুল আসির ৭/৫৮২

তাতার-আগ্রাসন ছিল এক মহাবিপর্যয়। এই বিপর্যয়ে ইসলামিবিশ্বের কঠিন অস্তিত্বসংকট দেখা দিয়েছিল। সন্ত্রস্ত ছিল মুসলমান। আতঙ্কে ও হতাশায় ছেয়ে গিয়েছিল এক সীমান্ত থেকে অন্য সীমান্ত পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল।

তাতারদেরকে নিরঙ্কুশভাবে অপ্রতিরোধ্য এবং অপ্রতিহত ভাবা হতো, যেন কোনোভাবেই তাদের মোকাবেলা করে ওঠা সম্ভব না। তাতাররাও যে পরাজিত হতে পারে, কারুর যুক্তিতেই সেটা ধরত না। এমনকি প্রবাদবাক্য হিসেবে এ কথা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল : কেউ যদি বলে তাতাররা পরাজিত হয়েছে, একদম বিশ্বাস করবে না।[২৭৯]

ইউরোপ-রাশিয়ায় তাতারদের অগ্রযাত্রা

তাতার হামলার তখন দ্বিতীয় বছর পড়েছে। পশ্চিমা তাতার-বাহিনী উত্তরে এগিয়ে গেছে অনেক দূর।

তাতার-সেনারা কাসপিয়ান সাগরের উত্তরদিকের লবণাক্ত ময়দানগুলোতে গিয়ে পৌঁছল। সেখানকার লান ও কিপচাক গোত্রগুলিকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দিল তারা। তারপর দ্রুতবেগে অগ্রসর হতে লাগল রাশিয়া-অভিমুখে। একবার তারা রুশ বাদশাহ ও কিপচাকদের ঐক্যবদ্ধ শক্তির মুখে পিছু হটতেও বাধ্য হয়েছিল। তবে এ ছিল মূলত তাদের যুদ্ধের একটা চাল। ৯ দিন পর্যন্ত তারা শুধু পেছনেই হটে আসছিল। অবশেষে উপযুক্ত সময়ে এসে আচমকা ঘুরে দাঁড়াল। প্রচণ্ড শক্তিতে আক্রমণোদ্যত হয়ে উঠল শত্রুপক্ষের উপর; এবং রাশিয়ান সেনাবাহিনীকে মুহূর্তেই বিক্ষিপ্ত করে ফেলল।

তারপর গোবি মরুভূমির এই আওয়ারা হায়নাগুলো ঢুকে পড়েছিল জেনেভায়। সেখানে হত্যাকাণ্ড চালাবার পর তারা ওলগা-নদীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। নদী-তীরে পৌঁছে দেখল—সেখানে বাস করে একটি বুলগেরিয়ান জনগোষ্ঠী। রক্তখেকো তাতাররা তাদেরও হত্যা করল।

এর মধ্যেই একদিন মারা গেল সেনা কমান্ডার জুবি নৈয়ান। কিন্তু সুবেদাইয়ের রক্তনেশা তবু কমল না। ন্যাপিয়ার নদী পেরিয়ে মস্কো ও ইউরোপের অন্যান্য সাম্রাজ্য-জয়ের প্রস্তুতি নিতে শুরু করল সে।[২৮০] ইউরোপিয়ানরা তাতার-জাতির ধারালো তলোয়ার দেখে ভয়ে কাঁপতে লাগল। চোখের সামনে তারা দেখতে লাগল মৃত্যুর ভয়ানক তাণ্ডব।

---

[২৭৯] তারিখে দাওয়াত ওয়া আজিমাত ১/৩১৫

[২৮০] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১৬, পৃষ্ঠা ১২৪-১২৫

দারুল মদিনা মাদরাসা ও মসজিদ
স্থাপিতঃ ২০২০ইং

দ্বাদশ অধ্যায়

বিদায় হে পৃথিবীর মেহফিল

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِیْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّه مُلَاقِیْكُمْ

আপনি বলে দিন—তোমরা যে-মৃত্যু থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছ, তা এসে তোমাদের পাকড়াও করবেই।[২৮১]

মৃত্যুর পদধ্বনি

কাসপিয়ান সাগরের সেই সুনসান উপত্যকায় শাহজাদা জালালুদ্দীন খুব অস্থিরতায় দিন কাটাচ্ছিলেন। বহির্জগতের সাথে উপত্যকার কোনো যোগাযোগই ছিল না। মাঝেমধ্যে উদাস-উদাস চেহারায় একা একা বসে থাকতেন তিনি। ভাবতেন—কী হচ্ছে এখন বাইরে? আমাদের আমজনতার কী অবস্থা? শাহজাদা রোকনুদ্দীনের প্রতিরোধযুদ্ধ কি বহাল আছে এখনও? গিয়াসুদ্দীনেরই-বা কী অবস্থা? তাতার-বাহিনীর বিরামহীন অগ্রযাত্রা কি থেমে গেছে, নাকি যেতে-যেতে হিন্দুস্থান সীমান্তেও বিজয়-পতাকা উড়িয়ে ছেড়েছে তারা? বুড়ি দাদি তুর্কান খাতুন ও খানদানের অন্যান্য নারীর ইজ্জত-সম্ভ্রম মাহফুজ আছে তো? আমার লক্ষ লক্ষ মুসলিম মা-বোনের কেমনতরো পরিণতি আজ?

এইসব ভাবতে ভাবতে বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে উঠত তার চোখ। এ ধরনের অসংখ্য প্রশ্নবাণে হরদম জর্জরিত হতে থাকতেন তিনি। মাস-দুমাসের ভেতর হাজারও বিপৎসঙ্কুল পথ মাড়িয়ে বিশ্বস্ত কোনো সরকারি কর্মকর্তা এসে উপত্যকায় উঠত। সঙ্গে নিয়ে আসত ভয়মিশ্রিত দু-চারটে নতুন সংবাদ। প্রত্যেকটি সংবাদ বাড়িয়ে তুলত উপত্যকায় আশ্রয়গ্রহণকারীদের অস্থিরতা। অবশ্য এই মাধ্যম ব্যতীত অন্য কোনো পন্থায় বাইরের খবর তাদের মিলতও না।

রোগে-শোকে জর্জরিত আলাউদ্দীন খাওয়ারিজম শাহ জীবনের শেষমুহূর্তগুলো পার করছিলেন তখন। শরীরে বাসা বেঁধেছিল একসঙ্গে কয়েকটি রোগ। স্বদেশভূমির স্মরণে সারাক্ষণ তিনি তড়পাতেন। বারবার এই কবিতাটি আওড়াতেন :

مردم چوں کار خویش سر گشتہ شود

بہ زاں نبود کہ بر سر رشتہ شود

মানুষ যখন আপন কাজে খেই হারিয়ে ফেলে
গোড়ার দিকে ফেরাই শ্রেয় সকলকিছু ফেলে।

---

[২৮১] সুরা জুমআ, আয়াত ৮

জালালুদ্দীন ও বাকিসব সেবায়েতকে অসহিষ্ণু গলায় বারবার বলে উঠতেন—'চলো, শিগগির আমাকে খাওয়ারিজমে নিয়ে চলো! আমি সেই সেখানে ফিরে যেতে চাই, যেখানে আমার রাজত্বের সূত্রপাত ঘটেছিল!'

কিন্তু তার নিজের দেহেই তখন সক্ষমতা ছিল না সফর করবার। মাঝেমধ্যে যাতায়াতকারীদের মাধ্যমে, রাজধানীতে যে আমিরগণ রয়েছে, তাদের কাছে অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ অনেক পয়গাম পাঠিয়ে দিতেন। বলতেন—তোমরা গিয়ে আমিরদের বলবে, আক্রমণকারী তাতাররা কোনো সাধারণ বাহিনী নয়। তাদের সাথে সন্ধি করে নাও, নাহয় আনুগত্য স্বীকার করে প্রাণ বাঁচাও।

খাওয়ারিজম শাহের অবস্থা অবনতির দিকে যেতে লাগল দিন-দিন। এর মধ্যেই একদিন তার ভেতরে শক্ত এক প্রলয়কাণ্ড ঘটে গেল। সংবাদ পেলেন—প্রিয় মা, বেগম ও শাহজাদিরা দুশমনের খাঁচায় আবদ্ধ হয়ে গেছে।

সংবাদটা যেন আকাশ ফুঁড়ে ভয়ংকর যমদূতের মতো নেমে এল তার সামনে। প্রবল দুশ্চিন্তা ও সীমাহীন অস্থিরতায় আক্ষরিক অর্থেই ঝলসে গেল তার সমস্ত হৃদয়। দুঃখতাপে ভেতরটা পচে-গলে যেন একটা বিক্ষত রক্তপিণ্ডে পরিণত হল। অনুভূতিহীন নিশ্চলভাবে তিনি পড়ে রইলেন বিছানায়।

খাওয়ারিজম শাহের জীবনসন্ধ্যা তখন ঘনিয়ে এসেছিল। জালালুদ্দীন ও অন্য শাহজাদারা, সাম্রাজ্যের বিশেষ কিছু লোক ও সেবায়েত, সারাক্ষণ তার মাথার কাছে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতেন। মাস কয়েক আগেও দূরপাল্লার সফরে বালুঝড় উড়িয়ে যিনি ঘোড়া ছোটাতেন, আজ মৃত্যুর কালো হাত তার টুঁটি চেপে ধরতে এসেছে।

এতকিছু হয়ে যাবার পরও ফয়সালা দেবার মতো তার যথেষ্ট বোধশক্তি ছিল তখনও। মৃত্যুর সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ থেকেও শেষদিকে এসে তিনি খুব ভালো একটি সিদ্ধান্ত দিলেন। এটাকে বলা যায় জড়পিণ্ডে বয়ে যাওয়া এক চেতনাস্রোত। যদিও বেলা তখন অনেক গড়িয়ে গেছে। হয়তো এটাই ছিল তার জীবনের সর্বশেষ নেক আমল কিংবা বহুদিনের গাফলতি মুছবার সামান্য প্রচেষ্টা।

তিনি কুতুবুদ্দীনকে বরখাস্ত করে শাহজাদা জালালুদ্দীনকে নিজের স্থলাভিষিক্ত ঘোষণা করলেন। কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বললেন—দেখো, পুরো সাম্রাজ্য আজ ভেঙে পড়েছে। সাম্রাজ্যের নড়বড়ে দেয়াল হয়ে পড়েছে ভূলুণ্ঠিত। দুশমনের পাল্লা এখন অনেক ভারী। ওরা আমাদের মুলুকে এসে কর্তৃত্ব করছে। আমাদের গ্রীবায় বসিয়ে দিয়েছে বিষদাঁত। এইবার আমার একমাত্র পুত্র মুনকাবিরাতিই পারবে প্রতিশোধ নিতে। ওকেই আমার স্থলাভিষিক্ত ঘোষণা করছি।

তারপর কুতুবুদ্দীন ও আক সুলতানের দিকে তাকিয়ে বললেন—জালালুদ্দীনের পূর্ণ আনুগত্য ও তাঁবেদারি করা তোমাদের দায়িত্ব।

বলেই তিনি শাহি তরবারিটা হাতে নিলেন। জালালুদ্দীনকে কাছে ডেকে কাঁপা-কাঁপা হাতে তার কোমরে সেটা বেঁধে দিলেন। এই তরবারি ছিল মুনকাবিরাতির শাহি স্থলাভিষিক্ততার নিদর্শন।

সিদ্ধান্তের তিনদিনের মাথায় মৃত্যুবরণ করেন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহ। জীবনের প্রথমদিকে এক শানদার অধ্যায় পেরিয়ে, শেষদিকে হাজারও অপমানকর দৃশ্য দেখে চিরদিনের জন্য আলোকহীন হয়ে গেল তার চোখ। শেষদশা এমন হল—জন্মভূমির দু-গজ মাটিও তার কপালে জুটল না; এমনকি জুটল না কাফনের কাপড়ও। তার গায়ের জামা ও গোসল প্রদানকারী খাদেমের পাগড়ি দিয়ে তাকে দাফন করা হল। গোসল ও দাফন-কাফনের কাজ আঞ্জাম দিল খাদেম শামসুদ্দীন মাহমুদ ও মুকাররাবুদ্দীন।

সুলতান আলাউদ্দীনের মৃত্যু : ইবনুল আসিরের মূল্যায়ন

সুলতান আলাউদ্দীনের মৃত্যু ছিল পুরো মুসলিমবিশ্বের জন্যই এক শোকাবহ ঘটনা। আত্মগোপনের পর সহচরবৃন্দ তার যাবতীয় খবর নির্দিষ্ট একটা সময় পর্যন্ত গোপন রেখেছিল। মৃত্যুর কিছুকাল পরেও জানা যায়নি তার প্রকৃত অবস্থা। নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ায় মুসলিমবিশ্বের বিশাল এক অঞ্চল শাসকশূন্য হয়ে পড়েছিল। ফলে কাফেররা নির্বিঘ্নে-নির্বিচারে মুসলিমদের রক্ত ঝরিয়েছে। আজও এই ঘটনা প্রত্যেক হৃদয়বান মুসলিমের মনের দেয়ালে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্তক্ষরণ ঘটায়।

আল্লামা ইবনুল আসির ভেতরের সমস্ত আকুতি ঢেলে লিখেছিলেন—খাওয়ারিজম শাহ এমনভাবে গায়েব হয়ে গেছেন যে, কোনো খবরই মিলছে না তার। মুসলিমদের জন্য এটি বড় শোকাকুল ঘটনা। কখনও শোনা যাচ্ছে—হামাদানের নিকটবর্তী একটি এলাকায় মারা গেছেন তিনি এবং তার মৃত্যুর সংবাদ গোপন রাখা হয়েছে। কখনও বলতে শুনছি—পারস্য এলাকায় পৌঁছে সেখানেই কোথাও মৃত্যুবরণ করেছেন। পিছু-পিছু তাতাররা ওখানে চলে যেতে পারে ভয়ে মৃত্যুর ব্যাপারটা গোপন রাখা হয়েছে। কেউ তো বলছে—তিনি তাবারিস্তানের (কাসপিয়ান) দিকে গিয়েছিলেন। সমুদ্রসফরে কোনো উপত্যকায় গিয়ে হারিয়ে গেছেন। তারপর আর খোঁজ মেলেনি।

যা হোক, এটা নিশ্চিত যে তিনি মারা গেছেন। পরবর্তীতে কাসপিয়ান সাগরের মৃত্যুসংবাদটাই সঠিক হল। তার মৃত্যু মূলত একটি বিরাট ঘটনা। খোরাসান ও ইরাকের মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলো এখন খোলামেলা পড়ে আছে। প্রতিরক্ষাকারী এমন কোনো শাসক নেই যে, তিনি প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন। দুশমন নির্বিবাদে শহরগুলোতে ঢুকে যা-কিছু নেবার লুট করে নিচ্ছে। ফেলনা জিনিস ফেলে যাচ্ছে। কোনো শহরের ভেতর দিয়ে যাওয়া-আসার কালে এরা প্রতিবারই সেটিকে বিরানভূমিতে পরিণত করে। লুটপাট করে শেষে ধ্বংসশালা বানিয়ে ছাড়ে।

সুলতান আলাউদ্দীনের বিস্ময়কর জীবনচিত্র

সুলতান আলাউদ্দীনের পুরো জীবনোপাখ্যান পর্যবেক্ষণ করে উঠলে বিস্ময়কর এক বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয় আমাদের। খাওয়ারিজমের সিংহাসনে ২১ বছর পর্যন্ত রাজত্ব করেছেন যে মহান বাদশাহ, তার পুরো দাস্তানে হায়াত, বিরামহীন অগ্রযাত্রা ও শেষকালে অধঃপতনের এক করুণ অধ্যায় আমাদের দেখে উঠতে হয়।

প্রথম দিকে তাকে এক দুর্ধর্ষ বাহাদুর, উন্নত সাহসী, অসামান্য সহনশীল ও সুদক্ষ সেনাপতি হিসেবেই দেখতে পাই। অন্যদিকে পতনকালে দেখতে পাওয়া যায় একজন হীনম্মন্য, কাপুরুষ শাসকের বেদনাপূর্ণ ছবি।

তার জীবনচরিতের এই প্রলয়ঙ্করী পরিবর্তন বিপুল বিস্ময়ের জন্ম দিলেও, কেয়ামত পর্যন্ত সবার জন্যই তা এক শিক্ষণীয় অধ্যায় হয়ে থাকবে।

প্রথম যুগে তিনি সর্বদা তলোয়ার হাতে ঘোড়ার পিঠে অতিক্রম করতেন সুদীর্ঘ দূরত্বের পথ। নিজ সেনাবাহিনীর এমনভাবে খেদমত করতেন—মনে হতো সাধারণ একজন সিপাহিমাত্র তিনি। সহচরদের খেদমতও করতেন। সহচরদের বিশ্রামের সময় তাদের শিয়রের কাছে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিতেন।

শত্রু-এলাকায় ঢুকে পুরো রাজ্য ঘুরেফিরে গোয়েন্দাগিরি করে চলে আসতেন। দুইবার গ্রেফতারও হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যবশত জীবিতই ফিরে আসতে পেরেছিলেন।

একবার তিন সঙ্গীর সাথে বেশ বদল করে তিনি তুর্কানেখাতার এলাকায় ঢুকে পড়েছিলেন—যাতে স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন তাদের যাবতীয় অবস্থা। দুশমন তখন অপরিচিত লোক ভেবে তাদের গ্রেফতার করে ফেলে। এলাকায় প্রবেশের আসল কারণ কী—তা জানার জন্য তাদের উপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকে।

খাওয়ারিজম শাহের দুই সাথিকে এই জেরার ভেতরেই তারা হত্যা করে ফেলে। তবু তারা মুখ খোলেনি। তুর্কানেখাতারা স্বয়ং খাওয়ারিজম শাহ ও তার তৃতীয় সঙ্গীটিকেও দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলেছিল। সৌভাগ্যক্রমে, সুযোগ পেয়ে একরাতে চালাকি করে দুজন পালাতে এবং নিরাপদে সাম্রাজ্যে ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। খাওয়ারিজম শাহের গ্রেফতারির দ্বিতীয় ঘটনাটি এ গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে পড়ে এসেছেন।

এক বণিকের মুখে শাহের প্রশংসা : মুসলিমবিশ্বে তার অবস্থান

সিরিয়ার শাসকরা যখন আলাউদ্দীন মুহাম্মদের বিজয়ের গন্ধ পেয়েছিলেন, তাদের রাতের ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছিল। সে-সময় খাওয়ারিজম শাহ সম্পর্কে মালিক আজ-জাহের গাজির জিজ্ঞাসার উত্তরে বাগদাদের এক বণিক তার সামনে সুলতান আলাউদ্দীনের গুণাবলি এভাবে বর্ণনা করেছিল—'তিনি (খাওয়ারিজম শাহ) লাগাতার চার দিন ঘোড়ার পিঠে থাকতে পারেন। একবারও নিচে অবতরণ করেন

না। সওয়ারি ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে গেলে সেটি বাদ দিয়ে আরেকটিতে আরোহণ করেন। ওরকম কষ্টকর পরিশ্রমে ঘোড়াগুলিকেও তিনি অভ্যস্ত করে তুলেছেন। তিনি শহরের পর শহর জয় করে সামনে এগোতে থাকেন। কখনও কোনো কাঙ্ক্ষিত শহরে অল্পকিছু সাথি-সঙ্গী নিয়ে নিজেই পৌঁছে যান। হামলা করে বসেন আচমকা। সকালবেলা পেছন থেকে ১০ হাজার এবং সন্ধ্যায় ২০ হাজার সহযোগী সিপাহি তার কাছে পৌঁছে যায়। কখনও, সহযোগীরা পৌঁছার পূর্বেই অল্পকজনকে নিয়েই শহর জয় করে ফেলেন তিনি।

কোনোবার রণাঙ্গনে এক বাহিনী প্রেরণের পরপর পাঠিয়ে দেন দ্বিতীয় বাহিনী। একদম শেষের দিকে ধীরে-সুস্থে নিজে যখন পৌঁছেন, দেখেন, প্রথম বাহিনীই সব কাজ চুকিয়ে ফেলেছে।

হঠাৎ কখনও শয়ের কম সৈন্য নিয়েও তিনি অতর্কিতভাবে হামলা করে বসেন। ছিনিয়ে নেন বিজয়। কবজাকৃত শহরের হাকিমকে কখনও হত্যা করেন, নাহয় জেলের ভেতর পোরেন। এতে শত্রুপক্ষের ঐক্যবদ্ধ জনশক্তিতে বড়সড় ফাটল ধরে যায়। তিনি খুবই সাদাসিধে মানুষ। তার ঘোড়ার জিন-লাগামের মূল্য এক দিনার পরিমাণও নয়। পোশাকের মূল্য দুই দিনারের চেয়েও কম।

একবার এক অভিযানে যাওয়ার সময় রাত্রি খুব গভীর হয়ে গিয়েছিল। শেষপ্রহর তখন। সাথিদের তিনি থামালেন। সাথি ছিল ৭০জন। সবাই অশ্বারোহী। সকলকে খানিক ঘুমিয়ে নিতে বললেন তিনি। নিজে জেগে থেকে ঘোড়াগুলিকে হাঁকিয়ে নিয়ে গেলেন একটি কুয়ার পারে। সেখান থেকে পানি উঠিয়ে তাদের পান করালেন।

কুয়ার কাছ থেকে ফেরার পর যখন মনে হল—সিপাহিরা তৃপ্তিমতো ঘুমিয়ে নিয়েছে, কয়েকজনকে তখন জাগালেন। তাদেরকে পাহারায় নিয়োজিত করে নিজে একটু ঘুমিয়ে নিতে শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে সোজা উঠে বসলেন, সঙ্গীরাও উঠে দাঁড়িয়ে গেল। ঘুমের মধ্যেও তাদের ভেতর কাজ করছিল যুদ্ধের একটা তাড়া। এজন্য হঠাৎ করেই ধড়মড়িয়ে সবাই উঠে দাঁড়ালেন। রাতের প্রগাঢ় অন্ধকারে সবাইকে তখন ভূতের মতো লাগছিল। তারপর তারা আক্রমণে গেলেন। শহর দখলে নিয়ে হাকিমকে হত্যা করলেন।

প্রথমকালের গল্প

উন্নতির কালে কেমন দাপুটে অবস্থান ছিল আলাউদ্দীনের, শুনুন এক পশ্চিমা ইতিহাসবিদের জবানিতে। হ্যারল্ড ল্যাম্ব লিখেছেন—'সে-সময় পুরো মুসলিমবিশ্বে সুলতান আলাউদ্দীন খাওয়ারিজম শাহ ছিলেন অন্যতম প্রধান সেনানায়ক। হিন্দুস্থান থেকে বাগদাদ পর্যন্ত, অরাল সাগর থেকে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তার সাম্রাজ্য। সেলজুকি তুর্কি ও মিশরের মামলুক সুলতানগণ ব্যতীত, ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যেসব মুসলিম সাম্রাজ্য জয়লাভ করেছিল এবং রোজ রোজ উন্নতির শিখরে

আরোহণ করছিল, তাদের সবার উপর কর্তৃত্ব ছিল সুলতান আলাউদ্দীন মুহাম্মদের। তার প্রতি আব্বাসি খলিফা নাসির বিরূপ মনোভাব পোষণ করলেও ভেতরে-ভেতরে ঠিকই তার শক্তিমত্তাকে স্বীকার করতেন।'

ঐতিহাসিক আবুল ফিদার বক্তব্য—'পৃথিবীর সব শাহি খানদানের লোকজন দিয়ে ভর্তি থাকত খাওয়ারিজম শাহের আস্তানা। যারা সারাক্ষণ তার আশপাশে লেগে থাকত, যাদের নিয়ে তিনি একপাত্রে খেতে বসতেন, তারা এবং তার অস্ত্রধারী ও ঘোড়ার রেকাবধারী সবাই ছিল বিভিন্ন শাহি খানদানের। তার দস্তরখান ছিল খুবই প্রশস্ত।'

শিহাবুদ্দীন নাসাবি বলেন—নামাজের প্রাক্কালে খাওয়ারিজম শাহের দহলিজে এক বিরাট শিঙ্গা বাজানো হতো। পূর্ববর্তী রাজা-বাদশাহদের থেকে এই রুসুম পেয়েছিলেন তিনি। তারপর একসময় দহলিজে শিঙ্গা বাজানোর এই রুসম বন্ধ করে দিয়ে সেটি জারি করে দিলেন শাহাজাদাদের জন্য, যারা তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে বিভিন্ন প্রদেশ শাসন করছিল। ফলে শাহজাদাদের দহলিজে এই রুসুম পালন হতে লাগল।

আর নিজের জন্য জারি করলেন 'নওবতে সিকান্দারি'। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় তা বাজানো হতো। নওবতে সিকান্দারি হল—বড় বড় ২৭টি স্বর্ণনির্মিত শিঙ্গা। সেগুলোর সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল অনেক দামি জহরত।

এই সংস্কৃতির উদ্বোধনের দিন, ২৭জন বাদশাহ অথবা শাহজাদাকে প্রাঙ্গণে উপস্থিত করে, তাদের সামনে সেগুলো বাজানো হয়েছিল। যাতে বিষয়টা ব্যাপকভাবে চর্চিত হয় মানুষের মুখে মুখে। যাদের উপস্থিত করা হয়েছিল—তাদের মধ্যে তুগরুল বিন আরসালান সেলজুকি, সুলতান গিয়াসুদ্দীন ঘুরির সন্তান, বামিয়ানের শাসক মালিক আলাউদ্দীন, বলখের শাসক মালিক তাজুদ্দীন এবং তার পুত্র তিরমিজের শাসক মালিক আজম ও বোখারার শাসক মালিক সানজারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সুলতান আলাউদ্দীনের বাহিনী, ঘাঁটি ও তাঁবু খুবই শানদার হতো। তবে নিজে ছিলেন নিতান্ত সাদাসিধে মানুষ। শায়েখ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দি তার সঙ্গে সাক্ষাতের গল্পটা বলেছিলেন এভাবে—'তিনি সাদাটে একটা সিংহাসনে বসে ছিলেন। পরনে ছিল বোখারার কোর্তা। সেই কোর্তার দাম পাঁচ দিরহামের চেয়ে বেশি ছিল না। মাথায় বসানো পাগড়ির মতো চামড়ার একটা কাপড় মৃদু-মৃদু দুলছিল। এর মূল্য বোধকরি এক দিরহাম হবে।'

মরেও তোমার মেলেনি খানিক স্বস্তি

খাওয়ারিজম শাহের শান-শওকত এবং উন্নত মর্যাদার পাশাপাশি, তার কেমন দুঃখজনক পরিণতি হয়েছিল—এতক্ষণ ধরে তো আমরা তা-ই দেখে এসেছি।

কিন্তু চূড়ান্ত পরিণতিটা ঘটেছিল মরবার পর। আহ, তার মরদেহটা পর্যন্ত একটুখানি স্থিরতা পায়নি। স্থলাভিষিক্ত জালালুদ্দীন খুব দ্রুত তখত সামলে নিয়ে

কয়েকজন আমিরকে কাসপিয়ান সাগরের সেই আবসুকুন উপত্যকায় পাঠালেন; যাতে তারা এই গহীন বিরানভূমি থেকে সসম্ভ্রমে উঠিয়ে নিয়ে আসে পিতাজির লাশ। লাশ আনার পর রায় নগরী থেকে ৪৮ মাইল দূরে আর্ধান দুর্গের ভেতর অস্থায়ীভাবে শাহকে দাফন করা হয়।

পরবর্তীতে ইস্পাহানে শানদার এক কবর নির্মাণ করে সেখানে লাশ স্থানান্তর করবেন—জালালুদ্দীনের ছিল এমনই পরিকল্পনা। কিন্তু সত্য বলতে কি, সেই অচেনা-নির্জন উপত্যকাতেই বহাল রাখা উচিত ছিল খাওয়ারিজম শাহের কবর। কারণ, ক-বছর পরে তাতাররা আর্ধান দুর্গও কবজা করে ফেলেছিল। তখন, ওখানে দুশমনের কবর রয়েছে জেনে মাটি খুঁড়ে বের করে এনেছিল খাওয়ারিজম শাহের অবশিষ্ট হাড়গোড়। এই হাড়গুলি তারা চেঙ্গিজ খানের স্থলাভিষিক্ত উকতাই খানের দরবারে পাঠিয়ে দিয়েছিল। উকতাই ক্রোধান্বিত হয়ে শাহের মৃত্যু-পরবর্তী এই হাড্ডিগুলো আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছিল। বাতাসে উড়িয়ে দিয়েছিল হাড্ডি-পোড়ানো ছাই।

ধর্মের প্রতি অনুরাগ

ইবনুল আসির খাওয়ারিজম শাহের জীবনকথায় লিখেছেন—তিনি উঁচুমানের আলেম ছিলেন। ফিকহ, উসুলে ফিকহ ও অন্যান্য ইলমে খুব পারদর্শী ছিলেন। আলেমদের শ্রদ্ধা করতেন। তাদের সাথে মহব্বত রাখতেন, এহসান করতেন তাদের উপর। তাদের ইলমি আলোচনায় হাজির হতেন। তিনি কষ্টসাধ্য কাজে, বিরামহীন সফরে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। সব রকমের বিলাসিতা এড়িয়ে চলতেন। প্রবৃত্তি পাত্তা পেত না তার কাছে। তার সমস্ত ধ্যান-ভাবনা আবর্তিত হতো সাম্রাজ্যের পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রজাদের সুরক্ষাকে ঘিরে। দীনদার মানুষদের খুব সম্মান করতেন। তাদের ফয়েজ ও বরকত হাসিলে খুব আগ্রহী ছিলেন।

ইবনুল আসির আরও লেখেন—একবার রওজায়ে নববির এক খাদেম আমাকে একটি গল্প শুনিয়েছিলেন। তিনি বলেন—একদা আমি খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যে গিয়েছিলাম। শহরে পৌঁছে খানিকক্ষণ অবস্থান করলাম। তারপর গোসল করে একটু ভালোভাবে প্রস্তুত হয়ে খাওয়ারিজম শাহের দরবারে গিয়ে হাজির হই। আমাকে দেখে এক লোক জিজ্ঞেস করল—তুমি কি কোনো প্রয়োজনে এসেছ?

বললাম—আমি রওজায়ে নববির একজন খাদেম।

এটুকু শুনেই ওই কর্মচারী আমাকে বসিয়ে রেখে তড়িঘড়ি ভেতরে ছুটল। খানিক পরে ফিরে এসে শাহি মহলের ভেতর নিয়ে গেল। সুলতানের এক সেবায়েত আমাকে সালাম দিয়ে বলল—সুলতানকে আপনার সংবাদ জানানো হয়েছে। তিনি আপনাকে ডেকেছেন।

আমি সুলতানের প্রশস্ত দরবারে ঢুকতেই দেখি—তিনি প্রাঙ্গণে রয়েছেন। আমাকে দেখেই অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন এবং দ্রুত আমার দিকে এগোতে থাকলেন। তা দেখে আমার পা দুটোও চঞ্চল হয়ে ওঠে। ত্রস্তপায়ে এগোতে থাকি

আমিও। প্রাঙ্গণের মাঝামাঝি যেতেই পরস্পরের হাত ধরাধরি হয়। তার হাতে চুমু খেতে চেষ্টা করি আমি। বাধা দিয়ে সুলতান আমাকে গলার সঙ্গে লাগিয়ে নিলেন। হাত ধরে একরকম টেনে নিয়ে সিংহাসনের একপাশে তার সঙ্গে বসালেন। আবেগমথিত কণ্ঠে বলতে লাগলেন—তুমি রওজায়ে নববির খেদমত করো?

'জি হ্যাঁ' বললাম আমি। সঙ্গে-সঙ্গে আমার দু-হাতের তালু টেনে নিয়ে সুলতান তার পুরো চেহারায় ছোঁয়ালেন। তারপর অনেকক্ষণ ধরে আমার সঙ্গে আলাপে মশগুল রইলেন। আমাদের কী অবস্থা, জীবনাচার কেমন, মদিনা শহরের অবস্থা কী, এক এক করে জিজ্ঞেস করলেন অনেক কথা।

যখন ফিরে আসব, সুলতান বলে উঠলেন—এই মুহূর্তে যদি সফরের ঝামেলা না-থাকত আমার, এত জলদি তোমাকে যেতে দিতাম না। আমরা জাইহুন পেরিয়ে তুর্কানেখাতার বিরুদ্ধে জিহাদের দৃঢ় সংকল্প করেছি। সফরের প্রারম্ভেই রওজাতুর রাসুলের খাদেমের সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে। নিশ্চয় এটি আমাদের সফরের সফলতার আগাম প্রমাণ। তারপর তিনি খুব বেশি-পরিমাণ রাহাখরচ দিয়ে আমাকে বিদায় দিয়েছিলেন।

আল্লামা ইবনুল আসির লেখেন—'এতকিছু বলার উদ্দেশ্য একটাই, তার ভেতর সব রকম মহৎ গুণের সন্নিবেশ ঘটেছিল। অথচ অন্য মুসলিম শাসকদের মধ্যে সেসবের দুয়েকটা মাত্র পাওয়া যেত। আমি যদি আলাদাভাবে শুধু তার মহৎ কাজেরই বর্ণনা দেওয়া শুরু করতাম, অনেক দীর্ঘ হয়ে যেত আলোচনা।'

মুওয়াফফিক বাগদাদির প্রতিক্রিয়া

মুওয়াফফিক আবদুল লতিফ বাগদাদি লিখেছেন—সুলতান তাকিশের পুত্র (মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহ) ছিলেন একজন সাহসী, মেধাবী, দুর্ধর্ষ যোদ্ধা এবং সবকিছু ধ্বংসস্তূপে পরিণতকারী। তিনি লাগাতার অনেকদিন ধরে সফর করতেন বিরামহীন। সুদীর্ঘ দূরত্ব এত কম সময়ে অতিক্রম করে যেতেন যে, দুশমন তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি সময়েও তা অতিক্রমের কল্পনা পর্যন্ত করে উঠতে পারত না। অতর্কিত হামলা করে ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ কায়েম করা ছিল তার প্রিয় অভ্যাস। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীও ছিলেন। প্রথম গাদ্দারি তিনি নিজ ভাইয়ের সঙ্গেই করেছিলেন তাকে হত্যার মধ্যমে। ভাইয়ের মস্তক যখন তার সামনে উপস্থিত করা হয়েছিল, তিনি খানা খাচ্ছিলেন। তার মধ্যে যেন এতটুকু ভাবান্তর হল না।

খুব কম ঘুমুতেন, জাগতেন বেশি। মাত্রাতিরিক্ত কষ্ট-পরিশ্রম সহ্য করতে পারতেন। আরাম করতেন অল্প। সেনাবাহিনী নিয়ে অভিযানে বেরুলে সিপাহিদের খেদমত করতেন। রাত্তিরে তাদের ঘুমুতে দিয়ে জেগে জেগে পাহারা দিতেন। তার কাপড় ও ঘোড়ার আসবাবপত্রের মূল্য এক দিনার সমমানেরও ছিল না। কষ্টসাধ্য কাজকর্মে বড় সুখ পেতেন তিনি। চরম ক্লান্তির মধ্যেও একটা আরাম অনুভব করতেন। খুব বেশি গনিমত হাসিল করতেন। আর খুব তাড়াতাড়িই ভাগ করে দিতেন সেসব।

আলেমদের সঙ্গে তার ভালো ওঠাবসা ছিল। বাদশাহ হওয়ার পূর্বে ইমাম ফখরুদ্দীন রাজির শিষ্যত্ব অর্জন করেছিলেন। তিনি ইমাম রাজির খুব রেয়াত করতেন। পার্থিব দিক-বিবেচনায় অনেক প্রশস্ততা ও সুবিধা দিয়েছিলেন ইমাম রাজিকে।

এতসব গুণ থাকা সত্ত্বেও, নিজ সিদ্ধান্তের প্রতি অটলতা ও নিজের মতটাই সঠিক, এমন একটা স্থায়ী ভাবনা তাকে খারাপ করে দিয়েছিল। নিজ সিদ্ধান্তে গোঁ ধরে থেকে পরিণাম সম্পর্কে ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। দুশমনকে তুচ্ছ ভেবেছিলেন। ভুলে গিয়েছিলেন মহাকালের কর্মফলের সেই অমোঘ বাণী।

আবার দাম্ভিকতার সুরে একথাও বলতেন—'মুহাম্মদ (খাওয়ারোজম শাহ) মুহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দীনের সাহায্য (!) করছে।'

মুওয়াফফিক বাগদাদি আরও লেখেন—তিনি তিফলিস জয় করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন। তিফলিসকে রাজধানী বানিয়ে সেখানে বসে রোম, আর্মেন, কিপচাকসহ সমস্ত আরব-অনারবে রাজত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু সুচিন্তিত পদক্ষেপ নিতে না-পারায় তার সকল প্রকল্প বিগড়ে গিয়েছিল। প্রবৃত্তিপূজা করে সময়ের আগেই নিজেকে ক্ষয়ে ফেলেছিলেন। তিনি বাদশাহ সিকান্দারের মতো হতে চাইতেন। কিন্তু কোথায় সিকান্দার আর কোথায় খাওয়ারিজম শাহ?!

তার মধ্যে সিরিয়া ও মিশর দখলের লোভ জেগেছিল। এমনকি তার মনে পুরো ভূপৃষ্ঠে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার বাসনাও ছিল। বাস্তবিকপক্ষে তার জন্য সেটা মুশকিল কিছুও ছিল না। যদি সুচিন্তিত পদক্ষেপগ্রহণ, সঠিক সিদ্ধান্ত, হুঁশিয়ারি ও ইনসাফের সন্নিবেশ ঘটত তার ভেতর, মহান আল্লাহ তার সেই আশাও সহজভাবে পূরণ করে দিতেন।

খাওয়ারিজম শাহের বয়স

আগে সংক্ষেপে একটু বিশ্লেষণ প্রদান জরুরি বলে মনে করছি। ইতিহাসে খাওয়ারিজম শাহি শাসকদের জন্মতারিখের সরাসরি কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। হয়তোবা তাদের ওখানে তখন জন্মতারিখ সংরক্ষণের রেওয়াজ ছিল না। এজন্য নিশ্চিতভাবে আলাউদ্দীন খাওয়ারিজম শাহের সার্বিক বয়স আমরা জানতে পারি না। জানতে পারি না তার নামজাদা পুত্র জালালুদ্দীনের বয়সও।

তবে একটি তথ্য অবশ্য আমরা পাই যে, মৃত্যুকালে শাহকে ছুঁতে পারেনি বার্ধক্য। এই বর্ণনা বিখ্যাত সুফি বুজুর্গ শায়েখ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দির। ৬১৫ হিজরিতে দূত হিসেবে তিনি খাওয়ারিজম শাহের দরবারে গিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, 'তার কাছে যখন গিয়েছিলাম, দেখেছিলাম তখনও তিনি টগবগে যুবক।'

এই সাক্ষাতের তিন বছর পরেই খাওয়ারিজম শাহের মৃত্যু ঘটেছিল। এ থেকে বুঝতে পারি—মৃত্যুকালে সর্বোচ্চ তিনি প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হয়েছিলেন। বয়স হয়তো ৪০-৪৫ এর মতো হয়েছিল। ফলে আন্দাজ করতে পারি—পিতার মৃত্যুর সময় শাহজাদা জালালুদ্দীনের বয়স ২০-২৫ বছরের বেশি ছিল না।

অন্যান্য সাম্রাজ্য থেকে ঘুরে-আসা বাণিজ্য-কাফেলা থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতেন সুলতান আলাউদ্দীন। দূরদূরান্তের সাম্রাজ্যগুলির অবস্থা নিরীক্ষণের জন্য গুপ্তচরবৃত্তিতে ছিল তার খুব আগ্রহ। তার দরবারে আলেমগণ ছিলেন খুব শ্রদ্ধার পাত্র। বিখ্যাত সব আলেমের গমনাগমনে জমজমাট থাকত তার দরবার। নাসিরুদ্দীন মিতর রাজি (৬১০), শিহাবুদ্দীন খায়ুফি, আল্লামা সাক্কাকি, ইমাম ফখরুদ্দীন রাজির মতো জগদ্বিদিত ইলমের সব পাহাড় তার দরবারে ফয়েজ ও নুরের অনুপম ধারা বর্ষণ করতেন।

জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি তার চুম্বকটানের মতো প্রবল আগ্রহ ছিল। তার ফরমায়েশে তারই জন্য ইমাম রাজি ফারসি ভাষায় জ্যোতিষশাস্ত্রের বিধানসংক্রান্ত একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা লিখেছিলেন। নাম দিয়েছিলেন الاحكام العلائية فى الاعلام السماوية সমকালীন কবিদের সাথেও তার খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। শাহপুর নিশাপুরি, জুলফিকার শেরওয়ানি, আবু আলি ইবনে হুসাইন মারোজি, মাজদুদ্দীন মুহাম্মদ নাসাবি, কামালুদ্দীন ইসমাইলের মতো খ্যাতনামা কবিরা ছিলেন তার দরবারের শোভাবর্ধক। শাহ নিজেও মুখে মুখে কবিতা বানাতে পারতেন। নিম্নের রুবাইয়াতটি তারই রচিত :

بیند چو فلک نماند ش قوت و تاب

اندر کف مسیں تیغ چو یک قطرہ آب

যখন আকাশ আমার হাতের তলোয়ারটি এক ফোঁটা জলের মতন দেখল, শক্তি ও সংরক্ষণ-ক্ষমতা ছিল তখন অপসৃয়মাণ।

دستم چو سحاب آمدہ ویں طرفہ کہ دید

ابرے کہ بیک قطرہ جہاں کرد خراب

আমার হস্ত ঘনকৃষ্ণ মেঘপুঞ্জের মতো। সেই অদ্ভুত দৃশ্য তোমরা কে দেখেছ, পুরো পৃথিবী ধ্বংস করে দিতে পারে মেঘপুঞ্জের একটি ছোট্ট বিন্দু!

পরাজয়ের কারণসমূহ

এত পরিমাণ সামরিক সরঞ্জাম ও সৈন্যশক্তি থাকবার পরও কোনো রণাঙ্গনেই কেন তাতারদের বিরুদ্ধে খাওয়ারিজম শাহ মোকাবেলা করতে পারেননি, বিষয়টি ভেবে ইতিহাসের পাঠকমাত্র হয়রান হন। প্রশ্ন জাগে—তা হলে সেই কারণগুলো কী, যে-জন্য মুসলিমবিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী এই শাসক মাত্র কয়েক মাসও টিকতে পারেননি দুশমনের সামনে?

ইতিহাসের গ্রন্থাবলি অধ্যয়ন করে সম্ভাব্য যে-ক'টি কারণ আমরা খুঁজে পাই, নিম্নে সেগুলো প্রদত্ত হল :

১. প্রথমদিকে আলাউদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহ ভেবেছিলেন তাতাররা আমার এক দুর্বল প্রতিদ্বন্দ্বী মাত্র। কিন্তু প্রথম লড়াইয়ে যখন এই ধারণা পুরোপুরি উলটে গেল, মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল খাওয়ারিজমি বাহিনী, তখন তার সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রে ছড়িয়ে পড়ল এই আঘাতের অসহনীয় তীব্র যন্ত্রণা। নিজেকে সামলাতে পারলেন না তিনি। তারপর থেকেই দুশমনের চকচকে তরবারির ভয়ে পুরোপুরি আচ্ছন্ন থেকেছে তার মন ও মস্তিষ্ক। এই শশব্যস্ত আতঙ্কই তাকে সর্বদা তাড়া করে ফিরেছে; প্রতিটি রণক্ষেত্রে সংঘর্ষের বদলে পিছু হটতে বাধ্য করেছে।

২. খাওয়ারিজম শাহ একজন সংশয়বাদী লোক ছিলেন। প্রবল তুষারপাতের মুখে বাগদাদ অভিযান সম্পন্ন করতে যখন ব্যর্থ হলেন, প্রজাদের ভেতর ছড়াছড়ি হয়ে গেল যে, খাওয়ারিজম শাহের ভাগ্যতারকা অলক্ষুণে ঘূর্ণনের ভেতর পড়ে গেছে। এ ধরনের কথাবার্তায় সম্ভবত খাওয়ারিজম শাহ নিজেও আক্রান্ত ও প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন। কিছুদিন পরে তিনি আল্লামা সাক্কাকির মাধ্যমে কাজি মুজিরুদ্দীনকে পাঠিয়ে খলিফা নাসিরের বিরুদ্ধে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটালেন। কাজি মুজিরুদ্দীন বাগদাদ গিয়ে মাটিতে একটি পুতুল গেড়ে চলে এসেছিলেন। খাওয়ারিজম শাহের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মানো হয়েছিল যে, এই পুতুল পোঁতার মাধ্যমে নাকি ধ্বংস হয়ে যাবে খলিফা নাসির!

কিন্তু কী আশ্চর্য, বেশিদিন কাটেনি, খলিফা তো ধ্বংস হলেনই না, উলটো খাওয়ারিজমেই ছড়িয়ে পড়ল তাতার-আগ্রাসনের ত্রাস। সাধারণ মানুষজন চর্চা শুরু করে দিল—খলিফার বিরুদ্ধে আল্লামা সাক্কাকিকে দিয়ে খাওয়ারিজম শাহ যে তদবির করিয়েছিলেন, তা একদম উলটে গেছে, যার প্রভাব এখন আমাদের ভেতর প্রকাশ পেয়েছে তাতার-রূপে।

শাহ এতেও হয়তোবা খানিক প্রভাবিত হয়ে থাকবেন।

তবু, প্রথম যুদ্ধের পূর্বে বিজয়ের ব্যাপারে তিনি পুরোপুরি আশাবাদী ছিলেন। প্রথমবার পরাজিত হলে লোকজনের এসব ফালতু কথাবার্তা তার পরাভূত মননে ও মস্তিষ্কে শক্তভাবে গেঁথে যায়।

এর সঙ্গে-সঙ্গেই ঘটে আরেকটা ব্যাপার। দরবারি জ্যোতিষীরা শাহের মনোগত সংশয়কে 'নিশ্চিত সত্য' বানিয়ে তুলতে বলে—'হুজুরওয়ালার ভাগ্যতারকা ভুল কক্ষপথে চলে গেছে। কিছুকাল ওখানেই ঘোরাঘুরি করবে। সেই সময়টাতে দুশমনের মোকাবেলা থেকে আপনাকে বিরত থাকতে হবে।'

বলা চলে—জ্যোতিষীদের এরকম ফালতু কথাবার্তা শাহ আসমানি ওহীর মর্যাদায় হৃদয়ে গেঁথে নিয়েছিলেন। ফলে একের পর এক সব রণক্ষেত্রেই পিছু হটলেন তিনি। দুশমন নির্বিঘ্নে সমস্ত এলাকা যখন ভগ্নস্তূপে পরিণত করল, শাহের ধারণা আরও পোক্ত হয়ে উঠল যে, জ্যোতিষীরা আসলে ঠিকই বলেছে। আমার ভাগ্যতারকা ভুল পথে ঘুরছে।

৩. প্রজাদের যোগ্যতা দেখে তাদের থেকে বেছে বেছে কাজ নেবার কৌশল কিংবা ক্ষমতা, কোনোটাই খাওয়ারিজম শাহের মধ্যে ছিল না। সিপাহি ছিল ৩-৪ লাখ। শাহজাদা জালালুদ্দীন ও তৈমুর মালিকের মতো দুর্ধর্ষ দুই সৈনিক এই ৩-৪ লাখ সেনাশক্তি নিয়ে প্রতিটি ময়দানেই তাতারদের পরাজিত করবার যোগ্যতা রাখতেন। কিন্তু শাহ বোখারা ও সমরকন্দের মতো গুরুত্বপূর্ণ দুই যুদ্ধক্ষেত্রেও এদের কোনো কাজেই লাগালেন না।

৪. তাতারদের আগ্রাসী সয়লাব রুখতে সুদূরপ্রসারী, সূক্ষ্ম ও সুপ্রশস্ত পরিকল্পনার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হল—ভাসা-ভাসা কিছু পদক্ষেপ গ্রহণকেই খাওয়ারিজম শাহ যথেষ্ট মনে করেছিলেন।

৫. তার মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত একরোখা মনোভাব ছিল। এই কারণে পামির, বোখারা, সমরকন্দের মতো গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধগুলোতে সেনাপতিদের মূল্যবান পরামর্শ একদম তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি। কর্মসম্পাদন করেছিলেন নিজের ধারণা মোতাবেক। ফলে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। বিশেষ করে পুরো বাহিনীকে বহুধা বিভক্ত-করা ছিল তার প্রধান বুদ্ধি-বিবেচনাহীন কাজ। ফলে, প্রতিটি রণক্ষেত্রে সেটিই হয়ে ওঠে তার পরাজয়ের কারণ।
সকল ইতিহাসবিদই খাওয়ারিজম শাহের এই সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণ অবিবেচনাপ্রসূত কর্ম বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৬. খাওয়ারিজম শাহের গুপ্তচর নিয়োগের দুর্বল পদ্ধতিও তার সামরিক শক্তির ব্যর্থতার একটি বড় কারণ। এজন্যই অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি দুশমনের তৎপরতা ও অভিযান সম্পর্কে বেখবর ছিলেন। তাতারদের সামরিক শক্তি, যুদ্ধের সরঞ্জাম, পলিসি ও পরিকল্পনা সম্পর্কে যেসব তথ্য তিনি পেয়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত সেসব পূর্ণাঙ্গ ও যথেষ্ট ছিল না। সঠিকভাবে গুপ্তচর নিয়োগ ও সংবাদ লাভের শক্ত 'মাধ্যম'ই হয়ে থাকে যুদ্ধজয়ের অন্যতম কারণ। সচেতন সেনাপ্রধানরা এই তথ্যের ভিত্তিতেই তাদের যুদ্ধের প্রজ্ঞাপূর্ণ পরিকল্পনা সাজান। সুলতান আলাউদ্দীনের গুপ্তচর ও সংবাদ সরবরাহকারীদের ত্রুটিযুক্ত, অসম্পূর্ণ কর্মধারা তার সৈন্য মোতায়েনে অত্যন্ত মন্দ প্রভাব ফেলেছিল। ফলে বাহিনী-বিন্যাসে তার যে পরিকল্পনা, তা সর্বক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছিল।

৭. খাওয়ারিজম শাহের আমির-সরদারদের ভেতর গাদ্দার ছিল অত্যধিক। এটি তার ধারাবাহিক পরাজয়ের অন্যতম বড় কারণ বলা যায়। আতরারে সেনাপ্রধান কেরাছা ও সমরকন্দে বার্শমাশ খানের ঘৃণিত গাদ্দারি প্রাচীর-বেষ্টিত এই শক্তিশালী শহরগুলোর দখল-কর্ম তাতারদের জন্য সহজ করে দিয়েছিল।
ভাবা যায়? বদরুদ্দীন আমিদের মতো নিকৃষ্ট গাদ্দারও খাওয়ারিজম শাহের আস্তিনের তলে প্রতিপালিত হয়েছে! তার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র সুলতানের সেনাশক্তি রাতারাতি চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছিল।

কৈফিয়তের দায়ভার

পামির মালভূমির কাছে তাতারদের সাথে প্রথম সংঘর্ষের পর খাওয়ারিজম শাহ আর কোথাও মুখোমুখি হতে পারেননি তাদের—সে-কথা ইতিপূর্বে আপনারা পড়ে এসেছেন। এই প্রথমবারের পর সর্বক্ষেত্রে শাহের যুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়ার কারণ এই নয় যে, মুসলিমদের প্রতিরোধ-ক্ষমতা একদম খতম হয়ে গিয়েছিল। কারণ, তখনও তো অবশিষ্ট ছিল খাওয়ারিজমি সিপাহিদের একটি বড় অংশ। কিন্তু অযোগ্য নেতৃত্বের কারণে তাদের থেকে কোনো ফায়দাই ওঠাতে পারেননি শাহ। পামিরের প্রথম যুদ্ধের পর তাতাররা নির্বিঘ্নে তাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে। আতরার ও কুকন্দের মতো দু-তিনটি রণাঙ্গন ছাড়া কোথাও তাদের দু-চার দিনের বেশি অবস্থান করতে হয়নি। নির্দ্বিধায় মুসলিমদের ভেতর গণহত্যা চালিয়ে গেছে।

এই হিসেবে সাধারণ দৃষ্টিতে এটাকেই সঠিক বলে মনে হয় যে, এসব ধ্বংসযজ্ঞের দায়ভার একমাত্র সুলতান আলাউদ্দীন মুহাম্মদের; তার কাপুরুষত্ব ও হীনম্মন্যতার দরুন উম্মাহকে এই ভয়ানক দুর্দিন দেখতে হয়েছিল। কিন্তু, প্রকৃত বাস্তবতা এর চেয়েও খুব বেশি গভীর। সেটি খতিয়ে দেখা অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করি। গভীর চিন্তাভাবনা করলে মনে হবে, এই বিরাট ধ্বংসযজ্ঞে মজলুমের রক্তপাতের দায় শুধু একজনেরই নয়; বরং গাদ্দার আমির-মন্ত্রীরাও এই অপরাধে সমানভাবে যুক্ত ছিল। পার্শ্ববর্তী মুসলিম সাম্রাজ্যগুলোও তাতে জড়িত ছিল পুরোপুরি। এত ভয়ানক হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে, তবু তাদের টনক নড়েনি! মজলুমদের রক্ষা-কর্মে তাদের কেউ এগিয়ে আসেনি। বিশেষত খলিফা নাসিরকে কোনোভাবেই অপরাধ ও দায়মুক্ত ভাবা যায় না। তিনি পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানের রুহানি পিতার সমতুল্য ছিলেন বলা যায়; অথচ চেঙ্গিজ খানকে খাওয়ারিজম আক্রমণের জন্য তিনিই আহ্বান জানিয়েছিলেন আর খেলাফতের মসনদে বুঁদ হয়ে থেকে বসে-বসে সেই হত্যাযজ্ঞের তামাশা দেখছিলেন।

সেইসঙ্গে কোনোভাবেই দায়মুক্ত বলা যাবে না মুসলিম জনসাধারণকেও। তাদের বদ আমলের কারণেই তাদের উপর ফেটে পড়েছিল আল্লাহর ক্রোধ। দুনিয়ার মহব্বত, ভোগবিলাস এবং সমরনীতি, যুদ্ধকৌশল ও যুদ্ধচর্চা থেকে দিন-দিন তারা দূরে সরে গিয়েছিল বলে দ্রুতই নেমে এসেছিল ফেতনা। বাদ্যবাজনা, সুরের রাগিনী, কবিকুল ও কাব্যকলা নিয়ে মাতামাতির কারণে উদ্দীপ্ত টগবগে যুবকের দলও চেতনাগতভাবে ঝিমিয়ে পড়েছিল।

কল্পনাবিলাস ও উদাস কাব্যিকতা দিন-দিন তাদের কাপুরুষ ও বে-ফিকির করে তুলছিল। সাধারণ্যের ভেতর তলোয়ার চালনা ও তিরন্দাজির যেটুকু চর্চা অবশিষ্ট ছিল, তা ওই খেল-তামাশা ও ম্যাজিক-ভেলকি দেখানোতেই ছিল সীমাবদ্ধ। তাদের ভেতর কায়িক পরিশ্রমের কোনো বালাই ছিল না। নিতান্ত জড়বস্তুতে পরিণত

হয়েছিল মুসলমান। ফলে এমন ভয়ানক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল যে, স্রেফ একজনমাত্র তাতার এসে কাতার ধরে শত শত মুসলিমকে জবাই করে চলে যেত; কিন্তু কেউ হাত ওঠানোর সাহসটুকু পর্যন্ত করত না।

তবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই—কিছু শহরে তাতারদের বিরুদ্ধে আমজনতা ঠিকই সংঘর্ষে মেতেছিল। নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-শিশু—প্রতিরোধের জন্য সবাই বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আফসোস, তাদের এই হুঁশও এসেছিল বহু দেরিতে। হায়, তারা তো জেগে উঠতে চেয়েছিল তখন, যখন গহীন সমুদ্রের একেবারে অতলে বরফশীতল জলে হারিয়ে গেছে। তাদের প্রতিরোধ ও সংঘর্ষ অবিন্যস্তভাবে একপ্রকার জোশের সাথে সহসাই ঘটে গিয়েছিল। খানিক বাদেই অবদমিত হয়ে পড়েছিল সেই জোশ ও উদ্দীপনা।

বহু শতক আগের এ ধ্বংসকাহিনিতে আজকের বেখবর মুসলিমদের জন্য রয়েছে শিক্ষার অনেক উপকরণ। যদি উদাসীনতার শক্ত খোলস ভেঙে এখনও আমরা জেগে না-উঠি, এ-রকম ভয়ংকর প্রলয় নেমে আসা আজও কোনো সুদূরপরাহত বিষয় নয়।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে একটি কথা খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এই আগ্রাসনের কারণ হিসেবে শুধু খাওয়ারিজম শাহের রাজনৈতিক দুর্বলতাকেই দায়ী করা উচিত হবে না। কেউ তা বললে সেটা বাস্তব-বিরুদ্ধ কথা হবে।

একটি উপমা দিলে বিষয়টির আদ্যোপান্ত চমৎকারভাবে ফুটে উঠবে। ধরুন—খাওয়ারিজম শাহ হচ্ছেন এক বিরাট জাহাজের নাবিক। সেই জাহাজের যাত্রীরা জাহাজ ডোবানোর সকল কর্মযজ্ঞ নিজেরাই সম্পন্ন করেছে। ফলে ধীরে-ধীরে সকলেই ডুবে মরেছে সমুদ্রতলে।

উম্মাহ যখন সামগ্রিকভাবে অলসতা, দুর্বলতা ও পাপকাজে লিপ্ত হয়ে বেছে নেয় আত্মহননের পথ, উম্মাহর খলিফাও যদি তাদের ধ্বংসের পেছনে ইন্ধন যুগিয়ে যান, শাসকশ্রেণি থেকে অনবরত প্রকাশ পেতে থাকে ভুলের সমাহার, তা হলে তাদের হালাকত ও বরবাদির, ধ্বংস ও বিধ্বস্ততার খুব একটা দেরি থাকে না। এমনতরো সম্প্রদায়কে উদ্ধারের জন্য যাবতীয় যুদ্ধবিগ্রহ এবং প্ল্যান-পরিকল্পনাও নিষ্ফল সাব্যস্ত হয়। এজন্যই খাওয়ারিজম শাহের মতো এক সংকল্পবদ্ধ মুজাহিদও ধ্বংসকোপ থেকে জাতিকে বাঁচাতে পারেননি।

কারাকোরাম সম্পর্কিত একটি ভুল ধারণার অবসান

কিছু লেখক চেঙ্গিজ খানের রাজধানীর কথা লিখতে গিয়ে বহু জায়গায় কুহে কারাকোরাম শব্দটি ব্যবহার করেছেন। মূলত এটা একটা ভুল ধারণা। চেঙ্গিজ খানের রাজধানী ছিল গোবি মরুভূমির বালুকাময় এক বিশুষ্ক শহর। সেই শহরের নাম ছিল কারাকোরাম। কারাকোরাম শব্দের আভিধানিক অর্থ হল 'কালো ভূমি'। ওখানে

যেহেতু আদিগন্তবিস্তৃত শুধু কৃষ্ণবর্ণের বালুই ছিল, তাই এলাকার নাম হয়ে গেছিল কারাকোরাম। কুহে কারাকোরামের সাথে এই কারাকোরামের কোনোই সম্পর্ক নেই। কারাকোরাম শহরটি মোঙ্গলিয়ায় অবস্থিত ছিল। আর কুহে কারাকোরাম হচ্ছে মোঙ্গলিয়ার ঘাস-পানিবিহীন মরুভূমিগুলো হতে আরও কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরের একটি পাহাড়। এটি পাকিস্তান ও চীনের মধ্যখানে একটি ব্যবধান তৈরি করে আছে। এখানেও কালো-কালো পাথর ও কঙ্কর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। ফলে এ পাহাড়ের নামও কারাকোরাম রেখে দেওয়া হয়েছে।

চেঙ্গিজ খান সারা জীবনে একবারও হয়তো এই কুহে কারাকোরাম দেখেননি।

নাম একইরকম হওয়াতে কিছু পাকিস্তানি সাহিত্যিক—কারাকোরাম শব্দ শুনতেই যাদের মন চলে যায় কুহে কারাকোরামের দিকে—বুঝে নিয়েছেন, এখানকার এই পার্বত্য এলাকারই কোনো-এক স্থানে চেঙ্গিজ খানের দরবার প্রতিষ্ঠিত ছিল।

কেউ আবার খাওয়ারিজম ও গোবি মরুভূমির মধ্যবর্তী পর্বতশ্রেণিকেও কুহে কারাকোরাম বলেছেন; অথচ পৃথিবীর মানচিত্র দেখে মনে হয় খাওয়ারিজম ও মোঙ্গলিয়ার মধ্যবর্তী পর্বতশ্রেণি কুহে কারাকোরাম নয়। মোঙ্গলিয়ার পশ্চিমে কুহে তাঈ, কুহে তিয়ান-শিয়ান ও পৃথিবীর ছাদখ্যাত পামির মালভূমির উঁচু-উঁচু সব প্রাচীর। সেগুলো খাওয়ারিজম ও মোঙ্গলিয়ার মাঝখানে একটা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে। এই দুই সাম্রাজ্যে যাতায়াতকারী লোকজন এই পাহাড়গুলোর গিরিপথ বেয়েই চলাফেরা করত। এখানে কুহে কারাকোরাম বলে কিছু নেই। তবে তিব্বত ও কাশ্মির থেকে বলকশ লেক পর্যন্ত বিভিন্ন পাহাড় নিয়ে গড়ে উঠেছে হাজার কিলোমিটারব্যাপী দীর্ঘ পর্বতশ্রেণি। হিমালয়, কারাকোরাম, হিন্দুকুশ ও পামির—একের পর এক সবক'টি পর্বত এই সারির ভেতরেই পড়েছে।

তুর্কি, তাতারি ও মোগল

চেঙ্গিজ খানের জাতিকে অধিকাংশ ইতিহাসকার তাতার কিংবা মোগল নামে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কিছু কিছু ইতিহাসগ্রন্থে তাদের বলা হয়েছে তুর্কি। তেমনি চেঙ্গিজ খানের বংশধরদের মধ্য থেকে যে মোগল শাসকরা ভারতবর্ষ শাসন করেছিলেন, তাদেরও তুর্কিজাতি গণ্য করা হয়। অন্যদিকে হিজরি সপ্তম শতকে চেঙ্গিজ খানের সঙ্গে যেসব মুসলিম শাসকের যুদ্ধ বেধেছিল, তাদেরও তুর্কি বলা হতো। আলাউদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহ, পুত্র জালালুদ্দীন ও অধিকাংশ সেনানায়ক তুর্কিই ছিলেন।

এক্ষেত্রে ইতিহাসের পাঠকমাত্র ভেবে বসেন যে, চেঙ্গিজ খান তা হলে নৃশংসভাবে স্বগোত্রীয়দের রক্তই ঝরিয়েছেন! এটা কীভাবে সম্ভব—ভেবে ভেবে হয়রান হন। বিষয়টার প্রকৃত বাস্তবতা স্পষ্ট করে তুলতে নিম্নোক্ত আলোচনাটি যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি :

হজরত নুহ আলাইহিস সালামের পুত্র ছিল তিনজন। হাম, সাম ও ইয়াফিস। ইয়াফিসের বংশধরেরা চীনকে নিজেদের আবাসভূমি বানিয়েছিল। তাদের মধ্যে তুর্ক ইবনে ইয়াফিস নামের একজন লোক ছিল। চীন এবং পূর্ব ও পশ্চিম তুর্কিস্তানে ছড়িয়ে পড়েছিল তার সন্তানাদি। তাদের সবাইকে বলা হতো তুর্ক। কালের আবর্তনে তাদের ভেতর গড়ে ওঠে বহু কবিলা। তুর্ক সম্প্রদায় এশিয়ার যে-অঞ্চলে বাস করত, তার নাম ছিল তুর্কিস্তান। তুর্কিস্তান ছিল দুই ভাগে বিভক্ত।

ক. পূর্ব তুর্কিস্তান। বর্তমান চীনে অবস্থিত একটি এলাকা।

খ. পশ্চিম তুর্কিস্তান। এখানে মধ্য এশিয়ার হালের স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো, যেমন উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান ও কাজাখিস্তান অবস্থিত। তুর্ক গোত্রগুলি খুব দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং অল্পকালের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে। তারপর যখন কয়েক শতাব্দী কেটে গেল, পৃথক পৃথক জাতিতে পরিণত হল প্রতিটি কবিলা। তাদের জীবনাচার, শিল্প-সংস্কৃতি এমনকি মুখের ভাষাও পুরোপুরি পালটে গেল। প্রতিটি গোত্রের রক্তের ভেতরেই ছিল যুদ্ধের উন্মত্ত নেশা। এজন্য ভিন্ন ভিন্ন সরদারের অধীনে এক গোত্র অন্য গোত্রের সাথে সংঘর্ষে মেতে উঠত। পাশাপাশি তাদের মধ্যে হিজরত ও স্থানবদলের ধারাও অব্যাহত ছিল। পশ্চিম তুর্কিস্তানে আবাসস্থল গড়েছিল তুর্কিদের এক বিরাট জনসংখ্যা। কয়েকটি গোত্র চীনের পূর্বাঞ্চলে সিংকিয়াংয়ে (পূর্ব তুর্কিস্তানে) বাস করত। কিছু গোত্র বাস করছিল মোঙ্গলিয়ার মরুভূমি এলাকায়। এদের মধ্যেও গড়ে উঠল বিভিন্ন শাখা।

মোঙ্গলিয়ার দিকে যে গোত্রগুলি থাকত—মোঙ্গল, মোগল ও তাতার নামে প্রসিদ্ধ হয়ে গেল। পূর্ব তুর্কিস্তানে বসবাসকারী গোত্রগুলির মধ্যে এগওয়ার, কিপচাক, খালজ, তুর্কমান ও আরও কয়েকটি শাখা প্রকাশ পেয়েছিল। পরবর্তীকালে গড়ে-ওঠা সেলজুক, তুর্কানেখাতা, তুর্কানে গাজা ও খাওয়ারিজম শাহি খানদান এই গোত্রগুলিরই শাখা।

সারকথা দাঁড়াল—খাওয়ারিজমি মুসলমান ও মোঙ্গলিয়ান তাতারদের পূর্বপুরুষ একজনই—তুর্ক ইবনে ইয়াফিস। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এ দুই জাতিকে তুর্কি বলাটা ঠিক আছে। কিন্তু যেহেতু মাঝখানে সুদীর্ঘ হাজার বছর কেটে গিয়েছিল, স্থানিক দূরত্বও তৈরি হয়েছিল তাদের ভেতর, গড়ে উঠেছিল পৃথক পৃথক সাম্রাজ্য, আচার-ব্যবহার, সভ্যতা-সংস্কৃতিতে ভিন্নতা এসেছিল, এরা পরিণত হয়েছিল পৃথক দুটো জাতিতে, এজন্য বিশাল সেই ধ্বংসযজ্ঞ দেখে 'তুর্কিরাই পরস্পরের রক্ত ঝরিয়েছে' বলে আশ্চর্য প্রকাশের কিছু নেই।[২৮২]

---

[২৮২] সংক্ষেপিত, তারিখে ইসলাম, মাওলানা আকবর শাহ নজিবাবাদী

তুর্কিস্তান ও বর্তমান তুরস্ক

কিছু লোকের ধারণা বর্তমান গণতান্ত্রিক তুরস্কই হচ্ছে তুর্কিজাতির আসল দেশ। আবার অনেকে মনে করেন—এই গণতান্ত্রিক তুরস্কের প্রাচীন নাম তুর্কিস্তান।

দুটো ধারণাই ভুল। তুর্কিজাতির প্রকৃত বাসস্থান তুর্কিস্তান—আজকাল যেখানে সিংকিয়াং (চীন), গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান-সহ বিভিন্ন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমান তুরস্ক দেশ যেটুকু সীমানা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত, সে-সময় ওখানে ১১শ বছর পূর্ব পর্যন্ত প্রকৃত তুর্কি জাতির বসবাস ছিল না। প্রাচীনকাল থেকে সেখানে ইউরোপের রোম সাম্রাজ্যের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখানকার সকল বাসিন্দাই ছিল রোমান বংশোদ্ভূত।

বনু উমাইয়া ও বনু আব্বাসের খলিফাদের জামানায় মুসলিমদের অব্যাহত বিজয়ধারা এই পর্যন্ত এসে পৌঁছেছিল। কনস্টান্টিনোপল ব্যতীত এই পুরো এলাকাই চলে এসেছিল মুসলিমদের আয়ত্তে। সে-সময় এ এলাকা এশীয় রোম, এশিয়া মাইনর কিংবা রোমভূমি নামে পরিচিত ছিল। শায়েখ জালালুদ্দীন রুমি এই এশীয় রোমে (বর্তমানে যে-জায়গা তুরস্ক বলে খ্যাত) বাস করতেন বলেই রুমি নামে প্রসিদ্ধ হয়েছেন।

বনু আব্বাসের পতনকালে রাজ্যের অভ্যন্তরে বেড়ে গিয়েছিল তুর্কিদের প্রভাব-প্রতিপত্তি। এশীয় রোম তখন রাজ্যের অধীনস্থ একটি অঞ্চল ছিল বলে এটিও তুর্কিদের ক্ষমতার বাইরে থাকতে পারেনি। এবং তুর্কিস্তানের বিভিন্ন লোক এখানে এসে বাস করত। হিজরি পঞ্চম শতকে যখন তুর্কিদের সেলজুক খানদান এই এলাকা কবজা করে ফেলেছিল, তুর্কি সভ্যতা-সংস্কৃতি তখন এ অঞ্চলে আরও বেশি ছড়িয়ে পড়েছিল। তুর্ক থেকে আগত প্রকৃত তুর্কি বংশোদ্ভূত বাসিন্দাদের সংখ্যাও বাড়তে লাগল। এভাবে ধীরে-ধীরে একসময় তুর্কিরাই এখানকার বড় ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে। তারপর হিজরি ষষ্ঠ শতকে এসে বিভিন্ন তুর্কি গোত্র দিয়ে ভরে যায় পুরো এলাকা। শুধু সমুদ্র-উপকূলীয় এলাকায় অল্প কিছু প্রাচীন রোমান বংশোদ্ভূত লোক বসবাস করত।

হিজরি সপ্তম শতকে তুর্কিস্তানে হামলা করে তাতার-বাহিনী। ফলে তুর্কি মুহাজিরদের একটি বিরাট দল এখানে (বর্তমান তুরস্কে) চলে আসে। অতঃপর অষ্টম শতকে উসমানীয় তুর্কিরা পুরো এশিয়া মাইনর দখল করে বিশাল ইসলামি হুকুমতের গোড়াপত্তন করেন। সেটি বাড়তে বাড়তে মিশর ও সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এবং তারা ইউরোপের রোম সাম্রাজ্যের উপর প্রবল আক্রমণ চালাতে থাকে একের পর এক। উসমানীয় তুর্কিরা তাদের কবজাকৃত অঞ্চলে ইসলামকে কেন্দ্র করে গড়ে-ওঠা তুর্কি সভ্যতাকে আরও বেশি পাকাপোক্ত করে ফেলেন। এমনকি একসময় আন্দাজ করে ওঠাও দুষ্কর হয়ে পড়ে যে, একসময় এখানে রোমকদের বসবাস ছিল। তখন থেকেই এই সাম্রাজ্যকে তুর্ক সাম্রাজ্য (বর্তমান তুরস্ক) কিংবা তুর্কি বলা হতে লাগল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শিক্ষাগৃহ আরগেঞ্চ

'তাতাররা এই শহরটি পুরোপুরি ডুবিয়ে দিয়েছে।[২৮৩] চূর্ণবিচূর্ণ সব ইমারতের উপর দিয়ে ধেয়ে চলেছে পানির বিস্তার। শহরের এ-মাথা থেকে ও-মাথাজুড়ে পড়ে আছে আস্ত একটা ভগ্নস্তূপ। কোথাও কোথাও পানির উপর ভেসে আছে আধাভাঙা দালানের কোনো পিলার। ভেসে চলেছে কাঠখড়লাকড়ি। এখানকার বাসিন্দাদের একজনও বাঁচতে পারেনি। অন্যান্য শহরের কিছু লোক বেঁচে গিয়েছিল। কেউ আত্মগোপন করে, কেউ দূরে কোথাও পালিয়ে গিয়ে, আর কেউ অজস্র লাশের সারিতে মৃতের ভান করে শুয়ে থেকে প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু খাওয়ারিজমের (আরগেঞ্চের) যেসব বাসিন্দা তাতারদের ভয়ে শহরের আনাচকানাচে লুকিয়ে পড়েছিল, তাদের আমূল ডুবিয়ে দিল পানি। কিংবা কেউ মারা গেল ভাঙা প্রাসাদের নিচে চাপা পড়ে। ফলত সম্পূর্ণ বিরানভূমি হয়ে পড়ে রইল এ শহর। বলা যায়—হাজুন থেকে নিয়ে সাফা পর্যন্ত ছিল না সমব্যথী কোনো লোকের উপস্থিতি। মক্কাতেও ছিল না মধ্যরাতে মজার-মজার গল্প বলার কেউ। এইরকম কোনো ট্রাজেডি পূর্বযুগেও কখনো শোনা যায়নি, শুনে উঠিনি নিকট অতীতেও।'[২৮৪]

সুলতান জালালুদ্দীনের প্রত্যাবর্তন

সুলতান আলাউদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহকে আবসুকুন উপত্যকায় দাফন করা হয়ে গেছে। পিতার শেষকৃত্য সম্পন্ন করে সুলতান জালালুদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহ নিঝুম সেই উপত্যকা থেকে বেরোলেন। সঙ্গে আছে দুই ভাই কুতুবুদ্দীন ও আক সুলতান এবং উপত্যকায় আশ্রয়-নেওয়া সাম্রাজ্যের প্রায় ৭০ সদস্য।[২৮৫] সুলতানের চেহারায় খোদিত হয়ে আছে গভীর চিন্তামগ্নতার ছাপ। তাকে অস্বাভাবিক চিন্তিত ও বিষণ্ন দেখাচ্ছে। কপালে পড়েছে গভীর ভাঁজ। মন তার অনেকটা বিক্ষিপ্ত।

---

[২৮৩] মূল উর্দু বইটি দু-খণ্ডে লেখা। প্রথম খণ্ডের তুলনায় দ্বিতীয় খণ্ডের কলেবর ছিল অনেকটা দীর্ঘ। এজন্য মূল বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডের একটা বড় অংশ আমরা প্রথম খণ্ডে নিয়ে এসেছি। এ পর্যন্ত যা পড়ে এসেছেন, তা ছিল মূল বইয়ের প্রথম খণ্ড, যা খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন থেকে শুরু করে সুলতান আলাউদ্দীন খাওয়ারিজম শাহের পতন পর্যন্ত এসে সমাপ্ত হয়েছে। এবার শুরু করতে যাচ্ছেন মূল বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ড। এইখান থেকে লেখক ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করে গেছেন খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের শেষসম্রাট সুলতান জালালুদ্দীন খাওয়ারিজম শাহের দুর্ধর্ষ জিহাদি অভিযাত্রা থেকে তাঁর অন্তর্ধান পর্যন্ত ঘটনাপ্রবাহ। —প্রকাশক

[২৮৪] তারিখুল কামিল লি-ইবনিল আসির, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা, ৫৯২

[২৮৫] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ১২২, নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৬৪, জাহাঁকুশা ২/১৩১

তার সামনে এই মুহূর্তে খোলা আছে শুধু দুটো পথ—হয়তো পিতা যে পথে চলেছিলেন, দুশমনের থেকে মুখ লুকিয়ে সেই পথেই স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা খুঁজবেন, নতুবা তুচ্ছ জীবন-মরণের কথা না ভেবে মহান আল্লাহর ভরসায় মুষ্টিবদ্ধভাবে নেমে পড়বেন যুদ্ধের ময়দানে।

আনন্দের কথা হল—মহান আল্লাহ তাকে জীবনের সঠিক দিশাটুকুই দিলেন। কোনো কিছু না ভেবে নিঃশঙ্কচিত্তে তিনি অবলম্বন করলেন দ্বিতীয় পথ, যেই পথ কষ্ট-যাতনা ও মুসিবতের হাজারও চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে সফলতা, সুনাম, সম্মান ও সুখ্যাতির সুন্দরতম এক মনজিলে গিয়ে পৌঁছে।

পুরো মুসলিমবিশ্ব ও পুণ্যভূমির সুরক্ষার চ্যালেঞ্জ

শুধু খাওয়ারিজমই নয়, এই মুহূর্তে সুলতানের চোখের সামনে অত্যন্ত প্রকটভাবে ফুটে আছে পুরো মুসলিমবিশ্বের প্রতিরক্ষার এক বিশাল প্রশ্ন। তাতাররা মা-ওয়ারাউন-নাহার (ট্রান্স-অক্সিয়ানা) থেকে শুরু করে উত্তর ইরান, কাফকাজ ও কাসপিয়ান সাগর পর্যন্ত সমস্ত এলাকায় নির্বিঘ্নে-নির্ভয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। এই ঘটনা এটাই প্রমাণ করে যে, এই পশুদের উদ্দেশ্য শুধু খাওয়ারিজম রাজ্যকেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা নয়; বরং তাদের এই প্রবল ঝড় কঠিন কোনো অবরোধের ভেতর না পড়লে বিপুল-বিস্তৃত প্রান্তরজুড়ে ক্রমেই ছড়িয়ে পড়তে থাকবে; এবং প্রতিটি মনজিলে রেখে যাবে জনমানবশূন্যতা ও বিধ্বস্ততার গভীর নিশানা।

এইসব শঙ্কা ছাপিয়ে আচমকা সুলতানের বুকের ভেতর ঘাই খেয়ে উঠল—আল্লাহ না করুক, গোবি মরুভূমির এই রক্তখেকো হায়নাগুলো যদি হেজাজ অভিমুখে যাত্রা শুরু করে দেয়, তা হলে আল্লাহর ঘর কাবা ও রাসুলের রওজাকে এদের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে কীভাবে?

মোঙ্গলিয়ার মরু-এলাকায় জাহিলিয়াতের ভেতর জন্ম-নেওয়া এই সম্প্রদায়ের নিকট ভিন্ন সম্প্রদায়ের মাজহাব ও ইবাদতখানার আদব-সম্মান রক্ষার ব্যাপারটা নিতান্ত অনর্থক। তা ছাড়া মুসলিমদের প্রতি এদের ক্রোধ-বিদ্বেষও রয়েছে মাত্রাতিরিক্ত। বোখারা ও সমরকন্দের মতো সুপ্রাচীন, ইসলামি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারকবাহক দুই শহরে এদের হাতে হাজারও মসজিদ, মাদরাসা, কুতুবখানা ও মাকবারার কী করুণ দশা হয়েছে—তা তো চোখের সামনে এখনো স্পষ্ট হয়ে আছে।

যে কাফের সম্প্রদায় পবিত্র কুরআন ও হাদিসের গ্রন্থাবলির শুদ্ধতম পাতাসমস্ত ঘোড়ার পায়ের তলে পিষ্ট করতে পেরেছে, তাদের কাছ থেকে কীভাবে হারামাইন শরিফাইনের ব্যাপারে কোনো সদয় আচরণের আশা করা যায়!

আরবের মরু-এলাকার প্রতিকূলতা ও পারিপার্শ্বিক আবহ যদিও বহু আক্রমণকারীর কালো হাত রুখে দিয়েছে; কিন্তু এই তাতার-জাতিও তো বেড়ে উঠেছে গোবি মরুভূমির বিশুষ্ক এক আবহাওয়ার ভেতর। এইসব পরিবেশে জন্ম

থেকেই এরা বসবাসে অভ্যস্ত। তাই মরু-আরবে এদের যুদ্ধযাত্রা খানিকমাত্র কঠিন কিংবা বিঘ্নিত হবে না। এই মুহূর্তে, তাতারদের বর্তমান দখলীকৃত এলাকা ও জাজিরাতুল আরবের মাঝখানে বাগদাদ ব্যতীত এমন কোনো ইসলামি সাম্রাজ্য নেই, যেটাকে সেনাশক্তির বিবেচনায় কোনোক্রমে গোনায় ধরা যায়। খোদ বাগদাদের অবস্থাও ভয়ানক রকম বিপন্ন। তাতারদের নাম শুনলেই খলিফার সর্বাঙ্গে একটা কাঁপুনি জেগে ওঠে।

এই কিছুদিন আগের কথাই ধরা যাক, যখন পশ্চিমা তাতাররা মারাগেতে গণহত্যা চালিয়েছিল। তারপর তারা ভেবেছিল মারাগেহ থেকে খুব বেশি দূরে নয় বাগদাদ, ওখানে গিয়ে স্রেফ মৌজ-মাস্তির জন্য হলেও কর্তৃত্ব খাটিয়ে আসি কিছুদিন।

খলিফা এই সংবাদ শোনামাত্র বেহুঁশের মতো হয়ে পড়েছিলেন। বাগদাদের সম্ভাব্য ধ্বংসযজ্ঞ ঠেকাতে অস্থির হয়ে প্রতিরোধযুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিলেন তিনি। ভাগ্যিস, তাতাররা এই সমরাভিযান মুলতবি রেখেছিল ভবিষ্যতের জন্য। তারপর থেকে সেই ভয়-বিহ্বলতার কারণেই নিজের আশকারায় ডেকে-আনা-তাতারদের প্রতিটি হুকুম তৎক্ষণাৎ বাস্তবায়নের জন্য তিনি প্রস্তুত হয়ে থাকেন। এ-ই যখন অবস্থা বাগদাদের, তা হলে তাদের পক্ষে মক্কাভূমি দূরের কথা, নিজেদের রক্ষা করতে পারাটাই হয়ে উঠেছে প্রধান বিষয়।

মুসলিমদের পশ্চিমের রণাঙ্গন সামলাতে ব্যস্ত আইয়ুবি খানদানের শাসকবৃন্দও খ্রিষ্টানদের উপর্যুপরি হামলায় তেমন সুযোগ কিংবা সক্ষমতা পাচ্ছেন না যে, অন্যকোনো রণক্ষেত্রের প্রতি তাঁরা ভ্রুক্ষেপ করবেন। তা ছাড়া তাদের নিজেদের ভেতরকার খান্দানি ঝগড়াঝাঁটিও কম না। এ-সমস্ত ঝগড়াই তাদের পরস্পরকে প্রতিমুহূর্তে কোনো-না-কোনো যুদ্ধে ব্যস্ত করে রাখছে।

এদিকে, খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের সীমান্তের পর থেকে মক্কা ও মদিনা পর্যন্ত যত এলাকা রয়েছে, বহুবছর ধরে বিভিন্ন আমিরের হাতে শাসিত হয়ে আসছে। এইসব এলাকায় দূরদূরান্ত পর্যন্ত শক্তিমান কোনো স্থানীয় সাম্রাজ্যের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। অবস্থা যখন এমনই কঠিন ও সঙ্গিন হয়ে পড়েছে, তখন তাতারদের রোখ যদি ঘুরে যায় জাজিরাতুল আরবের দিকে, এই বদবখতদের হাতে মুসলিমবিশ্বে এমন এক প্রলয় নেমে আসতে পারে, যা কখনো কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে না।

এ-সমস্ত বিষয়ের চিন্তাভাবনা মুসলিমবিশ্বের বড় বড় শাসকদের ভেতর শুধু সুলতান জালালুদ্দীনকেই গভীরভাবে আলোড়িত করে তুলেছিল। তিনি বড় মায়া ও পেরেশানি নিয়ে অনুভব করে উঠেছিলেন, শিগগির করতে হবে কিছু একটা।

মনের ভেতর কোনোপ্রকার দ্বিধাবোধ জাগতে না-দিয়ে সরাসরি তিনি বুঝে নিয়েছিলেন—এই ভয়ংকর বিপদ থেকে মুসলিমদের মুক্ত করতে হলে তাতার-আগ্রাসনকে শুধু খাওয়ারিজম ও ইরানের ভেতরেই আটকে ফেলতে হবে আমার। এ ছাড়া কোনো উপায় নেই। তাদের রোখ দক্ষিণদিকে ফিরিয়ে দেব আমি। এখানে এমন

শক্ত সংঘর্ষ শুরু করব, যে তাতার-বাহিনী প্রতিনিয়ত ইরাক ও আরব-সীমান্তের কাছাকাছি চলে যাচ্ছে, খোরাসানেই তাদের আটকে রাখব। এই এলাকাতে বিভিন্ন রণাঙ্গন প্রতিষ্ঠা করে তাতারদের পশ্চিমমুখী অগ্রগামিতা রুখে দেব। এই সময়কালের মধ্যে দুশমনকে আটকে রাখব এখানকার রণক্ষেত্রগুলোরই বিভিন্ন ঝঞ্ঝাটের ভেতর, যতক্ষণ না এর মধ্যেই জেগে ওঠে পুরো মুসলিমবিশ্ব এবং তাতারদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য ভরপুর প্রস্তুতি নেয়।

আরগেঞ্চে সুলতান

মূলত এই খেয়াল ও জজবা নিয়েই সুলতান জালালুদ্দীন কাসপিয়ান সাগর থেকে খাওয়ারিজমের উদ্দেশে বেরিয়েছিলেন। পথিমধ্যে তিনি কাসপিয়ান সাগরের সীমান্তবর্তী শহর মানকিশলাগে থামলেন (এই শহরটি খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের শেষ-সীমানা অবস্থিত ছিল)। এখান থেকে সবার আগে একজন দূতকে পাঠালেন রাজধানী আরগেঞ্চে, যাতে করে শহরবাসী তার আগমনের সংবাদ পেয়ে যায় আগেভাগেই।[২৮৬] বিস্ময়করভাবে আরগেঞ্চ তখনও তাতারদের আয়ত্তের বাইরে ছিল। তবু প্রতিনিয়ত বেড়ে চলছিল আক্রমণের আশঙ্কা। শহরের অভ্যন্তরীণ অবস্থা হয়ে পড়েছিল বিক্ষিপ্ত। নায়েবের অবর্তমানে গুণ্ডা ও দস্যুশ্রেণির লোকেরা চতুর্দিকে হাঙ্গামা বাধিয়ে রেখেছিল। কুহে দরোগাঁ নামের এক যুদ্ধংদেহী দাগাবাজ লোক তাদের সরদার বনে গিয়েছিল। এই লোক ছিল বড়ই ধুরন্ধর, সুচতুর। এ-কারণে তার নাম হয়ে গেছিল কুহে দরোগাঁ—ধোঁকার পাহাড়।[২৮৭]

শহরজুড়ে সুলতান জালালুদ্দীন ও শাহি সদস্যদের আগমনের সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এইসব লুটেরার দল কীট-পতঙ্গের মতো ছোটাছুটি করে এদিক-ওদিক লুকোতে আরম্ভ করল। মুহূর্তখানিকের ভেতর বদলে গেল আরগেঞ্চের মলিন চিত্রপট। বাসিন্দা ও আমিরদের একটি বিরাট দল শহরের বাইরে বেরিয়ে এল। তাদের চোখে-মুখে নতুন শাসককে অভিবাদন জানাবার অধীর উত্তেজনা। শহরের কাছাকাছি তখনও আসেননি সুলতান। বাইরে এসে তার আগমনের পথপানে চেয়ে রইল জনতার উৎসুক দৃষ্টি। তৈমুর মালিক, কুজাই তেগিন, অফিসার এগওয়াল ও অন্য বড় সরদাররাও তার জন্য অপেক্ষা করছিল। সবার হাতে হাতে উঁচিয়ে-ধরা খাওয়ারেজমি পতাকা প্রবলভাবে সেসব দুলে চলেছে দখিনা বাতাসের ঝাপটায়। অবশেষে সুলতান এলেন। তৈমুর মালিক ও সরদারগণ সুলতান ও তার সহচরদের জন্য নতুন পোশাক, অস্ত্রশস্ত্র ও বাহনজন্তু পেশ করলেন।[২৮৮]

---

[২৮৬] জাহাঁকুশা ২/১৩০

[২৮৭] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ১২১, জাহাঁকুশা ১/৯৮

[২৮৮] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ১২২, নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৬৪, জাহাঁকুশা ২/১৩১

কঠিন মুহূর্ত

সুলতান জালালুদ্দীন খুব কঠিন এক অবস্থায় সাম্রাজ্যের লাগাম সামলালেন। এতদিনে পরিস্থিতি পুরোপুরি বিগড়ে গিয়েছিল। মুসলিমবিশ্বের সর্ববৃহৎ এই সাম্রাজ্যের নিশান ভেঙে গিয়েছিল। উত্তরের, মাঝের ও পূর্বদিকের সমস্ত প্রদেশ সম্পূর্ণ ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছিল। রাজধানী ব্যতীত, দক্ষিণে আফগানিস্তানের কিছু শহর, পশ্চিমে নাসা ও তৎসংলগ্ন সব এলাকা এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে অনারব ইরান-ইরাকের কিছু অঞ্চল শুধু তাতারদের রক্তপাত থেকে সুরক্ষিত ছিল তখনও।

রাষ্ট্রীয় কোষাগার একদম খালি পড়ে ছিল। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছিল সেনাশক্তি। এই অবস্থায় রাজ্যের হাকিমদের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়; বরং আগাগোড়া ছিল কণ্টকাকীর্ণ। শাহজাদা কুতুবুদ্দীন আযলাকও রাষ্ট্রের এই দুর্দশা দেখে হয়তোবা নিশ্চুপ ছিল তখনও। পিতার যে স্থলাভিষিক্ততার আসন তাকে দেওয়া হয়েছিল, তা নিয়ে সে মুখ খুলছিল না। নয়তো তার কবিলা এমন পাত্র ছিল না যে, সুলতান জালালুদ্দীনের ক্ষমতা মেনে নেবে।

তাতারদের সৈন্য পরিচালনা

তখনও সমরকন্দই ছিল চেঙ্গিজ খানের অবস্থানস্থল। সেখানে বসেই তিনি পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে আক্রমণের জন্য তোড়জোড় চালাচ্ছিলেন। ইতোমধ্যে আলাউদ্দীন মুহাম্মদের মৃত্যু ও সুলতান জালালুদ্দীনের ক্ষমতাগ্রহণের সংবাদও পেয়ে গেলেন তিনি। ইতিপূর্বে সুলতান জালালুদ্দীনের ব্যাপারে তিনি অনেক কিছু শুনেছিলেন। এজন্য খাওয়ারিজম শাহের পুত্রদের মধ্যে তাকেই একমাত্র ভয়ংকর মনে করতেন। ফলে, সুলতানের ক্ষমতাগ্রহণের সাথে সাথেই সতর্ক হয়ে উঠলেন তিনি। কোনো অপ্রীতিকর অবস্থা যাতে সংঘটিত না হয়, সেজন্য তাৎক্ষণিকভাবে এক বিরাট বাহিনী খাওয়ারিজমের রাজধানীর উদ্দেশে পাঠিয়ে দিলেন।[২৮৯]

জিহাদ ঘোষণা

সুলতানের জন্য তখন রাজধানীর সুরক্ষা-কর্মই হয়ে উঠেছিল সবচেয়ে বড় ব্যাপার। এজন্য তিনি তাৎক্ষণিকভাবে জিহাদের ঘোষণা করে দিলেন। প্রতিরোধ-শক্তি সঞ্চয়ের জন্য শুরু করে দিলেন প্রাণান্তকর চেষ্টা-মুজাহাদা। তার আহ্বানে হাজার হাজার নওজোয়ান এসে এক পতাকার নিচে জমায়েত হতে লাগল। পাহাড়ের বড়-বড় পাথরের আড়ালে কিংবা বনে-জঙ্গলে আত্মগোপন করেছিল যে-সমস্ত সিপাহি, তারাও আবার আরগেঞ্চে এসে জড়ো হতে লাগল; এবং অল্প-কদিনের ভেতর প্রস্তুত হয়ে উঠল সাত হাজার স্বেচ্ছাসেবীর একটি জামাত।[২৯০]

---

[২৮৯] ইবনুল আসির ৭/৫৯২

[২৯০] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ১২২, নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৬৪, ইবনে খালদুন ৫/১১৫

একদিকে সুলতান জালালুদ্দীন ছিলেন ইসলামের মৃতপ্রায় বৃক্ষের গোড়ায় প্রাণদায়ী পানি সিঞ্চনে মগ্ন, অন্যদিকে উম্মাহর কিছু গাদ্দার তার সেই প্রচেষ্টা ভণ্ডুল করে দিতে বুনে চলছিল গভীর চক্রান্তের জাল। সেনাবাহিনীর এক প্রতাপশালী সরদার ছিল কিৎলুগ খান। সে তুখি পাহলোয়ান উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিল। এই সংকটপূর্ণ নাজুক পরিস্থিতিতে শাহজাদা কুতুবুদ্দীনকে সুলতান জালালুদ্দীনের প্রতিদ্বন্দ্বী করে তুলতে তাদের পুরোনো ঘৃণা-বিদ্বেষের আগুনে অধিকহারে ঘি ঢালতে শুরু করেছিল সে।

এই গাদ্দার ভীষণ চতুরতার প্রমাণ দিয়েছিল। পিতার ক্ষমতা দাবি করতে একদিকে সে কুতুবুদ্দীনকে সম্মত করে তুলল, অন্যদিকে একথা ছড়িয়ে দিতে লাগল যে, কুতুবুদ্দীন আযলাকই হচ্ছে সুলতান মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহের প্রকৃত স্থলাভিষিক্ত; কিন্তু সুলতান জালালুদ্দীন এসে তার সেই অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছে। যতক্ষণ কুতুবুদ্দীন বেঁচে থাকবে, অন্য কেউ খাওয়ারিজমি জনতার জন্য ওয়াজিবুল ইতাআত (অবশ্যমান্য) গণ্য হতে পারে না।

এই ধৃষ্টতাপূর্ণ বিষাক্ত প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে শহরের পরিবেশ পঙ্কিল করে তুলল কিৎলুগ খান। এতদিন যেখানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল মুজাহিদদের ইসলামের প্রশংসাগীতি, সেখানে এবার উসকে উঠতে লাগল গৃহযুদ্ধের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। কিৎলুগ খান তুর্কি অফিসারদের বুঝিয়েসুঝিয়ে নিজের মতাবলম্বী বানিয়ে ফেলল। এই তুর্কি অফিসাররাই ছিল মূলত সেনাশক্তির প্রধান উপাদান। এদিকে সুলতান জালালুদ্দীনের সহযোগীদের পক্ষে এই অবস্থা হয়ে উঠেছিল সহ্যাতীত। তারা সংকল্প করল আমরা বেঁচে থাকতে প্রিয় সুলতানকে কেউ বরখাস্ত করতে পারে না।[২৯১]

সুলতান-বিরোধী চক্রান্তে যেসব আমির শামিল ছিল, তাদের ভয় ছিল—সুলতান একজন দক্ষ লোক, এজন্য আমরা রাজ্যে মনমতো জবরদখলের সুযোগ পাব না। কিন্তু কুতুবুদ্দীন আযলাক যদি সিংহাসনে থাকে, তার অনভিজ্ঞতার সুযোগে পুরোপুরি ফায়দা লুটতে পারব, সাধন করে উঠতে পারব নিজেদের যেকোনো উদ্দেশ্য।[২৯২]

কিন্তু সৌভাগ্যের ব্যাপার, একদিন, আমির ইনাজ খান নামে সুলতানের এক খাঁটি সহচর এসে এই বিদ্রোহীদের ভেতর ঢুকে পড়লেন। তাদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে লাগলেন তিনি। তারা বুঝতেও পারল না যে, এই লোক সুলতানপক্ষীয়। ইনাজ খানের উদ্দেশ্য ছিল বিদ্রোহীদের প্রতিটি পদক্ষেপ ও কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে সুলতানকে সংবাদ দিতে থাকা।

পূর্বোক্ত বোখারার সাবেক গভর্নরই হলেন এই আমির ইনাজ খান। তিনি বোখারার রণক্ষেত্রে তাতারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। কিছুদিনের ভেতর তিনি

---

[২৯১] জাহাঁকুশা ২/১৩২, ইবনে খালদুন ৫/১১৫

[২৯২] জাহাঁকুশা ২/১৩২-১৩৩

সুলতান জালালুদ্দীনকে জানালেন যে, কিৎলুগ খান ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা আপনাকে হত্যা করার পরিকল্পনা এঁটেছে। আপনার বিরুদ্ধে এরা যেকোনো সময় যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারে।[২৯৩]

রাজধানী ছাড়ার কাহিনি : এক কঠিন পরীক্ষা

সুলতানের সামনে এখন দুটো পথই শুধু খোলা। হয়তো রাজধানীতে থেকে একনিষ্ঠ সহযোগীদের নিয়ে প্রথমে এই বিদ্রোহীশক্তির মোকাবেলা করবেন, তারপর নামবেন তাতারদের বিরুদ্ধে। নতুবা বিশেষ বিশ্বস্তদের সঙ্গে নিয়ে ছেড়ে যাবেন রাজধানী, অন্য কোথাও গিয়ে এই নতুন জিহাদের প্রস্তুতি নেবেন।

প্রথম অবস্থায় আমল করার জন্য যথেষ্ট সেনাশক্তি, উপযুক্ত সময় ও সুযোগের প্রয়োজন ছিল। কারণ, এখানে তখন সুলতানের সহযোগীদের সংখ্যা অনেক কম পড়ে গিয়েছিল। অধিকাংশ সৈন্য সেনাপতির অধীনস্থ হওয়াতে কুতুবুদ্দীনের দলে গিয়ে মিশেছিল। এদিকে রোজ-রোজ ঘনীভূত হচ্ছিল তাতার-আগ্রাসনের শঙ্কা। এই অবস্থায় অভ্যন্তরীণ শত্রুদের খতম করতে উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষায় থাকার সুযোগই ছিল না। সুলতানের এটাও ভালো করে জানা ছিল যে—গাদ্দারদের সাথে লড়তে গেলে খড়্গ হাতে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে মুসলিমদেরই দুটি দল। এতে করে নিজেরাই প্রাণ বিকোবে আল্লাহর হাজারও বান্দা। আর তাদের সব বাচ্চাকাচ্চা তাতারদের তলোয়ারের নিচে এক দুর্বল শিকারবস্তু হয়ে পড়ে রইবে।

অপরদিকে, রাজধানী ত্যাগ করা হলে রাজধানী ও শাহি মহল থেকে সুলতান জালালুদ্দীন বঞ্চিত হবেন নিশ্চিত। তবে, এতে এমন একটা আশা অবশ্যই আছে যে, কুতুবুদ্দীন ও আক সুলতানের অধীনে সেপাই ও স্বেচ্ছাসেবকদের বর্তমান যে জনসংখ্যা রয়েছে, তারা দীর্ঘ সময় ধরে বহু প্রাচীর-ঘেরা এই আরগেঞ্চকে তাতারদের হাত থেকে প্রতিরক্ষা করতে পারবে, এবং এই নাজুক সময়ে মুসলমানরা থাকতে পারবে পরস্পরের তলোয়ার থেকে নিরাপদ।

শাহি মহল এবং রাজধানী থেকে বরখাস্ত হওয়ার ব্যাপারটি জনসাধারণের রেওয়াজ অনুসারে আসল বাদশাহি থেকেই বরখাস্ত হওয়ার নামান্তর। তাদের ধারণায়, সুলতান রাজধানী ছাড়তে বাধ্য হলেন মানে নিজের বাদশাহি নিজেই খুইয়ে ফেললেন। এমনটাই বোঝে তারা। প্রাণ থাকতে কোনো শাসকই তো ক্ষমতার মূলকেন্দ্র থেকে সরে পড়তে চান না। কিন্তু সুলতান জালালুদ্দীনের কাছে মিল্লাতের বাঁচা-মরার চিন্তা ছিল নিজের ক্ষমতার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তিনিই হলেন উম্মাহর ঐক্যবদ্ধতার আহ্বায়ক; এজন্য এই সংকটাপন্ন মুহূর্তে নিজের ক্ষমতা রক্ষার তাগিদে কী করে গৃহযুদ্ধে নামতে পারেন তিনি!

---

[২৯৩] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ১২২, নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৬৪, জাহাঁকুশা ২/৩২

ওদিকে কুতুবুদ্দীন হল তারই ভাই। সে তার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে; কিন্তু সস্তায় উম্মাহকে বিজাতির হাতে বিকিয়ে-দেবার মতো লোক না সে। তাতারদের থেকে মাতৃভূমি সর্বদা সে রক্ষা করতে চায়। তবে অনভিজ্ঞতা ও না-বোঝার দরুন ভুলভাবে কিপচাক আমিরদের হাতে সে ব্যবহৃত হচ্ছে।

কুতুবুদ্দীনের এই ভুল সত্ত্বেও, সুলতানের ভ্রাতৃস্নেহের দরুন তিনি বাধ্য হয়ে ওঠেননি যে, ক্ষমতার লোভে এক নতুন ট্রাজেডির জন্ম দিতে ভাইয়ের বিরুদ্ধে তলোয়ার ধরবেন। তিনি এ-ও জানতেন—চুপচাপ যদি কুতুবুদ্দীনের ক্ষমতা মেনেও নেন, তবু তাতে ঘোরবিরোধী কিপচাক আমিররা কখনো সন্তুষ্ট হবে না। তারা বরং তাকে হত্যা করার পাঁয়তারা চালাবে। আর স্পষ্টতই, সেইরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে নিজ উদ্দেশ্যের আসল কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছতে পারবেন না সুলতান।

প্রিয় পাঠক, এখানটায় আমাদের বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হবে—আরগেঞ্চে তখন সুলতানের অবস্থা এতটা দুর্বল হয়ে পড়েনি যে, আমরা তাকে মনে করব তিনি সিংহাসন ছেড়ে দিতে বাধ্য ছিলেন। না, মূলত এইরকম কিছু না। বরং তৈমুর মালিক, ইনাজ খান এবং পরীক্ষিত অনেক জেনারেল ও অভিজ্ঞ কিছু অফিসারসহ হাজারও স্বেচ্ছাসেবক সুলতানের জিহাদের আহ্বানে ইতোমধ্যে সমবেত হয়ে গিয়েছিল। সুলতানের জন্য তারা নিজেদের প্রাণ পর্যন্ত বিকিয়ে দিতে প্রস্তুত ছিল। তা ছাড়া খুব একটা অসম্ভবও ছিল না যে, বিদ্রোহীদের মোকাবেলায় তারা সকলেই যদি মুষ্টিবদ্ধ যুদ্ধে নেমে যেত, গাদ্দারপক্ষকে নিশ্চিত নাকানিচুবানি খাইয়ে ছাড়ত। কিন্তু সুলতান জালালুদ্দীন মুসলিমদের প্রতিটি রক্তবিন্দুর মূল্য পুরোপুরি অনুধাবন করে উঠতে পেরেছিলেন। তাদের অমূল্য রক্তের একেকটি ফোঁটা তারই হাতে প্রবাহিত হবে, সেই ধারণাও আসেনি তার মাথায়।

এমনতরো বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি লক্ষ করে শেষমেশ সুলতান জালালুদ্দীন আমিরদের নিয়ে পরামর্শসভায় বসলেন। আমির ইনাজ খানও রায় দিলেন শহর ছাড়বার। ফলে, গোপনে রাজধানী ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন সুলতান।

নিজের অভীষ্ট লক্ষ্যের সামনে ক্ষমতার মতো একটা সম্মোহক জিনিস কোরবান করে দেওয়ার এমন উদাহরণ পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কম লোকই পেশ করতে পেরেছে। আর এটাই সুলতানের সমস্ত মেহনত-মুজাহাদার পবিত্রতা ও শুদ্ধতার স্পষ্ট প্রমাণ যে, তিনি তার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত শাহি সিংহাসনকে কখনো জিহাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে দেননি।

স্বীয় মিশনের শুরুর দিকেই তাকে এত বড় এক কোরবানি দিতে হয়েছিল, নিশ্চয় এটি কুদরতে ইলাহির পক্ষ থেকে ছিল এক বিরাট পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় আল্লাহর তাওফিকে তিনি সফলও হয়েছিলেন। তার এই কর্মপন্থা কেয়ামত পর্যন্ত হকের জন্য যারা লড়াই করবে, তাদের সবার জন্যই এক জ্বলন্ত আলোকমশাল। তার এই অসামান্য কীর্তির ঝলক আমাদের সবক প্রদান করে যে, বাতিলের সর্বগ্রাসী আগ্রাসনের মুখে বুক চিতিয়ে-দাঁড়ানো-মহাবীরদের সিনা হওয়া উচিত সমুদ্রের

চেয়েও প্রশস্ত, সাহসিকতা হওয়া উচিত পাহাড়ের চেয়েও মজবুত এবং তাদের চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিত সিংহাসন ও রাজমহলের মতো ধ্বংসশীল পার্থিব জিনিসের চেয়েও বহুগুণ উন্নত।

পৃথিবীতে কোনো অভিযান কিংবা আন্দোলনের ভিত্তি যদি লিডারদের ইসার (অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া) ও কোরবানির অজস্র দৃষ্টান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, সেই আন্দোলন নিঃশেষিত হয়ে যাবে পাকাপোক্ত হওয়ার আগেই।

এক্ষেত্রে সুলতান ইসার ও শুদ্ধতার আরো এক মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করে উঠেছিলেন। আরগেঞ্চের যুদ্ধক্ষেত্রের গুরুত্ব ও এখানকার সৈন্যসংখ্যার স্বল্পতা সম্পর্কে তিনি গাফেল ছিলেন না। এজন্য ব্যক্তিগত প্রয়োজনের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না-করে তিনি অধিকাংশ সহযোদ্ধাকে শহরের প্রতিরক্ষাকর্মে নিযুক্ত থাকতে দিলেন, আর নিজে স্রেফ তিনশ খাস সহচর নিয়ে রাতারাতি বেরিয়ে পড়লেন শহর ছেড়ে।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের শহর নাসার দিকে ছিল তার রোখ। এই ছোট্ট বাহিনীর প্রথম সারির নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন কুকন্দের শার্দুল তৈমুর মালিক।[২৯৪] এই তিনশ সৈন্য নিয়েই ছুটে চললেন সুলতান। অথচ তার নিকট আরো বেশি সহযাত্রীর প্রয়োজন ছিল, যাদের ভূমিকা পালন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, পথিমধ্যে দেখা দিতে পারত নতুন কোনো শঙ্কা। কোথাও হয়তো তাদের ঘিরে ফেলতে পারত তাতাররা। কিন্তু, সুলতানের কাছে উম্মাহর সুরক্ষার দাবি ব্যক্তিগত প্রয়োজনের চেয়ে গুরুত্ব রাখত অনেক বেশি। এজন্য তিনি ভেবেছিলেন এই ক'জন সৈন্যই আমার জন্য যথেষ্ট।

কুতুবুদ্দীন আযলাকের হতাশা ও শহর থেকে পলায়ন

সুলতান জালালুদ্দীন চলে গেছেন। হতভাগ্য শাহজাদা কুতুবুদ্দীনের কপালে আরগেঞ্চের শাহিমহলে ক্ষমতা খাটাবার দু-চারটে দিনও জুটে উঠল না। তাতার-বাহিনী প্রতিনিয়ত আসতে লাগল শহরের খুব কাছাকাছি। কুতুবুদ্দীন অনুভব করতে পারছিলেন, অপ্রতিরোধ্য এই ঝড়ের মোকাবেলা তিনি করতে পারবেন না। তার সেই যোগ্যতা কিংবা ক্ষমতা কোনোটাই নেই।

সুলতান জালালুদ্দীনের সত্তা ছিল এমন এক পাহাড়ের মতো সুউচ্চ, যেই পাহাড়ের কোলের ভেতর আশ্রয় নিয়ে প্রতিরোধ করে ওঠা যায় সবরকম ঝড়ঝঞ্ঝা। সুলতানের শূন্যতা এবার গভীরভাবে অনুধাবন করতে লাগলেন কুতুবুদ্দীন। এবার তার আফসোসের কোনো সীমা-পরিসীমা ছিল না। শেষমেশ তিনি হতাশায় ভেঙে পড়ে আক সুলতান ও অন্যান্য খান্দানি লোককে সঙ্গে নিলেন। মূল্যবান কিছু জিনিসপত্তর গোছগাছ করে সিপাহিদের একটি দলের নিরাপত্তায় সুলতান জালালুদ্দীনের পেছন-পেছন রওনা দিয়ে দিলেন।

---

[২৯৪] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ১২২-১২৬, নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৬৪, ইবনু খালদুন ৫/১১৫

রাজধানী থেকে সুলতান জালালুদ্দীনের বেরোবার তিন দিন পরে তাতার-বাহিনী এসে শহরের সম্মুখে ছাউনি স্থাপন করল। নাসাবির বর্ণনায় পাওয়া যায়, তাদের এই বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিল বাজি নৈয়ান।[২৯৫]

আরগেঞ্চ অবরোধ

মরহুম সুলতান আলাউদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহের কোনো পুত্রই আরগেঞ্চে নেই তখন। কিন্তু জিহাদের ইচ্ছা নিয়ে যেসব জানবাজ মুজাহিদ এখানে এসে উঠেছিলেন, তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় হাজারের কোঠায়। তারা সবসময়ের জন্য লড়তে মরতে প্রস্তুত ছিল। জিহাদি চেতনার যে রুহ সুলতান জালালুদ্দীন তাদের ভেতর ফুঁকে দিয়েছিলেন, তার প্রভাব তখনও বাকি রয়ে গিয়েছিল। বাহিনীর কয়েকজন জেনারেলও ছিলেন আরগেঞ্চে। তাদের মধ্যে মোগল হাজিব, আরবোকা পাহলোয়ান ও সিপাহসালার আলি দারোগিনির নাম ইতিহাসে সংরক্ষিত আছে। এই জানবাজেরা 'খিমার তুর্কি' নামের এক সরদারকে (যে ছিল তুর্কানে খাতার আত্মীয়) নিজেদের আমির বানিয়ে নিয়েছিল এবং তার নেতৃত্বে লড়াইয়ের জন্য কোমর কষে উঠে দাঁড়িয়েছিল।[২৯৬]

আক্রমণ

অবরোধ তখনও শুরু হয়নি। তাতার-বাহিনী শহর থেকে খানিক দূরে আটকে ছিল। খুব ভোরে একদিন হঠাৎ তাতারদের বিরাট একটি দল এসে উপস্থিত হল। প্রাচীরের বাইরে ছিল বিশাল চারণভূমি। তাতাররা সেই চারণভূমিতে বিচরণশীল সব মহিষের পাল তাড়াহুড়ো করে হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। চারপাশের পরিবেশ তখন অন্যরকম শীতল; মোলায়েম একটা মমতা-মাখা যেন। এই দৃশ্য দেখে মুজাহিদবাহিনী ও শহরবাসীর একটি বড় বাহিনী শহরের 'বাবে আলি' নামক সদর দরজা খুলে ছুটে বেরিয়ে এল। বেরিয়েই ধাওয়া শুরু করল মহিষ হাঁকিয়ে নিয়ে-যাওয়া তাতারদের পেছন-পেছন।

এদের মধ্যে আরোহী ও পদাতিক, দুই দলই ছিল। ধাওয়া করতে করতে শহর থেকে তিন মাইল দূরের 'বাগে খড়ম' নামক স্থানে যখন পৌঁছল, সেখানে আগে থেকে ওত পেতে-থাকা হাজারও তাতার সিপাহি তাদের উপর আচমকা হামলা করে বসল। বেধে উঠল তুমুল যুদ্ধ। মুসলিমবাহিনী অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে দুশমনের ঘেরের ভেতর পড়ে গেল। সেই ভোরবেলা থেকে একদম জোহর পর্যন্ত প্রাণান্তকর লড়াই চালিয়ে যেতে থাকল তারা। এর ভেতর শহিদ হয়ে গেল তাদের ১ লক্ষ সিপাহি।

---

[২৯৫] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ১২২, নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৬৪, ইবনু খালদুন ৫/১১৫

[২৯৬] জাহাঁকুশা ১/৯৭, ইবনু খালদুন ৫/১১৫

অবশিষ্টাংশ যখন ঘেরাও ভেদ করে ধীরে-ধীরে পিছিয়ে আসতে শুরু করেছিল শহরের দিকে, তাদের পেছনে তাতাররা শুরু করেছিল ধাওয়া। এই হুলস্থুলের মধ্যে তাতারদের অনেকেই মুসলিমদের সাথে কাবিলান দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল শহরের ভেতর। এবং নির্বিঘ্নে তারা শহরের মাসহুরা নামক মহল্লা পর্যন্ত চলে এল।

দিনশেষে সন্ধ্যার ফ্যাকাশে অন্ধকার যখন চতুর্দিকে কালো জাল বিস্তৃত করতে লাগল, তখন তারা ফিরে গেল নিজেদের ডেরায়। এরই মধ্যে, যাবার বেলায় অন্ধকার নামতে-নামতেই পুরো শহরের নকশার একটা নিরীক্ষণও তারা করে ফেলল।

পরেরদিন তাতাররা এসে শহর-প্রাচীরে আক্রমণ করে বসল। জোরদার হামলা চালিয়ে শহরের ফটক ভাঙতে চেষ্টা চালাল। কিন্তু সুলতান ফারিদুন ঘুরি নামের এক সাহসী সেনাপতি ৫০০ দুর্ধর্ষ সৈন্য নিয়ে প্রতিরোধের জন্য দরজার কাছে এলেন। সর্বশক্তিতে ফটকের এপাশ থেকেই তিনি সেই আক্রমণ রুখে দিলেন।[২৯৭]

কামানের বিরল ব্যবহার

পরদিন বাহিনী নিয়ে শহরের কাছে এসে পৌঁছে চেঙ্গিজ খানের ছেলে উকতাই খান। তারপর বাকারজোন নৈয়ানের কমান্ডে চেঙ্গিজ খানের নির্বাচিত খাস সেপাইদের একটি দল এসে উকতাইয়ের বাহিনীতে শামিল হয়। তারপর ১ লক্ষ অশ্বারোহীর এক বিশাল বহর নিয়ে সেখানে এসে পৌঁছে চেঙ্গিজ-পুত্র চোগতাই খান। তুলোন নৈয়ান, ইসতুন নৈয়ান ও কাজান নৈয়ানও ছিল তার সফরসঙ্গী।[২৯৮]

চোগতাই ও উকতাই শহরের আশপাশ ঘুরে দেখে শক্ত অবরোধের পরিকল্পনা আঁটতে শুরু করেছিল। পাশাপাশি দূত-মারফত শহরবাসীদেরকে হাতিয়ার ফেলে দেওয়ার পয়গামও পাঠাচ্ছিল। কিন্তু অন্য শহরগুলোর নিরাপত্তা প্রদানের ব্যাপারে যে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি তাতাররা দিয়েছিল, শহরের নেতৃবৃন্দ সে-সম্পর্কে অবগত ছিলেন। এ-কারণে তাতারদের পুরোনো সেই ধোঁকায় তারা পড়েননি আর।[২৯৯]

চেঙ্গিজ খানের বড় ছেলে জোচি খানও একটি সৈন্যদল নিয়ে এখানে এসে পৌঁছুল কিছুদিন পর। এভাবে তাতারদের সেনাসংখ্যা বেড়ে গেল অনেক।

ইবনুল আসিরর ভাষ্যমতে, অন্য কোনো শহরের আক্রমণের বেলায় এত বিপুলসংখ্যক তাতার কখনো উপস্থিত ছিল না।[৩০০]

---

[২৯৭] জাহাঁকুশা ১/৯৮-৯৯, নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৬৪

[২৯৮] নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৯০

[২৯৯] জাহাঁকুশা ১/৯৯

[৩০০] ইবনুল আসিরের ভাষ্য হলো—'চেঙ্গিজ খান বাহিনীর যে অংশকে খাওয়ারিজমের রাজধানীতে পাঠিয়েছিলেন, তা ছিল বাকি সব অভিযানের সৈন্যদল থেকে বড়। কারণ, এ শহর ছিল সর্বাধিক প্রশস্ত।' ৭/৫৯২

শহরবাসীর আসল মনোভাব যে কী, চেঙ্গিজ খানের পুত্ররা তা ধরে ফেলেছিল। ফলে একযোগে তারা দীর্ঘতর এক শক্ত অবরোধের ব্যবস্থাপনা আরম্ভ করে দিল। কিছুদিনের ভেতর এমন কঠিনভাবে শহরটা ঘিরে ফেলল, সর্বদিক থেকেই তাতারদের বেষ্টনীর ভেতরে পড়ে গেল আরগেঞ্চ; যেন-বা শহরবাসী শক্ত কোনো খাঁচার ভেতর আটকে গেছে।

আরগেঞ্চ শহর ছিল জাইহুন-নদীর পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। ওদিককার পুরোটাই ছিল ময়দানি এলাকা, ধূ-ধূ বালুভূমি। ওদিকে বড় কোনো পাথরের দেখা পাওয়া যেত না। ফলে কামান ব্যবহারের জন্য তাতাররা আশপাশের তুঁতবৃক্ষের সব জঙ্গল কেটে সাফ করে ফেলল। সেইসব বৃক্ষের বড় বড় কাণ্ড এনে পানির ভেতর ডুবিয়ে রেখে দ্বিগুণ ভারী করে নিল। তারপর, কামানের মধ্যে সেগুলো স্থাপন করে তিরের মতো শহর-প্রাচীরে নিক্ষেপ করতে লাগল। ভূমিকম্পের চেয়েও কঠিনভাবে কেঁপে উঠতে লাগল দেয়াল। এটি ছিল অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ও বিরল কর্মপন্থা। কামান ব্যবহারের এমনতরো দৃশ্য ইতিপূর্বে কখনো দেখাও যায়নি, কোথাও শোনাও যায়নি।

কামান ব্যবহার ছাড়াও অন্যখান থেকে বন্দি করে আনা লোকেদেরকেও তারা প্রাচীর ভাঙার কাজে নিযুক্ত করে দিল। প্রাচীরের সম্মুখে ছিল একটি খন্দক। একদল গিয়ে মাটি ও কামানে ব্যবহৃত বৃক্ষ-তিরগুলো এনে এই খন্দক ভরাট করতে লাগল। খন্দক পুরোপুরি ভরে উঠতেই তাতাররা সরাসরি প্রাচীরের উপরে গিয়ে হামলে পড়ল। এক আক্রমণেই প্রাচীরের উপর নিজেদের পতাকা গেড়ে দিতে সক্ষম হল তারা। তবু প্রাচীর তাদের কবজায় পুরোপুরিভাবে এল না। এর ভেতর শহরের অস্থায়ী হাকিম খিমার তুর্কি প্রতিরোধ-কর্মে নিরাশ হয়ে চুপচাপ অন্যদিক থেকে পালিয়ে গেল। ফলে নিদারুণভাবে অস্থির হয়ে উঠল শহরবাসী। তবু সর্বশক্তি জমিয়ে তারা অব্যাহত রেখেছিল মোকাবেলা।[৩০১]

তাতার-আগ্রাসনের পূর্বে শায়েখ নাজমুদ্দীন কোবরার ভবিষ্যদ্বাণী

একদা খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের বিখ্যাত সুফি ও মা-ওয়ারাউন-নাহারের মানুষের মাথার মুকুট শায়েখ নাজমুদ্দীন কোবরা এখানে বসবাস করতেন। তাতার-জাতির আত্মপ্রকাশের কিছুকাল পূর্বের কথা। একদিন তিনি তার খলিফাদের (তাদের সংখ্যা ছিল ৬০) ডেকে অত্যন্ত ব্যস্ত গলায় বললেন, চলো, জলদি করো! সবাই নিজ নিজ এলাকায় পাড়ি জমাও। আমাদের পূর্বদিক থেকে এমন এক লেলিহান অগ্নিশিখা ভয়ংকর জিহ্বা প্রসারিত করেছে, যা পশ্চিম পর্যন্ত'র সমস্ত কিছু জ্বালিয়ে একদম ছাইভস্ম করে দেবে। এই উম্মাহ এমন এক ফেতনায় নিপতিত হতে যাচ্ছে, যে সম্পর্কে তাদের কোনো পূর্বধারণা নেই। এরকম অভিজ্ঞতার মুখোমুখি পূর্বে কখনো তারা হয়নি।

---

[৩০১] নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৯০, রওজাতুস সফা ৫/৩৩, জাহাঁকুশা ১/৯৯

ভয়কাতর গলায় এক লোক আরজ করে উঠল, হজরত, এই ফেতনা যাতে বিদূরিত হয়ে যায়, আপনি সেই রকম কোনো দোয়া করছেন না কেন; তা হলে সম্ভবত এর মুখোমুখি হতে হয় না মুসলিমদের!

শায়েখ নাজমুদ্দীন মৃদু কণ্ঠে জবাব দিলেন, এটাই যে আল্লাহর সিদ্ধান্ত! যতই দোয়া করি এর কোনো নড়চড় ঘটবে না।

সেবায়েতগণ আরজ করলেন, হজরত, আপনিও আমাদের সাথে চলুন-না! ওই তো বাহন উপস্থিত! চলুন আমরা খোরাসানের দিকে বেরিয়ে যাই।

শায়েখ বললেন, আমার জন্য এখান থেকে বেরোবার অনুমতি নেই। আমি তো এখানেই শহিদ হবো![৩০২] (তার এই ভবিষ্যদোক্তির কিছুদিনের মধ্যেই তাতাররা খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যে এসে আক্রমণ করেছিল)।

শায়েখ নাজমুদ্দীন কোবরার জীবনের নিরাপত্তা প্রদানের গল্প

চেঙ্গিজ খান তার কিছু মুসলিম অনুচর ও সংবাদ সরবরাহকারীর মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন শায়েখ নাজমুদ্দীন কোবরা একজন বড় বুজুর্গ। জানতে পেরেছিলেন তার কাশফ ও কারামাতের বিস্ময়কর সব ঘটনা। ফলে, একদিন তিনি পুত্রদের মাধ্যমে শায়েখ কোবরার কাছে চিঠি পাঠালেন যে, খাওয়ারিজমের রাজধানী আরগেঞ্জের দিকে ধেয়ে আসছে আমাদের বাহিনী। হতে পারে এই সমরাভিযান অনেক হত্যা-বিগ্রহের জন্ম দেবে। এজন্য আপনার মতো এক মহান দরবেশের জন্য উচিত হল শহর থেকে বেরিয়ে পড়া, যাতে আপনাকে কোনোপ্রকার কষ্ট পোহাতে না হয়।

শায়েখ জবাব দিয়েছিলেন, আমার মুরিদান-মুতাআল্লিকান সবাই বাস করে এ শহরে। ওদের ছেড়ে আমি চলে যেতে পারি না। ওদের এখানে ফেলে রেখে গেলে আল্লাহর কাছে কীভাবে ওজরখাহি করব আমি?

শায়েখের এই জবাব শুনে চেঙ্গিজ-পুত্ররা তাকে দশজন লোকের নিরাপত্তায় বাইরে নিয়ে যাওয়ার আবেদন করল। শায়েখ তা-ও কবুল করলেন না। তাতার শাহজাদারা শত লোকের নিরাপত্তায় নিয়ে যাওয়ারও সুযোগ দিল। তবু রাজি হলেন না শায়েখ কোবরা। শেষমেশ বাধ্য হয়ে শাহজাদারা আবেদন করল, দেখুন, আপনাকে এক হাজার লোকের ছায়ায় এখান থেকে নিয়ে যাব। তারপরেও চলুন।

এইবার শায়েখ তার শেষ উত্তরটি শুনিয়ে দিলেন—এ কী করে সম্ভব, আমার সম্প্রদায়ের সাথে শান্তিময় নিরাপদ ৭০টি বছর এখানে পার করে দিয়েছি, কিন্তু মুসিবতের বেলায় এখন আমি ধ্বংসমুখে তাদের ছেড়ে নিজে খুঁজব মুক্তির পথ? ভেতর থেকে আমার গায়রত (আত্মমর্যাদাবোধ) আমাকে এই অনুমতি প্রদান করছে না।[৩০৩]

---

[৩০২] শাযারাতুয যাহাব ৫/৮০, নাফহাতুল উনস ৬৬০

[৩০৩] রওজাতুস সফা ৫/৩৪, জামিউত তাওয়ারিখ ৩৭৪

অগ্নি-বর্ষণ ও শহর ডুবিয়ে দেওয়ার এক বিরল পরিকল্পনা

খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের রাজধানী আরগেঞ্জের অবরোধ দীর্ঘতর হতে লাগল। তাতার নিশানাবাজেরা দিনরাত এক করে কামান দাগিয়ে প্রাচীরের বিভিন্ন দিক দুর্বল করে দিতে লাগল। পাশাপাশি আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহারও তারা অব্যাহত রাখল। কামানের মাধ্যমে উত্তপ্ত হাঁড়ি-পাতিল ও কেরোসিন তেলের কুপি বর্ষণ করতে আরম্ভ করল। এই অগ্নিবর্ষণ তছনছ করে দিল শহরের ভেতরকার অবস্থা। শহরের অধিকাংশ আবাসস্থল ছিল লাকড়ি-কাঠের তৈরি। তাই দ্রুত সেগুলোতে দাউ দাউ করে আগুন ধরে যেতে লাগল। জ্বলেপুড়ে নিঃশেষ হয়ে যেতে লাগল মুহূর্তখানিকের ভেতর।

কিছুদিন পর তাতাররা ভাবল আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের ফলে সবকিছু জ্বলেপুড়ে ভস্ম হয়ে যাচ্ছে। এভাবে চললে আমরা এখান থেকে ধনসম্পদ বেশি সংগ্রহ করতে পারব না। এই ভাবনা উদয় হতেই তারা বন্ধ করে দিল আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার।[৩০৪]

দিন কেটে যাচ্ছিল। কঠিন সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যে পড়েও মোকাবেলা অব্যাহত রেখেছিল মুসলমান। চেঙ্গিজ খানের ছেলেরা তাদেরকে ফুঁসলিয়েছিল যেন সংঘর্ষে নেমে না আসে। বলেছিল সাধারণ ক্ষমাপ্রদানের কথা। কিন্তু সেই চাতুর্যপূর্ণ কথা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছিলেন শহরের নেতৃবৃন্দ। পুরোদস্তুর অব্যাহত রেখেছিলেন লড়াই।[৩০৫]

এদিকে তাতার শাহজাদাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে চেঙ্গিজ খানের পক্ষ থেকে উপর্যুপরি সেনাসাহায্য এসে আক্রমণকারী দলের সংখ্যা ও শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি করে চলছিল। দীর্ঘ অবরোধের ব্যস্ততায় ক্লান্ত হয়ে-পড়া তাতার শাহজাদারা এই সদস্য-শক্তিকে কাজে লাগিয়ে এমন এক চাল চেলেছিল, ইতিহাসে যার দৃষ্টান্ত মেলে না কোথাও।

তারা সিপাহি ও কয়েদিদের বিরাট একটা সংখ্যাকে জাইহুন-নদীর ওপারে পাথরের একটি বাঁধ নির্মাণের আদেশ দিল, যাতে নদীর স্রোতের মুখ শহরের দিকে ফিরিয়ে ডুবিয়ে দেওয়া যায় পুরো জনপদ। এই পরিকল্পনায় শামিল ছিল না জোচি খান। সে ভাইদের সাথে জেদ ধরে বসেছিল যে, এই মনোরম শহরটি যেন কোনোভাবেই বিধ্বস্ত করা না-হয়। সে বলেছিল, খাকান (চেঙ্গিজ খান) এই শহর আমাকে দান করেছেন। আমি চাই না এটি বিধ্বস্ত হয়ে যাক।

জোচির কথায় একমত হল না চোগতাই খান। পরিকল্পনা অনুসারে কাজ শুরু করে দিল সে।[৩০৬]

---

[৩০৪] জাহাঁকুশা ১/১০০

[৩০৫] তারিখু মুখতাসারিদ দুওয়াল ২৩৫

[৩০৬] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ১৭১, নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৯০

তাতার শাহজাদাদের মধ্যে অনৈক্য

চোগতাই খান শহর ধ্বংস করেই ছাড়বে। পিছু ফিরে তাকাচ্ছিল না সে। তার এই গোঁ-ধরা মনোভাব দেখে জোচি খান নারাজ হয়ে গেল। ফলে চেঙ্গিজ-পুত্রদের ভেতর জেগে উঠল বৈরিতা। এতে করে তাতার-বাহিনীর পরিচালনা ও শৃঙ্খলাবদ্ধতায় মোটামুটি একটা চিড় ধরে গেল। পূর্বের তুলনায় অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়ল তাদের ঐক্যের বন্ধন। এই বিরুদ্ধ মনোভাব জারি রইল কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত। এতে করে শহরবাসীর যথেষ্ট অবকাশ মিলেছিল। তারা যথেষ্ট কর্মপন্থা বিন্যস্ত করে তাতার-বাহিনীর এলোমেলো আক্রমণের জবাবে তাদের ব্যাপক ক্ষতি করতে লাগল। এর ভেতর তাতাররা নদীর রোখ এদিকে ফেরানোর কাজ করে যাচ্ছিল। তাদের এই অপতৎপরতা রুখতে সুযোগ পেয়ে একদিন মুজাহিদদের একটি দল শহর থেকে বেরোল। নদীর তীরে গোপন ঘাঁটি গেড়ে অকস্মাৎ সেই ৩ হাজার তাতারের উপর হামলা করে বসল, যারা নদীর স্রোত শহরের দিকে ফেরাবার প্রচেষ্টায় নিরত ছিল। মুজাহিদবাহিনীর এই আক্রমণ এতটাই সফল হয়েছিল যে, সেদিন জীবিত ফিরতে পারেনি এই ৩ হাজার তাতারের একজনও।[৩০৭]

আরগেঞ্চ রণাঙ্গনে তুলি খান

এর ভেতরে চেঙ্গিজ খান উত্তর আফগানিস্তানের তালকান দুর্গ অবরোধের উদ্দেশ্যে চলে গিয়েছিলেন। অবরোধের তখন প্রথম দিন। চেঙ্গিজ খান ছিলেন তাঁবুর ভেতর। সংবাদ সরবরাহক এসে তাকে জানাল, আরগেঞ্চ এখনো বিজিত হয়নি। সিপাহিদের একটা বড় দল সেখানে মারা পড়েছে। সংবাদ সরবরাহক এটাও বলল যে, বিজয় লাভ করে উঠতে এত দেরি হওয়ার কারণ, আপনার পুত্রদের মাঝে মতপার্থক্য ঘটে গেছে। বাহিনীও হয়ে পড়েছে অবিন্যস্ত।

এই সংবাদ শুনে খুবই বিচলিত বোধ করলেন চেঙ্গিজ খান। তৎক্ষণাৎ তার সবচেয়ে সাহসী যোদ্ধা ও চতুর পুত্র তুলি খানকে আরগেঞ্চের উদ্দেশে রওনা করিয়ে দিলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল তুলি সেখানে পৌঁছেই ফিরিয়ে আনবে পূর্বের শৃঙ্খলা। সঙ্গে উকতাইয়ের উদ্দেশে হুকুমনামা পাঠালেন যে, শিগগির কথা বলে জোচি ও চোগতাইয়ের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ভাঙো।

ফলে তাতাররা আবার দ্রুতই একতাবদ্ধ হয়ে ওঠে। মুসলিম নিধনে ফিরে আসে তাদের পূর্বের সেই ক্ষিপ্রতা।[৩০৮] দুশমনকে নতুনভাবে একজোট হয়ে উঠতে দেখে শহরের যারা লড়াইয়ের যোগ্য ছিল, তারা সবধরনের হাতিয়ার নিয়ে শহরের

---

[৩০৭] প্রাগুক্ত

[৩০৮] জামিউত তাওয়ারিখ ৩৭৩, রওজাতুস সফা ৩৩

ফটকগুলির কাছে ভিড়ে এল। সবার বুকে তখন টিপটিপ করছিল আতংকে। পূর্বের সাহসিকতায় অনেকটা ভাটা পড়েছিল।

তারপর এক সপ্তাহ পর্যন্ত প্রাচীরের উপরে ও বাইরে জবরদস্ত লড়াই চলল। তাতাররা বারবার প্রাচীরে চড়ে উঠছিল আর মুসলমানরা শক্ত সংঘর্ষ করে নিচে নেমে যেতে বাধ্য করছিল তাদের। সংঘর্ষের ভেতর এ পর্যন্ত অনেক মুসলিম-সেনা শহিদ হয়ে গেছিল। তবে সেই তুলনায় তাতার নিহতের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি।[৩০৯]

পাঁচ মাস ধরে চলমান এই কঠিন যুদ্ধ তখন চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছতে চলেছে। এদিকে ৮০ বছরের বৃদ্ধ শায়েখ নাজমুদ্দীন কোবরার ধারণাও পোক্ত হয়ে উঠেছে যে, এইবার তার আখেরি সময় সন্নিকটে। দীর্ঘদিন ধরে তার মনে দানা বাঁধছিল আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শাহাদাতের অমৃত সুধাপানের তামান্না। এখন সেই সৌভাগ্য অর্জন ক'মুহূর্তের ব্যাপার মাত্র। তিনি মুরিদদের সম্বোধন করে বললেন, দেখো, নিঃশ্বাস খানিকটা মাত্র বাকি আছে। আখেরি মুহূর্ত এসে গেছে। এসো, শহরের বাইরে গিয়ে জিহাদের সেই পবিত্র ও পুরোনো রুসুম আবার তাজা করে তুলি।

মুরিদগণ বিনীত কণ্ঠে আরজ করেন, হজরত, শহর থেকে বেরোবার ব্যাপারটা অকল্যাণকর ঠেকছে।

শায়েখ জবাবি আলাপ শুরু করলেন; আজ তার কণ্ঠে অভূতপূর্ব মায়া, সাহস ও ভালোবাসা। বললেন, আমি তো কেবল আমার এই শুভ্র চুলগুলোকে শাহাদাতের রক্তে রাঙাতে চাচ্ছি।[৩১০]

সম্মুখসমর

এদিকে চলছে এই আলাপ-আলোচনা। ওদিকে তাতাররা সর্বশক্তি সঞ্চিত করে শহরের একদিকে ধুমধাম আক্রমণ শুরু করে দিয়েছে। খুব দ্রুতই শহরে খবর ছড়িয়ে পড়ল যে, জবরদস্ত হামলা চালিয়ে তাতাররা শহরের একটি মহল্লা কবজা করে ফেলেছে।[৩১১] এই কথা শুনে আক্রমণকারীদের ঠেকাবার উদ্দেশ্যে সমস্ত মুজাহিদ সেই মহল্লার পানে ছুটলেন। কিন্তু তাতাররা শহরের ভেতর আগেই ঢুকে গিয়েছিল। ফলে, আরগেঞ্চের অলিতে-গলিতে বেধে উঠল প্রচণ্ড যুদ্ধ। মুসলিম নওজোয়ানের দল তাতারদের সাথে জায়গায় জায়গায় লিপ্ত হল সম্মুখযুদ্ধে। শিশু ও বৃদ্ধরা উঠে গেল বাসস্থানের ছাদের উপর। সেখান থেকে একসঙ্গে তারা এলোপাথাড়ি তির ও পাথর বর্ষণ করতে লাগল।[৩১২]

---

[৩০৯] ইবনুল আসির ৭/৫৯২

[৩১০] রওজাতুস সফা ৫/৩৪

[৩১১] ইবনু খালদুন ৫/১১৬, ইবনুল আসির ৫/৫৯২

[৩১২] ইবনু খালদুন ৫/১১৬, ইবনুল আসির ৭/৫৯২

শহরে তাতারদের প্রবেশের সংবাদ শুনে শায়েখ নাজমুদ্দীন কোবরার বুকের ভেতর ছলকে উঠল বহুদিনের লালিত সেই দ্রোহের নদী। এক ঝটকায় তিনি উঠে দাঁড়ালেন। উচ্চকণ্ঠে মুরিদদের বললেন, ওঠো, আমরা আল্লাহর পথে কিতাল করতে যাচ্ছি।

শায়েখের এই উদ্দীপ্ত আহ্বানে সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে উঠল অনুসারীগণ। পরপর এসে জমায়েত হয়ে গেল সবাই। সবার চোখে-মুখে চকচক করছিল দুর্বিনীত বীরত্ব। শায়েখ নিজের ঘরে ঢুকলেন। একটুক্ষণ পর যখন বেরোলেন, দেখা গেল, তার মুরশিদের দেওয়া খেলাফতের স্মৃতিবাহী কাপড়ের একটি খণ্ড গায়ে জড়িয়ে নিয়েছেন তিনি। চেহারায় লেপটে আছে প্রথম দেখায় যে-কাউকে ভয় ধরিয়ে দেবার মতো প্রচণ্ড দৃঢ়তা ও গাম্ভীর্যের ছাপ। উপস্থিত মুরিদরা তার এই রুদ্রমূর্তি চেহারার দিকে সহজে দৃষ্টিপাত করতে পারছে না।

সংক্ষিপ্ত এই দলটি নিয়ে তিনি আগ্রাসনকারী তাতারদের উপর হামলা করলেন। সঙ্গে ছিল পাথরভর্তি একটা বড় থলি। তিনি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে শত্রুবাহিনীকে পাথর নিক্ষেপের লক্ষ্যভেদী নিশানা বানাতে লাগলেন। একসময় ফুরিয়ে এল থলির সব পাথর। তখন চকচকে-রুপালি বর্শা উঁচিয়ে ঢুকে গেলেন তিনি শত্রুদলের ভেতর। মাথার উপরের আকাশ ও সমস্ত ভূতল নিশ্চুপে কালের এক মহান অলির অসামান্য বীরত্ব দেখছিল তখন। দেখতে-না-দেখতেই শায়েখ বর্শা দিয়ে ঘা মেরে কয়েকজন তাতারের ভবলীলা সাঙ্গ করে দিলেন।

হঠাৎ এক দুশমনের কামান থেকে সাঁই করে একটি তির এসে শায়েখের বুকে বিদ্ধ হল। অতি আশ্চর্য ব্যাপার, শায়েখ একটুও তকলিফ প্রকাশ করলেন না। বরং চেহারায় তার ঝলমল করে উঠল আনন্দের এক অপার্থিব রঙ। জোরে টান দিয়ে বুকে গেঁথে-থাকা তিরটা তিনি বের করে ফেললেন। সেখান থেকে ছিটকে বেরোল টকটকে রক্তের ফোয়ারা। তিনি আকাশের দিকে রক্তমাখা সেই তিরটা উঁচিয়ে ধরে বলতে লাগলেন, 'আমার আল্লাহ, খণ্ডবিখণ্ড করে কিংবা অখণ্ড দেহে, যেভাবে ইচ্ছা আমাকে হত্যা করো, আমি রাজি আছি।'

ঠিক এমন সময় দেখলেন, উদ্যত ভঙ্গিতে এক পতাকাধারী তাতার এদিকেই আসছে। তিনি এক ঝটকায় তার পতাকা ধরে ফেললেন। শক্তভাবে ধরেই রইলেন। তাতারটা দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে শত চেষ্টা করেও শায়েখের মুঠোর ভেতর থেকে পতাকা বের করতে পারল না। একটু পরে এই অবস্থাতেই তার শাহাদাত হয়ে গেল। তার শাহাদাতের পরেও সেই পতাকার কাষ্ঠদণ্ড তার হাত থেকে ছোটানো গেল না। শেষমেশ পতাকার খুঁটি কেটে তাতাররাই তার হাত থেকে সেটা আলাদা করল।[৩১৩]

---

[৩১৩] রওজাতুস সফা ৫/৩৪, নাফহাতুল উনস ৬৬১, শাযারাতুয যাহাব ৫/৮০

মাওলানা জালালুদ্দীন রুমি (তিনি শায়েখ নাজমুদ্দীন কোবরার খলিফা মাওলানা বাহাউদ্দীনের সন্তান হওয়ার সুবাদে এই মহান সিলসিলার ফয়েজ লাভ করেছিলেন) অধিকাংশ সময় রণাঙ্গনে শায়েখ কোবরার এই বীরত্বের দৃশ্যে প্রভাবিত হয়ে আল্লাহর আশেকদের শানে বিমুগ্ধ কণ্ঠে আবৃত্তি করতেন—

بہ یکے دست مئے خالص ایمان نوشند

بہ یکے دست دگر پرچم کافر گیرند

আল্লাহর আশেক তো একহাতে ঈমানের খাঁটি ও সুমিষ্ট সুরাপাত্রে মুখ লাগিয়ে থাকেন, অন্যহাতে তিনি শক্ত থাবায় ছিনিয়ে নেন কাফেরের পতাকা।

গণহত্যা : রাজধানীর সলীল সমাধি

তাতার-বাহিনী শহরে ঢুকে পড়ার পরেও আরগেঞ্চের গলিতে-গলিতে সিংহহৃদয় মুসলমানরা একসপ্তাহ যাবৎ তাদের সাথে লড়ে যাচ্ছিল। এই সুবিশাল রাজধানীতে ছিল অনেকগুলো মহল্লা। ভৌগোলিক অবস্থান ও আক্রমণ প্রতিরোধের বিবেচনায় প্রত্যেকটি মহল্লাই ছিল একেকটি প্রাচীর-ঘেরা শহরের মতো। তাতার-বাহিনী তবু থেমে থাকেনি। সঞ্চিত সমস্ত শক্তি দিয়ে একের-পর-এক কবজা করে নিচ্ছিল সব মহল্লা।

কোনো মহল্লা বেহাত হয়ে গেলে সেখানকার মুসলিমরা আরেক মহল্লায় গিয়ে দুর্গ গড়ে তুলছিল। সেখানেই অবরুদ্ধ হয়ে থেকে চালিয়ে যাচ্ছিল বীরদর্প মোকাবেলা।

এই লড়াইয়ে যুবকদের পাশাপাশি নারী, শিশু, বৃদ্ধ সবাই অংশগ্রহণ করেছিল। তাতাররা যে মহল্লাটিই আয়ত্ত করে নিচ্ছিল, সঙ্গে-সঙ্গে ভূমিতে ধসিয়ে দিচ্ছিল সেখানকার সুউচ্চ দেয়াল ও পাঁচিলগুলো। মাল-সামানা লুট করে নিচ্ছিল। সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকা সমস্ত আবাসস্থলে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছিল। শেষমেশ বাঁচতে পেরেছিল শুধু শহরের বড় তিনটে মহল্লা। অবশিষ্ট মুসলিমরা সেগুলির ভেতরে গিয়ে আবদ্ধ হয়ে রইল।

আল্লামা যাহাবি রহ. তারিখে ইসলাম গ্রন্থে শায়খ নাজমুদ্দীন কোবরার পরিচয় উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন—তার নাম ছিল আহমাদ ইবনে উমর। তিনি খাওয়ারিজমের 'খিয়ুক' নামক গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। আলেক্সান্দ্রিয়ায় মুহাদ্দিস আবু তাহের সালাফির শাগরেদ ছিলেন। ছিলেন সুফি, পরহেজগার এবং শাফিঈ ফিকহের আলেম। বহু যুগের প্রচেষ্টার পর দীনের ইলম ও আল্লাহর মারিফাত লাভ করেছিলেন তিনি। শামের হালব শহরের খানকায় দীর্ঘ এক যুগ কাটিয়েছিলেন। ১২ খণ্ডে কুরআন মাজিদের তাফসিরগ্রন্থও লিখেছিলেন। শেষদিকে মাতৃভূমি খাওয়ারিজমে ফিরে এসে সুলুক ও ইহসানের সিলসিলা জারি করেছিলেন এবং সেখানেই শহিদ হয়েছিলেন তিনি।

কিন্তু এবারে প্রথম ও শেষবারের মতো তাতারদের কাছে প্রাণভিক্ষার আবেদন পাঠাল শহরের কিছু লোক। নগরবাসীর পক্ষ থেকে তাতার শাহজাদাদের কাছে আবেদনপত্র নিয়ে গেলেন শহরের তত্ত্বাবধায়ক মুফতি আলাউদ্দীন খাইয়াতি। তাকে একটি তাঁবুর ভেতরে নিয়ে বসানো হল। সেখানে মোলাকাত হল জোচি খানের সাথে। আলোচনার মাঝে মুফতি সাহেব একবার বলে উঠলেন, আমরা আপনাদের ভয়ংকর শক্তিমত্তা তো দেখলাম, এবার আপনাদের পরম অনুগ্রহ ও অনুকম্পার কিছু দৃশ্য দেখতে চাই।

প্রথম থেকেই রুদ্রমূর্তি ধারণ করে বসে ছিল জোচি খান। এবার দ্বিগুণ ক্রুদ্ধ হয়ে সে হেঁকে উঠল, এরা আমাদের ভয়ংকর অবস্থার কী এমন দেখেছে? উলটো ওরাই তো আমাদের দেখিয়েছে। মেরে মেরে আমাদের সৈনিকদের নিঃশেষ করে দিয়েছে। চলো, এবার আমি দেখাচ্ছি আমার ভয়ংকর রূপ।

এভাবে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে প্রত্যাখ্যান করা হল নগরবাসীর নিরাপত্তার আবেদন। যুদ্ধের সপ্তমদিনে তাতার-বাহিনী পুরো শহর দখল করে ফেলল। চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল সমস্ত মহল্লা। বাচ্চাকাচ্চা যত ছিল, সবাইকে তারা হাঁকিয়ে শহরের বাইরে নিয়ে এল। এখানে সার ধরে ওদের সবাইকে জবাই করা হল। রাজধানী আরগেঞ্চ ছিল পুরো পৃথিবী থেকে আগত সুনিপুণ-সুদক্ষ সব ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে গড়ে-ওঠা এক মনোরম স্বর্গ। ইঞ্জিনিয়ারদের একটা বড় দল এখানে বিদ্যমান ছিল তখন।

বেছে বেছে এমন ১ লক্ষ শাস্ত্রজ্ঞ লোককে তাতাররা সবার থেকে আলাদা করল। উদ্দেশ্য ছিল, পরবর্তীতে এদেরকে চেঙ্গিজীয় সাম্রাজ্যের উন্নয়নপ্রকল্পে নিমগ্ন হতে বাধ্য করা হবে। সুশ্রী-সুন্দরী নারীদের ধরে ধরে বন্দি করা হল তাতার শাহজাদা ও সরদারদের ভোগের জন্য। বাকিদের শুধু তলোয়ার দিয়ে নয়, কোদাল, চাবুক ও লাঠি দিয়ে পর্যন্ত মারতে আরম্ভ করল। ফলে এই সারা শহর সেদিনকার জন্য হয়ে উঠল কলোকলো রক্তের এক টলটলে নহর।

জামিউত তাওয়ারিখের বর্ণনায় আছে, এই মুসলিম নিহতের সংখ্যা আনুমানিক ১২ লাখের কম ছিল না। কারণ, গণহত্যায় অংশগ্রহণকারী তাতারদের সংখ্যা ছিল ২৫ হাজার। তাদের প্রত্যেকের ভাগে পড়েছিল ২৪ জন করে মুসলমান।[৩১৪]

এই হত্যাযজ্ঞ থেকে অবসর হয়ে তাতার-বাহিনী তাদের সেই পাশবিক কার্যক্রম সম্পন্ন করল, যার প্রস্তুতি গত কয়েক মাস ধরে তারা নিচ্ছিল। অর্থাৎ, জাইহুন-নদীর বাঁধের মুখ আরগেঞ্চের দিকে ফিরিয়ে দিয়ে পানিতে ডুবিয়ে দিল সারা শহর। খাওয়ারিজমিদের এই প্রিয় শহরটি উপকথার এক জলমগ্ন শহর হয়ে পড়ে রইল। পরিণত হল সুপ্রাচীন গল্পকথায়।[৩১৫]

---

[৩১৪] জামিউত তাওয়ারিখ ৩/৩৭৩

[৩১৫] জামিউত তাওয়ারিখ ৩/৩৭৩, ইবনুল আসির ৭/৫৯৩

আল্লামা ইবনুল আসির এই বেদনাময় ট্রাজেডি দেখে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন, 'তাতাররা এই শহরটি পুরোপুরি ডুবিয়ে দিয়েছে। চূর্ণবিচূর্ণ সব ইমারতের উপর দিয়ে ধেয়ে চলেছে পানির বিস্তার। শহরের এ-মাথা থেকে ও-মাথাজুড়ে পড়ে আছে আস্ত একটা ভগ্নস্তূপ। কোথাও-কোথাও পানির উপর ভেসে আছে আধাভাঙা দালানের কোনো পিলার। ভেসে চলেছে কাঠখড়লাকড়ি। এখানকার বাসিন্দাদের একজনও জীবিত বাঁচতে পারেনি। অন্য শহরগুলোর কিছু লোক তো বেঁচে গিয়েছিল। কেউ আত্মগোপন করে, কেউ দূরে কোথাও পালিয়ে গিয়ে, আবার কেউ অজস্র লাশের সারিতে মৃতের ভান করে শুয়ে থেকে প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হয়েছিল।

কিন্তু তাতারদের ভয়ে খাওয়ারিজমের (আরগেঞ্চের) বাসিন্দাদের যারা লুকিয়ে পড়েছিল শহরের আনাচকানাচে, তাদের পুরোপুরি ডুবিয়ে দিল পানি। কিংবা কেউ মারা গেল ভগ্ন প্রাসাদের নিচে চাপা পড়ে। ফলে, সম্পূর্ণ বিরানভূমি হয়ে পড়ে রইল এ শহর। বলা যায়—হাজুন থেকে আরম্ভ করে সাফা পর্যন্ত ছিল না কোনো সমব্যথী লোকের উপস্থিতি। মক্কাতেও ছিল না মধ্যরাতে মজার-মজার গল্প বলার কেউ। এইরকম কোনো ট্রাজেডি পূর্বযুগেও কখনো শোনা যায়নি, শুনিনি নিকট অতীতেও।[৩১৬]

তাতারদের ক্ষয়ক্ষতির খেরোখাতা

আরগেঞ্চ দখল করতে তাতারদের পাঁচমাসব্যাপী ব্যয় করতে হয়েছিল কঠোর পরিশ্রম।[৩১৭] এই দীর্ঘ সময়কালে এ শহরের বাহাদুর ও সশস্ত্র মুসলমানেরা যে বীরত্ব ও সাহসিকতার নজির দেখিয়েছিল, তা কেয়ামত পর্যন্ত ইতিহাসের পাতায় প্রশংসা পাওয়ার হকদার। এই লড়াইয়ে তাতারদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছিল। তাদের জন্য সেই ক্ষতি ছিল খুবই অপ্রস্তুত ও অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতা।

অবরুদ্ধ মুসলমানেরা নিজেদের সীমিত উপকরণ সত্ত্বেও তীব্র মোকাবেলা করে গিয়েছিল। যদিও তাদের অনেকের জিহাদি প্রশিক্ষণ কিংবা সমর-দক্ষতা কোনোটাই ছিল না। তবু সেই নাজুক সময়ে মুজাহিদবাহিনীর সাথে ভরপুর সহযোগিতা করে গিয়েছিল নগরবাসী। তাদের সাথে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করে তাতারদের এত বেশি লাশ ফেলে দিয়েছিল যে, তাতার-বাহিনীর পক্ষে নিহতদের সঠিক পরিসংখ্যান করতে পারাই হয়ে উঠেছিল দুষ্কর। জায়গায়-জায়গায় লাশের স্তূপ পড়ে গিয়েছিল।

---

[৩১৬] তারিখুল কামিল লি-ইবনিল আসির, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা, ৫৯২

[৩১৭] ইবনুল আসির ৭/৫৯২, কিন্তু জামিউত তাওয়ারিখের বর্ণনানুযায়ী ৭ মাসের অধিক সময় অতিবাহিত হয়েছিল।

মানবদেহ পচে-গলে, ফুলে-ফেটে, হাড্ডিসারের বড়-বড় টিলা গড়ে উঠেছিল, যা পরবর্তী এক শতাব্দী পর্যন্ত এই শহরের অধিবাসীদের বীরত্ব ও সাহসিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে ছিল।[৩১৮]

জোচিকে ভর্ৎসনা

রাজধানী জয় করতে গিয়ে তাতারদের সামনে যেসব বাধাবিপত্তি আপতিত হয়েছিল, তার মধ্যে নগরবাসীর বীরত্ব ছাড়াও শহরের প্রশস্ততা, প্রাচীরের উচ্চতা ও কাঠিন্যের একটা বড় ভূমিকা ছিল। পাশাপাশি আরেকটা কারণও ছিল। তা হল, দুই ভাই উকতাই ও চোগতাইয়ের সঙ্গে তাতারদের পুরো বাহিনীর সিপাহসালার জোচি খানের মতানৈক্য। এই একটি কারণে নষ্ট হয়ে পড়েছিল তাদের পুরো বাহিনীর শৃঙ্খলাবদ্ধতা। বিজয় অর্জনের জন্য অন্যান্য-বারের তুলনায় এখানে বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল অনেক। তা ছাড়া শহর বিধ্বস্ত করতে সম্মত ছিল না জোচি খান। জোচির বড় একটা ত্রুটি ঘটে গিয়েছিল। সুলতান জালালুদ্দীনকে হত্যা নাহয় গ্রেফতার করার দায়িত্ব পেয়েছিল সে। কিন্তু এতে ব্যর্থ হয়েছিল জোচি।

এই বিষয়গুলো চেঙ্গিজ খানকে উত্তপ্ত করে তুলেছিল। শহর দখলের পর জোচি খান যখন চেঙ্গিজ খানের দরবারে গিয়ে পৌঁছল, পিতার চরম ভর্ৎসনার মুখে পড়ল সে। চেঙ্গিজ খান তাতার-বাহিনী থেকে জোচি খানকে ছাঁটাই করার হুকুম দিলেন। জোচি খান বাবার উপর অভিমান করে নিজের খাস কিছু লোক নিয়ে হনহন করে চলে গেল কাসপিয়ান সাগরের পারে।[৩১৯]

---

[৩১৮] জামিউত তাওয়ারিখ গ্রন্থে (যা তাতার এই আক্রমণের এক শতাব্দী পরে রচিত হয়েছিল) লেখা হয়েছে—খাওয়ারিজমিরা তাতারদের বড় একটা সংখ্যাকে হত্যা করেছিল। লোকে বর্ণনা করে, তাতার-নিহতদের হাড়-গোড় একত্র করায় যে টিলা গড়ে উঠেছিল, তা এখনো শহরের প্রাচীন নিদর্শন হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে। (জামিউত তাওয়ারিখ ৩৭৩)

[৩১৯] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১৭, পৃষ্ঠা ১৩২-১৩৩

চতুর্দশ অধ্যায়

নতুন শঙ্কা : নতুন সংকল্প

উসতুওয়ার যুদ্ধ

রাজধানী থেকে বের হয়ে খোরাসানের দিকে যাচ্ছিলেন সুলতান জালালুদ্দীন। বাতাসে কালো পতাকা উড়িয়ে ছুটে চলছিল ছোট্ট বাহিনীটি। সুলতানের আশা ছিল খোরাসান পৌঁছে সেখানকার নাসা ও নিশাপুরের মতো বড় শহরগুলো তিনি নতুন দুর্গ হিসেবে গড়ে নিতে পারবেন।

আরগেঞ্চ থেকে খোরাসান সীমান্ত পর্যন্ত প্রায় ২৫৬ মাইলের রাস্তা। এ দুইয়ের মাঝখানে শুধু আদিগন্ত বিস্তৃত ধূ-ধূ মরুভূমি। কোথাও কোনো ছায়াদায়ী বৃক্ষের অস্তিত্ব নেই। এটুকু দূরত্ব অতিক্রম করতে হলে সাধারণত সময় লাগত পূর্ণ ১৬ দিন। কিন্তু সুলতান জালালুদ্দীন অত্যন্ত দ্রুততার সাথে পথ চলে মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে অতিক্রম করে ফেললেন এই বিস্তীর্ণ মরুভূমি।

কিন্তু সামনের এই সফরও শঙ্কা থেকে মুক্ত ছিল না। জায়গায়-জায়গায় তাতারদের সেই সৈন্যদলের সাথে সংঘর্ষ বাধবার আশঙ্কা ছিল, চেঙ্গিজ খানের নতুন নির্দেশ পেয়ে যারা আরগেঞ্চের যুদ্ধে শরিক হতে রুদ্ধশ্বাসে ছুটে আসছিল এদিকে। তা ছাড়া খোরাসান সীমান্তে একটি বাহিনী মোতায়েন করে রেখেছিলেন চেঙ্গিজ খান। সেই বাহিনী মার্ভ থেকে শাহরাস্তানা পর্যন্ত রচনা করে ফেলেছিল একটি গোলাকার বৃত্ত। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, খাওয়ারিজমি শাহজাদা যদি আরগেঞ্চ থেকে পালিয়ে এইদিকে আসে, তখন তাকে পাকড়াও করতে হবে।

তা ছাড়া প্রত্যেক জায়গায় তাতারদের বহু মিত্র দুর্গপতি ও সংবাদ সরবরাহক বিদ্যমান ছিল। এইসব নরপশুর দৃষ্টি এড়িয়ে নিজ মনজিলের পানে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিলেন সুলতান।[৩২০]

মার্ভ হতে শাহরাস্তানা পর্যন্ত টহল দিচ্ছিল যে তাতার দলটি, হঠাৎ তাদের সিপাহসালারের কাছে ব্যস্ত ভঙ্গিতে এক গুপ্তচর এসে জানাল, 'ছোট একটি কাফেলা নিয়ে এদিকেই আসছে সুলতান জালালুদ্দীন।'

ইতিপূর্বে চেঙ্গিজ খানের পক্ষ থেকে সকল তাতার কমান্ডারকে শক্ত নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, 'যেভাবেই হোক, তোমরা সুলতান জালালুদ্দীন নামক আপদটাকে ধূলিসাৎ করে দেবে।'

---

[৩২০] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ১২৬, নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৬৪

ফলে, গুপ্তচরের সংবাদটা পেতেই এই তাতার-সেনাপতির মনে জেগে উঠল যে, এইবার খাকানের সামনে সম্মানিত হবার একটা সুযোগ মিলে গেছে আমার। লোভের ভেতর পড়ে সে দ্বিগুণ আগ্রাসী হয়ে উঠল। খাওয়ারিজমি বাহিনীর লাগাতার পরাজয় বরণের পর, একজন তাতার-সেনাপতি সাধারণত এক হাজার খাওয়ারিজমির জন্য ৫০০ তাতার-সেনা সঙ্গে নেওয়াকেই যথেষ্ট মনে করত। কিন্তু এই সেনাপতি নিশ্চিত সফলতা লাভের জন্য, সুলতান জালালুদ্দীনের তিনশ সহচরকে দমন করতে অভিজ্ঞ ও নির্বাচিত সাতশ বাহাদুরকে সেদিকে রওনা করিয়ে দিল, যেদিক থেকে আসছিলেন সুলতান জালালুদ্দীন। এরা সুলতানের আসার পথে উসতুয়া অঞ্চলের পুশতাশায়কান নামক স্থানে পৌঁছে ঘাঁটি গেড়ে ওত পেতে বসে রইল।[৩২১]

কাফেলা নিয়ে সুলতান যখন এখানটায় এসে পৌঁছলেন, ঠিক তক্ষুনি ঘাঁটির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে বুভুক্ষু হায়নার মতো তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তাতার-বাহিনী। সুলতান জালালুদ্দীন ও সহচরবৃন্দ পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে একদম অজ্ঞাতাবস্থায় এদিকে আসছিলেন। তাই প্রথম আক্রমণেই পুরোপুরিভাবে তাতারদের ঘেরের ভেতর পড়ে গেলেন। তাতাররা যদিও অপ্রস্তুত ও অস্বাভাবিক অবস্থায় হামলা করে বসেছিল, তার উপর তাদের সংখ্যাও ছিল দ্বিগুণের চেয়ে বেশি, তবু সুলতান জালালুদ্দীনের জানবাজ সৈনিকরা বিদ্যুচ্চমকের মতো মুহূর্তেই খাপমুক্ত করে ফেলল খরধার তলোয়ার। আল্লাহু আকবরের সমুন্নত তাকবিরধ্বনি তুলে ফেটে পড়ল তারা দুশমনের উপর। এমন কঠিন লড়াই করল যে, তাতার-সেনারা কুচিকুচি হয়ে কাটা পড়ল বলা যায়। সুলতানের তলোয়ারও তাতারদের নাপাক রক্তে জবজবে হয়ে উঠল। হক-বাতিলের এই আকস্মিক যুদ্ধ অব্যাহত রইল অনেকক্ষণ। মুসলিম গাজিরা তাতারদের লাশের স্তূপ ফেলে দিল। পশুদের কিছু পলাতক সৈন্য ব্যতীত কেউ জীবিত বাঁচতে পারল না।

আহমাদ নাসাবি বলেছেন—'এই যুদ্ধেই প্রথমবারের মতো তাতারদের রক্তে রঞ্জিত হয়ে উঠেছিল ইসলামের শমশির। তাদের লাশ নিয়ে ক্রীড়ায় মেতে উঠেছিল মুসলিমবাহিনী।'

এই রণক্ষেত্র থেকে যে-সমস্ত তাতার জীবিত পালিয়ে গিয়েছিল, তাদেরকে ঘিরে ফেলেছিল আশপাশের বিভিন্ন এলাকার কৃষকেরা। তারপর টেনে-হিঁচড়ে নাসায় নিয়ে এসেছিল। তারপর তাদের কল্লা উড়িয়ে দিয়েছিল সেখানকার হাকিম এখতিয়ার উদ্দীন। এই যুদ্ধের পর সুলতান জালালুদ্দীনের আন্দাজ হয়ে গিয়েছিল এই তাতার দলটি আশপাশে কোথাও বিদ্যমান তাদের বড় কোনো বাহিনী থেকে এসেছে। ফলে

---

[৩২১] জাহাঁকুশা ২/১৩২, সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ১২৬, নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৬৪

তিনি মনে করলেন, এক্ষুনি এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া জরুরি। সুলতানের কাছে তখন তাতারদের থেকে অর্জিত যথেষ্ট গনিমতও ছিল। প্রাচুর্যের অবস্থা পূর্বের তুলনায় হয়ে উঠেছিল অনেকটাই শক্তিশালী।[৩২২]

এখতিয়ার উদ্দীনের সাহায্য

ঘাস-পানিবিহীন মরুসাহারা ও গভীর বন-জঙ্গল পেরিয়ে সুলতান জালালুদ্দীন খাওয়ারিজম শাহ নাসার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। এই সুদীর্ঘ পথপরিক্রমায় সীমাহীন ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছে তার সওয়ারি। ক্ষুধায় সহচরদের সমস্ত শরীর বিধ্বস্ত। ঢোক গিলতে গিয়ে গলার কাছে তাদের আটকে যাচ্ছে থুথু। এই মরু-এলাকায় খাদ্য-খোরাকি ও ঘাসপানির নাম-নিশানা পর্যন্তও নেই।

এখন দ্বিপ্রহর। মরুভূমির উত্তপ্ত বালিয়াড়িতে আগুন ঢালছে সূর্য। সামনের দিকে তাকালে বালির ঝিলিকে ঝলসে যায় চোখ। নাসার প্রাচীর-বেষ্টিত জোয়ানমান্দ এলাকার কাছাকাছি পৌঁছল কাফেলা। জোয়ানমন্দে কাফেলা নিয়ে কিছুক্ষণ থামলেন সুলতান জালালুদ্দীন। একজন পত্রবাহককে বস্তির দিকে পাঠালেন। দূর থেকে কালো পতাকাধারী একজন যোদ্ধাকে আসতে দেখে হয়রান হয়ে গেল বস্তিবাসী। পত্রবাহক প্রাচীরের কাছে গিয়ে দূরাগত কণ্ঠে ডাক দিল, এই বাহিনী সুলতান জালালুদ্দীনের। নাসার সীমান্ত এলাকায় এরা তাতারদের পরাজিত করে এসেছে। কাফেলার মধ্যে স্বয়ং সুলতানও রয়েছেন।

বস্তিবাসী পত্রবাহকের কথা মিথ্যা মনে করল। কারণ, তাতারদের পরাজয় ঘটবে এটা তাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য ছিল না। তা ছাড়া সুলতান এত কাছাকাছি অবস্থান করছেন! এটাও ছিল তাদের কাছে আশ্চর্য ব্যাপার। এজন্য তারা প্রাচীরের ফটক খুলল না।

কিছুক্ষণ পরে আরও একজন পত্রবাহক এসে উচ্চকণ্ঠে ডেকে বলল, 'হে বস্তিবাসী, তোমরা সংশয় ও সতর্কতা অবলম্বন করতেই পারো। এক্ষেত্রে সুলতান জালালুদ্দীন তোমাদের মাজুর মনে করেছেন। তিনি তোমাদের শ্রদ্ধা করেন; কিন্তু খুব শিগগিরই তোমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে আসল বাস্তবতা। তখন তোমাদের অনুতপ্ত হওয়া লাগবে। আচ্ছা ঠিক আছে, এখন তোমরা আমাদের বাহিনী ও বাহনজন্তুগুলোর জন্য খাদ্য-খোরাকির ব্যবস্থাটুকু করো।'

বস্তিবাসী খাদ্য-খোরাকির ব্যবস্থা করে দিল। তারপর এক ঘণ্টা পরে বস্তির দিকে অগ্রসর হল কাফেলা।

---

[৩২২] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ১২৬, নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৬৪, জাহাঁকুশা ২/১৩২

পরবর্তীকালে সুলতান এই অনুগ্রহের স্মৃতি রোমন্থন করে খানিকটা উদাস ভঙ্গিতে বলে উঠতেন, সেদিন নাসাবাসী যদি মদদ না-করত, আমরা নিশাপুর পর্যন্তও পৌঁছতে পারতাম না। কারণ, যে-সমস্ত সওয়ারির মাধ্যমে আমরা মরুভূমির বিস্তৃত বালুরাশি পাড়ি দিচ্ছিলাম, সেগুলো ক্লান্তিতে নুয়ে পড়েছিল।

সুলতান জোয়ানমান্দ থেকে রওনা করতেই, এখানকার যিনি প্রধান ছিলেন, তিনি নাসার হাকিম এখতিয়ার উদ্দীনের কাছে এক সংবাদবাহককে দিয়ে একটি চিঠি লিখে পাঠালেন। এই কাফেলার সংবাদ জানালেন তাকে।

এক অজ্ঞাত সৈন্যদলের হাতে তাতার-বাহিনী পরাজিত হয়েছে বলে পূর্বেই একটা সংবাদ পেয়েছিলেন এখতিয়ার উদ্দীন। এবার জোয়ানমন্দের পত্র পড়ে তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেল যে, এই কীর্তি একমাত্র সুলতান জালালুদ্দীনই ঘটিয়েছেন।

ফলে, এখতিয়ার উদ্দীন সহযোগিতা ও নিরাপত্তার জন্য কিছু সিপাহি, আরোহীদের জন্য কিছু তাজাদম ঘোড়া এবং মালবহনের জন্য কিছু খচ্চর পাঠিয়ে দিলেন সুলতানের খেদমতে। কিন্তু তার এই তোহফা পৌঁছার আগেই সুলতানের কাফেলা এগিয়ে গেল অনেক দূর।[৩২৩]

শাদইয়াখে অবস্থান

খোরাসানের সীমান্ত এলাকায় যাত্রাপথে সুলতান জালালুদ্দীন সর্বপ্রথম শাদইয়াখে ছাউনি ফেললেন। এখানে দু-তিনদিন অবস্থান করলেন তিনি। এর মাঝে পরবর্তী প্রজ্ঞাপূর্ণ কার্যক্রম কেমন হতে পারে, সেই নিয়ে সহচরদের সাথে পরামর্শ, যুদ্ধের সামানপত্র ও সফরের সরঞ্জামাদির ব্যবস্থাপনা, জিহাদের দাওয়াত ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজে মশগুল রইলেন। এর ভেতর অকস্মাৎ সংবাদ পেলেন, শাদইয়াখ অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে তাতারদের একটি বাহিনী। তাদের প্রধান টার্গেট সুলতানকে গ্রেফতার করা।

সুলতানের সহচরবৃন্দ এই সময় এই বড় বাহিনীটির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে না। সে-রকম অবস্থা ও সক্ষমতা এখন তাদের মাঝে নেই। এজন্য সংবাদটা পেতেই কাফেলা-সমেত শহর থেকে মাঝরাত্তিরে বেরিয়ে পড়লেন সুলতান জালালুদ্দীন। মরুরাতের অদ্ভুত নির্জনতার ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে কাফেলা। আকাশের চাঁদটা মরুভূমির বালিয়াড়ির উপর ঢেলে দিয়েছে হালকা মোলায়েম আলোর স্রোত। ঝুপসি অন্ধকারের সাথে চাঁদের আলো মিশ্রিত হয়েছে বলে চারপাশ থেকে ঝুলে আছে একটা আবছায়া। হঠাৎ গাঢ় নীরবতার পর্দা চিরে অদ্ভুত কণ্ঠে ডেকে ওঠে মরুর কোনো অচেনা পাখি। মৃদুমন্দ বাতাসের চুমোয় শিহরিত হয়ে অদূরে কাঁপতে থাকে কয়েকটা বাবলাগাছের পাতা।

---

[৩২৩] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ১২৭, ইবনু খালদুন ৫/১১৫

সুলতানের এই নৈশভ্রমণ ১৫ জিলহজ, ৬১৭ হিজরির (১০ ফেব্রুয়ারি, ১২২১ খ্রিষ্টাব্দ) ঘটনা। সুলতানের শহর থেকে বেরোবার একটুক্ষণ পরেই তাতার-বাহিনী এসে শহরের সামনে উপস্থিত হল। কিন্তু যখন জানতে পারল সুলতান নেই শহরে, তৎক্ষণাৎ পেছন-পেছন ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। তারপর খুব দ্রুতই সুলতানের একদম কাছাকাছি পৌঁছে গেল তারা।

বিজলির বেগে ছুটে চলা

পেছন থেকে ছুটে আসা বাহিনীর গতি দেখে সুলতানের আন্দাজ হয়ে গেল, এদের কোনো বিভ্রমে না-ফেলে পিছু-ছাড়া করা মুশকিল। ফলে তিনি একটি মনজিলে পৌঁছে কাফেলা দুভাগ করে ফেললেন। একভাগের আমির বানালেন মালিক ইলেদযককে। থমথমে গলায় তাকে নির্দেশ দিলেন, 'শোনো, তাতার-বাহিনীকে ধোঁকায় ফেলে ভুল পথে নিয়ে যাবে তুমি।' বলেই তিনি রওনা দিয়ে দিলেন অন্য দিকে।

সুলতানের রওনা দেবার খানিক পরেই তাতার-বাহিনীর প্রথমাংশ যখন সেই মনজিল পর্যন্ত পৌঁছল, মালিক ইলেদযকের জানবাজ সিপাহিরা বাগে পেয়ে তাদেরকে তির ও বর্শার সাহায্যে আঘাত করতে লাগল। কতক্ষণ লড়াইয়ের পর পিঁপড়ের সারির মতো তাতার-বাহিনীর সৈন্যবহর যখন অনবরত আসতেই লাগল, মালিক ইলেদযক তখন সুলতান জালালুদ্দীন যে পথে গিয়েছেন, তার থেকে ভিন্নপথে পিছু হটে গেলেন।

ফলে তাতাররা মনে করল সুলতানও এদিকটাতে কোথাও আছে। তাই দ্রুত তারা ইলেদযকের পিছু-পিছু দৌড় লাগাল। সুলতান এই সুযোগটা ব্যবহার করে দুশমনের নাগালের বাইরে চলে গেলেন। তিনি এত দ্রুত অগ্রসর হতে লাগলেন যে, কোথাও না-থেমে এক মনজিলেই একনাগাড়ে ৪০ ফারসাখ (১২০ মাইল) পথ অতিক্রম করলেন। এই উল্কাবেগে ছুটে চলার ঘটনাটি সেকালের সমস্ত আশ্চর্য বিষয়ের একটি।[৩২৪] পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো মহান বিজেতা, কোনো অভিজ্ঞ যোদ্ধা, কোনো দক্ষ বাহিনী কিংবা কোনো পর্যটক দল এত দ্রুত সফর করতে পেরেছে বলে নজির নেই।

কুতুবুদ্দীন ও আক সুলতানের শাহাদাত

সুলতানের ভাই কুতুবুদ্দীন আযলাক ও আক সুলতানও সুলতানের পিছে-পিছে খোরাসানের দিকে যাচ্ছিল। মার্জ সাবেগ নামক স্থানে পৌঁছে তারা খবর পেল, তাদের পেছনেই রয়েছে তাতারদের একটি দল। তা শুনে শাহজাদারা পূর্বের তুলনায় ঘোড়ার গতি অনেক বাড়িয়ে দিল।

---

[৩২৪] জাহাঁকুশা ২/১৩৪

তাতারদের সঙ্গে সুলতান জালালুদ্দীনের যুদ্ধপরবর্তী তৃতীয়দিনে কাফেলা নিয়ে কুতুবুদ্দীন ও আক সুলতান উসতুওয়া অঞ্চলে এসে পৌঁছে। অকস্মাৎ শাহজাদাদের এই আগমনে সতর্ক হয়ে ওঠেন নাসার হাকিম এখতিয়ার উদ্দীন। এক সংবাদবাহক মারফত তাদেরকে এব্যাপারে সতর্ক করে তোলেন যে, এই এলাকায় তাতারদের আনাগোনা রয়েছে। সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে তাদের ত্রাস। আপনারা খুব সতর্কতার সঙ্গে আসুন।

পাশাপাশি দুজনের খেদমতে কিছু তোহফা, সওয়ারি ও রাহাখরচও পাঠালেন এখতিয়ার উদ্দীন। ফাঁকে আরেকটা আবেদনও জানালেন যে, নাসার হাকিম হিসেবে যেন তাকেই বহাল রাখা হয়।

এখতিয়ার উদ্দীনের এই খেদমতে কুতুবুদ্দীন খুশি হয়ে তার জন্য লিখে দিল নাসার শাসনকার্যের পরোয়ানা। এখতিয়ার উদ্দীন সেই পরোয়ানা পেয়ে যারপরনাই খুশি হলেন। এমন সময় আচমকা তার এক চাচাতো ভাই পয়গাম নিয়ে এল, এক দল তাতার সুলতানকে খুঁজতে এবং তার সাহায্যে যে-সমস্ত সৈন্য বেরিয়েছে, তাদেরকে আটকাতে এদিকেই আসছে। শিগগির আমি দুর্গ থেকে বেরিয়ে তাদেরকে খোশগল্পে লাগিয়ে দিচ্ছি, এই ফাঁকে কুতুবুদ্দীনের কাফেলা যাতে অন্যকোথাও চলে যাবার সুযোগ পেয়ে যায়।

এখতিয়ার উদ্দীন তৎক্ষণাৎ এই খবর শাহজাদাদের নিকট পাঠিয়ে দিয়ে তাদেরকে তাগিদ করেন যে, যত দ্রুত পারা যায় এখান থেকে বহুদূরে কোথাও চলে যান। কিন্তু তাতাররা আগেভাগেই শাহজাদাদের উপস্থিতির সংবাদ পেয়ে গিয়েছিল। তাই পেছন থেকে তারা ধূলিঝড় উড়িয়ে দ্রুত ছুটে আসতে লাগল। উসতুওয়ার ফরসত নামক এক নির্জন গ্রামে গিয়ে শাহজাদাদের নাগাল পেয়ে গেল তারা। শাহজাদারা পূর্ব থেকেই অনেক সতর্ক ছিল। তারাও মেতে উঠল তীব্র মোকাবেলায়। তলোয়ারের অনবরত আঘাতে তাতারদের কচুকাটা করে দিতে লাগল। মোকাবেলায় তাতাররা কিছুক্ষণ পর্যন্ত দৃঢ়পদ রইল। কিন্তু অপ্রত্যাশিত এই শক্ত সংঘর্ষ তাদের পুরোপুরি হতাশ করে দিল। শেষমেশ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে দিগশূন্য হয়ে ভাগতে আরম্ভ করল। ময়দান চলে এল খাওয়ারিজমি শাহজাদাদের দখলে।

যুদ্ধ তখন আপাতত শেষ হয়ে এসেছে; কিন্তু এ কঠিন লড়াইয়ে শাহজাদা ও তাদের সঙ্গী সিপাহিরা ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এজন্য খানিক আরামের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রেই তারা তাঁবু খাটিয়ে ফেলল। তারা ধারণা করেছিল, এখন আর এই এলাকায় খুব বেশি তাতার নেই। তাই আক্রমণেরও কোনো আশঙ্কা নেই।

কিন্তু আফসোস, এটি ছিল তাদের ভুল ধারণা। তাদের সাথে তাতারদের যে দলটির পরাজয় ঘটেছিল, তারা গিয়ে তাদের মূল বাহিনী থেকে একটি বড় দলের সহায়তা নিয়ে দ্রুত আবার এখানে এসে পৌঁছাল। এসেই আক্রমণ করে বসল ময়দানে তাঁবুতে অবস্থানরত বেখবর মুসাফিরদের উপর।

শাহজাদারা পড়ে গেল শত্রুর বীভৎস রক্তলোলুপতার মুখে। প্রাণরক্ষার যাবতীয় পথ তখন বন্ধ। ফলে আহত সিংহের মতো তারা মাতাল হয়ে উঠল। তীব্র শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল শত্রুবাহিনীর উপর। দেহে প্রাণের সঞ্চারণ থাকা পর্যন্ত সমস্ত শক্তিতে চালিয়ে গেল তরবারি।

শেষমেশ দুই-শাহজাদাসহ কাফেলার সবাইকে হত্যা করে অসংখ্য মূল্যবান মাল-সামানা লুট করে নিয়ে গেল তাতার-বাহিনী। কুতুবুদ্দীন আযলাক শাহ ও আক সুলতানের কর্তিত মস্তক বর্শার ডগায় লটকিয়ে উল্লসিত ভঙ্গিতে অগ্রসর হচ্ছিল তারা। কাফেলার নিহতদের থেকে যেসব সামানপত্র লুট করেছিল, তা বণ্টন করতে তাতারদের কেউ আপত্তি উত্থাপন করেনি তখন। কিন্তু পরবর্তীতে আশপাশের দেহাতীরা তাদের থেকে সেই সামানপত্র লুট করে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল এদিক-ওদিক।

কুতুবুদ্দীন আযলাকের হাতে একটি আংটি ছিল। সেই আংটির নাগিনা ছিল ৩০ দিনার সমপরিমাণ ওজনের। পরবর্তীতে বিভিন্ন হাত ঘুরে সেটা সুলতান জালালুদ্দীনের কাছে গিয়ে পৌঁছায়। ভাইয়ের এই নাগিনাটি দেখামাত্র চিনে ফেলেন সুলতান। বলেন, আরগেঞ্চে এটাকে চার হাজার দিনার দিয়ে ক্রয় করা হয়েছিল।[৩২৫]

কুতুবুদ্দীন ও আক সুলতানের শাহাদাতের ব্যাপারটা সুলতানের জন্য অত্যন্ত মর্মবেদনার কারণ হয়ে উঠেছিল। রোকনুদ্দীন তাতারদের মোকাবেলায় বীরবিক্রমে লড়াই করে শহিদ হয়ে গিয়েছিল পূর্বেই। বাকি ছিল শুধু এক সৎভাই—গিয়াসুদ্দীন। ইরানের এক দুর্গে আবদ্ধ হয়ে ছিল সে।

এই দুর্যোগপূর্ণ সময়ে একসঙ্গে দুই শাহজাদার শাহাদাত ছিল নিশ্চিতভাবে একটি বড় দুর্ঘটনা। তবে, একজন ইতিহাসবেত্তার দৃষ্টিতে তাকালে, এই ঘটনা ছিল সুলতানের পেরেশানিমুক্ত গভীর একাগ্রতা তৈরীর একটি মাধ্যম। কুতুবুদ্দীনকে মেরুদণ্ড বানিয়েই তো সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হয়েছিল।

কুতুবুদ্দীন যদি সুযোগ পেত—অসম্ভব ছিল না, ভবিষ্যতে সুলতানের বিরুদ্ধে বারবার সে অবস্থান নিত। সুলতানের বাধাবিঘ্ন ও সমস্যা বহুগুণ বাড়িয়ে তুলত।[৩২৬]

সুলতান জালালুদ্দীনের জিহাদের দাওয়াত প্রভাব

ক্ষমতার বাগডোর সুলতান জালালুদ্দীনের হাতে চলে আসতেই পরাজয়ের গভীর গ্লানিবোধে আচ্ছন্ন জনতা আবার নতুন করে জেগে উঠতে লাগল বিপুল উচ্ছলতায়। সাম্রাজ্যের প্রত্যেক অঞ্চলে গুঞ্জরিত হয়ে উঠছিল জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর আহ্বান। অবশিষ্ট জনপদে ঘুরে-ঘুরে সুলতানের স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী

---

[৩২৫] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ১৩১, নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৬৪

[৩২৬] খাওয়ারিজম শাহি ২২৭

লোকজনকে দাওয়াত দিচ্ছিল জিহাদের। তখনও সুলতানের আয়ত্তের বাইরে রয়ে গেছে বহু এলাকা। কিন্তু নতুন উদ্দীপনায় চালুকৃত সুলতানের এই জিহাদি কার্যক্রমই ছিল সেখানকার লোকদের ভেতর জোশ জাগিয়ে তুলবার জন্য যথেষ্ট। তারাও পাতালের পঙ্কিলতার ভেতর থেকে মাথা তুলে একটুখানি শুদ্ধ বাতাসের বাসনায় একে একে জেগে উঠছিল।

এদিকে অনবরত হন্যে হয়ে সুলতান জালালুদ্দীনকে খুঁজে ফিরছিল তাতারদের উন্মাতাল এক সেনাদল। ফলে কিছুকাল তিনি জিহাদি মিশন বাস্তবায়নের জন্য শক্ত কোনো পাটাতনে দাঁড়াতে পারেননি। তাতারদের দখলীকৃত এলাকার বাইরে দিয়ে ঘুরে-ঘুরে বিভিন্ন অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ জিহাদি রসদ শক্তিশালী করে তুলছিলেন। তার জিহাদের আহ্বানে লোকদের হৃদয়তন্ত্রীতে বেজে উঠেছিল উত্তপ্ত আবেগ।[৩২৭] মুসলিম জনসাধারণের ছোট-বড় সবার মধ্যে ঘটে গেল নব চৈতন্যের এক মহা বিপ্লব।

অল্পদিনের মধ্যেই আরম্ভ হয়ে গেল ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প। তাতারদের খানে আজমের নিকট বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হরেক রকমের অস্থিরতাবর্ধক সংবাদ পৌঁছতে লাগল। এটি ছিল নিশ্চয় মুসলিমদের জিহাদি জজবার ফসল। এই জিহাদের জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছিটকে ছড়িয়ে পড়ছিল নিম্নযুক্ত দৃশ্যপটজুড়ে।

অতর্কিত আক্রমণের কাহিনি

বিভিন্ন জায়গায় মুজাহিদবাহিনী ও বিক্ষিপ্ত খাওয়ারিজমি সিপাহিরা ছোট ছোট গ্রুপ করে রাত্রিবেলা ঝাঁপিয়ে পড়তে আরম্ভ করেছিল তাতারদের উপর। বোখারার সাবেক গভর্নর ও সুলতানের বিশ্বস্ত আমির ইনাজ খান (তিনি ছিলেন বদরুদ্দীন হাজিব উপাধিতে প্রসিদ্ধ) একটি মজবুত দল গঠন করতে সক্ষম হয়ে গেছিলেন। তার কর্মকাণ্ডে তাতার-বাহিনী ও তাদের সমস্ত প্রহরী পেরেশান হয়ে পড়েছিল। একবার সুযোগ বুঝে পশ্চিমদিক থেকে জাইহুন-নদী পেরিয়ে গভীর রাতে বোখারায় আচমকা আক্রমণ করে বসলেন এই মর্দে মুজাহিদ। শহরে প্রবেশ করে বোখারায় নিযুক্ত তাতার-বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দিলেন।

ইনাজ খানের এই সফল অভিযানের পর তাতারদের একটা বড় সৈন্যদল তার পিছু লেগে গেল। ইনাজ খান যুদ্ধটুদ্ধ করে ও আক্রমণকারীদের বিভ্রমে ফেলে উত্তর ইরানের দিকে চলে যেতে সক্ষম হলেন।[৩২৮] পরে নাসার হাকিম এখতিয়ার উদ্দীনের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাতারদের বিরুদ্ধে নতুন একটি বাহিনী গঠন করেছিলেন তিনি। নাসার নিকটবর্তী এক বস্তির নাম ছিল নশজোয়ান। তাতারদের নিমকহালালি করার জন্য সেখানকার অধিপতি তাদেরকে জানিয়ে দিল ইনাজ খানের নাসায় উপস্থিতির

---

[৩২৭] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১৮, পৃষ্ঠা ১৩৮

[৩২৮] ইবনু খালদুন ৫/১১৬

কথা। তাতার-বাহিনী তখন দ্রুত এদিকে অগ্রসর হতে লাগল। ইনাজ খানও মুজাহিদবাহিনীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে নশজোয়ানের দিকে যেতে লাগলেন।

মুজাহিদদের এই বাহিনীতে মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ আন-নাসাবিও ছিলেন। যুদ্ধ শুরু হলে ইনাজ খান এমন নজিরবিহীন বীরত্বের সাথে মোকাবেলা করে গেলেন, আহমাদ আন-নাসাবি বলেন—এই যুদ্ধে আমি তার এমন কঠিন বাহাদুরি দেখেছি, যদি বীরসেনা রোস্তমও এসে তা দেখত, সন্ত্রস্ত চোখে হা করে কেবল চেয়েই থাকত।

ইনাজ খানের দু-হাতে ছিল দুটি তলোয়ার। প্রচণ্ড বিক্রমে তাতার-বাহিনীকে উৎখাত করতে করতে তিনি তাদের সারিতে ঢুকে পড়েছিলেন। এমন জোরদার আক্রমণ চালিয়েছিলেন যে, তাতারদের অবস্থা একেবারে রক্তারক্তি হয়ে গেছিল। আচমকা শরীরের ভারসাম্য বিচ্যুত হয়ে গেলে ঘোড়ার পিঠ থেকে নিচে পড়ে গেলেন ইনাজ খান। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লাফ দিয়ে পাশের আরেকটি ঘোড়ায় উঠে পড়লেন তিনি। তারপর একাই এমন কঠিন আক্রমণ চালিয়ে গেলেন, ময়দানে তাতাররা অসংখ্য লাশের স্তূপ ফেলে রেখে দিকশূন্য হয়ে ছুটে পালাল।

আমজনতাকে দেখাবার জন্য, এই বিজেতা সিপাহসালার দশজন তাতারের খণ্ডিত মস্তক ও বন্দি দশ তাতারকে নাসায় পাঠালেন। তারপর আশপাশের এলাকায় একটা লম্বা সময় তাতারদের জন্য কঠিন যন্ত্রণার কারণ হতে থাকলেন তিনি। এলতাজ মালিক, তকনি মালিক, বকশান জঙ্কশি, আমিনুদ্দীন রফিক, কুজদেক আমির আখওয়ার-সহ অনেক খাওয়ারিজমি অফিসার এসে তার বাহিনীতে যোগদান করেছিল।[৩২৯]

দিকে দিকে আজ জাগিয়া উঠেছে জিহাদি ইনকিলাব

যে-সমস্ত এলাকায় কোনোপ্রকার প্রতিরোধ ছাড়াই তাতারদের জন্য শহরের ফটক খুলে দেওয়া হয়েছিল, তাতাররা লুণ্ঠন ও রক্তপাতের পর সেখানকার জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশকে জীবিত ছেড়ে দিয়েছিল। সেই জনগোষ্ঠীর কাছে এই দাসত্বের জীবন তখন মৃত্যুর চেয়ে নিকৃষ্ট ও গ্লানিকর মনে হচ্ছিল। তাতাররা জুলুম-পীড়ন, লুটতরাজ, কঠোরতা-রুক্ষতা ও অপমান-অপদস্থতার চূড়ান্ত করে ছেড়েছিল এদের। তারা এই শত্রুপক্ষের রক্তমাখা থাবার ভেতর খাঁচায় আবদ্ধ পাখির মতো ছটফট করে মরছিল; কিন্তু ভীষণ হতবিহ্বলতার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে করে উঠতে পারছিল না কিছুই। ভেতর থেকে সবাই যেন এক অচেনা শৃঙ্খলে আটকা পড়ে ছিল।

সহসা এই হতবুদ্ধি মজলুমদের চোখে জ্বলে উঠল নতুন আশার প্রদীপশিখা। সেই প্রদীপশিখা হলেন দুঃসাহসী যুবক সুলতান জালালুদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহ। তারই আহ্বানে গোলামির শেকল চুরমার করে নতুন শক্তিতে তারা জেগে উঠতে

---

[৩২৯] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ১৩৬-১৩৭

লাগল। মুক্ত-স্বাধীন বন্ধনহীন উদ্দামতায় বহুদিন ধরে চেপে-বসা তাতারদের ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে লাগল কল্লা।

দিগদিগন্তের এই জিহাদি বিপ্লবের ভেতর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল, হামাদান, তুস, নিশাপুর ও হেরাতের দুঃসাহসী জনতার কীর্তিমালা। কিন্তু এইসব প্রচেষ্টা স্থানীয় লোকেরা নিজেদের বাহুর জোরে বিচ্ছিন্নভাবে আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছিল। বাইরে থেকে কোনো সেনাসাহায্য মেলেনি তাদের। তদুপরি এই জানবাজ বাহিনী পুরোপুরি শৃঙ্খলাবদ্ধও ছিল না। সুলতান জালালুদ্দীনের সঙ্গেও কোনো যোগাযোগ ছিল না তাদের। এজন্য বিপ্লবের এই এলাকাগুলোতে তাতাররা আবার এসব জিহাদি আন্দোলনের প্রজ্বলিত শিখা নির্বাপিত ও নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল।

প্রচণ্ড সংঘর্ষ

এই জিহাদি ইনকিলাবেরই একটি তরঙ্গায়িত প্রভাব ছিল এই যে, যেসব এলাকা তখন তাতারদের আক্রমণের বাইরে ছিল, সেখানেও শুরু হয়ে গেছিল সংঘর্ষের পূর্ণ প্রস্তুতি। আরম্ভ হয়েছিল মোকাবেলা। তাতাররা সেখানে এমন প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিল, যা বহুদিন পর্যন্ত সেরে ওঠেনি।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই তুমুল সংঘর্ষগুলোর অধিকাংশ কেন্দ্রই ছিল পবিত্র শহর আফগানিস্তানের বুকে প্রতিষ্ঠিত। এখানকার বাহাদুর সন্তানরাই হিজরি ১৫ শতকের প্রারম্ভে রুশ সাম্রাজ্যকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছিল। এই রণাঙ্গনগুলোর ভেতর হেরাত, তালকান, বামিয়ান ও কান্দাহার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এমনকি আমুদরিয়ার পশ্চিমদিকের মার্ভ শহরটিও এই শক্ত সংঘর্ষের প্রতীক হয়ে রয়েছে।

ইতিপূর্বে অনেক প্রদেশ, শহর, রাজপথ এবং বিভিন্ন অঞ্চল দখল করে নিয়েছিল তাতাররা। সেজন্য উল্লিখিত রণক্ষেত্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক কোনো যোগসূত্র ছিল না। কারুর নিকট বহিরাগত কোনো সেনাসাহায্য এসে পৌঁছেনি কখনো। প্রত্যেক এলাকার সাহসী মুসলমানরা নিজেদের মতো করে আপন-আপন শক্তিতেই উড্ডীন করে গেছে জিহাদের পতাকা। আর ঠিক এ-কারণেই, খুব শীঘ্রই কিংবা ধীরে-ধীরে হলেও এইসব যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলিমদের শক্তি গুঁড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল তাতাররা।

সুলতান জালালুদ্দীনের যুদ্ধপ্রস্তুতি

চতুর্থ যে কারণটি চেঙ্গিজ খানের জন্য সর্বাধিক পেরেশানি সৃষ্টি করেছিল, তা ছিল সুলতান জালালুদ্দীনের যুদ্ধপ্রস্তুতি। সুলতান যেখানেই যেতেন, আমজনতার ভেতর জিহাদি উদ্দীপনা সৃষ্টি করে তাদেরকে দাঁড় করিয়ে ফেলতেন তাতারদের মোকাবেলায়। ফলে, সুলতান জালালুদ্দীনের পতাকাতলে সমবেত হয়ে জীবনের বাজি লাগাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে উঠছিল হাজারও নওজোয়ান।[৩৩০]

---

[৩৩০] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১৮, পৃষ্ঠা ১৩৯

নাসা শহরের পরে, বিভিন্ন বস্তি পেরিয়ে নিশাপুরে এসে পৌঁছলেন সুলতান জালালুদ্দীন। একবছর আগে জুবি নৈয়ান ও সুবেদাইয়ের বাহিনী যখন সুলতান আলাউদ্দীনের পেছন-পেছন এদিক দিয়ে পথ অতিক্রম করছিল, নগরের হাকিম মুজিরুল মুলক উমর কাখি তখন এই কথা বলে তাতারদের কাছ থেকে শহরবাসীর প্রাণভিক্ষা নিয়েছিল যে—দেখুন, আপনাদের মোকাবেলা হচ্ছে খাওয়ারিজম শাহের সঙ্গে। সুতরাং তার উপর যদি বিজয়লাভ করতে পারেন, কোনোরকম সংঘর্ষ ছাড়াই আপনাদের হাতে তুলে দেব নিশাপুর।

তাতার সরদাররা শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে হাকিমের সঙ্গে আলোচনা করে তার থেকে গ্রহণ করেছিল আনুগত্যের হলফনামা। শহরবাসীকে নিরাপত্তা প্রদান করে ছুটেছিল ফের সুলতান আলাউদ্দীনের উদ্দেশে।[৩৩১]

সুলতান জালালুদ্দীন তখন সবে নিশাপুরে পৌঁছেছেন। শহরবাসী তাতারদের সাথে সম্পন্ন পূর্বের সেই সন্ধিচুক্তিতে এখনো ছিল অবিচল। এর বড় কারণ হল, তাদের ভেতর সঞ্চার ঘটেছিল তাতার-ভীতির। সুলতান জালালুদ্দীন নিশাপুরবাসীর মন থেকে এই ভীতি কিংবা বিমূঢ়তা বিদূরিত করবার চেষ্টা করলেন। ইসলামের এই শত্রুদের বিরুদ্ধে এদের পুনরায় জাগিয়ে তুললেন।

নিশাপুর ছিল খোরাসানের একটি কেন্দ্রীয় শহর। পাশেই ছিল রায় ও হামাদানের মতো বড় দুটো শহর। সুলতান ভাবলেন, সেখান থেকেও তো সমবেত হতে পারে হাজারও মুজাহিদ। এই অবস্থাদৃষ্টে তিনি পার্শ্ববর্তী শহরগুলোতে এবং পলাতক খাওয়ারিজমি আমিরদের কাছে চিঠি লিখে পাঠালেন। জিহাদের জন্য তাদের এক পতাকার নিচে জড়ো হতে আহ্বান করলেন। আশপাশের রাজ্যগুলিতেও পাঠালেন কিছু কিছু পত্রবাহক। সেখানেও তাতারদের বিরুদ্ধে জিহাদি জজবা জাগিয়ে তুলতে অব্যাহত রাখলেন প্রচেষ্টা। এইসব ব্যস্ততায় তার পুরো একটা মাস কেটে গেল।

নিশাপুরে অবস্থানকালেই নাসার হাকিম তার কাছে দরখাস্ত পাঠাল যে, হুজুর, আমার হুকুমত মঞ্জুর করা হোক। সুলতান এই এলোমেলো পরিস্থিতির ভেতর তার দরখাস্ত কবুল করে নিলেন।[৩৩২]

তাতারদের মা-ওয়ারাউন-নাহার আক্রমণ ও দখলের পর, বোখারা, সমরখন্দ ও অন্যান্য শহর-বস্তির লক্ষ-লক্ষ বিপর্যস্ত বাসিন্দা হিজরত করে পশ্চিমের দিকে চলে গিয়েছিল। তাদের একটা বড় অংশ নিশাপুর ও মার্ভে এসে ডেরা পেতেছিল।[৩৩৩] তাদের আত্মীয়-প্রিয়জনদের সবাই তাতারদের হাতে শহিদ হয়ে গিয়েছিল। নরপশুরা

---

[৩৩১] রওজাতুস সফা ৫/৩৫-৩৭, জাহাঁকুশা ১/১৩১-১৪০

[৩৩২] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ১৩২, তারিখে খাওয়ারিজম শাহি ১৪১

[৩৩৩] ইবনু খালদুন ৫/১১৪, তারিখে খাওয়ারিজম শাহি ১৪১

বিরান করে ফেলেছিল তাদের ঘরবাড়ি। এই হতভাগ্য মানুষগুলো নিজেদের চোখেই লুণ্ঠিত হতে দেখেছিল মা, বোন ও বিবিদের ইজ্জত! পবিত্র নারীদের নিষ্ফল আহাজারিতে বিষণ্ন হয়ে উঠেছিল পুরো বস্তি।

ফলে, এ হতাশ অনুতপ্ত মনোবলহীন দুর্বল লোকগুলি সুলতান জালালুদ্দীনের পক্ষ থেকে যখনই শুনতে পেল ব্যাপক জিহাদের ঘোষণা, তৎক্ষণাৎ লাব্বাইক বলে সাড়া দিয়ে উঠল তারা। বহুদিন ধরে তাদের সিনায় দাউ দাউ করে জ্বলছিল রক্তমাখা আগুন। তাতারদের থেকে প্রতিশোধগ্রহণের এক উত্তপ্ত অনলে ঝলসে উঠেছিল তাদের বুকের প্রশস্ত জমিন। এইবার তারা পেয়ে গেল কাঙ্ক্ষিত এক যোগ্য অগ্রনেতা। বুকের সেই আগুন নেভাতে মনস্থির করল যুদ্ধে যাবার। এই মুহাজির ও স্থানীয় বাসিন্দাদের জজবার বিপরীতে শহরগুলোর নেতা ও সুশীল শ্রেণির লোকগুলো জানাল, এখন নাকি তাতারদের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ করতে পারবে না। তাদের ভেতর জিহাদের কোনো সাড়াশব্দ নেই। তাদের ভাবনা ছিল—তাতারদের কাছে জীবনের নিরাপত্তা পেয়ে যাওয়া বিরাট এক গনিমতের ব্যাপার। আমরা তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে জয়ী হতে পারব না। উলটো তাদের পালটা আক্রমণ এত কঠিন হবে যে, বাধ্য হয়ে আমাদের পিছপা হতে হবে তখন।

নিশাপুরেও হুবহু একই অবস্থা দেখা গেল। সুলতান জালালুদ্দীন আমজনতার বড় একটি দলের সহায়তা ও পক্ষপাতিত্ব লাভ করেছিলেন বটে, কিন্তু লাভ করতে পারলেন না শহরের নেতৃস্থানীয় লোকদের সহায়তা।[৩৩৪]

সুলতান জালালুদ্দীন তো সকলের বাদশাহই ছিলেন তখন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বদলে গিয়েছিল অবস্থার স্রোতধারা। তিনি তখন হয়ে পড়েছিলেন একজন যাযাবর রাহবার মাত্র। লোকদের সামনে সাহসিকতা ও কর্মপদ্ধতির একটা নমুনা ঠিকই পেশ করতে পারছিলেন, কিন্তু তাদের মানতে বাধ্য করবার মতো সক্ষমতা তখন তার হাতে ছিল না।

শাহি হুকুম কার্যকর করার জন্য সেনাশক্তি, প্রাচুর্য ও কার্যকর কমিটির প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু সুলতান জালালুদ্দীনের কাছে সেসবের কণামাত্রও ছিল না। তাই শহরবাসীকে তার পক্ষে আসতে বাধ্য করতে পারেননি তিনি।

ওদিকে সুলতান নিশাপুরে অবস্থান করছেন বলে জেনে গিয়েছিলেন চেঙ্গিজ খান। তার যুদ্ধপ্রস্তুতি সম্পর্কেও অবগত হয়েছিলেন তিনি। ফলে, নিশাপুরে শক্ত কোনো ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে-ওঠার আগেই তাতাররা সেখানে আক্রমণ চালাবার প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিল।[৩৩৫]

---

[৩৩৪] তারিখে খাওয়ারিজম শাহি ১৪২

[৩৩৫] নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৬৫

নিশাপুরে এক মাসের অবস্থানকালে এখানে মজবুত একটি জিহাদি ঘাঁটি স্থাপনের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন সুলতান। কিন্তু নিশাপুরবাসী তার পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠেনি। বাহির থেকে সময়মতো কোনো সেনাসাহায্য আসারও সম্ভাবনা দেখা যায়নি।

শেষমেশ সুলতান জালালুদ্দীন তার আশার প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে নিশাপুর ছাড়তে বাধ্য হলেন। তখন তার সঙ্গে ছিল পূর্বের সেই কয়েকজন যুবক, যারা খাওয়ারিজম থেকেই তার সঙ্গে পথ চলতে শুরু করেছিল।[৩৩৬]

তাতার আগ্রসনের নতুন ধারা

বিশাল খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ তিনটে দুর্গ ছিল। প্রথম দুর্গ ছিল সেই শহর, যা ছিল সাইহুন-নদীর কিনারায় জিঞ্জিরের মতো লম্বালম্বিভাবে সংযুক্ত। দ্বিতীয়টি ছিল আমুদরিয়ার কিনারায় গড়ে ওঠা মা-ওয়ারাউন-নাহারের ঘনবসতিপূর্ণ শহর। এর মধ্যে সমরকন্দ ও বোখারা ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আলাউদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহের জীবৎকালেই আগ্রাসী তাতাররা এই দুটো প্রতিরোধ-কেন্দ্রই টুকরো-টুকরো করে দিয়েছিল।

চেঙ্গিজ খান কিছুকাল থেমে, এবার খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের তৃতীয় এবং শেষপ্রতিরক্ষাকেন্দ্রের দিকে অভিযান চালাবেন বলে মনস্থির করলেন। তৃতীয় এই প্রতিরক্ষাকেন্দ্রটি ছিল আমুদরিয়ার পশ্চিম ও দক্ষিণে অবস্থিত শক্ত প্রাচীরবেষ্টিত একটি শহর। এর নিরাপত্তারক্ষী ছিল ইরানি ও আফগান যোদ্ধা কবিলা।[৩৩৭] চেঙ্গিজ খান তখনও সমরকন্দেই অবস্থান করছিলেন। তিনি বাহিনীকে কয়েকভাগে বিভক্ত করে বিভিন্ন দিক থেকে অভিযান চালাবার নির্দেশ দিলেন।[৩৩৮]

বিধ্বস্ত নাসা

খোরাসানের দিকে অগ্রসরমান তাতার-বাহিনীর সিপাহসালার ছিল চেঙ্গিজ খানের জামাতা কিফাচার নৈয়ান। এই বাহিনীর অগ্রগামী অংশ পিল ঘোষ নামের এক অভিজ্ঞ যুদ্ধবাজ সরদারের নেতৃত্বে আমুদরিয়া পেরিয়ে নাসার দিকে রওনা দিয়েছিল।[৩৩৯] এর কিছুদিন আগেই মারা গেলেন নাসার হাকিম এখতিয়ার উদ্দীন। রাজ্যের শাসনক্ষমতা সামলালেন তার চাচাতো ভাই নুসরাত উদ্দীন হামজা বিন

---

[৩৩৬] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ১৩২, নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৬৫, ইবনু খালদুন ৫/১১৫

[৩৩৭] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১৭, পৃষ্ঠা ১৩১

[৩৩৮] ইবনু খালদুন ৫/১১৪

[৩৩৯] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ১১৩, তারিখে খাওয়ারিজম শাহি ১২৪

মুহাম্মদ।[৩৪০] নুসরাত উদ্দীন ছিলেন সুলতান জালালুদ্দীনের সত্যিকার বিশ্বস্তদের একজন। তিনি নগরপ্রাচীর নেহায়েত মজবুত করে পুরোপুরিভাবে মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে রাখলেন।

তাতার-বাহিনী শহরের পাশে এসে জড়ো হল। এর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই শহরবাসী প্রচণ্ড সংঘর্ষ শুরু করে দিল। তাতার-বাহিনীকে বারবার পেছনে হটতে হচ্ছিল। মুজাহিদদের আচমকা প্রবল আক্রমণে মারা পড়ল পিল ঘোষ।

নাসার জানবাজ জনতা প্রাচীর থেকে ১৩ দিন পর্যন্ত তাতারদের দূরে রেখেছিল। কিন্তু শেষমেশ তাকদিরে যা লেখা ছিল, তাই বাস্তবায়িত হল। ১৪তম দিনে তাতাররা অজস্র লাশের স্তূপ মাড়িয়ে কোনো-না-কোনোভাবে শহরে ঢুকে পড়ল। এত কঠিন সংঘর্ষ সয়ে-সয়ে ক্রোধে যেন তারা পাগল হয়ে গিয়েছিল। ফলে, ভেতরের সমস্ত ক্রোধ জমিয়ে হয়ে উঠেছিল অপ্রতিরোধ্য। তারপর নরপশুরা ইমাম নাসায়ির পবিত্র জন্মভূমিকে মুহূর্তের মধ্যেই রক্তে-মাটিতে বিধ্বস্ত করে দিল।

নাসাবির লেখক বলেছেন—তখন নাসার অধিবাসীদের একত্র করে আদেশ দেওয়া হল, তোমরা একে অপরকে সবাই বাঁধতে শুরু করো।

সেদিন তারা যদি বিক্ষিপ্ত হয়ে প্রাণ বাঁচাবার জন্য ভেগে যেত, তা হলে তাদের অধিকাংশই বিভিন্ন পাহাড়ে আত্মগোপন করে বেঁচে যেতে পারত। খুব কাছেই ছিল পর্বতশ্রেণি। কিন্তু তারা ভয় পেয়ে গেছিল বলে ভাগতে পারেনি। তারা যখন তির-তরবারির সামনে একে অপরকে বেঁধে ফেলল, তাতাররা খুব কাছ থেকে প্রচণ্ড শক্তিতে শুরু করল তির বর্ষণ। কর্তিত বৃক্ষের মতো ধুপধাপ জমিনে পড়তে লাগল লাশের পর লাশ। এভাবে একসঙ্গে ৭০ হাজার লোককে শহিদ করল তাতাররা।

দরবারে খাওয়ারিজমের শ্রেষ্ঠ পরামর্শক, বিখ্যাত আলেম শিহাবুদ্দীন খায়ুফি নাসায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। তার পুত্র তাজুদ্দীনসহ তাকে গ্রেফতার করা হল। দুজনের হাত পিছমোড়া করে বেঁধে কিফাচার নৈয়ানের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। চারপাশে তলোয়ার ও বর্শা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল অজস্র হিংস্র তাতার। কিফাচার তাকে সম্মুখে দাঁড় করাল।

কিফাচারের নির্দেশে শহর থেকে লুণ্ঠনকৃত কয়েক মণ স্বর্ণ আগুনে গলানো হল। এই গলিত উত্তপ্ত স্বর্ণ ঢেলে দেওয়া হল শিহাবুদ্দীনের মাথায়। পুড়ে দগদগে হয়ে গেল তার সারা শরীর। ইলমের এই মহান সাধককে রঙ্গ-তামাশার মাধ্যমে নিকৃষ্টভাবে তারা শহিদ করে দিল! মারা যাবার আগে নিরুপায় তিনি শুরু করেছিলেন কলজে-চেরা করুণ আর্তনাদ।[৩৪১]

---

[৩৪০] ইবনু খালদুন ৫/১১৭

[৩৪১] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ১১৫, তারিখে খাওয়ারিজম শাহি ১২৪

চেঙ্গিজ খানের অস্থিরতা : তুলি খানের যাত্রা

চেঙ্গিজ খান সুলতান জালালুদ্দীনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে ও তৎপরতায় কঠিন দ্বিধার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। তাঁবুর সামনে পেছনে হাত বেঁধে অস্থির ছন্দে পায়চারি করতে লাগলেন তিনি। এ-সমস্ত এলাকায় যেখানেই সুলতানের যাওয়া-আসা হচ্ছিল, সেখানেই তাতারদের বিরুদ্ধে জেগে উঠছিল সব মহল্লা। চেঙ্গিজ খানের ছিল সেই একই কথা—দুশমনকে কখনো মওকা দেওয়া যাবে না। এজন্য ক্ষুব্ধ কণ্ঠে তিনি তুলি খানকে আদেশ দিলেন—এক্ষুনি জবরদস্ত একটি বাহিনী নিয়ে উত্তর ইরান ও খোরাসানের শহরগুলোর দিকে যাত্রা করো।

এই অঞ্চলগুলিতেই চেঙ্গিজ খান প্রতিনিয়ত সুলতানের আসা-যাওয়ার সংবাদ পাচ্ছিলেন। ইতিপূর্বে সুবেদাই ও জুবি নৈয়ান এই শহরগুলো বিধ্বস্ত না-করেই সামনে এগিয়ে গিয়েছিল। সুলতান জালালুদ্দীনের শক্তি খর্ব করে দেওয়ার দায়িত্ব ছাড়াও তুলি খানকে এই শহরগুলো পুরোপুরি ধসিয়ে দেবারও নির্দেশ দিয়ে দিলেন চেঙ্গিজ খান।[৩৪২]

নিশাপুরে কিফাচার নৈয়ানের আক্রমণ

এর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ১০ হাজার অভিজ্ঞ সিপাহিকে কিফাচার নৈয়ানের নেতৃত্বে চেঙ্গিজ খান নিশাপুরের দিকে পাঠালেন। নিশাপুরের লোকদের রক্তে সুলতান ফিরিয়ে এনেছিলেন যুদ্ধের টগবগে উত্তেজনা। যদিও সুলতান নিশাপুর থেকে চলে গিয়েছিলেন; কিন্তু সেখানে প্রস্তুত হয়ে উঠেছিল সুলতানের অনেক সহযোগী প্রতিরক্ষাকর্মী। তাই চেঙ্গিজ খান সেখানে বড় ধরনের কোনো বিপ্লবের আশঙ্কা করছিলেন। কিফাচার নৈয়ানের নিশাপুর রওনা দেওয়ার পূর্বেই খোরাসানে শুরু হয়ে গেল বিপ্লব। তাতাররা এতে প্রচণ্ডভাবে ভীত হয়ে পড়ল। সুলতানের জিহাদি আহ্বানে উদ্বুদ্ধ হয়ে তুস নগরেও জানবাজদের একটি দল উত্তোলন করল জিহাদের পতাকা। এই মুজাহিদরা শক্ত এক কাণ্ড ঘটাল। তুসের তাতার হাকিমের মুণ্ডু কেটে নিশাপুরের সেইসব নেতার কাছে পাঠিয়ে দিল, যারা ছিল তাতারদের মিত্রবাহিনী।

মূলত, তুসের এই মুজাহিদরা নিশাপুরের বাসিন্দাদের ভেতর জাগাতে চাচ্ছিল আত্মমর্যাদাবোধ। এর মাধ্যমে তাদের আহ্বান করছিল দাঁড়িয়ে যেতে তাতারদের মোকাবেলায়।[৩৪৩] তাদের এই জিহাদের দাওয়াত বৃথা গেল না। জেগে উঠল নিশাপুরের মুসলিম-সেনারা। তারা একজোট হয়ে, শহর পরিচালনায় যে তাতার অফিসারকে নিযুক্ত করা হয়েছিল, তাকে মৃত্যুঘাটে নিপতিত করল।

---

[৩৪২] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১৭, পৃষ্ঠা ১৩৫

[৩৪৩] রওজাতুস সফা ৫/৩৭-৩৮, জাহাঁকুশা ১/১৩৩

মুসলিমদের এই বিপ্লব দেখে অস্থির হয়ে ওঠেন চেঙ্গিজ খান। তৎক্ষণাৎ কিফাচার নৈয়ানকে খোরাসানে পাঠিয়ে দেন তিনি। ফলে, কিফাচার নৈয়ান তুস নগরে যাবার আগে রওনা দিল নিশাপুর অভিমুখে; এবং ৬১৭ হিজরির রমজান মাসে শহর অবরোধ করে প্রচণ্ডভাবে উপর্যুপরি আক্রমণ শুরু করে দিল। মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হয়ে ছিল নিশাপুরের বাহাদুর জনতাও। তারা এমন দাঁতভাঙা জবাব দিল যে, তাতারদের অবস্থা হয়ে গেল নাজেহাল। যুদ্ধের তৃতীয়দিনে আচমকা মুসলিমরা প্রচণ্ড আক্রমণ করে বসল। সেই আক্রমণে সন্ত্রস্ত কিফাচার নৈয়ান মারা পড়ল এক মুজাহিদের তিরের নিশানায়। তাতার-বাহিনী তখন পিছপা হয়ে গেল।[৩৪৪]

বিধ্বস্ত তুস ও সাব্জেভর

পিছপা-হওয়া তাতার-বাহিনী দুইভাগে বিভক্ত হয়ে দু-দিক থেকে এসে তুস ও সাব্জেভরে আক্রমণ করে বসল। তুস দখল করে জালেমরা এখানকার সব মহল্লায় শুরু করল গণহত্যা। লুট করে নিতে লাগল সমস্ত ধন-সম্পত্তি। প্রোথিত ধনভান্ডারের তালাশ করতে গিয়ে সেখানকার কবরগুলো পর্যন্ত ছাড়ল না। তুসে আলি বিন মুসা রেজা ও খলিফা হারুনুর রশিদের মাকবারা খোদাই করে ধসিয়ে দিল ধুলোয়। শেষে সারা শহরে লাগিয়ে দিল আগুন। ধকধক করে শহর জ্বলে কয়লায় পরিণত হল। সাব্জেভরের বাসিন্দাদেরও একই অবস্থা হল। বর্ণনা করা হয়—এখানকার শহিদের সংখ্যা ছিল ৭০ হাজারের কাছাকাছি।[৩৪৫]

কিফাচার নৈয়ানের মৃত্যুতে চেঙ্গিজ খানের ক্রোধ

কিফাচার নৈয়ান চেঙ্গিজ খানের জামাতা হওয়ার পাশাপাশি তার এক যোগ্য সেনাপতিও ছিল সে। এ-কারণে তার মৃত্যুসংবাদ যেন চেঙ্গিজের সর্বাঙ্গে আগুন ধরিয়ে দিল। তিনি তুলি খানের কাছে (যে তখনও সুলতান জালালুদ্দীনের সন্ধানে ঘুরে ঘুরে ফিরছে) দ্রুত হুকুম পাঠালেন—শিগগির তুমি নিশাপুর অভিমুখে ছোটো। সেখানকার অধিবাসীদের হত্যা করো এবং শহরের প্রাচীরগুলো এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করে দাও, পরবর্তীকালে যেন সেখানে ভূমি কর্ষণ করে চাষাবাদ ছাড়া অন্যকিছু করা না যায়।[৩৪৬]

---

[৩৪৪] রওজাতুস সফা ৫/৩৭-৩৮, জাহাঁকুশা ১/১৩৩

[৩৪৫] রওজাতুস সফা ৫/৩৭, জাহাঁকুশা ১/১৩৩, নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৮৯, আলি ইবনে মুসা রেজার মাকবারার বিধ্বস্ততার কথা ইবনু খালদুনে (৫/১১৫) এবং হারুনুর রশিদের মাকবারা ধ্বংসের আলোচনা আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থেও (৭/১০৬) রয়েছে।

[৩৪৬] রওজাতুস সফা ৫/৩৮

তুলি খানের নিশাপুর আক্রমণ

বসন্তকাল এসে গেছে। নিশাপুরের আশপাশ হয়ে উঠেছে ঝকঝকে সবুজ। রকমারি সুগন্ধি ফুলের সৌরভে সুবাসিত হয়ে উঠেছে শহরের সমস্ত বাগিচা। এর ভেতর একদিন প্রতিশোধের আগুনে দহ্যমান তুলি খান এক জবরদস্ত বাহিনী নিয়ে নগরপ্রাচীরের সামনে এসে উপস্থিত হল। সঙ্গে ছিল ৩ হাজার তির-চরখ। তির-চরখ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে—বড় বড় তির-কামান, যেগুলো চালাতে হতো কয়েকজন মিলে। এগুলো নিক্ষেপ করলে প্রচণ্ড বেগে অনেক দূর পর্যন্ত যেত। দুইশ আগ্নেয়াস্ত্রও ছিল। সেগুলো শহরের আশপাশে স্থাপন করা হয়েছিল।

ঐতিহাসিকরা বলেন—পাথরবর্ষণের জন্য শহরের কয়েক মনজিল দূর থেকে এত বেশি প্রস্তরখণ্ড আনা হয়েছিল যে, যুদ্ধ যখন শেষ হল, দেখা গেল—জমানো প্রস্তরাদির দশভাগের একভাগও ব্যবহৃত হয়নি। স্তূপাকার হয়ে পড়ে রয়েছে সব পাথর।[৩৪৭] আগ্নেয়াস্ত্র পরিচালনার জন্য নিযুক্ত ছিল ১৭শ আমলা। শহরবাসী যখন দেখল শত্রুপক্ষের জনসংখ্যা অত্যধিক, তখন তাদের সাথে সন্ধিচুক্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা চালাল। পরামর্শ শেষে তুলি খানের কাছে পাঠানো হল কাজি রোকনুদ্দীন আলি ইবনে ইবরাহিমকে। কাজি সাহেব প্রচুর পরিমাণ বিনিময়ের বদলায় শহরবাসীর জীবনের নিরাপত্তা তলব করলেন। কিন্তু তুলি খানের মেজাজ আগে থেকেই বিগড়ে ছিল। সে শুধু সন্ধিই প্রত্যাখ্যান করল তা না, বরং কাজি সাহেবকেও বন্দি করে ফেলল।[৩৪৮]

২২ সফর ৬১৮ হিজরি (৭ এপ্রিল ১২২১ খ্রিষ্টাব্দ)। তুলি খান তার বাহিনীকে ব্যাপক আক্রমণের নির্দেশ দিল। দুইদিন পর্যন্ত অব্যাহত রইল যুদ্ধ। দু-দিকেরই অসংখ্য লোক যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগল, লড়তে লাগল, মরতে লাগল।

তৃতীয় দিন। সূর্য তখন পশ্চিমাকাশে হেলতে শুরু করেছে। তাতার-বাহিনী আচমকা শক্ত আক্রমণ চালিয়ে কয়েকদিক থেকে খন্দক পেরিয়ে যেতে সক্ষম হল। প্রাচীরের কাছে গিয়ে উপরে ওঠার চেষ্টা চালাতে লাগল তারা। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে উপর থেকে শহরবাসী অসংখ্য তির ও পাথর বর্ষণ করতে শুরু করল। ফলে, চোখের পলকেই পড়ে যেতে লাগল তাতারদের অসংখ্য লাশ।

শেষনিঃশ্বাস পর্যন্ত সর্বশক্তি দিয়ে লড়ে যাচ্ছিল নিশাপুরের আমজনতা। তাদের তুমুল আক্রমণে তাতাররা বারবার পেছনে হটতে বাধ্য হচ্ছিল। লড়াইয়ের ভেতরেই সকলের অগোচরে দিগন্তে শেষলালিমা ছড়িয়ে ডুবে গেল সূর্য। যুদ্ধের ব্যস্ততায় সূর্যের অস্তগামিতার দিকে তাকাবার সুযোগ রইল না কারুর। তারপর চারপাশ অন্ধকার হয়ে এলেও অব্যাহত রইল বাঁচা-মরার এই যুদ্ধ। অন্ধকারের সুযোগে প্রাচীরে খামচে-

---

[৩৪৭] রওজাতুস সফা ৫/৩৭

[৩৪৮] রওজাতুস সফা ৫/৩৭-৩৮

স্থাপিতঃ ২০২০ইং

থাকা শত শত তাতার-সেনা দেয়াল টপকে গিয়ে শহরে নামতে সক্ষম হল। তারপর ভেতরে বিক্ষিপ্তভাবে লড়তে লড়তে শহরের ফটকও তারা খুলে ফেলল।[৩৪৯]

চতুর্থ দিনের সকাল। আজ তাতার-বাহিনীর বড় একটা অংশ শহরে ঢুকতে সক্ষম হয়েছে। নিশাপুরের আমজনতা বাঁচবে নাকি মরবে সেই ব্যাপারে বেপরোয়া হয়ে রাস্তায়-রাস্তায়, গলিতে-গলিতে, সর্বখানে তাতারদের সাথে মুখোমুখিভাবে লড়ে যেতে লাগল। কিন্তু আক্রমণকারী তাতারদের অন্তর ছিল পাথরের চেয়েও কঠিন।

জুয়াইনির বর্ণনায় আছে—'এই গণহত্যায় তাতাররা একটা বিষয়ের প্রতি সর্বোচ্চ লক্ষ রেখেছিল। চেয়েছিল, প্রত্যেক লোকের দেহ থেকে সরাসরি আলাদা করে ফেলতে হবে মাথা, কেউ-ই যাতে বাদ না পড়ে।'

কতক ইতিহাসবিদ এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন—মার্ভে গণহত্যা চালাবার পর তাতারদের মনে হয়েছিল মরার ভান করে লাশের সারিতে লুকিয়ে পড়েছিল অনেক লোক, পরে তাতাররা চলে গেলে সহিসালামতে তারা অন্য শহরে পাড়ি জমিয়েছিল। এজন্য তাতার-বাহিনী যখন নিশাপুরে আক্রমণ চালাল, শত্রুপক্ষের প্রত্যেকের মস্তক বিচ্ছিন্ন করে দেওয়াকে তারা জরুরি মনে করল, যাতে কেউ আর মৃতদের ফাঁকেফুঁকে শুয়ে পড়ে জান বাঁচাতে না-পারে।[৩৫০]

খোদ চেঙ্গিজ খানের হিংস্র কন্যা (কিফাচারের স্ত্রী) ১০ হাজার সিপাহিকে নিজ কমান্ডে নিয়ে এই হত্যাযজ্ঞে এসে শরিক হয়েছিল। কয়েকশ মজলুমকে নিজ হাতে জবাই করে শীতল করেছিল সে প্রতিশোধের আগুন।

নিশাপুর পতনের আজ চতুর্থ দিন। চেঙ্গিজ খানের হুকুম-মোতাবেক তুলি খান শহরের সমস্ত প্রাসাদ-ভবন চূর্ণবিচূর্ণ করে জমিনের সাথে মিশিয়ে দিল। ১৫ দিন পর্যন্ত শহরে জারি রইল রক্তের হোলিখেলা। শেষমেশ পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল শহরের সমস্ত কিছু। তাতারদের ক্রুদ্ধতা চরমে উঠল। শহরের কোনো কুকুর-বিড়াল পর্যন্ত জীবিত ছাড়ল না তারা।

তুলি খান আক্ষরিক অর্থেই পুরো নিশাপুর এমনভাবে উজাড় করে দিয়েছিল, হাল চষে ফসল উৎপাদন ছাড়া কোনো কর্মের জন্য উপযুক্ত ছিল না শহরের জমিন। নিশাপুরের হাকিম মুজিরুল মুলক কাখি তাতারদের শহর দখলের পর কোথাও লুকিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু গন্ধ শুঁকে শুঁকে শিকারসন্ধানী তাতার-বাহিনী শেষ পর্যন্ত তাকে গ্রেফতার করেই ছেড়েছিল। তরবারির প্রচণ্ড আঘাতে তাকে শহিদ করে দিয়েছিল।[৩৫১] নিশাপুরের শহিদদের যদি গণনা করা হয়, ১৫ লাখ ছাড়িয়ে যাবে তাদের সংখ্যা।[৩৫২]

---

[৩৪৯] রওজাতুস সফা ৫/৩৮, জাহাঁকুশা ১/১৩৩-১৪০

[৩৫০] রওজাতুস সফা ৫/৩৭-৩৮

[৩৫১] জাহাঁকুশা ১/১৩৩-১৪০, আফগানিস্তান দর মাসিরে তারিখ ২১৯

[৩৫২] সিয়ারু আলামিন নুবালা ২২/৩২৯, 'তারিখনামা হেরাত' গ্রন্থের লেখক সাইফুদ্দীন ইবারি এই সংখ্যা ৭০ লাখ ৪০ হাজার বর্ণনা করেছেন। তার এ গ্রন্থের ৬৩ পৃষ্ঠায় দেখুন; আরো দেখুন : তারিখে নাহজতহায়ে মিল্লি ইরান ৫২২

চালিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তুলি খানের বিশ্বাস জন্মাল যে, এখানে শুধু শক্তি ব্যয় করে জয় লাভ করে ওঠা মুশকিল। সূক্ষ্ম বুদ্ধি খাটানো প্রয়োজন। ফলে, সে তার ধূর্ত মেজাজ কাজে লাগিয়ে খুব ভেবেচিন্তে শক্ত একটি পরিকল্পনা সাজাল। সৈনিকদের প্রাচীরের বাইরে যুদ্ধের পজিশন নিয়ে থাকতে আদেশ দিল। তারপর শহরের হাকিমের কাছে সন্ধিচুক্তির জন্য একটি চিঠি লিখে পাঠাল।

মার্ভের হাকিম মুজিরুল মুলক এই কাণ্ড দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তুলি খানও এত কোমলতা মিশিয়ে চিঠি লিখতে পারে? ব্যাপারটা তার কাছে অস্বাভাবিক ঠেকল। কিন্তু পারলেন না, শেষ পর্যন্ত ধোঁকায় পড়েই গেলেন তিনি। তৎক্ষণাৎ এই চিঠির পিঠে মোলায়েম কথাবার্তা-মেশানো একটি জবাব পাঠাবার প্রয়োজন বোধ করলেন।

পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলো থেকে প্রতিনিয়ত সুলতান জালালুদ্দীনের সাহসী তৎপরতা ও কর্মকাণ্ডের সংবাদ আসছিল। পাশাপাশি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল যে, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে একটি বিন্যস্ত বাহিনী নিয়ে মার্ভের দিকে আসছেন সুলতান। এই অবস্থায় মার্ভের হাকিম এই কয়েক সপ্তাহ নাগাদ তাতারদের খানিক খোশগল্পে মত্ত রাখতে চাচ্ছিলেন। তার মনে হচ্ছিল, হয়তোবা তার এই কর্মপন্থা আগত যুদ্ধাভিযানের বিজয়ের কারণ হয়ে উঠতে পারে।

হাকিমের পক্ষ থেকে মার্ভের বিখ্যাত আলেমন শায়েখ জামালুদ্দীনকে রাজকীয় দূত বানিয়ে সন্ধিসংক্রান্ত আলোচনার জন্য তুলি খানের কাছে প্রেরণ করা হল। তুলি খান শায়েখ জামালুদ্দীনকে অত্যন্ত উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল। আশাজাগানিয়া কিছু কথাবার্তা বলল কিছুক্ষণ। তাকে খুব সম্মানের সাথে নতুন এই পয়গাম দিয়ে ফেরত পাঠাল যে, স্বয়ং শহরের হাকিম এসে যদি তুলি খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তা হলে আমাদের মধ্যকার বহু ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটতে পারে।

তুলি খানের চিঠির এই সুকোমল ভাষা শুনে মার্ভের বোদ্ধামহলের ভেতর জেগে উঠল নতুন শঙ্কা। তারা ভাবলেন—তুলি খান নতুন কোনো ফাঁদ পাততে চাইছে না তো! ভেবেচিন্তে তারা এই প্রস্তাবটা নতুন এক চক্রান্ত বলে আখ্যা দিলেন। এই প্রস্তাব পালন করা থেকে হাকিমকে বিরত রাখবার চেষ্টা করলেন অনেক। কিন্তু হাকিম সাহেব এত পরিমাণ শঙ্কা থাকা সত্ত্বেও শুধু কিছুকাল পর্যন্ত শহর বাঁচাবার জন্য সন্ধিসংক্রান্ত আলোচনা জারি রাখতে চাচ্ছিলেন। তিনি চূড়ান্ত একরোখামি করে নিজের এই সিদ্ধান্তে গোঁ ধরে রইলেন। তিনি নগদ অর্থ, ঘোড়া, খচ্চর ও মূল্যবান অনেক তোহফা নিয়ে চেপে বসলেন সওয়ারির হাওদায়। খানিক বাদেই তুলি খানের সেনাশিবিরের কাছে গিয়ে নামলেন।

তুলি খান তাকে পরম অভ্যর্থনা জানাল। তুলির তাঁবুর কাছে সেদিন আয়োজন করা হয়েছিল রান্নার। কিছু তক্ষক ধরে আনা হয়েছিল। সেগুলো রান্না করা হচ্ছিল। মরুর বাতাসে চারপাশে চমৎকার একটা ঘ্রাণ ভাসছিল। উপঢৌকনের বদলাস্বরূপ হাকিমকে তুলি খান প্রথমে কারুকার্যখচিত শাহি পোশাক প্রদান করল। তারপর শুরু

হল ভোজনের পালা। হাকিমের পাতে তুলি খান নিজ হাতে খাবার তুলে দিতে লাগল। হাকিম এত খেতে পারবেন না বলে বলে মানা করতে লাগলেন। তুলি তবু জোর করেই তুলে দিচ্ছিল। ভাব দেখে মনে হচ্ছিল যেন কতদিন পর দুই বন্ধুর দেখা! এভাবে না-খাওয়ালে চলে?

ভোজনপর্ব শেষ। মুজিরুল মুলককে ভরপেট করে খাইয়েছে তুলি। হাকিমের পেটের ভেতর থেকে গরম ঢোক উঠছে। তুলি খান এবার শুরু করল সন্ধিসংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা। সে হাকিমকে বিশ্বাস যোগাল যে, শহরবাসীকে নিরাপত্তা দিতে সত্যিই মন থেকে সে প্রস্তুত। তবে বিনিময়ে মার্ভবাসীর পক্ষ থেকে তাকে কিছু জামানত দিতে হবে।

জামানতের বিষয়টা নিয়ে কিছুক্ষণ ধরে বাতচিত চলতে লাগল। চূড়ান্ত কোনো সমাধানে পৌঁছা যাচ্ছিল না। শেষে তুলি খান হাকিমের কাছে শহরের আরো কয়েকজন বোদ্ধা ও বিচক্ষণ লোকদের সহযোগিতা তলব করল, এসে যাতে হাকিমের সঙ্গে বসে পরামর্শ করতে পারে। মুজিরুল মুলক তৎক্ষণাৎ সঙ্গের এক চাকরকে দিয়ে শহরের সম্মানিত শ্রেণির কিছু লোককে ডেকে পাঠালেন। কিছুক্ষণ পরে তারা এলেন। তুলি খান তাদেরকেও সংবর্ধনা জানাল। যথাসাধ্য তাদের আতিথ্য করল। কিছুক্ষণ পর দাবিকৃত জামানত পেতে সে শহরের বিশেষ ছয়শ লোককে নির্বাচন করতে আদেশ দিল, যারা নিজেদের সম্পত্তি থেকে প্রদান করবে এই জামানতের বড় একটা অংশ।

সহচরদের নিয়ে মার্ভের হাকিম পরামর্শে বসে গেলেন। তিনি নিজ হাতে এমন ছয়শ লোকের ফিরিস্তি তৈরি করলেন, যাদের ভেতর ছিল কেবল মার্ভের ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতিদের নাম।

এই ফিরিস্তি পেতেই তুলি খানের মুখচ্ছবি বদলে গেল। তার চোখের ইশারায় ক্ষিপ্রবেগে তাতার সেপাইরা নেতাশ্রেণির লোকদের উপর তরবারি চালাল। মাথার উপর ছিটকে উঠল রক্তের লাল ফোয়ারা। হাকিম তখনও অক্ষত অবস্থায় রয়েছেন। তাতাররা ভাবল, এবার আমাদের কাজের পথ সহজ হয়ে গেছে।

তারা এই ধূর্ততার মাধ্যমে হাকিমকে দিয়ে শহরের ফটকও খুলিয়ে ফেলল। প্রহরীদের হটিয়ে দিয়ে ফটকের কাছেও প্রতিষ্ঠা করে ফেলল আধিপত্য।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অস্ত্রধারী তাতার সেপাইদের সয়লাবে ভরে গেল মার্ভের সব সড়ক ও প্রান্তর। জায়গায় জায়গায় তারা আমজনতার উপর হিংস্র পশুর মতো হামলে পড়তে লাগল। আবার, গোপনে ঘাঁটি গেড়ে-থাকা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নিক্ষিপ্ত পাথর ও তিরের ঝাঁকে জমিনে ধসে পড়তে লাগল তাতারদেরও লাশের পর লাশ। কিন্তু ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পরও শেষ পর্যন্ত তাতার-বাহিনী রুখে দিতে সক্ষম হল শহরবাসীর শক্ত সংঘর্ষ।

তুলি খান শহর কবজা করে ফেলল। রোষকষায়িত কণ্ঠে সে এলান করল—নগরবাসী, তোমরা শিগগির পরিবার-পরিজন ও তৈজসপত্র নিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে পড়ো!

হতভম্ব ও বিভ্রান্ত নারীকুল, বাচ্চাকাচ্চা, যুবক, বৃদ্ধ সবাই শুধু জান বাঁচানোর তাগিদে মাল-সামানা নিয়ে দলে দলে শহর ছেড়ে বেরুতে শুরু করল। চারদিন ধরে শুধু খালিই হচ্ছিল শহর। তারপর দেখা গেল—ভেতরে এখন কোনো জনমানুষ নেই। খাঁ খাঁ করছে ভয়ানক নিস্তব্ধতা।

বাইরে বেরিয়ে-আসা লোকদের বিরাট এক ময়দানে আটকানো হল। তাতার-বাহিনী তলোয়ার উঁচিয়ে চারদিক থেকে তাদেরকে টহল দিচ্ছিল। তারা বেপরোয়া গলায় বলে উঠছিল—এরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে কঠিন অপরাধ করেছে। সেই শাস্তি এদের প্রদান করা হোক।

তুলি খান তার শয়তানি পরিকল্পনার শেষদৃশ্যটি দেখতে স্বর্ণনির্মিত এক তখতে গিয়ে বসল। তার সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল লক্ষ-লক্ষ দুর্বল ও বাধ্য মানুষ। মহিলাদের আর্তচিৎকার ও বাচ্চাদের চেঁচামেচিতে কেঁপে উঠতে লাগল সমস্ত ঊর্ধ্বাকাশ।

তুলি খান হাত উঁচিয়ে উচ্চকণ্ঠে হুকুম প্রদান করতেই সঙ্গে-সঙ্গে তাতার-বাহিনী বাচ্চাকাচ্চা-নারী-পুরুষ সবাইকে আলাদা করতে আরম্ভ করল। পুরুষ ও বাচ্চাদের ধরে-ধরে গলা টিপে কিংবা তলোয়ার দিয়ে কেটে টুকরো-টুকরো করে হত্যা করতে লাগল। নারীদের সম্ভ্রম লুট করে নিয়ে তাদেরকেও অত্যন্ত অপদস্থভাবে হত্যা করে ফেলতে লাগল। গ্রেফতারকৃত আমির ও নেতাদের প্রদান করতে লাগল বিভিন্ন রকম শাস্তি। তাদের জমাকৃত সম্পদ হরণ করে তাদেরকে পাড়িয়ে দিতে লাগল মৃত্যু-ঘুম। ধনদৌলতের সন্ধানে শহরের বাসগৃহগুলো ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে লাগল। দেয়াল ও ভিত্তিপ্রস্তর ধসিয়ে দেওয়া হল। কবরগুলো পর্যন্ত খোদাই করে গুপ্ত ধনভান্ডারের সন্ধান করতে আরম্ভ করল। এমনকি সুলতান সানজার সেলজুকির মাজার জ্বালিয়ে দিল তারা। সম্পদের সন্ধানে তার কবরও খোদাই করে ফেলল।[৩৬০]

ঐতিহাসিক ইবনে ওয়াসিল বলেছেন—আমি মার্ভের নিহতদের গণনা করেছি। তারা ছিল সর্বসাকুল্যে ৭ লাখ।[৩৬১]

তবে মির খান্দান্দ সাইয়েদ ইজ্জুদ্দীনের রেফারেন্সে নিহতের সংখ্যা আরো অধিক বলে বর্ণনা করেছেন। সাইয়েদ ইজ্জুদ্দীনের বর্ণনায় আছে—আমি কিছু লেখককে

---

[৩৬০] ইবনুল আসির ৭/৫৯১, খাওয়ারিজম শাহি ১২৩

[৩৬১] মুফাররিজুল কুরুব ৪/৬০, সিয়ারু আলামিন নুবালা ২২/২৪০ এর রেফারেন্সে ইবনুল আসিরও এই সংখ্যা ৭ লাখ বর্ণনা করেছেন।

নিয়ে ১৩ দিন পর্যন্ত দিনরাত এক করে কাতার ধরে-ধরে মার্ভের শহিদদের গণনা করেছিলাম। সাকুল্যে বেরিয়েছিল ১০ লাখ ৩ হাজারের চেয়ে কিছু বেশি।[৩৬২]

মুসলিমবিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ভূগোলবিদ ইয়াকুত আল-হামাবি মার্ভের এই আক্রমণের সময় শহরের কুতুবখানাগুলোতে পাঠরত ছিলেন। তিনি পালিয়ে গিয়ে জান বাঁচাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কুদরতের এক আজিব কারিশমা যে, ইসলামি তাহজিব-তামাদ্দুনের এই কেন্দ্রগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার আগে-আগেই ইয়াকুতের মতো এক মহান ভূগোলবিদের এই শহরগুলোতে ভ্রমণ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। শুধু তা-ই নয়, বরং তাতারদের হাতে এইসব জনপদের ধ্বংস ও বরবাদি ইয়াকুতের চোখের সামনেই ঘটেছিল। একজন নিরীক্ষক আলেমের মতো সবকিছু তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত বসে-বসে কলমবন্দি করেছিলেন, যতক্ষণ তাতাররা খোদ মার্ভ শহরে এসে হামলে পড়েনি।

এটাও ভাগ্যের ব্যাপার যে, মৃত্যুর মুখগহ্বর থেকে বেরিয়ে নিরাপদে তিনি মুসেল শহরে পৌঁছে গিয়েছিলেন। সেখানে বসেই রচনা করেছিলেন মুজামুল বুলদানের মতো জগদ্বিখ্যাত এক গ্রন্থ। সেই গ্রন্থে, শব্দের পর শব্দ গেঁথে অন্যান্য ইসলামি শহর ও বস্তির পারিপার্শ্বিকতা ছাড়াও খাওয়ারিজম ও খোরাসানের শোকগাথা লিখেছেন তিনি। মার্ভের অবস্থা তিনি হৃদয়ের সম্পূর্ণ আবেগ ও ভালোবাসা মিশিয়ে লিখেছেন। সেখানকার ইসলামি মারকাজ ও কুতুবখানা, আলেম এবং সাধারণ লোকের পরিচিতি পর্যন্ত গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরেছেন।[৩৬৩]

দুর্ভাগা শহরের বারবার ধ্বংস হওয়ার গল্প

আশ্চর্যের কথা হল—এই ভয়ানক গণহত্যার পরেও মার্ভ শহর ফের কিছুকালের জন্য কয়েকবারই আবাদ হয়ে উঠেছিল। কারণ, মার্ভ ছিল খোরাসান, ইরান ও মা-ওয়ারাউন-নাহারের সংযোগস্থলে অবস্থিত। এজন্য অন্যান্য এলাকা থেকে ভেগে-আসা অসংখ্য লোকের সামনে সর্বপ্রথম যে বড় শহরটি পড়ত, সে ছিল মার্ভ। ফলে এখানেই তারা আবাদ হয়ে উঠত। গড়ে তুলত স্থায়ী আবাস। বাণিজ্যিক পথগুলোও এর পাশ দিয়েই গিয়েছিল। এ-কারণে সওদাগরদের বড়-বড় কাফেলা এখান দিয়েই যাতায়াত করত বেশিরভাগ। এজন্য (আতা মালিক জুয়াইনির মতে) এখানে মানুষের প্রয়োজন-পূরণের সামগ্রী এবং সব রকমের নেয়ামতের প্রাচুর্য ছিল। কিন্তু এ শহরের সেই চাকচিক্য ও সৌন্দর্যই হয়ে ওঠে এখানকার লোকদের দুর্ভাগ্যের কারণ। কেননা, এইদিকে চলে-আসা রাজপথগুলো দিয়ে তাতার-বাহিনীও তখন আনাগোনা করত।

---

[৩৬২] রওজাতুস সফা ৫/৩৭

[৩৬৩] মুজামুল বুলদানে পড়ুন মার্ভ, খাওয়ারিজম ও বোখারার বৃত্তান্ত।

এ শহরের প্রতি তাদের এক প্রকার ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা এসে গিয়েছিল। কারণ, প্রতিবার এখান দিয়ে পথ চলার সময় রক্ত প্রবাহিত করতে হতো তাদের। এক জায়গায় এক কাজ আর কতবার করা যায়? তাদের ধৈর্যের সুতো ছিঁড়ে গিয়েছিল। কিন্তু তবু, যেন-বা নিতান্ত অপারগতাবশত কয়েক মাসের ভেতর ফের কয়েকবার তারা গণহত্যা চালিয়েছিল এখানে।

প্রথমবারের গণহত্যা থেকে কোনোমতে বেঁচেবর্তে বনে-জঙ্গলে ও পাহাড়ে গিয়ে আত্মগোপন করেছিল ৫ হাজারের মতো লোক। কিছুদিনের মধ্যেই দ্বিতীয়বারের মতো এখানে এসে তারা আবাসন গড়েছিল। তাতারদের আরও একটি বাহিনী তখন এখান দিয়ে পথ চলছিল। তারা যখন এখানে দেখতে পেল মানুষের আনাগোনা, এই নতুন ৫ হাজার জনগোষ্ঠীকেও পুরোপুরিভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিল।

এর কিছুদিন পর তাতারদের আরও একটি বাহিনী ঘোড়ার লম্বা বহর নিয়ে এদিক দিয়ে পথ অতিক্রম করছিল। তাদের সিপাহসালার শহরের কাছে থেমে ভরাট কণ্ঠে হুকুম ছাড়ল—এখানে যে-কটাকে পাও, গিয়ে গর্দান উড়িয়ে দাও। এভাবে বাড়তি যে-ক'জন ছিল, তাদেরকেও হত্যা করে ফেলা হল।[৩৬৪]

হামাদানের জিহাদ

খাওয়ারিজম শাহের পিছু-পিছু ধাবমান তাতার-বাহিনী কিছুকাল আগেই হামাদানের পাশ দিয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে ছুটে গিয়েছিল। শহরের হাকিম তখন আনুগত্যের ভাব দেখিয়েছিলেন। খোদ তাতাররাও খাওয়ারিজম শাহকে ধরবার একটা তাড়াহুড়োর ভেতর ছিল। এজন্য শহরবাসীদের থেকে ধনদৌলতের বড়-বড় ভান্ডার ও মহিষের পাল উসুল করে তাদের জীবনের নিরাপত্তা দিয়ে তারা চলে গিয়েছিল। তাদের এক অফিসারকে শহরের ব্যবস্থাপক ও পরিচালক বানিয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে গিয়েছিল। শহরের মুসলিম হাকিম যিনি ছিলেন, তাকে এই তাতার অফিসারের বিশ্বস্ত হয়ে থাকার জন্য বহাল রেখেছিল পূর্বের দায়িত্বেই।

তখন প্রাণ বেঁচে যাওয়াতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়েছিল হামাদানবাসী। কিন্তু কিছুকাল কাটতে-না-কাটতেই তাতার অফিসারের পক্ষ থেকে আবার এক নতুন আবেদন এল যে, এত পরিমাণ (একটা নির্দিষ্ট অঙ্ক) সম্পত্তি দিতে হবে তাদের।

হামাদানবাসী এবার কঠিন সংকটে পড়ে গেল। তাতারদের এইরকম দাবিদাওয়া পূরণ করতে করতে ও বারবার অসহনীয় রকমের ট্যাক্স দিতে দিতে একেবারে দেউলিয়ার কাতারে চলে গেল শহরবাসী। শেষ পর্যন্ত সবকিছু এভাবে দিয়ে দিতে-দিতে তাদের নিকট যখন কোনো কানাকড়িও রইল না, হামাদানের ফটকের মুখে

---

[৩৬৪] রওজাতুস সফা ৫/৩৭

আরো একবার শোনা গেল হিংস্র তাতারদের মেঘ-চেরা গর্জন। তাতার-বাহিনীর সিপাহসালার এখানে মোতায়েনকৃত অফিসার-মারফত নতুন করে মোটা অঙ্কের অর্থ প্রদানের জন্য জোর তাগাদা দিতে লাগল।

হামাদানবাসীর অস্থিরতা

হামাদানের বাসিন্দারা একধরনের মূর্ছাচ্ছন্নতা কিংবা হতভম্বতার খোলসের ভেতরে থেকে শহরের বাইরে শিবির স্থাপনকারী তাতার-সেনাপতির এই নতুন দাবিটা শুনল। দাবি শুনে একইসঙ্গে তারা ভীত, বিস্মিত ও মূর্ছিত হল। পরক্ষণেই বিস্ময়ের সেই বিকলন কাটিয়ে সুপ্তোত্থিতের মতো তারা জেগে উঠল। ভেবে উঠতে পারল না এইবার কী করবে তারা? তাতার-সেনাপতির দাবি পূরণ না-করার অর্থ হল ভয়ানক মৃত্যু। কিন্তু সেনাপতিকে দেওয়ার মতো তাদের কাছে যে আর কিছুই নেই এখন! প্রত্যেকজনের কপালের বলিরেখায় একটা প্রশ্নই কেবল ফুটে রইল—এখন কী হবে?

তারপর তড়িঘড়ি করে অল্পক্ষণ ভেবেচিন্তে হাকিমের কাছে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিল শহরবাসী।

হাকিমের সঙ্গে আলোচনাপর্ব

শহরের হাকিমের কাছে হামাদানবাসীর প্রতিনিধিদল এসে উপস্থিত হয়েছে। হাকিমের উদ্দেশে প্রতিনিধিদলের এক সদস্য অত্যন্ত আবেগমিশ্রিত কণ্ঠে বলে উঠল—দেখুন, এই কাফেররা প্রথমেই আমাদের সমস্ত সম্পত্তি হাতিয়ে নিয়েছে। আমাদের কাছে এখন তাদের দেওয়ার মতো কিছুই নেই। আমরা মাল-সামানা দিয়েই যাচ্ছি আর ওদিকে তাদের নিযুক্ত পরিচালকের অপমানজনক আচরণ সয়ে-সয়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি।

কথাগুলো প্রায় এক নিঃশ্বাসে বলে শেষ করল সে।

হাকিম হতাশায় ভেঙে-পড়া কণ্ঠে বললেন—তাদের সাথে মোকাবেলা করতে আমরা যখন অক্ষমই হয়ে পড়েছি, এখন ভালোমতো বাঁচবার পন্থা আর কী হতে পারে, বলুন? স্পষ্টতই ধনদৌলত দিয়ে তাদেরকে সম্মত রাখা ছাড়া কোনো উপায় আমাদের হাতে নেই।

এই হতাশাব্যঞ্জক কাপুরুষোচিত জবাব শুনে প্রতিনিধিদলের সদস্যদের সবাই ক্রোধে ফেটে পড়ল। বলে উঠল—আরে, এই কাফেরদের তুলনায় আপনার অস্তিত্বই দেখছি আমাদের জন্য অধিক ক্ষতিকারক।

সদস্যদের এই জোশ ও জজবা দেখে হাকিম সাহেব যেন খানিকটা ভড়কে গেলেন। থতমত খেয়ে তিনি বললেন—দেখুন, আমি তো সবসময় আপনাদের সঙ্গেই আছি। আপনাদের যা অভিমত, তা-ই করুন, কোনো সমস্যা নেই!

হামাদানের ফকিহ সাহেবের জিহাদের ডাক শহরবাসীর ঐকমত্য

হামাদানে তখন নামজাদা একজন ফকিহ বাস করতেন। তিনি ছিলেন হাকিমের পরামর্শদাতা ও দক্ষিণবাহু। আমজনতা তার ইলম ও মাহাত্ম্যের গুণে অত্যন্ত প্রভাবিত ছিল। উপর্যুক্ত মজলিশে হাকিমের সঙ্গে তিনিও ছিলেন।

লোকজন তার কাছে পরামর্শ তলব করল। তৎক্ষণাৎ তিনি কোনো রাখঢাক ছাড়াই স্পষ্ট কণ্ঠে তাতারদের বিরুদ্ধে জিহাদের সংকল্প ব্যক্ত করলেন। মজলিশের সদস্য যারা ছিল, তাদেরকেও এ-ব্যাপারে উৎসাহিত করলেন।

সুলতান জালালুদ্দীনের ক্ষমতাগ্রহণের পর থেকে ব্যাপকভাবে মানুষ জিহাদের পথে আসতে শুরু করেছিল। খণ্ডবিখণ্ড হয়ে-পড়া পুরোনো হিম্মতের গায়ে নতুন করে তারা জোড়া লাগাচ্ছিল। তাতারদের নির্যাতনে হামাদানবাসীর জীবন হয়ে উঠেছিল চূড়ান্ত সংকটপূর্ণ। ফলে, ফকিহ সাহেবের এই জিহাদি আহ্বান শোনামাত্র নগরবাসীর সবাই লাব্বাইক বলে তাতে সাড়া দিতে লাগল। তারা এইরকম লাঞ্ছিত জীবন আর যাপন করতে চায় না। তারা চায় এক সম্মানজনক জীবন, নয়তো শাহাদাতের বীরোচিত মৃত্যু।

ফকিহ সাহেবের নেতৃত্বে জিহাদের জন্য শহরের নেতৃস্থানীয়দের বদ্ধপরিকর হয়ে উঠতে দেখে তাদের সঙ্গে জুড়ে গেলেন হাকিম সাহেবও। তারপর সবচেয়ে বড় যে ব্যাপারটা দেখা দিয়েছিল, সেটা হল—হামাদানে তখন নিয়মানুগত পেশাদার সৈন্যসংখ্যা ছিল খুবই কম। ওদিকে সুলতান জালালুদ্দীনের অবস্থাও ততটা পোক্ত হয়ে ওঠেনি যে, তিনি যেখানে আছেন, সেখানকার কর্মযজ্ঞ বাদ দিয়ে অন্য রণাঙ্গনে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবেন।

সুলতান তখন খোরাসানে অবস্থান করছিলেন। হামাদান থেকে খোরাসানের দূরত্ব এত বেশি ছিল যে, হামাদান থেকে সুলতানের কাছে পয়গাম পৌঁছতে এবং সেখান থেকে সেনাসাহায্য আসতে নিশ্চিত একটা লম্বা সময় কেটে যেত। অথচ তাতার-বাহিনী তখন তরবারি নিয়ে একদম মাথার উপরে দণ্ডায়মান। যেকোনো মুহূর্তে আক্রমণ করে বসতে পারে তারা।

এইসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ করে প্রতিনিধিদলকে হাকিম সাহেব পরামর্শ দিলেন—'আপনারা বাগদাদের খলিফা নাসিরের কাছে বর্তমান পরিস্থিতি জানিয়ে একটা বিশ্লেষণধর্মী চিঠি লিখুন। এই নাজুক অবস্থা সম্পর্কে তাকে অবগত ও সতর্ক করে তুলুন। বলুন, তিনি যেন আমাদের সাহায্যে কোনো অভিজ্ঞ সেনাপতির কমান্ডে একটি সৈন্যদল প্রেরণ করেন, যারা এসে এই কাফেরদের হাত থেকে মুসলমানদের জান-মালের হেফাজত করবে।'

হাকিমের এমন পরামর্শ প্রদানের কারণ হল, হামাদান থেকে বাগদাদের দূরত্ব খুব বেশি ছিল না। এজন্য হাকিম সাহেব আশাবাদী ছিলেন—তাতার-বাহিনী এত কাছে

এসে গেছে শুনে খলিফা নাসির সাধারণ মুসলিমদের জন্য না-হোক, অন্তত বাগদাদের প্রতিরক্ষার জন্য হলেও কিছু-না-কিছু সৈন্য অবশ্যই এদিকে পাঠাবেন।

হামাদানের নেতৃস্থানীয় লোকজন পছন্দ করলেন হাকিমের এই পরামর্শ। খলিফার উদ্দেশে দ্রুত একটি পত্র লেখালেন। সেই পত্রে হামাদানে বিরাজমান ভীতি-সন্ত্রস্ততা ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনার একটি হৃদয়ছোঁয়া দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হল, যা তাতার-কর্তৃক মুসলিমদের উপর আপতিত হয়েছিল। তারপর খলিফাকে ইসলাম ও মুসলমানদের ইজ্জতের দোহাই দিয়ে কমপক্ষে ১ হাজার অশ্বারোহী এবং এমন একজন যোগ্য সিপাহসালার প্রেরণের আবেদন জানানো হল, যাঁর পতাকাতলে সমবেত হয়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে পারবে হামাদানবাসী।

যুদ্ধের সিদ্ধান্ত

চিঠি নিয়ে বাগদাদের উদ্দেশে রওনা দিল হামাদানের পত্রবাহক। কিন্তু বড় দুর্ভাগ্য, কিছুদূর যেতেই তাতার-সেনাদের হাতে ধরা পড়ে গেল সে। তাতার-সেনারা তাকে গ্রেফতার করে উদ্ধার করে ফেলল চিঠি। চিঠিতে তারা শনাক্ত করে উঠল হামাদানের হাকিম ও নেতাদের সিলমোহর। এইরকম গোপন পাঁয়তারা দেখে তারা অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে উঠল। হাকিমের কাছে এসে শক্ত ভাষায় এই কর্মকাণ্ডের ভয়ংকর পরিণতির কথা জানিয়ে গেল।

এতে পুরোপুরি ভড়কে গেলেন হাকিম সাহেব। কাঁপা-কাঁপা গলায় তিনি বললেন—এই চিঠির সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি নির্দোষ।

সাথে সাথে তাতাররা ভাঁজ-করা চিঠিটা খুলে গরম কণ্ঠে বলে উঠল—দেখো তো, এতে কার কার সিলমোহর রয়েছে?

তাতারদের উত্তেজিত মূর্তি দেখে হাকিমের পায়ের তলার মাটি সরে গেল। তিনি বুঝে গেলেন—এখন জীবন-মৃত্যুর বাজি লাগানো ছাড়া উপায় নেই। তাতারদের কাছে কোনো প্রকার অনুগ্রহের আশা করা নিরর্থক।

ফকিহ সাহেব, যিনি ততক্ষণে হামাদানের আমজনতার জিহাদের লিডার বনে গিয়েছিলেন, এই সুরতহাল দেখে সাধারণ্যকে খুবই চৌকস ও প্রস্তুত থাকতে আদেশ দিলেন। তখনও শহরের পরিচালক হিসেবে হামাদানে অবস্থান করছিল তাতারদের প্রধান অফিসার।

ফকিহ সাহেব লোকজনকে হুঁশিয়ার কণ্ঠে নির্দেশ দিলেন—আপনারা এই অফিসারকে শহর থেকে বহিষ্কার করুন। হামাদানের আকাশে শিগগির উড্ডীন করুন জিহাদের পতাকা।

তার এই আদেশ পেয়ে উত্তেজিত জনতা আরেকটু যেন অগ্রে বেড়ে গেল। তারা তাতার অফিসারকে ধরে একেবারে হত্যা করে ফেলল। শহরের সমস্ত ফটক শক্তভাবে বন্ধ করে দেওয়া হল। অস্ত্রসজ্জিত যুবকেরা প্রাচীরের চূড়ায় উঠে ভরাট কণ্ঠে হেঁকে উঠতে লাগল চিরায়ত জিহাদের তাকবিরধ্বনি।

হামাদানবাসীর পূর্বাবস্থা এমন ভয়ানকভাবে বদলে যেতে দেখে শহরের বাইরে ছাউনি-ফেলা তাতার-বাহিনী একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। প্রাচীরের সমস্ত লৌহকপাট শক্ত করে এঁটে দেওয়া হয়েছে। দেয়ালের উপর পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অস্ত্রসজ্জিত তিরন্দাজ-বাহিনী। এদিকে তাতার-বাহিনীও বসে রইল না। তারাও প্রস্তুত করে ফেলল তাদের যুদ্ধের সারি। চতুর্দিক থেকে শক্তভাবে অবরোধ করে রাখল সারা শহর।

হামাদানবাসী বুঝে গেল—এই অবরোধের দীর্ঘতা তাদের জন্য বয়ে আনবে ভয়ংকর মৃত্যুর পয়গাম। তাতারদের এই কঠিন অবরোধ ভেদ করে বাহির থেকে কোনো খাদ্যখোরাকি আসারও সম্ভাবনা নেই। এমনকি শহরের ভেতর ইতোমধ্যে প্রবল সংকট পড়ে গেছে। বাড়িঘরে যে-পরিমাণ খোরাকি রয়েছে, তাতে টানাটানি করে চলতে পারে মাত্র কিছুদিন।

অভাব এইরকম জাঁকিয়ে বসার কারণ, দূরদূরান্তের সব শহর ও জনপদের অধিবাসীরা তাতারদের হিংস্রতার টার্গেটে পরিণত হয়েছে বলে আগেভাগেই হামাদানে এসে আশ্রয় নিয়েছে। ফলে এখানকার অবস্থা এমন হয়ে গেল যে—চোখের সামনে পড়ে রয়েছে যোজনবিস্তৃত খেতখামার; কিন্তু নেই কোনো পানিসিঞ্চনকারী কিষান। রয়েছে ফলভর্তি সবুজ-শ্যামল বাগিচা; কিন্তু নেই কোনো মালী। নিদারুণ হাহাকার ধারণ করে জেগে আছে সমস্ত চারণভূমি, নেই শুধু মহিষের লম্বা বহর। রাজ্যের সর্বত্র বিরাজ করছে ভীতিকর থমথমে নিস্তব্ধতা। এ-কারণে বাইরে থেকে কোনোধরনের আনাজ, সবজি, ফলমূল আসার প্রশ্নই ওঠে না। চারদিকে নেমে এসেছে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ।

তবে এই নাজুক সময়েও তাতারদের খাদ্যসংস্থানে কোনো সমস্যা হচ্ছিল না। যেকোনো জীবিত কিংবা মৃত মানুষ অথবা জানোয়ারের মাংসে নিবারণ করে নিচ্ছিল পেটের ক্ষুধা। তাদের ঘোড়াগুলোকেও দানাপানি প্রদানের প্রয়োজন পড়ছিল না। তারা একা-একাই বিভিন্নদিকে ঘুরে-ঘুরে ঘাসপাতা, জঙ্গলের বৃক্ষশিখর কিংবা চারাগাছ তুলে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে নিচ্ছিল। কোথাও কিছু না-মিললে পায়ের খুর দিয়ে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে কর্তিত চারাগাছের অবশিষ্ট জড়-শেকড় বার করে তা-ই খাচ্ছিল।[৩৬৫]

এ-সমস্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ করে হামাদানের নেতৃত্বস্থানীয়রা সিদ্ধান্ত নিল—অনতিবিলম্বে তাতারদের সাথে খোলা ময়দানে যুদ্ধে নামতে হবে। শহরে নিয়মানুবর্তী পেশাদার সৈনিক ছিল খুব কম। সুলতান আলাউদ্দীন খাওয়ারিজম শাহ তার ৪ লক্ষ সৈনিককে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু পশ্চিমের

---

[৩৬৫] ইবনুল আসির ৭/৫৮৪

এলাকাগুলোতে একেবারেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করেননি তখন। কারণ, সে-সময় তিনি ধারণাও করতে পারেননি যে, কয়েক মাসের মধ্যে তাতার-বাহিনী এই দুর্গম শক্ত শহরগুলোর লৌহপ্রাচীর ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে জাইহুন-নদীর পার পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবে।

এজন্যই পশ্চিমের এই শহরগুলোতে পেশাদার সৈনিকের উপস্থিতি ছিল নামেমাত্র। লোকস্বল্পতা সত্ত্বেও হামাদানের বোদ্ধাশ্রেণি নগরবাসীকে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তুলছিলেন। জনতার মাঝে তরঙ্গায়িত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল বিপুল ঈমানের জোশ। হাজার হাজার নওজোয়ান জান কোরবান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে উঠেছিল। মোকাবেলার জন্য তারা নিয়ে রেখেছিল আমূল প্রস্তুতি।[৩৬৬]

যুদ্ধের প্রথম দিন

পরদিন হামাদানের বাইরে উন্মুক্ত প্রান্তরে বাতাসে ধুলো উড়িয়ে শুরু হল সংঘর্ষ। স্বয়ং ফকিহ সাহেবও প্রথম সারিতে থেকে তীব্রভাবে মোকাবেলা করে যেতে লাগলেন। তা দেখে হামাদানের যোদ্ধাদের হিম্মত বহুগুণ বৃদ্ধি পেল। তলোয়ার-বর্শার ঝপাঝপ ঘাত-প্রতিঘাতে সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত অগ্নিময় হয়ে রইল পুরো যুদ্ধপ্রান্তর। কিন্তু যুদ্ধের চূড়ান্ত কোনো ফয়সালা ঘটে উঠল না। সন্ধ্যার দিকে ধীরে-ধীরে খালি হতে লাগল ময়দান। হাওয়ায় উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণা হঠাৎ যেন কোথায় মিলিয়ে যেতে লাগল। চারপাশ হয়ে পড়ল থমথমে নীরব। প্রান্তরজুড়ে লেপটে রইল কেবল বিধ্বস্ত বালুরাশি ও লাল রক্তের দাগ।

মরুভূমির পশ্চিমে খানিক আগেই তলিয়ে গেছে সন্ধ্যার মলিন সূর্য। আধো আলো আধো ছায়ায় রণক্ষেত্রে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে তাতার-সেনাদের অসংখ্য লাশ। মুসলিমদের একটা বড় অংশও কোরবান হয়ে গেছে। আহতদের সংখ্যাও কম না। নিদারুণভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন ফকিহ সাহেবও। তার বুকে, পিঠে ও বাহুতে ভয়ংকর কিছু আঘাত লেগেছে। তবু তার ভেতর জমাটবদ্ধ পাহাড়-সমান ধৈর্য ও সহনশীলতা। একটুও তকলিফ প্রকাশ না-করে, আগামীকালের যুদ্ধ কীভাবে পরিচালনা করতে হবে, সেই পরিকল্পনা সাজাতে ব্যতিব্যস্ত তিনি।[৩৬৭]

যুদ্ধের দ্বিতীয় দিন

দ্বিতীয় দিনের শুরু। দুদিকের বাহিনীর মাঝে বেধে উঠেছে ঝনঝন যুদ্ধ। সৈনিকদের উদ্যম ও পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে—গতকালের চেয়ে আজকের যুদ্ধের গতি আরও প্রচণ্ড, অপ্রতিরোধ্য। হামাদানের যোদ্ধাদের সংখ্যা অত্যল্প; তবু তারা প্রবল বিক্রমে এসে তাতার-বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ক্ষিপ্ত তরবারির আঘাতে কর্তিত

---

[৩৬৬] ইবনুল আসির ৭/৫৮৪-৫৮৫

[৩৬৭] ইবনুল আসির ৭/৫৮৪-৫৮৫

বৃক্ষকাণ্ডের মতো ধুপধাপ জমিনে পড়তে শুরু করেছে তাতারদের লাশ। আহত অবস্থাতেও ফকিহ সাহেব সুনিপুণভাবে মুজাহিদবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। এটি নিশ্চয় তার উন্নত সাহসিকতার প্রমাণ। হামাদানবাসীকে একা তিনিই হতাশার অতল অন্ধকার থেকে তুলে এনে জিহাদের স্বাদে ও প্রেরণায় বানিয়ে দিয়েছেন মাতোয়ারা। নগরবাসী যখন দেখল তাদের প্রাণপ্রিয় নেতা আহত হয়েও লড়ে যাচ্ছেন বিপুল শক্তিতে, তখন তাদের সাহস ও উদ্দামতাও কয়েকগুণ বেড়ে গেল।

সারাদিন ধরে যুদ্ধ জারি রইল। সন্ধ্যার দিকে দুইপক্ষই নিজেদের জখম সামলাতে-সামলাতে ময়দান থেকে পিছু হটল। আজকের যুদ্ধের সমাপ্তির দিকে এসে তাতার মুসলিম দু-দলই বেশ স্তম্ভিত ও দ্বিধান্বিত। সবার চোখে-মুখেই হয়রানি ও পেরেশানির গভীর ছাপ স্পষ্ট। তাতার-বাহিনী পেরেশান তাদের নিহত ও জখমপ্রাপ্তদের সংখ্যাধিক্য দেখে। এতে ইতোমধ্যে ভাঙতে আরম্ভ করল তাদের মনোবল। লড়বার খুব বেশি হিম্মত আর রইল না। আগামীকালের যুদ্ধে পরাজয় ঘটতে পারে বলে শঙ্কা অনুভব করছিল তাদের সেনাপতি। তাই সবাইকে নিয়ে সে বিধ্বস্ত শরীরেই দ্রুত পরামর্শে বসে গেল—তারা এখানে থাকবে, নাকি এখান থেকে চলে যাবে!

অন্যদিকে মুসলিমবাহিনী তাদের লিডারের রক্তাক্ত জখম দেখে খুবই হয়রান হয়ে পড়েছিল। আজকের এই দ্বিতীয় দফার যুদ্ধে ফকিহ সাহেবের দেহে যুক্ত হল আরো কিছু ভয়াবহ আঘাত। তার মাঝে আগামীকালের ফাইনাল ও চূড়ান্ত যুদ্ধের নেতৃত্ব দেবার মতো সক্ষমতা রইল না। শরীরে এই আঘাতপ্রাপ্তির ফলে আগের মতো সক্ষম কিংবা উপযুক্ত থাকেননি তিনি।

ফকিহ সাহেবের পরে যুদ্ধক্ষেত্রে দ্বিতীয় যে ব্যক্তিটি বাহিনীর কমান্ড করতে পারতেন, তিনি ছিলেন হামাদানের হাকিম। কিন্তু এই নাজুকতর অবস্থার দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে চূড়ান্ত হীনম্মন্যতার প্রকাশ ঘটিয়ে বসলেন তিনি। পরিবার নিয়ে গোপন ও অন্ধকার এক সুরঙ্গপথে শহর ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। হামাদানের আমজনতা তাকে হন্যে হয়ে শহরের চতুর্দিকে খুঁজতে লাগল। শেষ পর্যন্ত কোথাও তাকে পাওয়া গেল না।

উন্মুক্ত প্রান্তরে সেনাপতির অনুপস্থিতিতে কোনো সৈন্যদলের পক্ষেই পা জমিয়ে লড়াই চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না কখনো। ফলে, আগামীকালের সম্ভাব্য বিজয় এখন নগরবাসীর নিকট খুব অসম্ভব লাগতে লাগল। সকলে মিলে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল যে, প্রাচীরের ভেতর আবদ্ধ থেকেই শেষনিঃশ্বাস পর্যন্ত তারা চালিয়ে যাবে মোকাবেলা।[৩৬৮]

---

[৩৬৮] ইবনুল আসির ৭/৫৮৪-৫৮৫

তাতারদের শহর দখল

পরদিন তাতাররা চলে যাবে বলে গোছগাছ শুরু করে দিয়েছিল; কিন্তু সূর্যোদয়ের পরে যখন দেখল, শহরের ফটকগুলোর কাছে গতদিনের মতো মুসলিমবাহিনীর কোনো ক্রিয়াকর্ম ও তৎপরতা দেখা যাচ্ছে না, বুঝে ফেলল, মুসলমানরা ভেতর থেকে প্রবল কমজোরি ও মনোবলহীনতার শিকার হয়ে পড়েছে, তারা আর লড়াই করতে চাচ্ছে না।

ফলে, তাতারদের থিতিয়ে-আসা হিম্মতের নদীতে নতুন পশুত্বের জোয়ার উঠল। পুরো বাহিনী সম্পূর্ণ বিন্যস্ত হয়ে শহরে উপর্যুপরি হামলা করতে শুরু করল। নগরবাসী ভেতরে আবদ্ধ থেকেই জবরদস্ত সংঘর্ষ করে যাচ্ছিল, কিন্তু শেষ নাগাদ তাতার-বাহিনী ঢুকেই পড়ল শহরের ভেতর।

হামাদানের পথে-প্রান্তরে, বাজারে-বাজারে শোনা যেতে লাগল তলোয়ারের ঝনঝনানি। সংকীর্ণ গলিঘুঁজির ভেতর যেখানে তলোয়ার-বর্শা চালানোর কোনো সুযোগ ছিল না, সেখানে শুরু হল খঞ্জরের লড়াই। অপারগ মুসলমানরা তখন অন্য কিছুর জন্য নয়, শুধু একটি বীরোচিত সম্মানজনক মৃত্যুর জন্য লড়ে যাচ্ছিল। তাতার-বাহিনী ছিল আপাদমস্তক সুবিন্যস্ত; শৃঙ্খলাবদ্ধ। অন্যদিকে মুসলিমরা হয়ে পড়েছিল বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন। তার উপর এ ছিল এক পূর্ণাঙ্গ পেশাদার বাহিনী এবং অনভিজ্ঞ মুসলিম সাধারণের এক যুদ্ধ। ফলে, মাত্র দু-চার দিন গণহত্যা চালাতেই তাতারদের হাতে শহিদ হয়ে গেল হামাদানের সমস্ত নারীপুরুষ। কিন্তু, অন্যদিকে তাতারদের নিহতের সংখ্যাও কম ছিল না।[৩৬৯]

গণহত্যা থেকে অবসর হতেই তাতাররা সর্বাগ্রে তাদের স্বভাবসিদ্ধ রীতি অনুযায়ী পুরো শহরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। ৬১৮ হিজরির রজব মাসে ঘটেছিল হামাদানের এই মর্মান্তিক ট্রাজেডি।[৩৭০]

শহিদদের সংখ্যা : অতিরঞ্জন কিংবা বাস্তবতা

ধ্বংস ও হত্যাযজ্ঞের এই ঘটনা এবং নিহতদের সংখ্যা আজকালকার লোকদের কাছে বড় অতিরঞ্জিত লাগে। হ্যাঁ, কারুর কাছে এইসব শহরের জনগোষ্ঠীর সংখ্যাধিক্যের ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য কিছু মনে হতে পারে। কিন্তু ভাই, আমরা এগুলোকে যতই সুদূর পরাহত বিষয় বলে ভাবি না কেন, এসবই যে প্রকৃত বাস্তবতা! বাস্তবতা কখনো অস্বীকার করা যায়?

চিন্তা করুন, তখনকার পুরো মুসলিমবিশ্বে ইঞ্জিনিয়ারিং, কারিগরি, গতিশীল জীবনযাত্রা ও অর্থনীতির এক সোনালি অধ্যায় চলছিল। তৎকালে পৃথিবীর সমস্ত

---

[৩৬৯] ইবনুল আসির ৭/৫৮৪-৫৮৫

[৩৭০] ইবনুল আসির ৭/৫৮৪-৫৮৫

মহাদেশ থেকে লোকজন সে-রকমভাবেই মুসলিমবিশ্বে পাড়ি জমিয়েছিল, আজ যেমন আমরা জীবিকার সন্ধানে পশ্চিমাদের বিভিন্ন দেশে ছুটতে শুরু করেছি। মুসলিমবিশ্বের এই হামাদান শহর, তাতারদের তরবারির আঘাতে যেটি রক্তাক্ত হয়েছিল—জনসংখ্যা, ধনদৌলত, মনোরম ও সুদৃশ্য হওয়ার দিক থেকে মুসলিমবিশ্বের অন্যসব শহর থেকে ছিল সম্পূর্ণ পৃথক, নিরুপম।

সে-সময়কার বাগদাদের জনসংখ্যা ছিল ২০ লাখ। এটিই প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য আলোচনা। জনসংখ্যায় মধ্য-এশিয়ার এই শহরটিও (হামাদান) বাগদাদের বরাবর না-হলেও কাছাকাছি নিশ্চয় ছিল। হামাদান ছিল পৃথিবীর প্রধানতম শহরগুলোর একটি। এটি ছিল সকল গোত্রের জ্ঞানবিজ্ঞান, শিল্প ও কারিগরির প্রধানকেন্দ্র। বহু শতাব্দী ধরে ঠিক একইভাবে আবাদ হয়ে ছিল এটি। ইসলামপূর্ব যুগেও ছিল বৃহৎ ও কেন্দ্রীয় শহরগুলোর পর্যায়ভুক্ত। তারপর খোলাফায়ে ইসলাম ও সুলতানদের আমলে, হামাদানের বিস্ময়কর অগ্রগতির অব্যাহত ধারা যেন দূরদূরান্ত থেকে অবিরাম মানবসম্প্রদায়কে সম্মোহিতের মতো টেনে টেনে আনছিল। এজন্য এখানকার জনসংখ্যা তখন লাখের কোঠায় পৌঁছে যাওয়া অসম্ভব কিছু ছিল না; এটি একটি অকাট্য বিষয়। তা ছাড়া যুদ্ধের দিনগুলোতে আশপাশের গ্রাম-জনপদ থেকে সারি বেঁধে লোকজন যে এ শহরে এসে উঠেছিল, সেটাও সুনিশ্চিত।

কিন্তু এই ভয়ংকর তাতার-আগ্রাসনের সময় দূরদরাজের অন্যান্য শহর ও গ্রামের লোকজনও হিজরত করে পশ্চিম ও দক্ষিণের শহরগুলোতে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছিল। এ-কারণে ঐতিহাসিকরা এখানকার শহিদদের যে সংখ্যাটি বর্ণনা করেছেন, তা কোনোভাবেই যুক্তিবিবর্জিত নয়, বরং পুরোপুরি যুক্তিসিদ্ধ।

পশ্চিমা ঐতিহাসিক হ্যারল্ড ল্যাম্ব লিখেছেন, আজকের দিনে বসে এই হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা দেখলে বড় হতভম্ব লাগে। এটি ছিল এমন এক যুদ্ধ, যা অন্য সমস্ত ট্রাজেডিকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এ ছিল বনি আদমের মাঝে এক ভয়ংকর গণহত্যা। তাতারদের উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবী থেকে মানবজাতিকে ধ্বংস করে দেওয়া। এই গণহত্যা মুসলিমবিশ্বের প্রাণকেন্দ্রকে ছায়াহীন রৌদ্রদগ্ধ এক খাঁ-খাঁ প্রান্তরে পরিণত করেছিল। এই গণহত্যা থেকে যেসব লোক বাঁচতে পেরেছিল, তারাও স্বস্তিতে থাকতে পারেনি। ভেতর থেকে ক্ষয়প্রাপ্ত জীর্ণশীর্ণ এক বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। কষ্টেসৃষ্টে ও পেরেশানিতে তারা এক নিদারুণ উদ্ভ্রান্ত জীবন কাটাচ্ছিল। লুকিয়ে-চুরিয়ে কিছু খেয়ে-না-খেয়ে কোনোমতে নিবারণ করত ক্ষুধার আগুন। তারপর আবার কোথাও লুকিয়ে পড়ত। কোনো ধরনের কাজের ক্ষমতা তাদের ছিল না।

যে-সমস্ত শহর পুরোপুরি মিসমার হয়ে গিয়েছিল, সেখানে দ্বিতীয়বার আবাদ হয়ে উঠতে পারেনি মানুষ। এই শহরগুলোর ধ্বংসচিহ্নই শুধু অবশিষ্ট ছিল, যা পরবর্তীকালের লোকদের জন্য পরিণত হয়েছিল নাভিশ্বাস-তোলা এক উপকথায়।

একাধিকবার হয়েছে কি—কোনো বিধ্বস্ত শহর যেখানে কোনোরকমে আবাদ ছিল, সেখানে শুধু হালচাষ ও চাষাবাদের কাজই করা গিয়েছিল; অন্যকিছু করা যায়নি।[৩৭১]

আশ্চর্যের কথা হল—এই ব্যাপক হত্যাযজ্ঞের সবটুকু ধাক্কা শুধু বিশুদ্ধ আকিদাসম্পন্ন মুসলিমদের (আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত) শহরেই লেগেছিল। বিপরীতে উত্তর ইরানের বাতেনি ফেরকার শহরটি ছিল একেবারে নিরাপদ। অথচ তাদের এলাকা ছিল খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যেরই সীমান্তসংলগ্ন।

এক্ষেত্রে মুওয়াফফিক বাগদাদি ওয়াসেতের এক ব্যবসায়ীর বর্ণনা ব্যক্ত করেছেন। তাতারদের রাক্ষুসে তরবারি থেকে বেঁচে গিয়ে পাহাড়ের গোপন কন্দরে লুকিয়ে ছিল সেই ব্যবসায়ী। তাতার-বাহিনী হেরাতের দিকে যাত্রা করলে সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছিল সে। এই ব্যবসায়ী বলেছে, 'একসঙ্গে আমরা সাতজন পাহাড়ের ঢালু বেয়ে হিড়হিড় করে নামলাম এবং প্রান্তরে এসে লাশ গুনতে লাগলাম। আমরা সেদিন ৫ লক্ষ ৫০ হাজার লাশ গুনেছিলাম। তা ছাড়া অজস্র ধনসম্পত্তি ও সামানপত্র সবদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে ছিল। তারপর সেখান থেকে আমরা বাতেনিদের শহরের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমাদেরকে ছুঁয়ে যায় খানিকটা অবাক বিস্ময়, দেখি—ওখানকার সবকিছু সম্পূর্ণ সুস্থির, কোনো কিছুতে একটুও ভিন্ন রূপ দেখা যায়নি।'[৩৭২]

এ থেকে জানতে পারি—একেবারে প্রথম থেকেই মুসলিমদের বিভিন্ন স্তর ও ফেরকার মধ্যকার পার্থক্য বুঝত তাতাররা। তাদের কাছে কিছু ফেরকা ছিল বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য, যাদের দিয়ে তারা বাস্তবায়ন করাতে পারত নিজেদের উদ্দেশ্য।

---

[৩৭১] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১৮, পৃষ্ঠা ১৩৭-১৩৮

[৩৭২] তারিখে কাবির যাহাবি ৬২/৬১৭

পঞ্চদশ অধ্যায়

পুণ্যভূমি আফগানিস্তানের যুদ্ধক্ষেত্র

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ

নিশ্চয় মহান আল্লাহ সেসব লোককে ভালোবাসেন, যারা এমন সারিবদ্ধভাবে যুদ্ধ করে যায় যে, দেখে মনে হয়—সম্মুখে সিসা-গলিত জমাটবদ্ধ শক্ত প্রাসাদ।[৩৭৩]

হেরাতের যুদ্ধ

এই অধ্যায়ে আমরা তাতারদের বিরুদ্ধে সংঘটিত সেইসব যুদ্ধ ও সংঘর্ষের আলোচনা করব, যে যুদ্ধগুলো পরিচালনার প্রাণকেন্দ্র ছিল ওইসমস্ত এলাকা, বর্তমানে যেগুলো আফগানিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। বহু শতাব্দী ধরে মুজাহিদদের এই পবিত্র এলাকাটি বক্ষে ধারণ করে আছে গৌরবান্বিত এক শুভ্রোজ্জ্বল ইতিহাস। কোনোকালেই এখানকার বাহাদুর মুসলিমরা কোনো কাফের-শক্তির সামনে হাতিয়ার ফেলেনি। তাদের দেহ ও মস্তক কর্তিত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, কিন্তু তবু কাফের-শক্তির সামনে কখনো ঝুঁকে পড়েনি।

চেঙ্গিজ খান থেকে শুরু করে ব্রিটেন, রাশিয়া, আমেরিকাসহ পৃথিবীর সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকেই আফগানিস্তানের জমিনে ঠিক একইরকম তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। চলুন দেখে আসি—আটশ বছর আগে চেঙ্গিজ খানের বল্গাহীন কাফের-বাহিনী জিহাদের এই পবিত্রভূমির সীমানায় যখন ঢুকেছিল, তখন উদ্ভব ঘটেছিল কেমনতরো সব রণক্ষেত্রের। এই লোমহর্ষক দাস্তানের বয়ান আমরা হেরাত থেকে শুরু করছি।

হেরাত আফগানিস্তানের সেই বৃহৎ ও প্রাচীন শহরগুলোর একটি, ইসলামপূর্ব যুগেও যেগুলো কেন্দ্রীয় শহরের পর্যায়ভুক্ত ছিল। খাওয়ারিজমি জামানায় এর চাকচিক্য ছিল অত্যন্ত সমুজ্জ্বল। এখানে মাদরাসা, খানকা ও লঙ্গরখানার সংখ্যা ৩৫০ এর কম ছিল না। বাজারগুলোতে ১২ হাজারের মতো দোকান ছিল। নিশ্ছিদ্র ভিড় ও কান ঝালাপালা করে-দেওয়া শোরগোল লেগেই থাকত সবসময়।[৩৭৪]

মার্ভ ও নিশাপুর ধ্বংস করার পর চেঙ্গিজ খানের সবচেয়ে বাহাদুর যোদ্ধা, রক্তপিপাসু ও চতুর পুত্র তুলি খান এক জবরদস্ত বাহিনী নিয়ে হেরাতের দিকে

---

[৩৭৩] সুরা সফ, আয়াত ৪

[৩৭৪] আফগানিস্তান দর মাসিরে তারিখ ২১৮, ইবনে হাওকাল ও আল-মুকাদ্দিসির সূত্রে বর্ণিত।

অগ্রসর হল। এক বছর আগে আলাউদ্দীন খাওয়ারিজম শাহের পিছু-পিছু ধাবমান তাতার জেনারেল জুবি নৈয়ান ও সুবেদাই এই হেরাতের পাশ দিয়েও অতিক্রম করেছিল। কিন্তু খাওয়ারিজম শাহকে ধাওয়া করতে গিয়ে তারা খুব তাড়াহুড়োয় ছিল তখন। তাই সে-সময় এখানকার লোকদের উপর তারা আঙুল তোলেনি। শুধু হেরাতের হাকিম আমান মালিকের কাছ থেকে আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি নেওয়াই যথেষ্ট মনে করেছিল। তাতারদের চলে যাবার পর, আমান মালিক তার বিশ্বস্ত সেপাইদের নিয়ে হেরাত থেকে বেরিয়ে বর্তমান আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলীয় সিস্তানে পাড়ি জমিয়েছিলেন। তার অনুপস্থিতিতে শামসুদ্দীন মুহাম্মদ নামের এক প্রভাবক শক্তিসম্পন্ন সরদারকে নতুন হাকিম নিযুক্ত করা হয়েছিল। তিনি ছিলেন একজন হিম্মতজিগর নির্ভীক মানুষ। তাতারদের একটুও ভয় পেতেন না। তিনি বুদ্ধি করে দুশমনের আক্রমণের আগেভাগেই হেরাতের প্রতিরক্ষার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা নিয়ে রাখলেন। অন্যান্য শহরের মতো হেরাতেও তখন সুলতান জালালুদ্দীনের আহ্বানে বিপুল সাড়া জেগেছে। আমির-সরদারদের থেকে শুরু করে সাধারণ সেপাইদের ভেতরেও তৈরি হয়েছে জিহাদের জোশ ও জজবা। সাধারণ ও বিশিষ্টজনদের সবাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠেছে।

অল্প সময়ের মধ্যে তুলি খান তার বাহিনী-সমেত এসে উপস্থিত হয়ে গেল। শহরের বাইরে উন্মুক্ত ময়দানে ছাউনি খাটাল সে। দূত-মারফত হেরাতের হাকিমের কাছে পয়গাম পাঠাল, তোমরা যদি নিজেদের কল্যাণ চাও, কোনো ধরনের সংঘর্ষ না-করে অনতিবিলম্বে শহরের ফটক খুলে দাও।

তাতার দূতের চিঠিপাঠ শুনে শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন। হুংকার দিয়ে ক্ষিপ্ত গলায় বলেন—'খোদা, আমি যদি কোনো দিন এই জান্তবদের আনুগত্যের বেড়ি আমার গর্দানে পরাই, সেইদিন তুমি আমাকে ধ্বংস করে দিয়ো।' এ কথা বলেই তিনি কোমরের খাপ থেকে ঝপাং করে তলোয়ার বের করে আনলেন। এক কোপেই হত্যা করে ফেললেন দূতকে। দূত-হত্যার খবর শুনে তুলি খানের ক্রোধ ও জজবা তেমনই হয়ে উঠল, এইরকম পরিস্থিতিতে রক্তপাতকারী এক নিষ্ঠুর জানোয়ারের যেমন হয়ে ওঠার কথা। সে সর্বশক্তিতে শহরে আক্রমণ করে বসল। কিন্তু তার পাশবিকতা ও শক্তি অন্যান্য শহরে যেমন আঘাত হেনেছিল, হেরাতবাসীর সাহসিকতার মুখে তা টিকলই না।

যুদ্ধে বাহাদুর মুজাহিদদের শামসুদ্দীন মুহাম্মদ এমন সূক্ষ্ম দক্ষতায় পরিচালনা করলেন, তুলি খানকে তারা একদম নাকাল করে ছেড়ে দিল। মাত্র সাতদিনের যুদ্ধে বড় বড় তাতার সরদাররা মারা পড়ল, যাদের নিয়ে খুব বেশি গর্ব করত তুলি খান ও তার রক্তপায়ী বাবা। সাধারণ তাতার সেপাইদের লাশের তো সীমাই রইল না।

তাতারদের জন্য এই চিত্রপট অত্যন্ত পীড়াদায়ক ও হতবুদ্ধিতার কারণ হয়ে ওঠে। ওদিকে মুসলিমদের জন্য হয়ে ওঠে দুর্বার সাহসিকতার উপকরণ। কিন্তু বাস্তবে তো তা-ই ঘটে, মহান আল্লাহ যা মঞ্জুর করে রেখেছেন।

যুদ্ধের অষ্টমদিন। শামসুদ্দীন মুহাম্মদ খোলা ময়দানে মুসলিমবাহিনীকে দিয়ে বীরবিক্রমে লড়াই করাচ্ছেন। তার এই কঠিন হিম্মত দেখে তুলি খানের আপাদমস্তক ঘর্মসিক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু, আচমকা সাঁৎ করে উড়ে এসে একটি তির বিঁধে গেল শামসুদ্দীনের গায়ে। তিরটা যেখানে এসে গেঁথেছিল, সেখানে এত বেশি জখম হল যে, এর বিষাক্ত প্রতিক্রিয়ায় নাক-মুখ-চোখ বন্ধ করে কাঁপতে কাঁপতে সেখানেই তিনি শহিদ হয়ে গেলেন।

শামসুদ্দীনের শাহাদাতের পর শহরবাসীর ভেতর সৃষ্টি হল মতভিন্নতা। আমজনতা ও সেপাইরা তো যুদ্ধ অব্যাহত রাখবার সিদ্ধান্তে স্থির ছিল। কারণ তারা দেখেছিল—তাতার-বাহিনী ক্রমাগতভাবে ক্ষয়ক্ষতি সয়ে সয়ে এবার দুর্বল হয়ে পড়েছে, চেঙ্গিজ খানের তরফ থেকে সেনাসাহায্য আসার আগেই এদের পরাজিত করা খুব মুশকিল কিছু না। কিন্তু শহরের আমির ও নেতৃস্থানীয়রা সন্ধিচুক্তি স্থাপনের প্রতি খুব বেশি জোর দিচ্ছিলেন। তাদের মনে হয়েছিল—আমাদের এই সাময়িক বিজয়ে চেঙ্গিজ খানের প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞা আরও পোক্ত হয়ে উঠবে। খবর পাওয়ার সাথে-সাথে সে জবরদস্ত বাহিনী পাঠিয়ে দেবে, যারা এসে মানচিত্র থেকে হেরাতের নামনিশানা মুছে ফেলতে না-পারা পর্যন্ত নিঃশ্বাস ফেলবে না।

আজ নবম দিন। হেরাতের প্রাচীরের কাছে অদ্ভুত নীরবতা বিরাজ করছে। তুলি খান খানিকটা বিস্মিত। এই দৃশ্য দেখে সে ভেবে নিল—শহরবাসী হয়তো যুদ্ধ জারি রাখবে কি না সেই নিয়ে দোটানায় পড়ে গেছে। পূর্বের দিনগুলোতে নিজের দুর্বল পদক্ষেপ দেখে তুলি নিজেও যুদ্ধ থেকে সরে পড়তে চাচ্ছিল। কিন্তু আজকের এই অভূতপূর্ব অবস্থা দেখে ঘোড়া দৌড়িয়ে প্রাচীরের সামনে খন্দকের পারে এসে থামল সে।

পিতার মতো ধমকের সুরে লম্বা বয়ান ঝেড়ে প্রতিপক্ষকে সন্ত্রস্ত করে তুলতে জানত সে-ও। সেই সূত্র ধরে ঘোড়ার পিঠে বসে লোহার শিরস্ত্রাণ খুলে সে চিৎকার করে উঠল—'হেরাতের লোকসকল, কান খুলে শোনো, আমি হচ্ছি তুলি খান। মহান চেঙ্গিজ খানের পুত্র। তোমাদের কাছে তোমাদের পরিবার-পরিজনের প্রাণ যদি প্রিয় হয়ে থাকে, হাতিয়ার ফেলে দাও। বাৎসরিক ট্যাক্সের অর্ধেকের বেশি আমার কাছে অর্পণ করো। আমি তোমাদের প্রাণের নিরাপত্তা দেব।' এই বলে সে ওয়াদা করল।

প্রাচীরের গায়ে কয়েকবার বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে তার এই ঘোষণা। শহরের নেতৃস্থানীয়রা সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরের ভেতর পরামর্শ করতে বসে যান। মুহূর্তখানিক পর জান-মালের নিরাপত্তার শর্তে তাতারদের জন্য শহরের ফটক খুলে দেবেন বলে সম্মতি প্রকাশ করেন।

চুক্তি সম্পন্ন হয়ে গেছে। তাতার-বাহিনী বহর ধরে ঢুকে পড়েছে শহরের ভেতর। কিন্তু, প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তুলি খান ব্যাপক নিরাপত্তাপ্রদানের সেই প্রতিশ্রুতি ভুলে

গেল। সে ওইসব লোককে হত্যার হুকুম দিল, কোনো-না-কোনোভাবে যারা সংঘর্ষে অংশগ্রহণ করেছিল অথবা সুলতান জালালুদ্দীনের প্রতিরক্ষাকর্মী।

মুহূর্তে খাপমুক্ত হতে লাগল তাতারদের তরবারি। সংঘর্ষে অংশগ্রহণ কিংবা সুলতানের পক্ষাবলম্বনের 'অপরাধে' কমপক্ষে দশ-বারো হাজার লোককে শহিদ করে ফেলল।[৩৭৫]

মুহাদ্দিস বাযযাযের শাহাদাত

সেই শহিদদের ভেতর মহান মুহাদ্দিস ইমাম আজদুল মুঈজ মুহাম্মদ আবদুর রহমান আল-বাযযাযও শামিল ছিলেন। লোকে তাকে মুসনিদুল আসর উপাধি ধরে ডাকত। তখনকার মুসলিমবিশ্বে তিনিই ছিলেন সেই বিরলপ্রজ মুহাদ্দিস, যিনি মাত্র সাত মধ্যস্থতায় রাসুলুল্লাহ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছিলেন।[৩৭৬] তার বয়স ছিল ৯৬।[৩৭৭]

হেরাতের এই মর্মান্তিক ট্রাজেডি ৬১৮ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল।[৩৭৮] হেরাতবাসীদের মধ্যে যারা তাতারদের গণহত্যা থেকে বেঁচে যেতে পেরেছিল, তুলি খান তাদের লাঞ্ছনাকর দাসত্বের জিঞ্জির পরিয়ে চলে গেল। তাতারদের পক্ষ থেকে মালিক আবু বকরকে শহরের ক্ষমতাহীন হাকিম বানিয়ে গেল সে। আর তাতার অফিসার মুনকিতাহকে বানিয়ে গেল এখানকার আসল কার্যনির্বাহক।

কাজি ওয়াহিদুদ্দীনের বিস্ময়কর ঘটনা

কাজি ওয়াহিদুদ্দীন ছিলেন হেরাতের বিখ্যাত আলেম ও নামজাদা ফকিহ। তিনি এই তাতার-বিরোধী জিহাদে নগরপ্রাচীরের চূড়ায় একটি গম্বুজে গিয়ে উঠেছিলেন। তার গায়ে ছিল লৌহবর্ম, মাথায় শক্ত শিরস্ত্রাণ। হাতিয়ার তাক করে তিনি যে গম্বুজটির ভেতর দণ্ডায়মান ছিলেন, সেখান থেকে সামনের খোলা ময়দানে একেবারে সোজাসুজি ছিল তুলি খানের তাঁবু। কাজি সাহেব দুশমনের দিকে তির নিক্ষেপ করছিলেন। গম্বুজের জায়গাটাতে আরো কিছু সিপাহির ভিড় লেগে গেলে হঠাৎ তার পা ফসকে গেল। তিনি উঁচু প্রাচীর থেকে ঘুড়ির মতো গোত্তা খেতে খেতে নিচে পড়ে গেলেন। বাতাসে পাক খেতে খেতে ঝপ করে প্রাচীরের বাইরের গভীর খাদে গিয়ে পড়লেন তিনি।

---

[৩৭৫] রওজাতুস সফা ৫/৩৭, আফগানিস্তান দর মাসিরে তারিখ ২১৮

[৩৭৬] সিয়ারু আলামিন নুবালা ২২/১১৪, মাকতাবায়ে শামেলা

[৩৭৭] তার জন্ম ৫২২ হিজরি সনে হয়েছিল; সিয়ারু আলামিন নুবালা ২২/১১৪, তারিখে কাবির যাহাবি ৬২/৬১৮

[৩৭৮] তারিখে কাবির যাহাবি ৬২/৬১৮

প্রচণ্ড গতিবেগে তার পতনের ফলে খন্দকের পানি ছিটকে অনেক উঁচুতে উঠে গেল। সবাই ভাবল—তিনি বোধহয় মারা গেছেন। কিন্তু অল্পক্ষণ পরে সম্পূর্ণ সহিসালামতে তিনি খন্দক থেকে উঠে এলেন। খন্দক থেকে উঠে আসতে দেখে তাতার-বাহিনী তার দিকে লাগাতার তির নিক্ষেপ করতে লাগল। কিন্তু তাদের একটি তিরও লাগল না তার গায়ে। উড়ে উড়ে সব আশপাশে গিয়ে পড়েছিল। এই দৃশ্য দেখে বিস্ময়ে হা হয়ে গেল তুলি খানের মুখ। সে তৎক্ষণাৎ হতভম্ব গলায় তার বাহিনীকে আদেশ দিল—'থামো, তাকে কেউ মেরো না।' বলেই সে কাজি সাহেবকে ডেকে নিজের কাছে আনল। জিজ্ঞেস করল—তুমি কে? কোনো ফেরেশতা, নাকি আসমানি মাখলুক?

কাজি সাহেব স্থির-নিষ্কম্প কণ্ঠে জবাব দিলেন—আসলে তেমন কিছু না। আমি একজন সাধারণ মানুষ।

তুলি খান বলল—তা হলে বেঁচে গেলে কীভাবে?

কাজি সাহেব মোসাহেবি করে বললেন—আমি কোনো চোট না-পেয়ে এখনো বেঁচে আছি, যাতে আপনার মতো একজন মহান শাসকের ভয়ংকর সব দৃশ্যের পরিদর্শক হতে পারি।

অন্যসব প্রবঞ্চিত শাসক ও বিজেতার মতোই তুলি খানের এই তোষামুদে জবাব খুব পছন্দ হয়ে গেল। সে বলল—তুমি খুবই যোগ্য লোক। তুমি খানে আজমের দরবারি হওয়ার উপযুক্ত।

এই বলে কাজি সাহেবকে সসম্মানে চেঙ্গিজ খানের দরবারে পাঠিয়ে দিল সে। চেঙ্গিজ খানের বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা কিংবা উপকথা শোনার প্রতি খুব আগ্রহ ছিল। সেজন্য কাজি ওয়াহিদুদ্দীনকে তিনি যথেষ্ট উপযুক্ত মনে করলেন। তাকে তার দরবারে বিভিন্ন গল্পটল্প শোনানোর জন্য নিজের কাছে রেখে দিলেন। তার কাছ থেকে প্রতিদিন একটু একটু করে খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের শাসকদের ঐতিহাসিক ঘটনাবলি শুনতে লাগলেন।

এভাবেই কেটে গেল কিছুদিন। কাজি সাহেবের ইতিহাসজ্ঞানে মুগ্ধ হয়ে চেঙ্গিজ খান একদিন জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা, তোমার কী ধারণা বলো তো, এই ব্যাপক হত্যাযজ্ঞের পর পৃথিবীজুড়ে আমার নামধাম বিরল ও বিস্ময়করভাবে প্রসিদ্ধ হবে কি?

কাজি সাহেব বললেন—হ্যাঁ, বলছি। তার আগে বলুন, আমার জীবনের নিরাপত্তা দেবেন কি না!

ইতিবাচক মাথা ঝাঁকালেন চেঙ্গিজ খান। কাজি সাহেব চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে লাগলেন—একজন মানুষের নাম তো তার স্বজাতীয় মানুষদের মাঝেই জিইয়ে থাকে। খানে আজম যখন সেই মানুষদেরই এমনভাবে হত্যা করে ফেলছেন, তা হলে তার নাম নেওয়ার জন্য পৃথিবীতে জীবিতই-বা থাকবে কে?

একথা শুনতেই অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে ওঠে চেঙ্গিজ খানের মন। তখন তির-কামান তার হাতেই ছিল। ক্রোধের সাথে সেগুলো সজোরে মাটিতে নিক্ষেপ করে বললেন—আমি তো তোকে আকলমন্দ মনে করেছিলাম। কিন্তু দেখছি তুই মহা বেওকুব। আমি মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহের কওমকে ধ্বংস করেছি ঠিক; কিন্তু দুনিয়াতে এমন বহু কওম রয়ে গেছে, যাদেরকে আমি হত্যা করিনি। তাদের ভেতরেই জিন্দা থাকবে আমার নাম।

শঙ্কার মুখে পড়ে গেল কাজি সাহেবের জীবন। ইতিহাস-শ্রবণের সেই মজলিশ চেঙ্গিজ খান মুলতবি করে দিলেন। তারপর মওকা পেয়ে একদিন সেখান থেকে দুরুদুরু বুকে পালিয়ে এলেন কাজি সাহেব।[৩৭৯]

সুলতানের আফগানিস্তান রওনা

তাতার-বাহিনীর বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মের তাজা-তাজা সব সংবাদ পেয়ে সুলতান জালালুদ্দীনের একিন হয়ে গেল—এখন চেঙ্গিজ খান তার মূল শক্তি নিয়ে কাবুল ও গজনির দিকে অগ্রসর হবেন। সুলতান জালালুদ্দীন জানতেন—যতক্ষণ পর্যন্ত চেঙ্গিজ খানের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে তাকে উচিতশিক্ষা দেওয়া না হবে, থামানো যাবে না তাতারদের এই বিশ্বব্যাপী আগ্রাসন।

সুলতানের কাছে তখন অত পরিমাণ শক্তি সঞ্চিত নেই যে, সবদিকের যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি মনোযোগ দেবেন। এজন্য আশপাশের এলাকাগুলিতে ঘটতে-থাকা তাতার হামলার দিকে ভ্রুক্ষেপ করলেন না তিনি। দ্রুত একদল সহযোদ্ধা নিয়ে গজনির দিকে ছুটলেন, যাতে সরাসরি চেঙ্গিজ খানের সাথে মোকাবেলা করে নির্মূল করে উঠতে পারেন এই ভয়ংকর ফেতনা।

চেঙ্গিজ খানের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি এতই বেড়ে গিয়েছিল যে, তার নাম শুনে তখন সুদূর ইউরোপ-আফ্রিকার শাসকরা পর্যন্ত কাঁপত। এর মাঝে সুলতান জালালুদ্দীন যে দুর্বার সাহসিকতা দেখাচ্ছিলেন, তা নিশ্চয় অজস্র প্রশংসার দাবিদার। তাতারদের এ নৃশংস পাশবিকতার সম্মুখে একটুও ভীত ছিলেন তিনি। কণামাত্র তাকে ছুঁতে পারেনি মানুষকে নিঃশক্তি বানিয়ে-দেওয়া হতাশা। তাতার হামলার পর মুসলিমবিশ্বের ঘনবসতিপূর্ণ সমস্ত জনপদ তখন সম্পূর্ণ উজাড় পড়ে আছে। অবশিষ্ট যেসব এলাকা রয়েছে, সেখানকার অধিকাংশ লোকেরই তরবারি ওঠাবার মতো কোনো যোগ্যতা নেই। এ-কারণে ধারাবাহিক অনেক প্রচেষ্টার পরেও সুলতানের সহযোদ্ধাদের সংখ্যা সেই কয়েক হাজারের কোঠাতেই রয়ে গেছে তখন পর্যন্ত। তবে, আফগান সরদারদের সহযোগিতা পাবেন বলে আশা ছিল তার।

---

[৩৭৯] রওজাতুস সফা ৫/৩৮-৩৯ আফগানিস্তান দর মাসিরে তারিখ ২১৯

যুযানবাসীর নির্লজ্জতা

সুলতান জালালুদ্দীনের চেহারা খানিকটা চিন্তাক্লিষ্ট। কপালজুড়ে দুটো ভাঁজ পড়েছে। তাতারদের চোখ ফাঁকি দিয়ে দিয়ে সাবধানী পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন তিনি। কিন্তু, হঠাৎ অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে তাতারদের একটি দলের সাথে তার সংঘর্ষ বেধে গেল। সেখানে তিনি অনন্য বীরত্বের পরিচয় দিলেন। তাদের মেরে-কেটে যুযানে গিয়ে পৌঁছলেন। যুযান ছিল নিশাপুর ও হেরাতের মধ্যবর্তী একটি প্রাচীরঘেরা শহর। পেছন থেকে ছুটে-আসা তাতার-বাহিনী থেকে দূরে থাকতে লাগাতার কয়েকদিন সফর করে এখানে এসে পৌঁছলেন সুলতান ও তার সহচরবৃন্দ। ক্লান্তিতে নাকাল সবার অবস্থা। বাহনজন্তুগুলিরও বিশেষ আরামের প্রয়োজন।

সুলতান প্রাচীরের বাইরে দাঁড়িয়ে যুযানের বাসিন্দাদের সম্বোধন করে আবদার জানালেন—কিছুদিনের জন্য আমাকে ও আমার সাথিদের শহরে অবস্থান করার অনুমতি দিন। আমরা চাচ্ছি—এর ভেতর আমরা আমাদের সংকটাপন্ন অবস্থা গুছিয়ে আনব। শারীরিকভাবে আমরা খুবই বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছি। তাতার-বাহিনী এসে পড়ার আগেই মোকাবেলার জন্য আমাদের একটু তাজাপ্রাণ হয়ে ওঠা দরকার।

অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে সুলতানের এই আবেদন প্রত্যাখ্যান করল শহরবাসী। রসকষহীন কণ্ঠে জবাব দিল—আমরা শহরের দরজা খুলব না। এখন তাতার-বাহিনী এসে যদি এখানে আপনার উপর আক্রমণ করে বসে, আপনার সামনের দিকে থাকবে তাদের চকচকে তলোয়ার, আর পেছন থেকে আমরা পাথর নিক্ষেপ করব আপনার উপর।

এই বেকুব ও বুজদিল মুসলিমদের বিষমিশ্রিত জবাব শুনে সুলতান জালালুদ্দীন যারপরনাই হয়রান হয়ে গেলেন। ইচ্ছে করলে শহরে ঢুকে পড়তে পারতেন তিনি। তার জন্য সেটা কোনো ব্যাপারই ছিল না। কিন্তু তিনি মনে করলেন—এই মুহূর্তে মুসলিমদের অভ্যন্তরীণ লড়াই ডেকে আনবে শক্ত ক্ষয়ক্ষতি। এজন্য যুযানবাসীকে এই অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে খানিক দূরের মাবনাজাবাদে গিয়ে থামলেন। কিন্তু তখনও জোঁকের মতো পুরোদস্তুর লেগেই রয়েছে তাতারদের শঙ্কা।

তাই বেশিক্ষণ এখানে অবস্থান করলেন না তিনি। মাঝরাতে এখান থেকে অন্য জায়গায় রওনা দিলেন। সকালবেলা তাতাররাও ধাওয়া করতে করতে মাবজানাবাদ পর্যন্ত এসে গেল। কিন্তু সুলতান কোন দিকে গিয়েছেন, সঠিক খবর মিলল না তাদের। বাধ্য হয়ে আন্দাজের ভিত্তিতে তারা হেরাতের দিকে ছুটল। হেরাতের উপান্তবর্তী 'বারদুযাহ' পর্যন্ত গিয়েও সুলতানের সন্ধান তারা পেল না। ফলে সেখান থেকে ফিরে এল নিষ্ফলভাবে।[৩৮০]

---

[৩৮০] জাহাঁকুশা ২/১৩৪-১৩৫

এর ভেতর যুযানের সীমান্ত এলাকায় অত্যন্ত মজবুত একটি দুর্গ পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন সুলতান। দুর্গটিকে ডাকা হতো কাহেরা। এটি নির্মাণ করেছিলেন কিরমানের হাকিম মুয়াইয়িদুল মুলক।

সুলতান এই দুর্গে আশ্রয় নিতে চাচ্ছিলেন। দুর্গপতি আইনুল মুলক যদিও তার প্রজাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল; কিন্তু সেই মুহূর্তে সবাই ছিল নিজ নিজ চিন্তায় নিমগ্ন। দ্রুত সে সরদার মুয়াইয়িদুল মুলকের সঙ্গে যোগাযোগ করল। মুয়াইয়িদুল মুলক ঘাবড়ে গেলেন—কে জানে, সুলতানকে সাহায্য করতে গিয়ে তাতারদের তিরস্কারের না আবার শিকার হতে হয়! ফলে তিনি সুলতানের খেদমতে একটি মুনাফেকিপূর্ণ কাব্যিক পয়গাম প্রেরণ করলেন। লিখলেন—রাজা-বাদশাহদের শান এটা নয় যে, তারা কোনো দুর্গে আবদ্ধ হয়ে থাকবেন; হোক সেই দুর্গ চন্দ্র-তারকার উচ্চতায়। রাজা-বাদশাহদের প্রকৃত দুর্গ মূলত তেজি ঘোড়ার পিঠের উপর। মাটির এইসব শহরের সাথে সিংহদের কী সম্পর্ক?...এই অবস্থায় আপনি যদি দুর্গের ভেতর আবদ্ধ হয়ে পড়েন, তাতাররা রাজ্যের সমস্ত শহর ধ্বংস করে চলে যাবে। তারা তাদের মকসুদ হাসিল করে নেবে।

যাবার সময় রাহাখরচের জন্য দুর্গপতির কাছে সুলতান কিছু অর্থ তলব করলেন। দুর্গপতি তাকে আশরাফি ভর্তি একটি থলি প্রদান করল। দানশীল স্বভাবের সুলতান সেগুলো ভাগবণ্টন করে সহযাত্রীদের মাঝে দিয়ে দিলেন।[৩৮১]

আমুদরিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে (বর্তমান উত্তর-পশ্চিম আফগানিস্তান) পৌঁছে সুলতান জালালুদ্দীন বুঝে গেলেন—এই এলাকা তার জন্য মোটেই বাসযোগ্য না। এখানকার কোনো শহর কিংবা দুর্গ তাকে জায়গা দিতে প্রস্তুত না। পূর্বে এখানে তাতারদের শক্ত আক্রমণ ঘটে গিয়েছিল। এই এলাকার সবচেয়ে বড় শহর হেরাত তাতারদের দখলে চলে গিয়েছিল। মোটকথা, বোঝা যাচ্ছিল, উত্তর আফগানিস্তানে কদম জমানো এখন মুশকিল।

এই বাস্তবতার প্রতি লক্ষ করে সুলতান জালালুদ্দীন দ্রুত বিজলির বেগে সিস্তানের (দক্ষিণ আফগানিস্তান) দিকে ছুটলেন। তিনি যখন শাহজাদা ছিলেন, পিতার পক্ষ থেকে জায়গির হিসেবে এই এলাকাই মিলেছিল তার। তাতারদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য এর চেয়ে উপযুক্ত জায়গা তখন আর নেই। এ সফর চলাকালেই নিশাপুর ও মার্ভের বিধ্বস্ততার সংবাদ পেলেন তিনি। এতে তার মনের কল্পনা বিশ্বাসে রূপান্তরিত হয়ে উঠল যে—এবার দক্ষিণ খোরাসান ব্যতীত কোনো ভূমি আদায় করে উঠতে পারবে না জিহাদের হক।[৩৮২]

---

[৩৮১] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ১৩২-১৩৩, নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৬৫

[৩৮২] ইবনু খালদুন ৫/১১৫, নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৬৫

হজরত খিজির আ. এর সুসংবাদ : গায়েবি ইলহাম

কাজি মিনহাজুস সিরাজের বর্ণনায় আছে—সফরকালে, কিরমানের নিকটবর্তী খোরাসানের সুবিস্তীর্ণ মরুভূমির ভেতর হজরত খিজির আলাইহিস সালামের সঙ্গে সুলতান জালালুদ্দীনের সাক্ষাৎ ঘটেছিল। খিজির আলাইহিস সালাম তাকে শিগগির ক্ষমতা লাভ করবেন বলে সুসংবাদ দিয়েছিলেন। সঙ্গে তার থেকে এই ওয়াদাও নিয়েছিলেন—তার হাতে যেন প্রবাহিত না হয় কোনো মুসলমানের রক্ত।[৩৮৩]

চেঙ্গিজ খানের অগ্রযাত্রা

বিভিন্ন রণাঙ্গনে সৈন্যদল পাঠিয়ে চেঙ্গিজ খান নিজেও তখন নতুন করে আক্রমণে নামতে চাচ্ছিলেন। সমরকন্দ থেকে বেরিয়ে আমুদরিয়ার পার ধরে পূর্বাঞ্চলের দিকে নদীর উৎসস্থলপানে যাত্রা করলেন তিনি। সেখানে অবস্থিত ছিল বাদাখশান প্রদেশ। এই প্রদেশকে হিন্দুস্থান, কাশ্মির, চীন, আফগানিস্তান ও মধ্য-এশিয়ার সঙ্গমস্থল বলা যায়।

বাদাখশান, ফারগানা ও আমুদরিয়ার উৎসস্থলের কাছে পামির মালভূমি কবজা করে তিনি শত্রুবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ একটি রাজপথ বন্ধ করে দিলেন।[৩৮৪] পাশাপাশিএকটি বাহিনী পাঠালেন তিরমিজ আক্রমণের জন্য।

ইমাম তিরমিজির শহরের বাসিন্দারা লড়তে ও মরতে প্রস্তুত হয়ে ছিল। তাতাররা তাদের সাথে লাগাতার ১৪দিন যুদ্ধ চালিয়ে শহর দখল করে ফেলল।

এখানে, আমুদরিয়ার তীরে, কাল্লাত নামে প্রসিদ্ধ একটি দুর্গ ছিল। প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর তাতার-বাহিনী সেটিও জয় করে নিল। দুর্গ ও শহরের যেসব লোককে কষ্টকর কাজ আঞ্জামের জন্য উপযুক্ত মনে করল, তাদের বন্দি করে ফেলল। অন্যদের ব্যাপকহারে হত্যা করে বইয়ে দিল উষ্ণ রক্তের নদী।[৩৮৫]

বিধ্বস্ত বলখ

চেঙ্গিজ খানের পরবর্তী টার্গেট ছিল ঘনবসতিপূর্ণ দৌলতমন্দ শহর। এটিকে কুব্বাতুল ইসলামও বলা হতো। কারণ, এই শহর ছিল সুফি, সাইয়েদ ও আলেমদের বসতি।

আমুদরিয়া পেরিয়ে এসে চেঙ্গিজ খান বলখ অবরোধ করে নিলেন। তার ধ্বংসাত্মক উৎপাত দেখে সেখানকার সন্ত্রস্ত আমজনতা নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি নিয়ে শহর হাওয়ালা করে দিল তার হাতে। শহরের চারপাশজুড়ে দণ্ডায়মান কোনো প্রাচীরও ছিল না। এ-কারণে কোনোরকম প্রতিরোধ কিংবা সংঘর্ষ সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

---

[৩৮৩] তাবাকাতে নাসিরি ১৬/৩৭২

[৩৮৪] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১৭, পৃষ্ঠা ১৩১, ইবনু খালদুন ৫/১১৪-১১৫

[৩৮৫] জাহাঁকুশা ১/১০১, রওজাতুস সফা ৫/৩২

কিছুদিন চেঙ্গিজ খান তার দেওয়া প্রতিশ্রুতিতে অটল থাকলেন। হঠাৎ একদিন জানতে পারলেন—সুলতান জালালুদ্দীন খাওয়ারিজম শাহ দক্ষিণ খোরাসানে পৌঁছে গেছেন। এতে অত্যন্ত শঙ্কা অনুভব করে ওঠেন চেঙ্গিজ খান। কিছু একটা ঘটে যেতে পারে ভয়ে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি ভুলে সমস্ত শহরবাসীকে হত্যা করে ফেলেন।[৩৮৬]

মিরখান্দের বর্ণনায় পাওয়া যায়—বলখে যাদের হত্যা করা হয়েছিল, তাদের মাঝে শুধু নেতৃস্থানীয় এবং শায়েখের সংখ্যা ছিল ৫০ হাজার।[৩৮৭]

ফারিয়াব ও যুযান

বলখের পর তাতার-বাহিনী কোনো ধরনের সংঘর্ষ ব্যতিরেকে যুযান, মায়মানা, আন্দখুই ও ফারযাব দখল করে ফেলল। এখানকার বাসিন্দাদের তারা হত্যা করল না। বন্দি করে পরবর্তী অগ্রাভিযানে কষ্টকর খাটুনি খাটাবার জন্য সঙ্গে নিয়ে নিল।[৩৮৮] কিছুদিন পূর্বে এই যুযানবাসীরাই তাতারদের সহযোগী হয়ে সুলতানের উপর পাথর বর্ষণ করবে বলে ধমকি দিয়েছিল। এখন তারাই সেই তাতারদের হাতে মৃত্যুর চেয়েও জঘন্য জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে।

তালকান অবরোধ

ইতিপূর্বে চেঙ্গিজ খানের একটি বাহিনী তালকানের দিকে যাত্রা করেছিল। তালকানের যোদ্ধারা বুঝে গিয়েছিল, তাতারদের কোনো প্রতিশ্রুতির উপর ভরসা করা স্পষ্টতই আত্মপ্রবঞ্চনার শামিল। এ-কারণে লড়াইয়ের জন্য তারা যথাসম্ভব প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল। তালকানের কেন্দ্রীয় দুর্গ নুসরাতকুহ ছিল উচ্চতায়, প্রশস্ততায় ও দৃঢ়তায় অনন্য। এখানকার মুজাহিদরা পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে এত বিপুল অস্ত্রপাতি ও খাদ্যখোরাকি জমিয়ে নিয়েছিল, কয়েক মাসের জন্য তা ছিল যথেষ্ট। চেঙ্গিজ খানের প্রেরিত বাহিনী বাদাখশান জয়ের পর তালকানে এসে শহর অবরোধ করল। এই অবরোধের ভেতর কেটে গেল একটা দীর্ঘ সময়; কিন্তু বিজিত হল না নুসরাতকুহ দুর্গ।

মুজাহিদরা রাত্রিবেলা গোপন পথে বেরিয়ে তাতার-বাহিনীর উপর বিভিন্ন দিক থেকে চালাতে লাগল অতর্কিত আক্রমণ। তাদের জান-মালের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি করে অন্ধকারেই সরে পড়তে লাগল। কখনো তারা দুশমনের আনাজপাতির ভান্ডার লুটে নিচ্ছিল। কখনো-বা হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তাদের মহিষের পাল।

বলখ অভিযান থেকে অবসর হয়ে চেঙ্গিজ খান নিজেই তালকান অভিযানে যুক্ত হলেন। তবু দুর্গ বিজিত হওয়ার কোনো পন্থা দেখা গেল না। কিছুদিন পরে চোগতাই,

---

[৩৮৬] জাহাঁকুশা ১/১০৩-১০৪

[৩৮৭] রওজাতুস সফা ৫/৩৪

[৩৮৮] ইবনু খালদুন ৫/১১৪

উকতাই ও তুলি খানও উত্তর-পশ্চিম খোরাসান থেকে অসংখ্য সৈন্য নিয়ে পিতার সাহায্যে এসে উপস্থিত হল।

যুদ্ধও চলতে লাগল প্রচণ্ড বিক্রমে। কখনো ঝাঁকে-ঝাঁকে নেমে আসতে লাগল তিরবৃষ্টি কিংবা পাথরবর্ষণের ধারা। অবরুদ্ধ লোকদের যদিও জানের ক্ষয়ক্ষতি সইতে হচ্ছিল; কিন্তু তাতারদের তার চেয়ে দ্বিগুণ ক্ষতি হয়ে যাচ্ছিল কখনো। এভাবে কেটে গেল দীর্ঘ সাত মাস। তবু এই মুজাহিদদের সাহস ও সংকল্প পূর্বের মতোই তাজা রয়ে গেল। তাদের আক্রমণের ভেতর এখনো বিরাজ করতে লাগল প্রথম দিনের সংঘর্ষের মতো তেজ। এদিকে দক্ষিণ খোরাসানে সুলতান জালালুদ্দীন আগমন করেছেন বলে সংবাদ আসতে লাগল। তার এই আগমনীসংবাদ তীক্ষ্ণ কাঁটা হয়ে খচখচ করে ফুটছিল চেঙ্গিজ খানের বুকের মাঝখানে। শেষমেশ চেঙ্গিজ খান অধীর হয়ে বাহিনীকে হুকুম দিলেন—এই দুর্গের পাশ ঘেঁষে মাটি ও লাকড়ি দিয়ে একটি টিলা তৈরি করা হোক। টিলার উপরে উঠে সেখান থেকে ঝাঁপ দিয়ে দেয়াল টপকানো হবে।

হুকুম পেয়ে তাতার-বাহিনী আশপাশের সব জঙ্গল কেটে সাফ করে লাকড়ির স্তূপ বানিয়ে ফেলল। সেই স্তূপের উপর মাটি এনে ফেলতে লাগল। ওদিকে শহরবাসীও থেমে ছিল না। তারা প্রাচীরের উপর দাঁড়িয়ে তাতারদের দিকে ধনুক তাক করে অনবরত তির ছুড়ছিল। কিন্তু দুর্মর তাতারদের কোনো-এক সেনা তিরবিদ্ধ হয়ে পড়ে যেতেই তার স্থলে এসে পড়ত আরো দুজন তাতার। এর ভেতর টিলার কাজ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। উপরে উঠতে উঠতে দুয়েক দিনের মধ্যেই হয়তো ছুঁয়ে ফেলবে প্রাচীরের চূড়া। শহরবাসীর কাছে তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠল।

তাতাররা ঝাঁপ মেরে প্রাচীর টপকাবার আগেই মুজাহিদদের পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী ফটক খুলে বাইরে বেরিয়ে এল। তাদের মধ্যে পদাতিক যারা ছিল, লড়তে লড়তে শহিদ হয়ে গেল সবাই। অধিকাংশ অশ্বারোহী সামনের সবুজ পর্বতশ্রেণির চড়াই-উৎরাই ভেঙে গাছগাছালির আড়ালে উধাও হয়ে যেতে সক্ষম হল। অবশিষ্ট যারা শহরে অবরুদ্ধ ছিল, তাতাররা তাদেরকে যথারীতি হত্যা করে ফেলল।[৩৮৯]

গরাযওয়ান দুর্গ

নুসরাতকুহের পর চেঙ্গিজ খানের টার্গেট ছিল গরাযওয়ান দুর্গ। উত্তর-পূর্ব খোরাসান থেকে বামিয়ানের দিকে গিয়েছিল বিশাল এক রাজপথ। সেই রাজপথের পাশেই দুর্গটির অবস্থান ছিল। বলখ, জুযজান, ফারিয়াব ও তালকানের অসংখ্য নারীপুরুষের শাহাদাতের খবর শুনেও গরাযওয়ানের বাহাদুরেরা উড্ডীন রাখল জিহাদের পতাকা। দুর্গের সামনে চেঙ্গিজীয় বাহিনীর বিশাল বহর এসে পৌঁছল। দুর্গবাসীদের তারা হাতিয়ার ফেলে দিতে আদেশ করল। কিন্তু সেই আদেশ সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করল দুর্গবাসী।

---

[৩৮৯] ইবনু খালদুন ৫/১১৪, জাহাঁকুশা ১/১০৪-১০৫, আফগানিস্তান দর মাসিরে তারিখ ২১১

ফলে, চেঙ্গিজ খানের প্রচণ্ড শক্তিশালী বাহিনী ও ছোট্ট এই দুর্গের নিরাপত্তারক্ষীদের মধ্যে বেধে উঠল শক্ত সংঘাত। দিন-দিন সেই সংঘাত আরও দীর্ঘ ও ঘনীভূত হয়ে উঠতে লাগল। চেঙ্গিজ খানের ধারণা ছিল, এ দুর্গ ধসিয়ে দিতে দু-তিনদিনের বেশি সময় বোধহয় লাগবে না। কিন্তু দুর্গপ্রাচীরের কাঠিন্যের চেয়েও নিরাপত্তারক্ষীদের প্রবল সাহসিকতা তার সেই ধারণা ভুল প্রমাণিত করল। শুরু হয়ে গেল পালটাপালটি যুদ্ধ, আর দুর্গের প্রতিরক্ষাকর্মীরা একে একে শহিদ হতে লাগল।

দীর্ঘ একমাস কেটে গেল এভাবে। শেষমেশ যখন দুর্গের শেষ-প্রতিরক্ষাকর্মীটিও শহিদ হয়ে গেল, বাহিনী-সমেত দুর্গের ভেতর ঢুকতে সক্ষম হলেন চেঙ্গিজ খান। ভেতরে ঢুকে তিনি পুরোপুরি হতভম্ব হয়ে গেলেন। দেখলেন—দুর্গে বন্দি করবার মতো একটি প্রাণীও অবশিষ্ট নেই। ফলে তিনি প্রাচীর-সমেত পুরো দুর্গ ধূলিসাৎ করে দিলেন। তারপর যাত্রা করলেন কাবুল ও গজনির দিকে।[৩৯০]

বাৎসরিক শিকার-খেলা

তখন গরমকাল পড়েছে। এই নিম্নাঞ্চলের প্রচণ্ড গরমে তাতার-বাহিনী হয়ে উঠেছে অতিষ্ঠ। গোবি মরুভূমির আলো-বাতাসে এদের বেড়ে ওঠা। সেখানকার বায়ুপ্রবাহেই এরা অভ্যস্ত। তাই ভিন্ন এলাকার আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে উঠতে পারছিল না। তা দেখে চেঙ্গিজ খান খানিকটা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। পুরো বাহিনীকে তিনি আমুদরিয়ার এ-পারে ডেকে এনে সম্মুখের পর্বতশ্রেণির দিকে পাঠিয়ে দিলেন। আশপাশের কিছু শহর ইতোমধ্যে জয় করে নিয়েছিলেন তিনি। এই পাহাড়ি অঞ্চলটি ছিল হিন্দুকুশের সবচেয়ে উঁচু এলাকা। চেঙ্গিজ খান সেখানে মৌজ-মাস্তির জন্য সেনাবাহিনীকে কিছুদিন শিকার খেলার আদেশ দিলেন। কয়েক মাস পর্যন্ত জারি রইল এই শিকার ধরার খেলা। পূর্বে গোবিতে থাকতে শিকার ধরা ছিল তাতারদের বছরব্যাপী প্রিয় ব্যস্ততা।[৩৯১]

জিহাদের স্মরণীয় ইতিহাস

সুলতান জালালুদ্দীনের জিহাদ ঘোষণার পর খোরাসানের প্রাচীর-বেষ্টিত উল্লিখিত বড় বড় শহরগুলোতেই না শুধু, বরং ছোট ছোট দুর্গ ও সাধারণ সেনাছাউনিগুলোতেও তাতারদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ শুরু হয়ে গিয়েছিল। এর একটি উদাহরণ হচ্ছে গরাযওয়ান দুর্গের যুদ্ধ। তাতার-বাহিনী তখন কয়েকভাগে বিভক্ত হয়ে এই ছোট ছোট দুর্গ ও সেনাছাউনির লোকদের সাথে লড়বার জন্য বিস্তৃত খোরাসান এলাকার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। চেঙ্গিজ খান ধারণা করেছিলেন, এই

---

[৩৯০] আফগানিস্তান দর মাসিরে তারিখ ২১১, জাহাঁকুশা ১/১০৫

[৩৯১] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১৭, পৃষ্ঠা ১২৮-১২৯

সেপাইরা সপ্তাহ কিংবা মাসখানিকের ভেতর নিজেদের কাজ সম্পন্ন করে ফিরে আসবে। কিন্তু তাদের কোনো-কোনো দল কয়েক মাস পরে ফিরে এসেছিল। তা-ও আবার ব্যর্থভাবে। দুর্গ ধ্বংসের কাজে কিছু বাহিনীর লেগে গিয়েছিল বছর কিংবা তার চেয়েও বেশি সময়। তাদের ফিরে-আসা পর্যন্ত সুলতান জালালুদ্দীন ও চেঙ্গিজ খানের মাঝে সংঘটিত হয়েছিল ঐতিহাসিক কয়েকটি যুদ্ধ। সেগুলোর আলোচনা যথাসময়ে আসবে ইনশাআল্লাহ।

নিচে আমরা এমন কিছু দুর্গের ঘটনা বলব, যেগুলো আয়তন ও অবস্থানগত দিক থেকে গুরুত্বহীন হলেও জিহাদের স্মরণীয় ইতিহাসের জন্ম দিয়েছে।

কালিয়ুন দুর্গ

হেরাত থেকে ২০ ফারসাখ (৬০ মাইল) দূরত্বে অবস্থিত ছিল কালিয়ুন দুর্গ। সুলতান আলাউদ্দীন মুহাম্মদের বিশিষ্ট সহচর আবু বকরের (সে পাহলোয়ান উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিল) দুই পুত্রকে এখানকার কোটাল নিযুক্ত করা হয়েছিল। সাম্রাজ্যের প্রধান অফিসারদের মধ্যে এখতিয়ারুল মুলক দৌলত ইয়ার তুগরাই নামের এক সরদারও তখন অবস্থান করছিলেন সেখানে।

তাতার-বাহিনী দুর্গের সামনে এসে পৌঁছল। দুর্গবাসী প্রস্তুত হয়ে উঠল মোকাবেলা করার জন্য। তারা এক-এক করে দুর্গ থেকে নেমে এসে সামনা-সামনি মোকাবেলা করতে লাগল। এভাবে অনেক কাফেরকে পাঠিয়ে দিল জাহান্নামের অতলান্তে।

যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হচ্ছিল। যেন-বা যুদ্ধটা এখানকার একটা নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে উঠেছিল। তির ও পাথরের ব্যবহার অব্যাহত ছিল। সেই সঙ্গে চলছিল নৈশকালীন আক্রমণও। তাতার সিপাহিদের সংখ্যা ছিল প্রচুর। কিন্তু দুর্গবাসীর বীরত্ব ও হুঁশিয়ারি দেখে তারা ভয়ানক ঘাবড়ে গেল।

মিনহাজুস সিরাজের বর্ণনায় আছে—ভয়ে তাতার-বাহিনীর রাতে ঘুম আসত না তখন। শেষে তারা ক্যাম্পের চারদিকে একটি দেয়াল নির্মাণ করেছিল। দেয়ালের দু-দিকে রেখেছিল দুটো দরজা। দরজাদুটোয় সার্বক্ষণিক পাহারাদার নিযুক্ত করে রেখেছিল, যাতে দুর্গবাসীর নৈশ হামলা থেকে বাঁচতে পারে তারা।

দিনগুলো সপ্তাহে এবং সপ্তাহগুলো মাসে রূপান্তরিত হচ্ছিল। কিন্তু দুর্গ বিজয়ের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। এর ভেতর সিস্তান থেকে আরেকটি তাতার বাহিনী স্বগোত্রীয়দের সাহায্যে এখানে এসে পৌঁছল। তাদের সাথে যথেষ্ট পরিমাণ খোরাকি ও রসদও ছিল। অধিবাসীরা দুর্গের ভেতর খনন করে ফেলেছিল পানির সাতটি কুয়া। সেজন্য তাদের মধ্যে কোনোধরনের পানিস্বল্পতা দেখা দেয়নি। তদ্রূপ শুকনো গোশত ও পেস্তাও অনেক পরিমাণে জমিয়ে রেখেছিল। সেগুলোকে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করছিল তারা।

এভাবে কেটে গেল এক মাস। এই একমাস শুধু গোশত, পেস্তা ও পেস্তার তৈল দিয়ে কাটিয়ে দেওয়ায় বিভিন্ন অসুখ বেধে গেল অনেকের। অধিকাংশই অসুস্থ হয়ে পড়ল। তাদের মাথা ও পায়ের চামড়া স্ফীত হয়ে ফোসকা পড়ে গেল। দুর্গের ভেতরে চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। দিন-দিন বেড়েই চলছিল রোগীর সংখ্যা। মৃত মানুষেরও সিরিয়াল পড়ে গিয়েছিল।

এই সংকটকালেও অবশিষ্ট অবরুদ্ধরা হাতিয়ার ফেলতে প্রস্তুত হয়নি। তখনও জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছিল তারা। দেখতে দেখতে এভাবেই এক মাস কেটে গেল। তবু দুর্গ বিজিত হল না। অবরোধ করে রাখতে-রাখতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল তাতার-বাহিনী। কিন্তু একটুও কমল না দুর্গের প্রতিরক্ষাকর্মীদের শাহাদাতের তামান্না।

১৬ মাস যখন কেটে গেল, দেখা গেল দুর্গে মাত্র ৫০ জন লোক বেঁচে আছে। তাদের ২০ জন অসুস্থ, বাকি ৩০ জন সুস্থ। তাতার-বাহিনীর আন্দাজ হয়ে গেল দুর্গের ভেতরকার এই অবস্থা। কারণ, ক'দিন ধরে প্রাচীরের কাছে লড়াকুদের সংখ্যা তারা খুব কম দেখছিল। ফলে, তারা অস্ত্র উঠিয়ে নিঃশঙ্কচিত্তে প্রাচীরের গা বেয়ে দুর্গে চড়তে লাগল। কালিয়ুন দুর্গের সেই ৫০ জন তখন তৈরি ছিল শাহাদাতের জন্য। তারা দুর্গের স্বর্ণ-রুপা, হিরে-জহরত, পরিধেয় পোশাক ও আনাজপাতির সমস্ত ভান্ডার নিয়ে দুর্গের কুয়ার মধ্যে ফেলে মাটিচাপা দিয়ে দিল সেগুলো। তাদের বুকের সমুদ্রে তখন ঈমানের প্রবাহে শাহাদাতের উত্তাল তরঙ্গ উঠেছে। তাতাররা ভেতরে প্রবেশ করার সাথে সাথেই মুজাহিদরা তাদের উপর হামলা করে বসল; এবং অত্যন্ত বীরোচিতভাবে লড়তে লড়তে শাহাদাত ঘটল তাদের।

এশয়ার ও ফেওয়ার দুর্গ

এশয়ার দুর্গ ছিল আমির মুহাম্মদ মারকাজির হাতে। তিনি তালকান ও বামিয়ানের পথে তাতার-বাহিনীর উপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে তাদের জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করেছিলেন। চেঙ্গিজ খান এবার বড় একটি সেনাদল পাঠালেন এই দুর্গ দখল করতে। সেই সেনাদলে ছিল দশ হাজার আগ্নেয়াস্ত্র। দুর্গের বাহাদুররা বীরোচিত মোকাবেলা করে তাতারদের কোনোভাবেই দুর্গ কেড়ে নিতে দিল না। কয়েক মাস এভাবেই পেরিয়ে গেল। শেষ হয়ে এল দুর্গের সঞ্চিত ঘাস-পানি ও খাদ্য-খোরাকির ভান্ডার। দুর্গে যতগুলো মহিষ ও প্রাণী ছিল, এশয়ারবাসী সেগুলো জবাই করে গোশত শুকিয়ে নিল। তারপর অল্প-অল্প করে ব্যবহার করতে লাগল সেগুলো। শেষমেশ গোশতও ফুরিয়ে গেল।

এমনভাবে দুর্ভিক্ষ নেমে এল যে, গোশত হয়ে উঠল তাদের কাছে উচ্চমূল্যের বস্তু আর স্বর্ণ হয়ে গেল খুবই সস্তা। অর্থাৎ, স্বর্ণ খুব সহজলভ্য হয়ে পড়েছিল; কিন্তু খাবারের গোশত খুঁজে পাচ্ছিল না কেউ।

জুযজানি বর্ণনা করেছেন—খাদ্য না পেয়ে ক্ষুধায় পরপর মারা গেল অবরুদ্ধদের এক মহিলার মা ও বাঁদি। মহিলা তাদের দেহের গোশত বিক্রি করে অধিক পরিমাণ স্বর্ণ লাভ করেছিল। কিন্তু সেই স্বর্ণে কোনো খাদ্য যোগাতে পারল না সে। শেষমেশ নিজেও মারা গেল ক্ষুধার যন্ত্রণায়।

অবরোধের ১৫ দিন কেটে গেল। এর মধ্যে এশয়ারের অধিকাংশ অবরুদ্ধ দুর্ভিক্ষে মারা পড়েছে। শেষমেশ শুধু আমির মুহাম্মদ মারগাজি ও তার ৩০ জন সহচর অবশিষ্ট রয়েছে। শহরের ভেতর ঢুকে পড়ল দুশমন। আমির ও সহচরবৃন্দ তরবারির সাহায্যে লড়তে-লড়তে অর্জন করে নিল শাহাদাতের সৌভাগ্য।

এমনিভাবে ফারিয়াব দুর্গের অবরুদ্ধরাও খাদ্যসঙ্কটের কারণে দু-মাস পর্যন্ত জমে রইল শত্রুর মোকাবেলায়। শেষনিঃশ্বাস পর্যন্ত জিহাদ করতে করতে তারাও শহিদ হয়ে গেল।

সাইফরোদ দুর্গ

সাইফরোদ দুর্গ ছিল ঘুরের বিশুষ্ক মরুভূমি এলাকায় অবস্থিত। এখানে পানি ছিল খুবই কম। তাতাররা এখানে পৌঁছে আশপাশের সব এলাকার সমস্ত শস্য, আনাজপাতি ও মহিষের পাল লুট করে নিয়ে নিল, যাতে দুর্গের অধিবাসীদের কোনো ধরনের রসদ না মেলে। এদিকে সাইফরোদের যোদ্ধারা দুর্গে আবদ্ধ হয়ে প্রস্তুত হয়ে ছিল মোকাবেলার জন্য। ফলে তাতাররা আসতেই তাই শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ। দীর্ঘ সময় যুদ্ধের পর দুর্গের ভেতরকার জমাকৃত পানি ও খোরাকি ফুরিয়ে আসতে লাগল। এর প্রভাব সর্বপ্রথম পড়ল মহিষগুলোর উপর। প্রয়োজন পরিমাণ পানি ও ঘাস না পেয়ে ২৪ হাজার মহিষ মারা গেল।

দুর্গের হাকিম মালিক কুতুবুদ্দীন আদেশ দিলেন, দ্রুত অবশিষ্ট মহিষগুলো জবাই করে গোশত শুকিয়ে ফেলা হোক। মৃত জানোয়ারগুলো ছুড়ে ফেলা হোক দুর্গের বাইরে। হুকুম মোতাবেক কাজ আঞ্জাম দেওয়া হল। অবরুদ্ধ জনতা অনেক পরিমাণ গোশত জমিয়ে নিল এবং দুর্গের বাহাদুর মুজাহিদরা বীরত্বের সাথে সার্বক্ষণিকভাবে দুশমনের সাথে লড়ে যেতে থাকল। আর এভাবেই কেটে গেল কয়েক মাস। দুর্গ দখল করার জন্য নিষ্ফল চেষ্টায় তাতাররা ক্লান্ত হয়ে পড়ল।

দীর্ঘ সময় ধরে সংঘর্ষ চলবার পর এ পরিমাণ পানি বাকি রইল যে, অবরুদ্ধদের জন্য তা শুধু ৪০ দিনের প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট ছিল, এর বেশি নয়। মালিক কুতুবুদ্দীন আলাদা আলাদা সবাইকে পানি ভাগ করে দিলেন। প্রত্যেককে রাত্রদিনের জন্য ৩৪ তোলা (প্রায় আধা সের) পানি ও সমপরিমাণ শস্যদানা দেওয়া হতে লাগল। মালিক কুতুবুদ্দীনকে দেওয়া হচ্ছিল ৬৮ তোলা করে পানি। কারণ, তার সঙ্গে তার ঘোড়াও ছিল, যে ঘোড়ার পিঠে চড়ে তিনি দুর্গের আশপাশ পর্যবেক্ষণ করতেন। নিজের ভাগের পানি থেকে যেটুকু তিনি অজুর জন্য ব্যবহার করতেন, তাও (ব্যবহৃত

পানি) ঘোড়ার অংশে যেটুকু পড়ত সেখান থেকে নিতেন। মোটকথা, এভাবে পানি বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে পুরো ৫০ দিন পার হয়ে গেল। শেষে যখন শুধু একদিনের পানি অবশিষ্ট ছিল, পানির তদারককারীরা তা হাকিমের কাছে জানাল। মালিক কুতুবুদ্দীন নামাজের পর দুর্গে বিদ্যমান সব পুরুষকে দুর্গের একটি ময়দানে জমা করলেন। যুদ্ধ জারি রাখা হবে নাকি হাতিয়ার ফেলে দেওয়া হবে, সেই মর্মে তাদের কাছে পরামর্শ তলব করলেন।

কাজি মিনহাজুস সিরাজের বর্ণনায় আছে—সিদ্ধান্ত হল, আগামীকাল ভোরে দুর্গের সব লোক নিজেদের নারীকুল ও বাচ্চাকাচ্চাকে তাতারদের হাতে অপদস্থ হতে না দিয়ে, তাদের জুলুমের শিকার হওয়া থেকে বাঁচাতে নিজেরাই হত্যা করে ফেলবে। তারপর তলোয়ার নিয়ে সবাই দুর্গের বিভিন্ন কোণে গিয়ে লুকিয়ে থাকবে, তারপর কেউ-একজন গিয়ে খুলে দেবে দুর্গের প্রবেশদ্বার। তাতাররা যখন ছড়িয়ে পড়বে দুর্গের ভেতর, একযোগে সবদিক থেকে এসে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া হবে। শেষনিঃশ্বাস পর্যন্ত জারি রাখা হবে সেই মোকাবেলা।

ময়দানের উপস্থিত সবাই একথার উপর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হল। শাহাদাতের জন্য কোমর কষে উঠে দাঁড়াল তারা। এবং ময়দান থেকে একে অপরের সঙ্গে শেষবারের মতো মোলাকাত করে বিদেয় হল।

রাত্রিবেলা দুর্গবাসীরা জীবনের প্রত্যেকটি সেকেন্ড গুনে গুনে রুদ্ধশ্বাসে শাহাদাতের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। চাঁদ-ওঠা রাতে পূর্বদিক হঠাৎ ধোঁয়াশাচ্ছন্ন হয়ে গেল। কেমন যেন একটা প্রহেলিকাময়। গুনগুন করে মেঘ ডেকে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। আকাশের বুক ফেটে নেমে এল ঝমঝম বাদলের ধারা। সঙ্গে শুরু হল ভয়ানক তুষারপাত।

দুর্গবাসী মৃত্যুর দরজায় দাঁড়িয়ে জীবনের এই সুকোমল বৃষ্টিজলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। ঠোঁটে ঠোঁটে গুঞ্জরিত হয়ে উঠল মহান আল্লাহর অপার প্রশংসাধ্বনি। সবাই মটকা ও থলি ভরে পানি জমাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বৃষ্টি ও তুষারপাত থেমে এল একসময়। তখন দেখা গেল, তাদের সবার নিকট জমে উঠেছে দু-মাসের প্রয়োজন পূরণের মতো পর্যাপ্ত পানি। এই অবস্থাপট দেখেই আক্রমণকারী তাতাররা বুঝে ফেলল—এখন আর দীর্ঘ অবরোধের ভেতর কোনো ফায়দা নেই। এজন্য তারা এ অভিযান গরমকাল পর্যন্ত মুলতবি রেখে ফিরে চলে গেল।

শীতকাল ফুরিয়ে গেছে। তাতার-বাহিনী দ্বিতীয়বার সাইফরোদ অবরোধের জন্য প্রাচীরের সামনে এসে পৌঁছেছে। কিন্তু তাতারদের জন্য একটা খারাপ সংবাদ আছে। তা হল—এই দীর্ঘ সময়ের সুযোগে দুর্গবাসীরা প্রচুর আনাজ, পানি ও ঘাস জমিয়ে নিয়েছে। তারা এখন দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।

তারপরও তাতাররা দু-মাস পর্যন্ত অবরোধ করে রাখল দুর্গ। কিন্তু দুর্গের দেয়ালে হস্তক্ষেপ করতে সক্ষম হল না। নিষ্ফলভাবে মাথা কুটে মরতে লাগল।

তারপর তারা একটা ফন্দি আঁটল। সন্ধিচুক্তিতে নেক নিয়ত প্রকাশ করে দুর্গবাসীকে করতলগত করবার জন্য, আশপাশ দিয়ে পথ অতিক্রমকারী সওদাগরদের ব্যবসার সামানাপত্র দুর্গে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিল। দুর্গবাসী মনে করল—ব্যবসায়ীরা আমাদের জন্য খাদ্য-খোরাকির যোগান দিচ্ছে, এর চেয়ে খুশির ব্যাপার কী হতে পারে? তারা হৃষ্টচিত্তে বাণিজ্য-কাফেলার জন্য দুর্গের ফটক খুলে দিল। পার্শ্ববর্তী রাজপথগুলো দিয়ে অতিক্রম-করা সওদাগররা ব্যবসার সামান নিয়ে দুর্গে যাওয়া-আসা করতে লাগল।

এদিকে তাতাররা সন্ধান করছিল উপযুক্ত মওকার। তৃতীয়দিন দুর্গের প্রহরীদের একটু গাফেল পেয়ে ব্যবসায়ীদের পেছন-পেছন অনেক তাতার সিপাহিও ঢুকে গেল দুর্গের ভেতর। তারপর তাদের সামনে যেই পড়ছিল, তাকেই হত্যা করতে শুরু করেছিল তারা।

বাইরে-থাকা তাতাররা দুর্গের ফটক পর্যন্ত পৌঁছে সেখানটা কবজা করে নেবার আগেই হুঁশিয়ার হয়ে ওঠে দুর্গের নিরাপত্তারক্ষীরা। তাতারদের দুর্গের বাইরে ঠেলে দিয়ে বন্ধ করে দেয় ফটক। কিন্তু, এই আচানক হামলায় শহিদ হয় অনেক মুসলমান এবং ২৮০ জন লোক হয় কাফেরদের হাতে বন্দি।

অসতর্কতাবশত ঘটে-যাওয়া এই ঘটনার পর দুর্গের বাসিন্দাদের কাছে তাতাররা পয়গাম পাঠায়, তোমরা এসে আমাদের কাছে হাজির হও। মুক্তিপণ দিয়ে বন্দিদের নিয়ে যাও।

সাইফরোদের বাহাদুরেরা এই প্যাঁচালো কথার ভেতর গোপন প্রবঞ্চনার গন্ধ পাচ্ছিল। তাই সরাসরি তারা তা প্রত্যাখ্যান করে মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠল। দুশমন সমস্ত শক্তি একাট্টা করে ঝড়ের মতো এসে হামলে পড়ল। কিন্তু সাইফরোদের তিরন্দাজ ও পাথর বর্ষণকারী বাহিনী তাদের এই আক্রমণের দাঁতভাঙা জবাব দিল। প্রাচীরের চূড়ায় দাঁড়িয়ে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী বড় বড় পাথর নিক্ষেপ করতে লাগল। তাতে থেঁতলে গেল ডজন-ডজন তাতার। রশিতে ঝুলে বাইরে নেমে অতর্কিতে আক্রমণ করে-বসা মুজাহিদবাহিনী ও গোপনে ওত পেতে-থাকা সাহসী যোদ্ধারা তাতারদের অবস্থা নাকাল করে দিল। অসংখ্য লাশ ফেলে রেখে পেছনে হটতে বাধ্য হল তাতাররা। এই অসহনীয় অবরোধে প্রতিরক্ষাকর্মীদের সামনে মুখ থুবড়ে পড়ল তাদের সাহসিকতা। নিরুপায় হয়ে নিজেদের সামানপত্তর গুছিয়ে বেছে নিল প্রত্যাবর্তনের পথ।

ফিরোজকুহ

ঘুরের দ্বিতীয় দুর্গ ফিরোজকুহও তাতারদের দখল থেকে মুক্ত রইল। বিশ হাজার তাতার ২১ দিন পর্যন্ত এটাকে অবরোধ করে রাখল। তারপর শীত ও তুষারপাতের আকৃতিতে নেমে এল আল্লাহর সাহায্য। তাতাররা অবরোধ ভেঙে ফিরে আসতে বাধ্য হল।

তুলক দুর্গ

তুলক দুর্গ কবজা করতে তাতাররা আশপাশ থেকে দশ হাজার বন্দি নারী-পুরুষকে সঙ্গে নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। সিপাহিদের নজরদারিতে এই বন্দিদের দ্বারা সম্পন্ন করা হল ঘাঁটি ও খন্দক নির্মাণের কাজ। বিপুল প্রস্তুতি নিয়ে আরম্ভ হল অবরোধ; এবং আট মাস পর্যন্ত তা জারি রইল। এই আট মাসের ভেতর তুলকের প্রতিরক্ষাকর্মীরা জানপ্রাণ দিয়ে মোকাবেলা করে গেল। দুশমনকে কোনোক্রমেই সফল হতে দিল না। শেষমেশ এখান থেকেও জান্তব তাতারদের নিষ্ফল ফিরে যেতে হল।[৩৯২]

তাতার-আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানের আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন বীর মুজাহিদদের কীর্তিমালার এই যে গিয়েছে কিছু ঝলক, এগুলো ইতিহাসের গ্রন্থাদির মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। নিঃসন্দেহে, ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে সর্বকালে প্রথম সারিতে থাকা এ মুজাহিদরা যে কঠিন হিম্মত ও বীরত্বের সাথে তাতার-বাহিনীর মোকাবেলা করে গেছে, পৃথিবীর ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত খুব কমই পাওয়া যায়। কারণ, নরপশু চেঙ্গিজ খান খোরাসানকে বরবাদ করতে তার সঞ্চিত চূড়ান্ত শক্তি ব্যয় করেছিলেন। এবং একবার নয়, বারবার এখানে গণহত্যা চালিয়েছিলেন, যাতে মুজাহিদদের এই পবিত্রভূমি চিরতরে নিশ্চিহ্ন বিরানভূমি ও অনাবাদ হয়ে পড়ে।

আতা মালিক জুয়াইনি সত্য বলেছেন—'আজ থেকে কেয়ামত পর্যন্তও যদি এ রাজ্যে অব্যাহত থাকে মানবগোষ্ঠীর জন্ম ও প্রবৃদ্ধির সিলসিলা, তবু সপ্তম শতকের সেই বিধ্বস্ত জনপদের এক-দশমাংশের সমানও আর ঘনবসতিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারবে না।' তা হলে বোঝা যায়, কী ভয়ানকভাবে এই এলাকা বিধ্বস্ত করে ফেলেছিলেন চেঙ্গিজ খান!

জিহাদভূমিতে সুলতান জালালুদ্দীন

এদিকে বিভিন্ন রণাঙ্গনে চলছিল এরকম যুদ্ধ, ওদিকে সুলতান জালালুদ্দীন দক্ষিণ খোরাসানের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তখন তিনি সংবাদ পেলেন—তালকানে চেঙ্গিজ খান এক ভারী সৈন্যদল জমা করে চলেছেন। ফলে, সুলতান সর্বপ্রথম দক্ষিণ খোরাসানের সিস্তান এলাকার দিকে রোখ নিলেন। বর্তমানে এই এলাকা নিমরুজ ও ফারাহ, এই দুই ভাগে বিভক্ত। এখানে পৌঁছে ছাউনি স্থাপন করলেন তিনি। তখন খবর এল তার মামাতো ভাই আমান মালিক (যিনি হেরাতের সাবেক হাকিম ছিলেন, তাতারদের হামলা থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন) এই এলাকাতেই এক জায়গায় অবস্থান

---

[৩৯২] কালিয়ুন দুর্গ থেকে তুলক দুর্গ পর্যন্ত সমস্ত রণক্ষেত্রের বর্ণনা আফগানিস্তান দর মাসিরে তারিখ ২১৩-২১৬ থেকে গৃহীত হয়েছে।

করছেন। সুলতান তৎক্ষণাৎ আমান মালিকের কাছে সংবাদ পাঠালেন, যেন তিনি সুলতানের দলে এসে ভেড়েন।

আমান মালিক এসে পৌঁছালে সুলতান জালালুদ্দীন তাকে অত্যন্ত আবেগপূর্ণ সংবর্ধনা জানান। তাতারদের মোকাবেলায় জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর জন্য তাকে সঙ্গ দিতে আমান মালিককে সম্মত করার চেষ্টা করেন। আমান মালিক গ্রহণ করেন সুলতানের সেই প্রস্তাব। তার সবরকমের খেদমত সুলতানের জন্য অর্পণ করতে থাকেন। সুলতান জালালুদ্দীন, আমান মালিক ও অন্যান্য সহচর তাতারদের বিরুদ্ধে যথাযথ অভিযান পরিচালনার জন্য করতে থাকেন চিন্তাভাবনা।[৩৯৩]

কান্দাহারযুদ্ধ : শানদার বিজয়

জায়গায় জায়গায় খোরাসানের পাঠান গোত্রগুলোর একনিষ্ঠ ও চেতনাসমৃদ্ধ আমজনতা সুলতানকে অত্যন্ত আবেগঘন অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল। সুলতানের পতাকাতলে ধীরে-ধীরে বেড়ে চলছিল মুজাহিদের সংখ্যা। তারপর আমান মালিকের সিপাহিরা এসে তার সঙ্গে যুক্ত হলে সুলতানের শক্তি এতটাই বেড়ে উঠল, যেকোনো স্থানে গিয়ে তাতারদের বিরুদ্ধে তিনি নিজেই এখন লড়াই করতে পারবেন।

তখন সুলতানের দৃষ্টিতে এই বাহিনীর প্রতিটি সদস্য ছিল মুসলিম উম্মাহর একেকজন ভবিষ্যৎ-রাজমিস্ত্রি। সুলতানের নিকট এই মুজাহিদদের তরবারির ঝলকানিগুলো ছিল হতাশার গভীর অন্ধকারে জ্বলে-ওঠা আশার চেরাগ। বর্তমানে তার ও তাতারদের সেনাশক্তি কতটুকু, সুলতান সেটা যাচাই করে সমীচীন মনে করলেন যে, এখন যুদ্ধের সূচনা এমন এক রণাঙ্গনে করতে হবে, যেখানে ইসলামি বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতিও কম হয়, আবার দুশমনকে যত বেশি পারা যায় ক্ষতিগ্রস্ত করা যায়। অর্থাৎ, বুদ্ধির জোর খাটিয়ে তাতারদের চোখে ধুলো দিতে হবে এখন। এতে একদিকে তার সঞ্চিত শক্তি কম হলেও দুশমনকে ভীত-বিহ্বল করে দেওয়া যাবে, অন্যদিকে তাতারদের কথা শুনে-শুনে সন্ত্রস্ত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে-পড়া আমজনতাকেও নতুন করে সাহস যুগিয়ে পরবর্তী যুদ্ধগুলোতে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত করে তোলা যাবে।

এর ভেতর একদিন সুলতান জালালুদ্দীন সংবাদ পেলেন—তাতারদের একটি বাহিনী কান্দাহার অবরোধ করে ফেলেছে। শহরবাসী জবরদস্ত প্রতিরোধ করেও আক্রমণকারীদের শক্তি খর্ব করতে পারছে না। তাতাররা যেকোনো মুহূর্তে শহর কবজা করে ফেলতে পারে। এ সংবাদ শোনামাত্র তাৎক্ষণিকভাবে তিনি আমান মালিক ও অন্যান্য সেনা অফিসারকে ডাকিয়ে এনে আক্রমণের সূক্ষ্ম পরিকল্পনা

---

[৩৯৩] নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৬৫, ইবনু খালদুন ৫/১১৫

সাজিয়ে দ্রুত কান্দাহারের দিকে যুদ্ধযাত্রা করলেন। বিদ্যুদ্বেগে সমস্ত মনজিল অতিক্রম করে ইসলামের এ যোদ্ধারা যখন কান্দাহারের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছলেন, তাতাররা তখন এদের আগমন সম্পর্কে কিছু না জেনে কান্দাহার প্রাচীরে প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল।

সুলতানের বাহিনী বিভিন্ন দিক থেকে সতর্কতার সাথে খুব নিশ্চুপে একে-একে অগ্রসর হতে হতে একদম তাতার লুটেরাদের উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এই মুসিবতে তাতাররা নিজেদের ভারসাম্য সামলে ওঠার আগেই মুজাহিদদের হাজারও বিষাক্ত তির আল্লাহর ক্রোধ হয়ে তাদের দেহ রক্তাক্ত করে দিল। পলকের ভেতর, তুর্ক ও আফগান যোদ্ধারা ঘোড়ার পিঠে গুঁতো লাগাতেই চেঁচিয়ে উঠে সেগুলো সরাসরি তাতারদের যুদ্ধসারির ভেতর ঢুকে গেল। অশ্বারোহী সেপাইরা প্রচণ্ড বিক্রমে সেই সারির এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত একেবারে রক্তের বন্যা বইয়ে দিল। তাতাররা কয়েকবার কদম জমিয়ে লড়বার চেষ্টা করেছিল।

কিন্তু নগরপ্রাচীর থেকে প্রচণ্ড তির ও পাথর প্রক্ষেপণ এবং পেছন থেকে সুলতান জালালুদ্দীনের যোদ্ধাদের চকচকে তরবারি প্রতিবার তাদের বিক্ষিপ্ত হতে বাধ্য করল। এখন পর্যন্ত তাবৎ যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয় পেয়ে-আসা এই তাতাররা অপ্রস্তুত চিত্রপট দেখে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে পালাতে লাগল দিগ্বিদিক। কিন্তু সুলতান জালালুদ্দীন পূর্বেই এর একটা বিহিত-ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। তিনি প্রত্যেকটি পাহাড়, ঘাঁটি ও রাস্তায় তার সিপাহিদের মোতায়েন করে রেখেছিলেন। তাতারদের যারা যেদিকেই পালাচ্ছিল, সেদিক থেকেই সিপাহিদের তরবারির কোপে উড়ে যাচ্ছিল তাদের কল্লা।

আল্লামা ইবনে খালদুনের বর্ণনায় আছে—সেদিন একজন তাতারও বাঁচতে পারেনি।[৩৯৪] রক্তক্ষয়ী এই যুদ্ধগুলোর ধারাবাহিকতায় কান্দাহার ময়দানই ছিল সেই প্রথম রণক্ষেত্র, যার মধ্যে তাতারদের প্রকাশ্য পরাজয় ঘটেছিল। সে হিসেবে এটি ছিল মুসলিমদের জন্য এক অতুলনীয় বিজয়। এতে সুলতান জালালুদ্দীন আশানুরূপ ফল পেয়েছিলেন। জঙ্গলের দাবানলের মতো দ্রুত এ সংবাদ সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। ইসলামি যোদ্ধাদের তেজি ও ধারালো তলোয়ারের ভয় আংটার মতো আঁকড়ে ধরেছিল তাতারদের বুকের মাংস। মুসলিমদের মন থেকে এই হায়নাগুলির ভীতি, বিহ্বলতা ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা বিদূরিত হতে শুরু করেছিল। আল্লাহর সমর্থন, সহায়তা ও নুসরাতের উপর ভরসা করে একে-একে তারা নেমে আসতে লাগল জিহাদের ময়দানে।

---

[৩৯৪] ইবনু খালদুন ৫/১১৫-১১৬, নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৬৫

গজনির জিহাদি মারকাজ

তখন জিহাদের এই আন্দোলন শক্তিময় করে তুলতে অবশ্যকর্তব্য ছিল একটা কেন্দ্র গড়ে তোলা। ইতিপূর্বে সুলতান জালালুদ্দীন রাজধানী আরগেঞ্চকে জিহাদের কেন্দ্রস্থল বানিয়ে দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধপ্রস্তুতি শুরু করেছিলেন। যদি মুসলিমদের দুর্ভাগ্য নেমে না-আসত, স্বয়ং রাজধানীর কিছু নিমকহারাম না-করত গাদ্দারি, তা হলে সুলতান জালালুদ্দীন আরগেঞ্চের মতো সংরক্ষিত ও শক্তিশালী শহরকে বাদ দিয়ে অন্যকোথাও মারকাজ গড়বার চিন্তাই করতেন না। কিন্তু আরগেঞ্চের মারকাজ বাস্তবায়িত হয়ে না-ওঠায় সুলতানের দৃষ্টিতে গজনি শহরকেই তখন জিহাদি অভিযান বাস্তবায়নের উত্তম কেন্দ্র বলে মনে হচ্ছিল। সুলতান আলাউদ্দীন যখন বেঁচে ছিলেন, শাহজাদাদের মাঝে সাম্রাজ্য ভাগবাটোয়ারা করে দেবার সময় গজনি শহরটি অর্পণ করেছিলেন সুলতান জালালুদ্দীনের হাতে। সুলতান জালালুদ্দীন যেহেতু পিতার খেদমতে থেকে সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো আঞ্জাম দেওয়ায় ব্যস্ত থাকতেন, তাই তার পক্ষ থেকে গজনিতে শাসন করত তার এক নায়েব।

তাতারদের আগ্রাসন শুরুর পর সাম্রাজ্যের সব ব্যবস্থাপনা যখন ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল, স্থানে-স্থানে আমিরেরা মেতে উঠল বিদ্রোহে ও আত্মচিন্তায়, তখন গজনিতেও ঘটে গেল কয়েকটি বিপ্লব। এক চতুর বিদ্রোহী সরদার দখল করে বসেছিল গজনি শহর।

কান্দাহারের যুদ্ধ থেকে বিজয়ীবেশে ফিরে সুলতান জালালুদ্দীন এবার গজনির দিকে রওনা দিলেন। গজনিতে পৌঁছে প্রথমেই বিদ্রোহী সরদারকে শায়েস্তা করে সামলে নিলেন শহরের ক্ষমতা। আরগেঞ্চ থেকে বেরোবার পর এটাই ছিল প্রথম অঙ্গন, যেখানে এমন এলাকায় যথাযোগ্য সেনাশক্তির সাথে সুলতানের প্রতিপত্তি অর্জিত হয়েছিল। ফলে, জিহাদের জন্য তার কোরবানিগুলো ফলদায়ক হয়ে উঠছে ভেবে আশান্বিত হলেন তিনি।

সুলতানের গজনি আগমনের সংবাদ ঝড়োহাওয়ার মতো পূর্ব খোরাসানের কোনায় কোনায় ছড়িয়ে পড়ল। সুলতানের স্বেচ্ছাসেবক, স্থানীয় আলেম ও মুবাল্লিগরা জায়গায় জায়গায় লোকজনকে জিহাদের মাসআলা শুনিয়ে-শুনিয়ে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর দিকে আহ্বান করতে লাগলেন। কিছুদিনের মধ্যেই মুজাহিদদের 'নারায়ে তাকবির আল্লাহু আকবার' ধ্বনিতে গুঞ্জরিত হয়ে উঠতে লাগল গজনির ময়দান। শাহাদাতের নেশায় পাগল যুবকের দল ঝাঁকবদ্ধভাবে এই জিহাদের কেন্দ্রভূমিতে এসে জড়ো হয়ে জিহাদ ও কিতালের জন্য নিজেদের ওয়াকফ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করতে লাগল। কাবুলের হাকিম মালিক শের, বলখের সাবেক হাকিম আজম মালিক, মাজহার মালিক, হাসান কাযলাক ও ঘুরি শাহজাদারা ৩০ হাজার সিপাহি নিয়ে সুলতান জালালুদ্দীনের পতাকাতলে এসে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠেন।

সাইফুদ্দীন আগরাক খলজিও নিজ গোত্রের ৪০ হাজার অভিজ্ঞ তুর্কমান সৈনিক-সমেত সুলতানের বাহিনীর সঙ্গে এসে মিলিত হলেন। এভাবে সুলতানের অধীনে জমায়েত হয়ে গেল ১ লাখের মতো মুজাহিদ।[৩৯৫]

মুজাহিদদের ছাউনি

গজনিতে সুলতান জালালুদ্দীনের এক ঐতিহাসিক সেনাছাউনি গড়ে ওঠে। সেই ছাউনিতে মুসলিম সম্প্রদায়ের চেতনাসম্পন্ন সৈনিকরা নিজেদের নিকৃষ্ট দুশমন থেকে বদলা নেবার জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দেয়। স্থানে স্থানে তাজাপ্রাণ উদ্যমী সাহসী যুবকেরা বর্শা নিক্ষেপণ, তলোয়ার চালনা, ঘোড়সওয়ারি, তিরন্দাজি, সন্তরণসহ সমরশাস্ত্রের কঠিন কঠিন বিষয়ের দীক্ষা নিতে থাকে। তাদের ভেতর যারা ছিল সমরশাস্ত্রে পারদর্শী, তারা এই দীক্ষাগৃহে জমায়েত হয়ে নিমগ্ন হয়ে যায় বাহিনী বিন্যস্ত ও সুগঠিত করবার কাজে। মুজাহিদদের খোঁজখবর, তদারকি ও নেগরানিতে কাটতে থাকে সুলতান জালালুদ্দীনের একটা বড় সময়।

সুলতানের বিবাহ

গজনিতে অবস্থানকালে, সুলতানের সাথে সম্পর্ক আরও পোক্ত করে তুলবার জন্য আমান মালিক তার কন্যাকে সুলতানের সঙ্গে বিয়ে দেন।[৩৯৬]

তাতার-বাহিনীর অগ্রযাত্রা

চেঙ্গিজ খান তখন তালকানে অবস্থান করছিলেন। সুলতানের এইসব তৎপরতা সম্পর্কে তিনি বেখবর ছিলেন না। রক্তপাতকারী এক চতুর প্রাণীর মতো একের পর এক এদিক-ওদিকের সমস্ত চড়াই-উৎরাই পর্যবেক্ষণ করে চলছিলেন। তার জন্য গজনিতে সুলতান জালালুদ্দীন খাওয়ারিজম শাহের নেতৃত্বে মুজাহিদদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠার ব্যাপারটি ছিল এক জবরদস্ত শঙ্কার কারণ। তিনি বুঝতে পারছিলেন—সঠিক সময়ে যদি উপড়ে ফেলা না-হয় এ শক্তির শেকড়, তা হলে ভিন্নদিকে মোড় নেবে অবস্থা; সুলতান জালালুদ্দীনের নেতৃত্বে জমায়েত হওয়া মুজাহিদবাহিনী মুসলিমদের রক্তের প্রতিশোধ নিতে ভূপৃষ্ঠ থেকে তাতার-জাতির নামনিশানা পর্যন্ত মুছে ফেলবে।

চেঙ্গিজ খানের কাছে এর তাৎক্ষণিক সমাধান ছিল একটাই। তা হল—গজনির দিকে যুদ্ধযাত্রা করে সুলতান জালালুদ্দীনের শক্তি খর্ব করে দেওয়া। কিছুদিন

---

[৩৯৫] ইবনু খালদুন ৫/১২০, জাহাঁকুশা ২/১৩৫-১৯৫, নিহায়াতুল আরাব ৭/৩৬৫

[৩৯৬] জাহাঁকুশা ২/১৩৫

পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং আক্রমণের পরিকল্পনা সাজিয়ে চেঙ্গিজ খান তার যোগ্য সরদারদের নেতৃত্বে শক্তিশালী একটি বাহিনী গজনির দিকে প্রেরণ করলেন। সেই বাহিনীর সার্বিক কমান্ড করছিল তাতারদের বিখ্যাত জেনারেল শেগি কুতকু।

সুলতানের বাহিনীর যুদ্ধযাত্রা

গজনিতে যখন তাতার-বাহিনীর অগ্রযাত্রার খবর ছড়িয়ে পড়ল, ধড়াস করে উঠল আমজনতার বুকের ভেতর। তাদের চোখে ঘুরছিল পূর্বের কয়েকটি যুদ্ধে ঘটে-যাওয়া পরাজয়ের দৃশ্য। সুলতান জালালুদ্দীন শহরবাসীকে হিম্মত যোগালেন। যুদ্ধের প্রজ্ঞাপূর্ণ কর্মপদ্ধতি কী হতে পারে, সেনা-অফিসারদের নিয়ে সে ব্যাপারে পরামর্শে বসলেন। সিদ্ধান্ত হল, শহর থেকে সামনে অগ্রসর হয়ে তাতারদের সাথে ইকদামি যুদ্ধ করা হবে, যাতে জনতার মন থেকে এই ধারণা দূর হয়ে যায় যে, তারা শুধুই প্রতিরোধযুদ্ধ করছে। এমনকি যুদ্ধে আশানুরূপ কোনো ফল না পেলেও তাৎক্ষণিক কোনো মুসিবত থেকে যাতে নিরাপদ থাকে গজনিবাসী।

পরামর্শের পর প্রস্তুত হয়ে উঠতে লাগল সৈন্যদল। অনেক লোক, যারা তাতার-বাহিনীর আগমনের সংবাদ শুনে শহর থেকে হিজরত করে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, সুলতান জালালুদ্দীনের বাহিনীর সাহসিকতা ও জজবা দেখে স্থির ও প্রশান্ত হল। শহরের প্রতিরোধ-ব্যবস্থা সম্পন্ন করে ৬০ হাজার মর্দে মুজাহিদ সঙ্গে নিয়ে গজনি থেকে যুদ্ধযাত্রা করেন সুলতান। তখন শহরের প্রতিটি বাচ্চা, বুড়ো, নারী ও পুরুষের হৃদয় থেকে ক্রমধারায় উৎসারিত হচ্ছিল দোয়া আর দোয়া।

গজনির যুদ্ধ

গজনির বাইরে বলক নামক স্থানে (যাবিল সংলগ্ন গজনির একটি প্রান্তিক এলাকা) পৌঁছে সুলতানের বাহিনী দেখল—তাতার-বাহিনী প্রচণ্ডবেগে পূর্ব ও পশ্চিম তীরে বাঁক-নেওয়া মরুপথে ধূসর রঙের ধুলো ওড়াতে ওড়াতে অগ্রসর হচ্ছে।[৩৯৭]

খানিক পরেই দু-দিকের যোদ্ধারা সেখানে কাতারবন্দি হয়ে উঠল; জমে গেল কঠিন যুদ্ধ।[৩৯৮] এমন প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ চলছিল যে, এক তলোয়ারের আঘাতে ভেঙে ভেঙে নিচে পড়তে লাগল অন্য তলোয়ার। বর্শার তীক্ষ্ণ ফলা আরও অধিক চকচকে ও ধারালো হয়ে উঠল। দেহ থেকে মস্তক এবং গ্রন্থি থেকে অঙ্গ কেটে কেটে আলাদা হতে লাগল। হিংস্র তাতারদের মোকাবেলায় মুজাহিদদের ভেতর থেকে ছাপিয়ে উঠতে লাগল তাকবিরধ্বনি।

---

[৩৯৭] যাবিল সংলগ্ন গজনির একটি প্রান্তিক এলাকা। (মুজামুল বুলদান)

[৩৯৮] ইবনুল আসির ৭/৫৯৩

দিনভর জারি রইল সেদিনকার যুদ্ধ। তরবারির কোপে অসংখ্য লোক কর্তিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে রইল। কিন্তু শেষ নাগাদ লড়াইয়ের কোনো চূড়ান্ত ফয়সালা ঘটল না। যখন অন্ধকারের ঘনকৃষ্ণ জাল চরাচরজুড়ে ব্যাপৃত হয়ে পড়তে লাগল, দুই পক্ষই তখন ফিরতে আরম্ভ করল নিজ নিজ ছাউনির দিকে।

শহিদদের কাফন-দাফন শেষে অজু করে মুসলিমরা নামাজ আদায় করতে ব্যস্ত হয়ে গেল। দিনভর যুদ্ধ করে তাদের সারা শরীর তখন অবশ হয়ে এসেছে। তারপর যখন গলার ভেতর কয়েক লোকমা খাবার ঢোকে, খানিকটা আরাম বোধ করে ওঠে ক্লান্ত সিপাহিরা। ক্যাম্পের ভেতর নিজেদের চিকিৎসকের থেকে সেবা নিতে আরম্ভ করে। কিন্তু সুলতান জালালুদ্দীনের তখনও মুহূর্তের জন্যও কোনো আরাম নেই। তিনি ঘোড়ায় চেপে খাস সহচরদের নিয়ে ছাউনির চারপাশ ঘুরেফিরে মুজাহিদদের দেখভাল করতে লাগলেন। পরিস্থিতি কিছুটা নিরাপদ বোধ করে আগামীকালের যুদ্ধের জন্য হেকমতপূর্ণ কর্মপন্থা সাজাতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। খানিক পরে ক্যাম্পের ভেতর জেগে ওঠে মুজাহিদদের ফোঁপানো কান্নার গুঞ্জরণ। সবার বুকের গহন থেকে একটা আবেগী বাতাস যেন ঠেলে বেরোতে চাইছিল। সেই কান্নায় চারপাশ থেকে ভেঙে পড়তে লাগল মরুরাতের নির্জনতার দেয়াল। সবাই মাওলায়ে কারিমের সামনে হস্ত প্রসারিত করে তার রহমত ও সাহায্যের ভিখ মাগতে লাগল।

পরদিন ভোরে রাত্তিরের গাঢ়-কৃষ্ণ নেকাব ওঠাল সূর্য। হক-বাতিলের সৈনিকেরা আরও একবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। আজকের যুদ্ধটা হয়ে উঠল গতকালের চেয়ে বহুগুণ জোরদার। জয়ের জন্য দু-দিকের সিপাহিরাই জীবন বাজি লাগিয়ে দিয়েছিল। লড়াইয়ের দৃশ্যপট পালটে গিয়েছিল কয়েকবারই। কিন্তু বিকেলের আলো মলিন হয়ে এলেও দেখা গেল দুই দল এখনো নিজ নিজ স্থানে অবিচল। শেষমেশ ক্রোধান্বিত দু-দলই টাটকা রক্ত লেগে থাকা তলোয়ারগুলো কোমরে কোষবদ্ধ করতে করতে ফিরে গেল। দুইপক্ষই তখন ফুঁসছিল ক্রোধে। দুদিকেরই এত পরিমাণ সিপাহি নিহত হয়েছিল যে, এবার তৃতীয় দিনের যুদ্ধে অবিচলভাবে শেষ পর্যন্ত যারাই টিকে থাকতে পারবে, বিজয় তাদের জন্য সুনিশ্চিত।

তৃতীয় দিন পড়েছে। পূর্বের দুদিনের চেয়ে আজকের যুদ্ধ আরও অগ্নিঝরা এবং দীর্ঘ হল। কিন্তু কোনো দলই ময়দান ছাড়তে প্রস্তুত হচ্ছিল না। রাতভর দুপক্ষই পরবর্তী যুদ্ধের প্রস্তুতি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ব্যস্ত রইল। শেষরাত্রে মুজাহিদদের কান্নার দৃশ্য বড় অন্যরকম হয়ে উঠল। তারা কেঁদে কেঁদে অস্থির কণ্ঠে রহমত চেয়ে আল্লাহকে ডাকছিল। তারা কাতর কণ্ঠে রাব্বুল ইজ্জতের নিকট সেই সাহায্য তলব করছিল, যা বদরযুদ্ধে সংকল্পবদ্ধ মুসলিম মুজাহিদদের কয়েকগুণ বেশি শত্রুবাহিনীর উপর বিজয় এনে দিয়েছিল।

সুবহে সাদিকের সময় সুলতান জালালুদ্দীন সেনা-অফিসারদের সাথে পরামর্শ ও আল্লাহর দরবারে সাহায্য তলব করে ময়দানে বেরোলেন। সৈন্যদলের কাতারগুলো

ঘুরে দেখে তাদের ঠিক মধ্যিখানে গিয়ে নিজের জায়গায় দাঁড়ালেন। বেজে উঠল যুদ্ধের নাকারা। সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ার নিয়ে দুইদল পরস্পরের ভেতর ঢুকে পড়ল। একটুক্ষণ পরেই যুদ্ধ এমন উত্তপ্ত হয়ে উঠল যে, বিগত তিন দিনের যুদ্ধকেও তা হার মানাল। ঘোড়ার খুড়ের আঘাতে উৎক্ষিপ্ত ধুলোবালি আকাশ স্পর্শ করল। এতে ঝাপসা আবহাওয়ার ভেতর দিনের প্রথমভাগেই যেন ঝুলে রইল সন্ধ্যা নামার খানিক আগের ফ্যাকাশে ছায়া। একদিকে মুসলিমরা তাকবির বুলন্দ করে অগ্রে বেড়ে-বেড়ে আক্রমণ করছিল, অন্যদিকে তাতাররা দাঁতে দাঁত পিষে চালিয়ে যাচ্ছিল সংঘর্ষ। তরবারিগুলো পরস্পরে এমনভাবে ঠোকর খাচ্ছিল যে, চোখের সামনে একদম স্পষ্টভাবে ঝরে পড়তে দেখা যাচ্ছিল হলুদ ফুলকি। মুষলধারার বৃষ্টির মতো বর্ষিত হচ্ছিল তির। বর্শাগুলোর তীক্ষ্ণ ফলা থেকে প্রবাহিত হচ্ছিল রক্তের ফোয়ারা। তলোয়ারের ঝংকার, বাহাদুরদের উত্তেজিত কণ্ঠ, ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি ও জখমপ্রাপ্তদের শোরগোল ব্যতীত কোনো আওয়াজ কানে আসছিল না।

সুলতান জালালুদ্দীন অত্যন্ত অবিচলতা ও স্বয়ম্ভরতার সাথে সেন্টারে থেকে বাহিনী পরিচালনা করে যাচ্ছিলেন। লড়াইয়ের চরম নাজুক মুহূর্তেও কোনোপ্রকার ভয়, হতাশা কিংবা অস্থিরতা তার কাছে ঘেঁষতে পারেনি। রবের ওয়াদার প্রতি তার পুরোপুরি ভরসা ছিল। যুদ্ধ চলাকালে কয়েকবার বিশেষ দল নিয়ে তিনি ময়দানে নামলেন। বিস্ময়করভাবে তলোয়ার চালিয়ে কচুকাটা করে দিতে লাগলেন দুশমনের সারি।

দিন গড়াতে লাগল আর আল্লাহর সাহায্য নাজিলের প্রকাশ ঘটতে লাগল। এবং ঢিলে ও শক্তিহীন হয়ে যেতে লাগল তাতারদের শক্ত বাহু। তাদের কদম অবিচল রইল না; হড়কে গেল।[৩৯৯] দ্বিতীয়বার তারা আর দৃঢ়পদ হতে পারল না। সুলতান জালালুদ্দীন বুকের ভেতর উৎসারিত শুকরিয়ার ফোয়ারা নিয়ে শত্রুবাহিনীকে বিক্ষিপ্তভাবে দিগ্বিদিক পিছপা হয়ে যেতে দেখছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বাহিনীকে হুকুম দিলেন—সবাই মিলে ব্যাপকভাবে দুশমনকে ধাওয়া করুন।

বিজয়ের খুশি এসে দূর করে দিল এই ক্লান্ত জানবাজদের গভীর অবসাদ। সুলতানের আদেশ পেতেই চতুর্দিক থেকে তারা পলায়নপর শত্রুবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। জায়গায় জায়গায় তাদের লাশের স্তূপ ফেলে দিল। খুব কমসংখ্যক তাতারই বেঁচে বেরোতে পেরেছিল সেদিন।[৪০০]

---

[৩৯৯] ইবনুল আসির ৭/৫৯৩

[৪০০] জুয়াইনির বর্ণনা থেকে জানা যায়—সুলতানের রওনা দেবার পর শহর রক্ষীবাহিনী থেকে খালি ছিল। কিন্তু তখন শহরে তাতারদের আক্রমণের কোনো আশংকা ছিল না। এজন্য শহরের দরজাগুলো খোলা ছিল। জুয়াইনি লেখেন—এর ভেতরেই ১০-১২ হাজার তাতার সিপাহি

গজনিবাসীর অবস্থা

সুলতান জালালুদ্দীন গজনি থেকে বেরিয়েছেন কয়েকদিন কেটে গেছে। সাধারণ ও বিশিষ্ট সবার মনোযোগ শুধু এবং শুধুই যুদ্ধের প্রতি নিবদ্ধ। মসজিদে মসজিদে, বাড়িঘরে, একাকী কিংবা সম্মিলিতভাবে, নারীপুরুষ, বালকবালিকা, বৃদ্ধবৃদ্ধা সবাই ইসলামি বাহিনীর বিজয় ও সুলতান জালালুদ্দীনের সুস্থভাবে প্রত্যাবর্তনের দোয়া করছিল। শহরবাসী দোল খাচ্ছিল আশা ও নিরাশার ভেতর। এর মধ্যে হঠাৎ করেই এসে পৌঁছাল সুলতানের বিজয়ের সংবাদ। লোকজন খুশিতে বাগবাগ হয়ে গেল। শুকরিয়ার সেজদায় নতুনভাবে আবাদ হয়ে উঠল গজনির মাটি। সবার চোখের কোণে চিকচিক করছিল কৃতজ্ঞতার অশ্রুবিন্দু। শহরজুড়ে বিস্তৃত হল খুশির আঁচল। আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহর উপর লোকজনের ভরসা বেড়ে গেল। এই মহা সফলতা যদিও চূড়ান্ত বিজয় ছিল না, তবু এতে দুশমনের দিলে সুলতানের বীরত্ব ও শক্তিমত্তার একটা ভয় গেঁথে গিয়েছিল। ইসলামি বাহিনীর ভাগ্যে প্রথমবারের মতো উন্মুক্ত ময়দানে এত বড় বিজয় ঘটে উঠল। আর শক্ত মোকাবেলার পরও তাতারদের হল বাজেভাবে পরাজয় বরণের এক ভয়ানক অভিজ্ঞতা।

গজনি যুদ্ধে জয়ের প্রভাব

চেঙ্গিজ খানের ভয়ানক রক্তপাতে মুসলিমদের মাঝে যে কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা জন্ম নিয়েছিল, গজনির যুদ্ধে ইসলামি বাহিনীর স্পষ্ট বিজয়ের কারণে তাদের সেই ভাব কেটে গেল। হিন্দুকুশ পাহাড়ের পাদদেশ থেকে আরম্ভ করে খোরাসানের সর্বশেষ সীমান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন আফগান গোত্র তাতারদের বিরুদ্ধে মুষ্টিবদ্ধভাবে উঠে দাঁড়াতে লাগল। প্রত্যেক শহর, বস্তি ও চৌকিতে মোতায়েনকৃত তাতার আমলাদের টুঁটি টিপে মেরে ফেলতে লাগল তারা।[৪০১]

হেরাতবাসীর জাগরণ

হেরাতের শাসিত মুসলমানেরা ফের একবার পার্শ্ব পরিবর্তন করল। স্থানীয় বাসিন্দারা শহরের তাতার নেগরান মনকেতাই ও কাঠপুতুল মুসলিম হাকিম মালিক আবু বকরের বিরুদ্ধে কর্মপরিকল্পনা সাজাবার কথা ভাবতে লাগল। একদিন মওকা পেয়ে

একদম শহরে ঢুকে পড়ে। সড়কে থাকা বহু লোককে শহিদ করে এবং এক মসজিদের বেশকিছু অংশে আগুন লাগিয়ে দেয়। তারপর সুলতানের বিরুদ্ধে সারিবদ্ধ হওয়া বাহিনীতে যোগ দিতে এখান থেকে রওনা করে।

বুঝে আসে যে, গজনিতে এদের এই আক্রমণ পরিকল্পনামত ঘটেনি; বরং ঘটনাক্রমে সংঘটিত হয়ে গিয়েছিল। তারা সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যখন বেরিয়েছিল, তখন পথিমধ্যে মওকা পেয়ে কিছুক্ষণের জন্য গজনিতে আগ্রাসন চালাবার জন্য থেমে পড়েছিল। তাছাড়া তাদের এই আগ্রাসন বড় কোনো ক্ষয়ক্ষতিরও জন্ম দেয়নি। (দেখুন : জাহাঁকুশা ২/১৯৭)

[৪০১] রওজাতুস সফা ৫/৩৯

অস্ত্রসজ্জিত নওজোয়ানরা আক্রমণ করে বসল এই দুজনের উপর। মালিক আবু বকর মারা গেল বাজারে আর মনকেতাইকে কিছু যুবক দুর্গে ঢুকিয়ে হত্যা করে ফেলল। তারপর অস্ত্রসজ্জিত আমজনতা শহরের তাতার গোমস্তাদের ধরে ধরে হত্যা করতে আরম্ভ করল। এই অভিযান ভালোভাবে সম্পন্ন করে জিহাদি লিডারদের নেগরানিতে শহরে নিয়োগ দিল নতুন হাকিম। মালিক মুবারিজ উদ্দীনকে শহরের হাকিম ও খাজা ফখরুদ্দীন আবদুর রহমানকে আমির নিযুক্ত করা হল। তাতারদের বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যাওয়া ও সুলতান জালালুদ্দীনকে সহযোগিতা করার উপর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হল সবাই।[৪০২]

চেঙ্গিজ খানের ক্রোধান্ধতা

হেরাত ও অন্যান্য অঞ্চলে মুসলিমরা যখন দ্বিতীয়বার তরবারি ধারণ করে উঠেছিল, নতুন এক বিষাদ হয়ে তা বাজতে আরম্ভ করেছিল চেঙ্গিজ খানের বুকে। তিনি তুলি খানকে ডেকে বাজেভাবে কিছু ধমকধামক দিলেন—তুই হেরাত জয় করার পর সেখানকার বাসিন্দাদের পুরোপুরিভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিলি না কেন? ধমকাতে ধমকাতে বললেন—এই ফেতনা তো সেকারণেই সৃষ্টি হয়েছে যে, তুই লোকদের উপর তলোয়ার চালনায় ঢিলেমি করেছিলিস।

তারপর তিনি ইলেকদাই নৈয়ানের হাতে ৮০ হাজার অশ্বারোহী সৈনিক প্রদান করে হেরাত দখলের আদেশ করেন। খুব তাগিদ করে বলেন—মনে হচ্ছে এই এলাকাগুলোতে মুর্দারা আবার জিন্দা হয়ে ওঠে। এজন্য তোমার জন্য জরুরি হচ্ছে সব নিহতের দেহ থেকে মস্তক কেটে ফেলা। কাউকেই তুমি জীবিত ছাড়বে না। কখনো কোনো কোমলতার পথ অবলম্বন করবে না। অত্যন্ত কঠোরতার সাথে আক্রমণ চালাবে।[৪০৩]

চেঙ্গিজ খান জরুরি মনে করলেন সুলতান জালালুদ্দীনের সাথে চূড়ান্ত মোকাবেলার পূর্বে এ-সমস্ত এলাকায় যেখানে যেখানে বিপ্লব শুরু হয়েছে, তা পুরোপুরি কবজা করে সেখানে রাজত্ব গড়ে তুলতে হবে, যাতে সুলতানের সাথে যুদ্ধের সময় পেছন থেকে তার কোনো সহায়তা মেলার সম্ভাবনা না-থাকে।

হেরাতবাসীর ভেতর গণহত্যা

হেরাতে মালিক মুবারিজ উদ্দীন, খাজা ফখরুদ্দীন ও অন্যান্য মুজাহিদ লিডার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন, দেহে রক্তের শেষবিন্দুটি বয়ে-যাওয়া পর্যন্ত হাতিয়ার ফেলবেন না। তারা অত্যন্ত বীরত্বের সাথে দুশমনের মোকাবেলায় নামলেন। দুশমনের কামানগুলো

---

[৪০২] রওজাতুস সফা ৫/৩৯

[৪০৩] রওজাতুস সফা ৫/৩৯, আফগানিস্তান দর মাসিরে তারিখ ২২৫

প্রাচীরে দিনরাত বিরামহীনভাবে প্রস্তর নিক্ষেপ করতে লাগল। পুরো ছয়মাস এভাবেই কেটে গেল। তাতারদের লাশের পর লাশ পড়ে যেতে লাগল। অন্যদিকে শহিদ হয়ে গেল মুজাহিদদেরও একটা বড় সংখ্যা। শেষে তাতাররা তাদের সমস্ত শক্তি জমিয়ে লাগাতার কয়েকদিন প্রচণ্ড আক্রমণ চালাল। মুজাহিদরাও ভরপুর মোকাবেলা করে যাচ্ছিল। কিন্তু এর মধ্যেই কামানগুলো পাথর নিক্ষেপ করে প্রাচীরের জায়গায় জায়গায় ছিদ্র করে ফেলেছে। একদিক থেকে বিকট আওয়াজে ধসে পড়ল ৫০ গজ দেয়াল। তারপর শহরবাসী বেশি প্রতিরোধ করতে পারেনি।[৪০৪] তাতার-বাহিনী ঢুকে পড়ল শহরের ভেতর। পুরো প্রাচীর ধুলোয় মিশিয়ে দিল। জনগোষ্ঠীর ভেতর গণহত্যা চালিয়ে আগুন লাগিয়ে সারা শহর ছাইভস্ম করে ছেড়ে দিল।

৬১৮ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে (মে, ১২২১ খ্রিষ্টাব্দ) ঘটেছিল এই ঘটনা। বর্ণনা করা হয়, হেরাতের শহিদদের সংখ্যা ছিল কয়েক লাখ। কাজি জুযজানি বলেছেন ছয় লাখ। রওজাতুস সফা গ্রন্থের লেখক বলেছেন, হেরাতে শহিদ হয়েছিল ১৬ লাখের মতো মানুষ।[৪০৫]

রওজাতুস সফার লেখক বলেন—লক্ষ জনতার অধিবাস এই বিশাল হেরাত শহরে শুধু খতিব মাওলানা শারফুদ্দীন ও অবশিষ্ট ১৫ জন লোক বাঁচতে পেরেছিলেন। তারা খুব গোপন এক জায়গায় আত্মগোপন করেছিলেন। তাতাররা চলে গেলে এই পনেরোজনের মধ্য থেকে সন্ত্রস্ত এক লোক গোপন স্থান থেকে বাইরে বেরোল। হালুয়ার এক বিধ্বস্ত দোকানের সামনে গিয়ে বসল সে। অত্যন্ত ভয়ার্ত চোখে দেখতে লাগল চারপাশ। যখন বুঝল, আর কোনো শঙ্কা নেই, আনন্দে মাথায় এমনভাবে হাত চাপড়াতে লাগল যে, সে মনে করল, এখন তার জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত।

তারপর এই বলে চিৎকার করে উঠল—আল্লাহর শোকর, আমার তো এখন স্থিরতার সাথে এক লহমা নিঃশ্বাস ফেলবার মওকা মিলেছে।

কিছুদিন পর হেরাতের গণহত্যা থেকে বেঁচে যাওয়া আরও ২৪ জন লোক এসে তাদের সঙ্গে মিলিত হল। ১৫ বছর এভাবেই কেটে গেল তাদের। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া এই স্থানে এই ৪০জন লোক ছাড়া কেউ ছিল না। এরা সুলতান ঘুরির নির্মিত মসজিদের গম্বুজের নিচে (যা তাতারদের বরবাদি থেকে রক্ষা পেয়েছিল) কোনোরকমে জীবন পার করছিল।[৪০৬]

---

[৪০৪] রওজাতুস সফা ৫/৩৯

[৪০৫] রওজাতুস সফা ৫/৩৯ জামিয়ে তারিখে হিন্দ ৯৮

[৪০৬] রওজাতুস সফা ৫/৪০

হেরাতের গণহত্যা থেকে ইমাম রাজির পরিবারের হেফাজত

ইমাম ফখরুদ্দীন রাজির জামাতা আলাউল মুলক আলাবি সুলতান মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহের একজন উজির ছিলেন। খাওয়ারিজমে তাতার-আগ্রাসনের শুরুর দিকে তিনি চেঙ্গিজ খানের সাথে গিয়ে মিশেছিলেন। চেঙ্গিজ খান তাকে দরবারে জায়গা দিয়েছিলেন। ইমাম রাজির মৃত্যুর পর হেরাতে তার পরিবারের লোকজন শান্তিতে বসবাস করছিল। এ আক্রমণের সময় তাদের জীবনও শঙ্কার মুখে পড়েছিল। কিন্তু আলাউল মুলক চেঙ্গিজ খানের কাছে সুপারিশ করে তাদের নিরাপত্তা নিয়ে নিয়েছিল। ফলে তাতাররা যখন হেরাতে গণহত্যা চালাল, তা থেকে নিরাপদ রইল ইমাম রাজির পরিবারের লোকজন।[৪০৭]

খোরাসানে দ্বিতীয়বার গণহত্যা

হেরাতে ভয়ংকর গণহত্যা চালাবার পর তাতাররা আরও একবার খোরাসান শহর বিধ্বস্ত করতে সম্মুখে অগ্রসর হল। তারা হেরাতের আশপাশের সমস্ত এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা লোকদের উপর নতুন করে আক্রমণ চালাল। হিন্দুকুশ পাহাড়ের পাদদেশ থেকে শুরু করে খোরাসানের পশ্চিমের সীমান্ত-শহরগুলো পর্যন্ত তাদের আয়ত্তে চলে এল সমস্ত এলাকা।[৪০৮] উকতাইয়ের নেতৃত্বে সিস্তানেও তাতাররা দ্বিতীয়বার আক্রমণ করল। অত্যন্ত নির্দয়ভাবে গণহারে হত্যা করল লোকদের। শেষদিকে এসে স্থানীয় লোকেরা ঘুরে দাঁড়াল তাদের মোকাবেলায়। এভাবে লড়তে লড়তে সব নারী-পুরুষ ও বাচ্চা-বুড়ো শহিদ হয়ে গেল।

সিস্তান ও হেরাত ছাড়াও, সে-সময় মার্ভের গণহত্যা থেকে বেঁচে যাওয়া লোকগুলো শহরের ভগ্নস্তূপে এসে দ্বিতীয়বার জীবনযাপন শুরু করেছিল। আশপাশের ছোট ছোট গ্রামগুলো থেকেও হাজার হাজার লোক চলে এসেছিল এখানে। যদিও তাদের ভেতর তাতারদের সাথে মোকাবেলা করার মতো একটুও হিম্মত ছিল না। তারা তেমন নতুন কোনো কর্মকাণ্ডে জড়িতও ছিল না। কিন্তু অন্যান্য এলাকার সংঘর্ষকারীদের প্রতি মনে যে ক্রোধ জন্মেছিল, তাতাররা তা ঝেড়েছিল এই নিরীহ মজলুমদের উপর।

বারমাস নামের এক তাতার সরদার, যাকে এ এলাকার হাকিম বানানো হয়েছিল, ফের একবার এখানে নির্বিচারে লোকদের রক্ত প্রবাহিত করল। কারণ, লোকজন খাওয়ারিজম শাহি খানদানের সহযোগিতায় কোমর কষে উঠে দাঁড়িয়ে এই সরদারের বিরুদ্ধে বিদ্রুপমাখা ঢোল পেটাতে শুরু করেছিল। কিছুকাল পর জিয়াউদ্দীন ও কাশতেগিন নামের দুই মুসলিম আমির এই দুর্ভাগা শহরটিকে পরপর জয় করে নিল।

---

[৪০৭] ইমাম রাজি ২৬

[৪০৮] ইবনে খালদুন ৫/১১৫

ভগ্ন প্রাচীরের মেরামতও করাল। অন্যান্য এলাকার বাস্তুহারা লোকেরা মার্ভ শহরকে নিরাপদ মনে করে ফের একবার এখানে এসে জমায়েত হতে লাগল। এভাবে এক-এক করে এখানকার লোকসংখ্যা ১ লক্ষ ছাড়িয়ে গেল।

তখন কুতুকু নামের এক সরদার এ শহরের পাশ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিল। উজাড় হয়ে-পড়া এ শহর নতুনভাবে আবাদ হয়ে উঠতে দেখে সর্বাঙ্গে আগুন জ্বলে ওঠে তার। সে তুরবাই নামের এক সরদারের—যে নাশখাব এলাকায় গণহত্যা চালিয়ে এদিকে আসছিল—সাথে মিলে শহরটি অবরোধ করে ফেলল। তার কয়েক মুহূর্ত পরেই পরাজিত হল শহরবাসী। তাতাররা ১ লক্ষ লোককে দেখতে দেখতেই শহিদ করে ফেলল। শহরের সব আবাসস্থল এবং অলিগলি জনসংখ্যামুক্ত করার পরও তাতারদের সন্দেহ হল, ফের কিছু লোক এসে আশ্রয় নেবে এখানে। তারা এ ধরনের আশ্রয়গ্রহণকারী লোকদের শিকার করতে তাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যয় করল। আক নামের এক সরদারকে এই মিশনের জিম্মাদার বানিয়ে গেল তারা। সে সারা শহর কয়েকভাগে বিভক্ত করে তুলে দিল সেপাইদের হাতে। সেপাইরা শিকারি কুকুরের মতো খুঁজে খুঁজে লুকিয়ে থাকা লোকদের হত্যা করতে লাগল। চল্লিশদিন পর্যন্ত মার্ভের ধ্বংসস্তূপ থেকে টেনে টেনে লোকজনকে বের করে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে শহিদ করে দেবার ধারা অব্যাহত রাখল।

প্রাসাদগুলোর ভেতরে যারা লুকিয়েছিল, তাদেরকে বের করে আনতে তাতাররা এখানে আশ্চর্য এক চাল চেলেছিল। নাখশাব থেকে তারা একজন মুয়াজ্জিনকে ধরে এনেছিল। এই মুয়জ্জিনের মাধ্যমে জায়গায় জায়গায় আজান দেওয়াল। আজানের আওয়াজ শুনে আত্মগোপনকারী মুসলমানরা এই ভেবে বেরিয়ে আসতে লাগল যে—যাক, তা হলে দুশমন এবার শহর ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু তারা বাইরে বেরোতেই নরপশুদেরকে নিজেদের জন্য অপেক্ষমাণ দেখতে পেল। তারপর কষ্টদায়ক যন্ত্রণা সয়ে সয়ে শহিদ হল। চল্লিশদিন পর পশুরা যখন এখান থেকে ফিরে গেল, মার্ভে তখন শুধু চারজন হিন্দু জীবিত ছিল। তারা ব্যবসার উদ্দেশ্যে এখানে এসেছিল। আর কিছু লোক, তাতাররা এখানে উঠতেই, বনে-জঙ্গলে পাহাড়ে-পর্বতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। তাতার-বাহিনী চলে যেতেই আবার তারা শহরে চলে এল। কিন্তু তখনও শেষ হবার ছিল না মার্ভের দুর্ভাগ্য। আরও একটি তাতার-সৈন্যদল এখান দিয়ে পথ চলছিল। তারা এখানে নতুন কিছু আশ্রিত পেয়ে তাদের ধ্বংস করে চলে গেল।

ধারাবাহিক এই ভয়ংকর গণহত্যার পর খোরাসানের অবস্থা এমন হয়েছিল যে, জায়গায় জায়গায় চোখে পড়ত শহিদদের লাশের টিলা। কর্তিত মস্তকের মিনার এত উঁচু হয়ে উঠেছিল যে, কয়েক মাইল দূর থেকে তা দেখা যেত। মির গোলাম মুহাম্মদ গোবার কাজি জুযজানির সূত্রে লিখেছেন—হেরাতের বস্তি ও গ্রামগুলোতে ২৪ লাখের মতো লোককে হত্যা করা হয়েছিল।[৪০৯]

---

[৪০৯] রওজা ৫/৩৭, আফগানিস্তান দর মাসিরে তারিখ ২২০, তারিখে নাহজতহায়ে মিল্লি ৫২২

বলখ, হেরাত ও উত্তর-পশ্চিম খোরাসানে তাতারদের হাতে মুসলিমদের এই গণহত্যা চলাকালে চেঙ্গিজ খান তালকানে অবস্থান করছিলেন। তখন তার কাছে সুলতান জালালুদ্দীনের পক্ষ থেকে পয়গাম পৌঁছল যে—আমি তোকে মোকাবেলার জন্য আহ্বান করছি। আমাকে বল, লড়াইয়ের জন্য কোন ময়দানটি তোর বেশি পছন্দ? আমি সেখানেই পৌঁছে যাব। স্বয়ং তুইও বেরিয়ে আয় ময়দানে।[৪১০]

সুলতান জালালুদ্দীনের ধমকি ও সাহসিকতাপূর্ণ এই আহ্বান বৃদ্ধ চেঙ্গিজ খানকে পেরেশান করে তুলবার জন্য যথেষ্ট ছিল। দীর্ঘ ধারাবাহিক যুদ্ধের পর এই প্রথমবার তিনি প্রয়োজন অনুভব করে উঠলেন বিক্ষিপ্ত সেনাশক্তি একত্র করে নিজে ময়দানে নামবেন।

চেঙ্গিজ খান দূরদূরান্তের সেনাশিবিরে বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থানরত সৈন্যদল ও সরদারদের অনতিবিলম্বে তার কাছে এসে হাজির হবার হুকুম পাঠালেন। সেই দিনগুলিতে সুবেদাই কর্তৃত্ব খাটাচ্ছিল ইউরোপের দোরগোড়ায়। জোচিকে শাস্তি প্রদান করে বাহিনী থেকে আলাদা করে দেওয়ার পর থেকে কাসপিয়ান সাগরের তীরবর্তী এক স্থানে অবস্থান করছিল সে। চেঙ্গিজ খান সুবেদাইয়ের কাছে হুকুমনামা পাঠালেন যে, জোচিকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত আমার কাছে এসে পৌঁছো।[৪১১]

তখন বসন্তকাল। চেঙ্গিজ খানের তাঁবুতে এসে জড়ো হয়ে গেল উচ্চপদস্থ সকল সেনা-অফিসার। কায়েম হল পরামর্শসভা। অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি সুলতান জালালুদ্দীনের সাথে মোকাবেলা করার হেকমতপূর্ণ কর্মপন্থা কেমন হতে পারে, সেই নিয়ে চিন্তাভাবনা চলতে লাগল। পরামর্শের পর চেঙ্গিজ খান খুব দৃঢ় মনে সম্পন্ন করে ফেললেন সুলতানের বিরুদ্ধে বাহিনী প্রেরণের ব্যবস্থাপনা।

কাবুলের দিকে সুলতানের অগ্রযাত্রা : পারওয়ানে অবস্থান

সুলতান জালালুদ্দীন এই শীতকালটা গজনির সবুজ-শ্যামল ময়দানি এলাকায় কাটালেন। এর ভেতর তিনি আগত চূড়ান্ত যুদ্ধের ভরপুর প্রস্তুতিও সম্পন্ন করছিলেন। তার বিশ্বাস ছিল—এখন চেঙ্গিজ খানের সাথে জীবন-মৃত্যুর সর্বশেষ যুদ্ধে লড়বার সময় খুব কাছে এসে গেছে। তিনি এই সংবাদও পেয়েছিলেন—চতুর্দিক থেকে ঘটা করে তাতার-সৈন্যরা চেঙ্গিজ খানের কাছে গিয়ে জড়ো হচ্ছে।

কয়েক সপ্তাহে গজনিতে সেনাবাহিনীকে অধিক সহনশীল ও শক্তিমান করে তুলে বসন্তকালের শুরুর দিকে তাদেরকে কাবুলের দিকে যাত্রা করতে আদেশ দিলেন সুলতান। তিনি চাচ্ছিলেন, চেঙ্গিজের বাহিনীকে কাবুল ও তার আশপাশের

---

[৪১০] ইবনুল আসির ৭/৫৯৩, ইবনে কাসির ৭/১০৭

[৪১১] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১৯, পৃষ্ঠা ১৪৮

ঘনবসতিপূর্ণ বালুকাময় এলাকাগুলোতে কোনোভাবেই রাজত্ব করবার সুযোগ দেওয়া যাবে না। নিজেরা সামনে বেড়ে শত্রুর অগ্রযাত্রা তাদের বর্তমান কবজাকৃত এলাকাতেই রুখে দিতে হবে।

এর মধ্যেই চেঙ্গিজ খান তালকান থেকে যুদ্ধযাত্রা করে বশীভূত করে ফেললেন গরাজওয়ান দুর্গ; এবং তিনি পৌঁছে গেলেন বামিয়ান পর্যন্ত। সুলতান জালালুদ্দীন কাবুলের উপকণ্ঠে থেকেই চেঙ্গিজ খানের নেতৃত্বে বামিয়ানে জড়ো-হওয়া তাতার-বাহিনীর উপরও দৃষ্টি রাখতে পারতেন। কিন্তু কাবুল শহরকে অবস্থানস্থল না-বানিয়ে সামনে বেড়ে তিনি পারওয়ান জেলায় গিয়ে ছাউনি ফেললেন। কিছুদিনের জন্য পারওয়ানই হয়ে উঠল সুলতানের জিহাদি কর্মকাণ্ডের অস্থায়ী কেন্দ্র।[৪১২]

ওয়ালিয়ান দুর্গের যুদ্ধ

সুলতানের মোকাবেলায় অগ্রসরমান তাতার-বাহিনীর যুদ্ধযাত্রার পূর্বে তাদের আরও একটি দল পারওয়ান ও বামিয়ানের মাঝখানে অবস্থিত ওয়ালিয়ান দুর্গে এসে আক্রমণ করেছিল। সুলতান জালালুদ্দীন যেইমাত্র এই সংবাদ পেলেন অমনি বাহিনীর একাংশকে স্বীয় কমান্ডে নিয়ে ওয়ালিয়ান দুর্গের দিকে রওনা হয়ে গেলেন। ওয়ালিয়ান দুর্গের নিরাপত্তারক্ষীদের প্রতিরোধ-শক্তি ছিল দুর্দান্ত। তাতার-দলটির নেতৃত্ব ছিল তুকজুক ও মালগুর নামের দুই সরদারের হাতে। এই দুই সরদার শক্ত প্রস্তুতি নিয়ে দুর্গের উপরে এসে হামলে পড়েছিল। এদের দুর্গ জয় করে ফেলবার কাছাকাছি মুহূর্তে অকস্মাৎ সুলতানের বাহিনী ধূলিঝড় উড়িয়ে তাকবিরধ্বনি দিতে দিতে সরসারি যুদ্ধক্ষেত্রে এসে ঢুকল। তুকজুক ও মালগুর সুলতানের বাহিনীকে দেখতে পাওয়ামাত্র নিজেদের বাহিনীকে পিছু হটতে আদেশ দিল। কারণ, এর আগেই যে রক্তে-মাটিতে মাখামাখি হয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছিল এক হাজার তাতার! সুলতান জালালুদ্দীনও পলায়নপর তাতারদের পেছনে ধাওয়া জারি রাখলেন।

পথিমধ্যে একটি নদী ছিল। তাতার-বাহিনী ব্রিজের মাধ্যমে নদী পেরিয়ে ওপারে পৌঁছেই ব্রিজটা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল। নদীর এ-পারেই থেমে গেল সুলতানের বাহিনী। দুইদিক থেকে দুপক্ষের সৈন্যরা নিশানাবাজির ঘাঁটি গড়ে তুলল। নদীর উপর দিয়ে সাঁ সাঁ করে শুরু হয়ে গেল তিরের ঝড়। রাত গভীর হয়ে-ওঠা পর্যন্ত তিরের এই যুদ্ধ চলমান ছিল। মাঝরাত্তিরে তাতাররা চুপচাপ নিজেদের ঘাঁটি ছেড়ে পালিয়ে গেল। সুলতান তাদের পেছনে আর ধাওয়া করা অনর্থক ভেবে অসংখ্য গনিমতের মাল লাভ করে পারওয়ানের উদ্দেশে রওনা দিলেন।

মরুরাতের অন্ধকারে গা-ছমছমে নীরবতার ভেতর দিয়ে ছুটে চলেছে মুসলিমবাহিনীর ঘোড়া। অদ্ভুত ঝিরঝিরে কোমল বাতাস এসে ছুঁয়ে যাচ্ছে গা। মাঝ-

---

[৪১২] জাহাঁকুশা ২/১৩৫-১৩৬

আকাশে ফুটে আছে অজস্র ঝকঝকে নক্ষত্র। বাহিনী পারওয়ানে এসে পৌঁছল। সুলতান পরবর্তী যুদ্ধের জন্য সর্বদিক পর্যবেক্ষণ করে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। ওয়ালিয়ান দুর্গে সুলতানের সফল আক্রমণের ফলে তাতার-বাহিনী এতটা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল যে, তাদের যে একটি খণ্ডদল তাখারের ওলখ দুর্গ ঘেরাও করে রেখেছিল, তারাও অবরোধ ভেঙে দিগ্বিদিক ছুটে পালাল।[৪১৩]

তুলি খানের যাত্রা

সুলতান জালালুদ্দীনের চ্যালেঞ্জের জবাবে উচিত ছিল মোকাবেলার জন্য স্বয়ং চেঙ্গিজ খানের বেরিয়ে আসা। কিন্তু এই চতুর ও প্রবঞ্চক বিশ্ববিজেতা খুব সতর্কতার সাথে সব কাজ গোছালেন। অত্যধিক সৈন্য ও যুদ্ধ-মাধ্যম থাকা সত্ত্বেও নিজ সফলতার প্রতি তার তখন আত্মবিশ্বাস হারিয়ে গিয়েছিল। ভয়ের আঘাতে ধসে গিয়েছিল তার দম্ভ ও ধোঁকাবাজির প্রাসাদ। স্বীয় বাহিনীর উপর থেকে ক্রমে ক্রমে উঠে যাচ্ছিল নির্ভরতা। ফলে, নিজে রণক্ষেত্রে নামার বদলে তার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পুত্র তুলি খানের হাতে বাহিনীর অধিকাংশ সৈনিক প্রদান করে জালালুদ্দীনের মোকাবেলায় পাঠালেন।[৪১৪]

বাকি সৈন্যদের নিয়ে বামিয়ান অবরোধে ব্যস্ত রইলেন তিনি।[৪১৫] সুলতান জালালুদ্দীনের পারওয়ানে পৌঁছার এক সপ্তাহ পরে তুলি খানের নেতৃত্বে তাতারদের বিশাল বাহিনীটি প্রচণ্ড সয়লাবের মতো পারওয়ান সীমান্তে এসে ঢুকল।[৪১৬] এই বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা এত অধিক ছিল যে, তখন সর্বদিক থেকে শুধু কালো-কালো মাথা আর মাথাই দেখা যাচ্ছিল। যেন-বা আকাশে উড়ে যাচ্ছে জলদগম্ভীর মেঘেদের ঝাঁক। তাতারদের বিজিত অঞ্চলের বন্দিদের একটা বড় সংখ্যাও এই বাহিনীতে শামিল ছিল। এই মজলুমদের থেকে বাধ্যতামূলকভাবে কষ্টকর কাজ নেওয়া হচ্ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে এদেরকে ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদের সৈন্যসংখ্যা অধিকতর দেখিয়ে প্রতিপক্ষকে সন্ত্রস্ত ও বিমূঢ় করে তোলা হতো।[৪১৭]

ইসলামি বাহিনীর কাতারবন্দি

তাতারদের আগমনের সংবাদ পেয়ে পারওয়ানের প্রাণকেন্দ্র চাহারয়েকার-এর উত্তর-পূর্বের দিকে যাত্রা করলেন সুলতান জালালুদ্দীন।[৪১৮] এক ফারসাখ (৩

---

[৪১৩] জাহাঁকুশা ২/১৩৬

[৪১৪] ইবনু খালদুন ৫/১১৮, ইবনুল আসির ৭/৫৯৩, শাযারাতুয যাহাব ৫/৭৮

[৪১৫] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১৯, পৃষ্ঠা ১৪৯

[৪১৬] জাহাঁকুশা ২/১৩৭

[৪১৭] ইবনুল আসির ৫৯৩, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৭/১০৭

[৪১৮] ইসলামি এনসাইক্লোপিডিয়া ৭১৭

মাইল) দূরত্ব অতিক্রম করবার পর একটি প্রশস্ত ময়দানে সৈন্যদেরকে সারিবদ্ধ করতে লাগলেন তিনি।[৪১৯]

ততক্ষণে পুবাকাশে সূর্য উঠে গিয়েছিল। সূর্যের সোনালি কিরণ কালের সেই সংকল্পবদ্ধ মুজাহিদের কপালে এসে চুমু খাচ্ছিল, যিনি এশিয়া থেকে আরম্ভ করে আফ্রিকা পর্যন্ত সমস্ত মুসলিমের জন্য একটি 'প্রতিরক্ষা-দুর্গ' গড়ে তুলেছিলেন। সেদিন ইসলামের মুজাহিদদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১ লাখ। অতীতের সমস্ত পরাজয়ের বদলা নিতে একসঙ্গে তারা জেগে উঠেছিল। তারা মুসলিমদের একেকটি রক্তবিন্দুর হিসেব নিতে চাচ্ছিল। তাদের চেহারায় কোনো রকম ভয় কিংবা হতাশার নামনিশানা পর্যন্ত ছিল না।

সুলতান জালালুদ্দীন বিশেষ সেনা অফিসারদের নিয়ে ঘুরে-ঘুরে সারিবদ্ধ বাহিনীকে খানিকক্ষণ পর্যবেক্ষণ করলেন। সংকল্পে তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠা তার দৃষ্টি সেদিন মুজাহিদদের উচ্চাশা ও সাহসিকতা বাড়িয়ে তুলবার জন্য যথেষ্ট ছিল। বাহিনীর ডান বাহুতে আমান মালিক ও বাম বাহুতে সাইফুদ্দীন আগরাককে নিযুক্ত করে সুলতান নিজে সারিবদ্ধ সৈনিকদের সেন্টারে চলে এলেন।

সূর্য যখন অনেকটা উপরে উঠে গেল, সোনালি কিরণে মুজাহিদদের ধাতুনির্মিত তরবারি ও লৌহবর্ম আয়নার মতো চমকাতে লাগল। তাতার-বাহিনী উদ্দাম বেগে ধূলিঝড় তুলে ময়দানের অপর প্রান্তে এসে পৌঁছাল।[৪২০] দুশমনকে সামনে দেখে মুসলিম জানবাজদের তরবারি ধারণকৃত হাতের মুঠো আরও শক্ত হয়ে ওঠে। জজবায় আসে মাতাল ঢেউ। রণসঙ্গীত ও জিহাদের গীতিবাক্যে গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে তাদের যুদ্ধসারি। নারায়ে তাকবিরধ্বনিতে কেঁপে উঠতে থাকে আশপাশের পাহাড় ও ময়দান।

সুলতানের হেকমতপূর্ণ বিস্ময়কর পদক্ষেপ

যুদ্ধক্ষেত্রের প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা ও অবস্থানস্থলের প্রতি দৃষ্টি রেখে, সিপাহিদের মন থেকে ময়দান ছেড়ে পালাবার সাধারণ থেকে অতি সাধারণ ওয়াসওয়াসা দূর করতে এবং শাহাদাতের জন্য পুরোপুরি তাদের প্রস্তুত করে তুলতে সুলতান হুকুম দিলেন—সমস্ত সিপাহি ঘোড়া থেকে নেমে পড়ো। পায়ে হেঁটে যাও এবং পুরো অবিচলতার সঙ্গে লড়তে থাকো।[৪২১]

চেঙ্গিজ খানের সেনা-অফিসাররা স্তম্ভিত হয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে মুসলিম সৈনিকদের নেমে যাওয়া দেখছিল। তারাও আক্রমণের জন্য পুরোপুরিভাবে তৈরি ছিল।

---

[৪১৯] জাহাঁকুশা ২/১৩৭

[৪২০] জাহাঁকুশা ২/১৩৭

[৪২১] জাহাঁকুশা ২/১৩৭

দ্রিকদ্রিক করে যুদ্ধের ঢোলক বেজে উঠতেই দু-দিক থেকে দুইপক্ষ ছুটে গিয়ে বাধিয়ে তুলল লড়াই। তারপর সূর্য যতই ঊর্ধ্বে উঠছিল, ততই বাড়ছিল আক্রমণের প্রচণ্ডতা। যুদ্ধের অগ্নি দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হয়ে উঠতে দেখা গেল তখন, যখন সুলতান মাঝখানের সৈন্যদলটিকে নিজ কমান্ডে নিয়ে তাতার সেপাইদের মাঝে ঢুকে প্রাণঘাতী হামলা চালাতে লাগলেন। মুহূর্তের মধ্যে চিড়ে ফেললেন তাদের নিশ্ছিদ্র কাতার। এ-সময় চারশ মুসলিম ও কাফের একদম মুখোমুখি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। তলোয়ারগুলির ঘূর্ণনের মাঝে সর্বদিক থেকে হা করে দাঁড়িয়ে ছিল মৃত্যু। চতুর্দিকে ছিটকে পড়ছিল লাল রক্তের ছিটা। যেন-বা আকাশ থেকে বর্ষিত হচ্ছিল টকটকে রক্তবৃষ্টি।

যুদ্ধের নকশা

শাহাদাতের তামান্নায় জীবন বাজি লাগিয়ে লড়ে যাচ্ছিল মুসলমান। কাফেররা তাদের ঔদ্ধত্য, ধোঁকাবাজি ও চতুরতা নিয়ে ইসলামের শত্রুতার উপর ভিত্তি করে পুরো হিংস্রতার সাথে হামলা করে যাচ্ছিল। অশ্বারোহী দুশমনের সামনে পদাতিক মুজাহিদরা এমন অবিচলতার সঙ্গে লড়তে লাগল যে, তাদের যুদ্ধসারি পিছু হটিয়ে দিতে অক্ষম হল দুশমন। বিশেষত আমান মালিকের নেতৃত্বাধীন ইসলামি বাহিনীর ডান বাহুটি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে লড়াই করে যাচ্ছিল। এই দৃশ্য দেখে তুলি খান ১০ হাজার তাজাদম সেপাইকে এই ডান বাহুর দিকে পাঠিয়ে দিল। আদেশ দিল—আক্রমণ চালিয়ে মুসলিমদের ডান বাহুকে তাদের অবশিষ্ট সৈন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেল!

তাতারদের নতুন ও শক্ত এই আক্রমণের মুখে আমান মালিকের বাহিনীর পা হড়কে গেল। পিছু হটতে বাধ্য হল তার পদাতিক সিপাহিরা। মাঝখান থেকে সুলতান জালালুদ্দীন এই সুরতহাল দেখেই সেন্টারের নেতৃত্ব এক বিশ্বস্ত জেনারেলের হাতে অর্পণ করে স্বীয় জানবাজ রক্ষীবাহিনীকে নিয়ে ডান বাহুতে চলে গেলেন। সুলতান সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই আমান মালিকের বাহিনী জোরেশোরে ফের একবার জমে উঠল মোকাবেলায়। বিপুল বিক্রমে আক্রমণ চালিয়ে তাতার-বাহিনীকে পিছু হটতে বাধ্য করল। তাতাররা প্রবল আক্রমণের মুখে টিকতে না-পেরে পিছু হটতে হটতে একেবারে তাদের সেন্টারের সৈনিকদের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হল।[৪২২] ইসলামি বাহিনীর বাম বাহুতে নিযুক্ত আমির সাইফুদ্দীন আগরাকও অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে অবিচল রইলেন। এবং দিনব্যাপী লড়াইতে এদিকটায় কখনো তাতারদের প্রবল হয়ে উঠতে দিলেন না।

লড়াই চলাকালে বাহাদুরি, যুদ্ধাভিজ্ঞতা ও চালাকির যেন বাজার খুলে বসেছিলেন সাইফুদ্দীন আগরাক। তার তুর্ক খলজি বীরদের নিয়ে তিনি সম্মুখে বেড়ে

---

[৪২২] জাহাঁকুশা ২/১৩৭

বারবার দুশমনের উপর হামলা চালাচ্ছিলেন। তার এই কর্মকাণ্ড ডান বাহুর সৈনিকদের জন্যও ছিল অত্যন্ত সাহসোদ্দীপক। একবার সুলতানের অন্যান্য সেপাইকে পিছু হটতে দেখে সাইফুদ্দীন রেগে ওঠেন। বিকট চিৎকার করে বলেন—যাও, তোমরা পিছে হটো! দুশমনকে তোমরা ভয় পাচ্ছ![৪২৩]

পুরো প্রচণ্ডতার সাথে সন্ধ্যা নাগাদ জারি রইল যুদ্ধ। যখন সূর্য পশ্চিমের কালো পর্দায় মুখ লুকাল, দুইপক্ষ ময়দান থেকে পিছু হটে ধীরে-ধীরে নিজেদের ছাউনির দিকে চলে গেল। যুদ্ধক্ষেত্রে জায়গায় জায়গায় গড়ে উঠেছিল লাশের পিরামিড। মুসলিমরা তাদের শহিদদের খুঁজে খুঁজে জানাজার নামাজ ও কাফন-দাফনের জিম্মাদারি আঞ্জাম দিতে লাগল। রাতভর দুইদল আগামীকালের যুদ্ধের জন্য সঞ্চিত করতে লাগল নিজেদের শক্তি। রাতের শেষপ্রহরে গিয়ে তা আঞ্জাম দিয়ে উঠল।

তাতারদের প্রতারণা

যুদ্ধক্ষেত্রে বিভিন্ন ফেরবাবাজিতে তাতারদের হস্ত ছিল খুব প্রসারিত। এই যুদ্ধে তারা এক বিস্ময়কর চাল চেলে বসল। সারাদিনের লড়াইয়ে যে-সমস্ত তাতার মারা পড়েছিল, তাতাররা লাকড়িকাঠ ও কাপড় দিয়ে তাদের মূর্তি বানিয়ে ঘোড়ার হাওদায় সেগুলোকে স্থাপন করে দিল। হস্ত নির্মিত এই মৃত সৈন্যদেরকে বাহিনী থেকে খানিকটা দূরে দাঁড় করিয়ে রাখল।[৪২৪] পরদিন সকালে ফের একবার সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হল দুই পক্ষ। সুলতান জালালুদ্দীন বাহিনীর পর্যবেক্ষণে ব্যস্ত ছিলেন। তখন কয়েকজন উঁচুপদের সেনা অফিসার এসে তাকে জানাল—হুজুর, পেছন থেকে তাতারদের জন্য খুব বড় সংখ্যক সেনাসাহায্য আসছে!

সুলতান জালালুদ্দীন গভীর চোখে তাকালেন—দূরে দিগন্তরেখার কাছে একটি বাহিনীর আগমনের চিহ্ন চোখে পড়ছে। ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে হাজারও সওয়ারিকে ওই প্রশস্ত ময়দানের শেষদিকে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যাচ্ছে।

মূলত এগুলো ছিল তাতারদের হস্তনির্মিত সেইসব আরোহী, যেগুলোকে কাঠ ও কাপড় দিয়ে রাতারাতি তারা তৈরি করে ফেলেছিল। মাঝখানে অনেকটা ব্যবধানের কারণে দূর থেকে বাস্তব কোনো সৈন্যদল বলে মনে হচ্ছিল। সুলতানের সেনা-অফিসাররা তাকে পরামর্শ দিতে গিয়ে বলল—এই ময়দানে আমাদের বর্তমান সৈন্যসংখ্যা নিয়ে আমরা দৃঢ়ভাবে মোকাবেলা করতে পারব না। উত্তম হবে—এ সময় পিছপা হয়ে আমাদের পেছনে অবস্থিত সুউচ্চ পর্বতশ্রেণিতে গিয়ে ঘাঁটি গড়ে তুলি, সেখান থেকে তিরন্দাজি ও প্রস্তর নিক্ষেপের মাধ্যমে তাতার-বাহিনীকে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া থেকে ঠেকিয়ে রাখি।

---

[৪২৩] ইবনুল আসির ৭/৫৯৩

[৪২৪] জাহাঁকুশা ২/১৩৭

সুলতান জালালুদ্দীনের দৃঢ়তা ও স্থিরতা

বাহ্যত অফিসারদের এই পরামর্শ ছিল অত্যন্ত যুক্তিসিদ্ধ। কিন্তু সুলতান জালালুদ্দীনের মনে ছিল ইতমিনান ও প্রশান্তির সুকোমল ছায়ার বিস্তার। মনে হচ্ছিল তিনি একদম খোলা চোখে দেখতে পাচ্ছিলেন আল্লাহর সাহায্য অবতরণ। যথাসম্ভব তিনি তাতারদের চালও হয়তো বুঝে ফেলেছিলেন। তিনি সেনা-কর্মকর্তাদের অস্থিরতা ও দোদুল্যমানতার ভেতরে না-ফেলে খুবই স্থির কণ্ঠে বললেন—আমার অকাট্য আদেশ হচ্ছে, গতকালের মতো ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়ো এবং পদাতিকভাবে আরও একবার দুশমনের উপর হামলা করো।

সুলতানকে আপন সিদ্ধান্তে অটল দেখে অফিসারদের পক্ষে তার এই আদেশ থেকে সরে পড়া সম্ভব ছিল না। সিপাহিরা গড়ে তুলল পদাতিক যুদ্ধসারি। দুশমনের সৈন্যসংখ্যা কত, সেদিকে না তাকিয়ে সরাসরি তাদের উপর হামলা করে বসল।[৪২৫]

পালটাপালটি যুদ্ধ ও বিজয়

শুরু হয়ে গেল পালটাপালটি যুদ্ধ। দেহ থেকে উড়তে লাগল কল্লা। তাতাররা সামনে বেড়ে বেড়ে আক্রমণ করছিল। মুসলমানরাও পদাতিকভাবে অত্যন্ত বীরত্বের সাথে মোকাবেলা করে যাচ্ছিল। সাইফুদ্দীন আগরাকের চল্লিশ হাজার সৈনিক ধীরে-ধীরে দুশমনের জন্য ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠতে লাগল। শেষমেশ তাতারদের বাছাইকৃত বীরদের একটি প্রলয়ংকরী দল সাইফুদ্দীনের মোকাবেলায় লড়তে-থাকা তাদের যুদ্ধসারির সাহায্যে সেখানে পৌঁছে গেল। ফলে, ইসলামি বাহিনীর বামবাহু ও তাতারদের ডান বাহুর মাঝে বেধে উঠল ভয়ানক যুদ্ধ। তাতারদের আক্রমণ যদিও অনেক প্রচণ্ড ছিল; কিন্তু তুর্কি সৈনিকেরা তাদের সামনে এমন জোরদার তিরবৃষ্টি বর্ষণ করল, মুহূর্তের মধ্যে মুখ ঘুরিয়ে পিছে হটতে বাধ্য হল দুশমন। সঙ্গে সঙ্গে সুলতান জালালুদ্দীন মাঝখানের সেনাদের কমান্ড করতে করতে এসে তাতারদের মূল বাহিনীর উপর ভীষণ জোরদার আক্রমণ করলেন। তাদের পা হড়কে গেল অনেক পেছনে। ময়দান ছেড়ে দিকশূন্য হয়ে পালাতে লাগল তারা।

সুলতান জালালুদ্দীন দুশমনকে জীবিত ফিরে যাওয়ার সুযোগ করে দেবার পক্ষে ছিলেন না। তার ইশারায় দ্রিগদ্রিগ করে যুদ্ধের দামামা পেটানো শুরু হয়ে গেল। সৈন্যদের তিনি হুকুম দিলেন—শিগগির ঘোড়ায় চেপে দুশমনকে ধাওয়া করো।

তার এই আদেশের সঙ্গে সঙ্গে চোখের পলকে ইসলামের বীর যোদ্ধারা বিজলির গতিতে তাজাদম ঘোড়ায় চড়ে হয়ে দুশমনের পেছন-পেছন ছুট লাগাল। ইসলামি বাহিনীর চোখের সামনে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মতো পলায়নপর তাতার-সেনারা সামনের একটি ময়দানে পৌঁছে একত্র হয়ে উঠল। মুসলিম যোদ্ধারা সেখানে পৌঁছতেই ফের একবার নতুন উদ্দীপনায় নতুন সংকল্পে বেধে গেল যুদ্ধ।

---

[৪২৫] জাহাঁকুশা ২/১৩৭-১৩৮, তারিখে খাওয়ারিজম শাহি ১৪৩-১৪৪, রওজাতুস সফা ৪/৮২৭

মনে হচ্ছিল—তাতার-বাহিনী যেন কোনো-একটা চাল চেলে ইসলামি বাহিনীকে এখানে নিয়ে এসেছে। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের প্রবল হামলার পরে তাতাররা অনুভব করে ওঠে যে, এখানে থেমে পড়ে তারা নিজেদের মৃত্যু ডেকে এনেছে।

সুলতানের বাহিনীর জবরদস্ত আক্রমণ তাদের ফালা-ফালা করে দিচ্ছিল। শেষমেশ তাতার-বাহিনী ফের একবার পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে ভাগতে আরম্ভ করল। মুসলিমবাহিনীও তাদের পিছে-পিছে জারি রাখল ধাওয়া। ছুটন্ত তাতারদের অধিকাংশকেই মৃত্যুঘাটে নিপতিত করল মুজাহিদদের ক্ষিপ্র তলোয়ার।

সুলতানের কাতেব শিহাবুদ্দীন নাসাবি, আল্লামা ইবনে খালদুন ও হাফেজ যাহাবি রহিমাহুমুল্লাহর বর্ণনামতে—এই ধ্বংসপ্রাপ্তদের ভেতর চেঙ্গিজ খানের পুত্র তুলি খানও ছিল।[৪২৬]

من عهد عاد كان لنا معروفا، اسر الملوك وقتلها وقتالها

রাজা-বাদশাহদের বন্দি করা, হত্যা করা, তাদের সঙ্গে মোকাবেলায় মেতে ওঠা আমাদের প্রসিদ্ধ অভ্যাস।

শিহাবুদ্দীন নাসাবি এই শানদার বিজয়ের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে লিখেছেন—সুলতান সুদৃঢ় জিহাদি সংকল্প ও সমুন্নত হিম্মতের সাথে তুলি খানের মোকাবেলা করেন। দুপক্ষ যখন সামনা-সামনি হয়, সুলতান নিজেই দুশমনের প্রধান শক্তির উপরে গিয়ে হামলা করে বসেন এবং তাদেরকে বিক্ষিপ্ত করে ফেলেন। ঘোড়ার খুড়ের নিচে ফেলে তাদের বিজয়-পতাকা ছিন্নভিন্ন করে দেন। তাদেরকে হাতিয়ার ফেলে পালাতে বাধ্য করেন। সেদিন প্রতিশোধের নেশায় মাতাল হয়ে-ওঠা তরবারিগুলো ক্রমাগত দুশমনের কল্লা উড়িয়ে দিচ্ছিল।

মুসলিমরা সেদিন জান্তব তাতারদের থেকে তাদের অত্যাচারের কী-রকম বদলা নিয়েছিল, তা রয়েছে নাসাবির বর্ণনায়। তিনি লিখেছেন, তাতারদের একটা বড় সংখ্যা সেদিন বন্দি হয়েছিল। মুসলিমবাহিনীর তাঁবু গাড়ার শ্রমিকরাও নিজেদের ক্রোধ মেটাতে এই বন্দি তাতারদের উপর ফেটে পড়ছিল। তাতারদের কানে তারা পেরেক ঠুকছিল যাতে শীতল করতে পারে প্রতিশোধের আগুন।

মনে রাখতে হবে—ইতিহাসে তাতার-সৈনিকরা সর্বপ্রথম এই যুদ্ধেই মুসলিমদের হাতে বন্দি হয়েছিল। কিন্তু এর পূর্বে প্রবাদের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল যে, তাতাররা লড়তে লড়তে মরে যায়; কিন্তু তাদের কেউ কখনও গ্রেফতার হয় না। তাতার-বাহিনী মুসলিম কয়েদিদের একটা বড় অংশকেও তাদের সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। বিজয়ের পর মুজাহিদরা সেই কয়েদিদের মুক্ত করে দিলেন।[৪২৭]

---

[৪২৬] ইবনে খালদুন ৫/১২০, সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন ১৫৪, সিয়ারু আলামিন নুবালা ২২/৩২৮, অবশ্য হ্যারল্ড ল্যাম্বের মতে তুলি খান এ যুদ্ধে শরিক ছিল না; সে হেরাত চলে গিয়েছিল। অন্যান্য আলামত অনুযায়ী এটাই সঠিক। দেখুন : চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ২০, পৃষ্ঠা ১৪৯, আজিজ আহমাদ অনুদিত।

[৪২৭] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৭/১০৭, ইবনুল আসির ৫/৫৯৩

বামিয়ান যুদ্ধ

চেঙ্গিজ খান দীর্ঘসময় ধরে 'বাবা' পর্বতশ্রেণির ভেতর প্রতিষ্ঠিত শক্ত প্রাচীর-ঘেরা বামিয়ান শহর অবরোধ করেছিলেন। কিন্তু তার উপর্যুপরি আক্রমণের পরও শহরবাসী তাদের সংঘর্ষ থামায়নি। কিছুদিন পর সুলতান জালালুদ্দীনের হাতে পারওয়ানে তাতারদের পরাজিত বাহিনীর সরদার ও সৈন্যরা চেঙ্গিজ খানের কাছে গিয়ে পৌঁছে। তাকে তাতার-বাহিনীর পরাজয় ও তুলি খানের মৃত্যুর খবর শোনায়। চেঙ্গিজ খানের জীবনে এর চেয়ে অধিক পীড়াদায়ক ও কঠিন মুহূর্ত হয়তো কখনো আসেনি। লক্ষ লক্ষ আল্লাহর বান্দার কোল থেকে তাদের সন্তানদের ছিনিয়ে-নেওয়া এই জালেম সেদিন আপন পুত্র-বিয়োগের নিদারুণ ক্ষত সইতে বাধ্য হয়ে উঠলেন। তার মনে এই জখম সৃষ্টি করেছিলেন তার সবচেয়ে বড় শত্রু সুলতান জালালুদ্দীন।

চেঙ্গিজ খান অত্যন্ত ক্রোধে নতুন বাহিনী নিয়ে বামিয়ানে এসে আক্রমণ করলেন। সুলতান জালালুদ্দীনের সাথে জীবন কিংবা মৃত্যুর শেষ খেলাটি খেলবার পূর্বে অস্ত্রসজ্জিত এ শহরটি তিনি তার প্রতিরোধ থেকে পিছ-ছাড়া করতে চাচ্ছিলেন। অবরুদ্ধ মুসলিমরা এই এলাকা থেকে বড় বড় সব পাথর আগেই নিয়ে গায়েব করে ফেলেছিল, তাতাররা যাতে সেগুলো তাদের আগ্নেয়াস্ত্রে ব্যবহার করতে না পারে। চেঙ্গিজ খানের আদেশে প্রাচীরের সামনে মিনার দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। তাতাররা সেই মিনারে উঠে প্রাচীরের উপর দণ্ডায়মান বামিয়ানের প্রতিরক্ষাবাহিনীর সাথে মোকাবেলা করতে লাগল। তাদের এই আক্রমণের জবাবে শহরবাসী জায়গায় জায়গায় অগ্নিময় ধাতু নিক্ষেপ করে লাকড়িকাঠ দিয়ে নির্মিত তাতারদের মিনারগুলোতে আগুন লাগিয়ে দিল। এই অগ্নি-হামলা প্রতিরোধ করতে তাতাররা দ্রুত তাদের মহিষগুলো জবাই করে ফেলল। সেগুলোর আর্দ্র চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে রোদে শুকোতে দেওয়ার মতো করে মিনারের উপর ছড়িয়ে দিল। এভাবে সেগুলোকে সংরক্ষণ করল অগ্নিদাহ থেকে।

নতুন সিপাহিদের নিয়ে সংঘটিত এই যুদ্ধ চলমান ছিল আপন গতিতে। হঠাৎ চেঙ্গিজ খান 'আখেরি হামলা'র আদেশ দিলেন। উদ্দেশ্য ছিল—দুর্গ বিজয়ের আগ পর্যন্ত প্রচণ্ড আক্রমণ জারি রাখতে হবে।

তাতার-বাহিনী সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে শহরের উপর হামলা করে দিল। প্রাচীরের উপর থেকে বর্ষিত পাথর ও তিরবৃষ্টির ভেতরেও তারা জারি রাখল আক্রমণ। এর মধ্যে চেঙ্গিজ খানের এক নাতি, যে ছিল তার আদরের সর্বশেষ দুলাল, মুসলিমদের তিরন্দাজ-বাহিনীর আক্রমণে মারা পড়ল। চেঙ্গিজ খানের হিংস্রতা যেন ছুঁয়ে ফেলতে লাগল উন্মত্ততার শেষসীমা। তিনি নাতির লাশ তার তাঁবুর ভেতর নিয়ে আসতে বললেন। প্রবল ক্রোধে মাথা থেকে শিরস্ত্রাণ নামিয়ে দূরে ছুড়ে মারলেন। তার চোখদুটো হয়ে উঠল আগুন-জ্বলা কয়লার দুটো টুকরো। মনের দেয়ালে অনেক বেশি চোট লাগল। সবেগে সিপাহিদের কাতার ভেদ করে তিনি সেই বাহিনীর কাছে গিয়ে পৌঁছলেন, যারা পুরোদমে শহরের প্রাচীরের ভেতর ঢুকতে চেষ্টা করছিল। চেঙ্গিজ

খানকে নিজেদের মাঝে পেয়ে তাদের জোশ তখন সর্বোচ্চে ওঠে। তারা প্রাচীরের মধ্যে একটি বড় ছিদ্র করে সেখানে কদম জমিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়। তারপর বামিয়ানের সাহসী সৈনিকদের জবরদস্ত সংঘর্ষের পরও শহরে ঢুকে পড়ে তাতারদের সয়লাব।

ক্রোধে পাগল হয়ে-যাওয়া চেঙ্গিজ খান আদেশ দেন—'শহরের কোনো মানুষ দূরের কথা, জানদার একটা প্রাণীও তোরা জীবিত ছাড়িস না। সমস্ত প্রাসাদ-ভবন চূর্ণবিচূর্ণ করে দে।' আদেশ বাস্তবায়িত হল। শহরের সমস্ত লোককে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে শহিদ করে ফেলা হল। কুকুর-বেড়াল ও ইঁদুর-ছুঁচো পর্যন্ত খুঁজে খুঁজে মেরে ফেলা হল। ছুরি দিয়ে টেনে টেনে চিড়ে ফেলা হল মৃত নারীদের পেট। কোনো লাশের ভেতর থেকে বাচ্চা বেরোলে কোপ দিয়ে সেই অপুষ্ট বাচ্চার দেহ থেকেও বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হতে লাগল মাথা।

মানুষ ও পশুপ্রাণী খতম করার পরে এল উদ্ভিদ ও মাল-সামানার পালা। তাতাররা সমস্ত বৃক্ষ ও চারাগাছ উপড়ে ফেলল। প্রাসাদগুলো ধসিয়ে দিল ধুলোয়। মোটকথা, তাতাররা যখন বামিয়ানে যুদ্ধ করছিল, সেখানে তখন খড়কুটো ও ছাইভস্মের স্তূপ ছাড়া কিছু অবশিষ্ট থাকেনি। বামিয়ানের মুজাহিদরা দীর্ঘ সময় লড়াই চালিয়ে তাতারদেরও বিরাট ক্ষয়ক্ষতি সাধন করেছিল। আর সেই সময়টাতেই চেঙ্গিজ খানের কাছে এসেছিল তার বাহিনীর পরাজয় ও তুলি খানের মৃত্যুর সংবাদ। চেঙ্গিজ খানের নাতিও ধ্বংস হয়েছিল এই শহরের প্রাচীরের সামনে। এইসব আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে তাতাররা এ শহরকে মওবালিগ ও শহরে গম বা আঘাতপ্রাপ্তির শহর বলে ডাকতে শুরু করেছিল।[৪২৮]

কিছু জরুরি আলোচনা

সে-সময় জিহাদভূমি আফগানিস্তানকে বর্তমানের এই 'আফগানিস্তান' নামে ডাকা হতো না। এর অধিকাংশকেই বলা হতো খোরাসান। এই এলাকা সিন্ধুনদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, যেখানটায় এসে পাঠান জনগোষ্ঠীর বসবাস থেমে গিয়েছিল, সেখান পর্যন্ত। তারপর সিন্ধুনদের পার থেকেই শুরু হয়ে যেত হিন্দুস্থান। এই এলাকাকে ইতিহাসে সর্বপ্রথম আফগানিস্তান নাম দেওয়া হয়েছিল আহমাদ শাহ আবদালির যুগে। আফগানিস্তানের বর্তমান সীমানা-প্রাচীর আমির আবদুর রহমানের যুগে ইংরেজদের সাথে একটি চুক্তির ভিত্তিতে টানা হয়েছিল। এ-কারণে ড্যুরান্ড লাইনের এদিককার অঞ্চলটা আফগানিস্তান থেকে বেরিয়ে গেছে।

প্রিয় পাঠক, এটা মাথায় রাখবেন যে, আমাদের এ দাস্তানের ভেতর যেখানে পূর্ব, দক্ষিণ কিংবা উত্তর খোরাসানের কথা বলা হয়েছে, সেখানে আফগানিস্তান এলাকা উদ্দেশ্য।

---

[৪২৮] রওজাতুস সফা ৮২৭-৮২৮, চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ২০, পৃষ্ঠা ১৫০

এক আচানক বিজয় অথবা বিজয়ের ধারা

সুলতান জালালুদ্দীন যবে থেকে উম্মাহর এইসব চেতনাসম্পন্ন ও সম্ভ্রমশীল সৈনিককে ঐক্যবদ্ধ করে দুশমনের মোকাবেলায় নেমেছিলেন, তখন থেকেই পালটে গিয়েছিল অবস্থার গতিবিধি। আফগান জনসাধারণ ও সুলতানের সামনে তাতারদেরকে প্রচণ্ড সংঘর্ষ ও গ্লানিকর পরাজয়ের মুখোমুখি হতে হচ্ছিল। সুলতান মাত্র এক বছরের ভেতর যেসব যুদ্ধে তাতারদের পরাজিত করেছিলেন, তার সংখ্যা ৭ এর কম হবে না। কান্দাহার, গজনি, ওয়ালিয়ান ও পারওয়ান যুদ্ধে সুলতানের শানদার বিজয়ের আলাপন এইমাত্র আপনারা পড়েছেন। এগুলো ছাড়া আরও কিছু যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ হস্তগত হয়নি। তবে প্রমাণের জন্য প্রখ্যাত ঐতিহাসিক হামদুল্লাহ মুস্তাওফা কাজবিনির সাক্ষ্যই যথেষ্ট বোধকরি। তিনি তার তারিখে গুজিদাহয় (যেটি সুলতান জালালুদ্দীনের এক শতাব্দী পরে ৭৩০ হিজরিতে সে-সময়কার সমস্ত ইতিহাসগ্রন্থ গভীরভাবে অধ্যয়নের পর লেখা হয়েছিল) লিখেছেন—এ বছর, ৬১৭/৬১৮ হিজরিতে, সুলতান জালালুদ্দীন ও তাতার-বাহিনীর মাঝে সাতটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। প্রতিবার জয় লাভ করেছিলেন সুলতান জালালুদ্দীন।

অত্যন্ত আফসোসের সাথে বলতে হচ্ছে—কিছু ঐতিহাসিক, (বিশেষত নিকট যুগের কিছু লোক, যারা নিজেদের মুহাক্কিক মনে করেন) এই বিজয়গুলোর প্রতি একটি উড়ো দৃষ্টিও দেননি। নিজেদের দৃষ্টির সীমাবদ্ধতার দরুন শুধু দুয়েকটা বিজয়ের উল্লেখ করেই সুলতান জালালুদ্দীনের পক্ষ থেকে নিজেদের উপর আরোপিত হক আদায় করতে চান।

কেউ শুধুই গজনির যুদ্ধের কথা উল্লেখ করেছেন। কেউ পারওয়ান যুদ্ধের সফলতার কথা উল্লেখ করাকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। অর্থাৎ, হজরতগণ তো গজনি ও পারওয়ান যুদ্ধের ভাসা-ভাসা অবস্থার বর্ণনা দেওয়ার পর বাস্তবতা ও স্পষ্টতা-বিরোধী এই কথাও বলে দিয়েছেন যে, 'এই একটা বিজয়ই মুসলিমদের সেই ধারাবাহিক যুদ্ধগুলিতে অর্জিত হয়েছিল।'

কিছু লেখক আলোকপাত করেছেন, 'এটাই ছিল প্রথম এবং শেষবার, যেখানে তাতারদের পরাজয় ঘটেছিল।'

তারপর এই একটি বিজয়েও দুর্ঘটনাক্রমে সফলতা এসে গেছে বলে তারা উল্লেখ করেছে। মুসলিম সৈনিকদের কোরবানির কথা না-লিখে তাতারদের সংখ্যা-স্বল্পতা ও তাদের সেনাপতির ভুল ধারণার মতো বাস্তবতা-পরিপন্থি বিষয়াবলিকে এই সফলতার কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। এভাবে এই মহা বিজয়ের ওজন কমাতে চেষ্টা করেছেন। পূর্বের পাতাগুলোতে যে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে, সেখান থেকে এটা খুব স্পষ্টভাবে সামনে চলে আসে যে, সুলতানের এই বিজয়গুলো সহসা

দুর্ঘটনার মতো ঘটে যাওয়া কিছু নয়। প্রত্যেকটি যুদ্ধ যখন বেধে উঠছিল, তাতারদের শক্ত-সমর্থ বাহিনী নিজেদের সমস্ত শক্তি ও গভীর পরিকল্পনা খাটিয়ে মোকাবেলায় নামছিল এবং পরাজয় খেয়েছিল প্রতিবার।

মার্কিন ঐতিহাসিকের ভুল বিবরণ

এখানে একথাও উল্লেখযোগ্য যে, হ্যারল্ড ল্যাম্ব তার চেঙ্গিজ খান গ্রন্থে এই যুদ্ধক্ষেত্রগুলোতে তাতার-বাহিনীর মোকাবেলায় যে মুসলমানরা নেমেছিল, তাদের সংখ্যা দশগুণ বেশি ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। তার লেখার দুটো উদ্ধৃতি নিম্নে প্রদত্ত হল :

১. সুলতান মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহের মৃত্যু ও তার দুই শাহজাদার শাহাদাতের পর মুসলিম জনসাধারণ তাদের নেতা, ইরানি শাহজাদা ও সরদারদের পতাকাতলে যুদ্ধের জন্য জমায়েত হচ্ছিল। এই খবর চেঙ্গিজ খানের জানা ছিল। তিনি জানতেন এবার আসল শক্তিপরীক্ষার সময় কাছে এসে গেছে। কারণ, ১০ লক্ষ অস্ত্রসজ্জিত অশ্বারোহী অপেক্ষায় ছিল তার মোকাবেলায় যুদ্ধযাত্রায় বেরোবার।

২. আগ্রাসনের এই দ্বিতীয় বছরে তাতার-বাহিনীর সংখ্যা ১২টি তাওমানের বেশি ছিল না। অর্থাৎ তারা ১ লাখের কিছু বেশি ছিল।[৪২৯]

উপর্যুক্ত দুটো উদ্ধৃতি থেকে মনে হয় মুসলিমবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল ১০ লাখ আর তাতারদের ছিল ১ লাখের চেয়ে কিছু বেশি। অর্থাৎ, হ্যারল্ড ল্যাম্বের স্পষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা বলা যে, তখন মুসলিমদের শক্তি তাতারদের তুলনায় প্রায় দশ গুণ বেশি ছিল। তার এই বর্ণনা স্পষ্ট ভুল। প্রথমেই প্রমাণ করা হয়েছে যে, আগ্রাসনের শুরুর দিকেই তাতার-বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ৮ লাখের কম ছিল না।[৪৩০] আগ্রাসনের দ্বিতীয় বছর নাগাদ তাতারদের জন্যসংখ্যা যেহেতু পৃথিবীর দূরদূরান্তের এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিল, এবং তাদের অনেক লোক মারাও গিয়েছিল, এজন্য এটা তো অস্বীকার করা হচ্ছে না যে, চেঙ্গিজ খানের মূল কমান্ডে (বাহিনীর সেন্টারে) সিপাহিদের সংখ্যা ছিল কম। কিন্তু এটাকে মাত্রাতিরিক্ত কমিয়ে প্রকাশ করাটা ভুল ধারণা তো বটেই, দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা।

প্রকৃতপক্ষে, মার্কিন ঐতিহাসিকের তাতারদের মোকাবেলায় মুসলমানদের শক্তিকে ১০ লাখ অশ্বারোহী পর্যন্ত বাড়িয়ে বলাটা পুরোপুরি যুক্তিবহির্ভূত কথা। এর কোনো প্রমাণ তিনি পেশ করতে পারেননি। কেউ পারবেও না কোনো দিন।

---

[৪২৯] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় : ১৭, পৃষ্ঠা : ১৩২

[৪৩০] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৭/১৩৭, রওজাতুস সফা ৫/৩৫, ইসলামি এনসাইক্লোপিডিয়া ৬১৬-৬১৭

আমরা জানি মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহের যুগে খাওয়ারিজমের অস্ত্রসজ্জিত সুবিন্যস্ত বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ৪ লাখের বেশি ছিল না। তখন, তাদের বিপরীতে তাতারদের সৈন্যসংখ্যা ৮ লাখ থেকে কোনোভাবেই কম ছিল না। তারপর তো তাতাররা পুরো রাজ্য দখল করে অধিকাংশ জনবসতি ও মানবগোষ্ঠীকে বরবাদ করে দিয়েছিল। নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল খাওয়ারিজমি বাহিনীর একটা বড় অংশ। সৈনিক হওয়ার যোগ্যতা রাখে এমন অধিকাংশ লোকেরই মৃত্যু ঘটেছিল। অবশিষ্ট মুসলিমদের বেশিরভাগেরই সমরশাস্ত্র সম্পর্কে কোনো জ্ঞান ছিল না।

এইরকম অবস্থায় দশ লাখ অস্ত্রসজ্জিত মুসলিম অশ্বারোহী কোথা থেকে এবং কীভাবে আসতে পারে, বলুন? পরিস্থিতিও তো সুলতান জালালুদ্দীনের জন্য প্রতিকূল ছিল তখন! আমজনতা যদিও সুলতানের প্রতি মহব্বত পোষণ করত, কিন্তু তাদের বেশিরভাগেরই সমরশাস্ত্রের অভিজ্ঞতা ছিল না। অস্ত্রসজ্জিত ১০ লক্ষ অশ্বারোহীর কোনো বাহিনী গঠন করে ওঠার মতো সঙ্গতি মুসলিমদের ছিল না।

জিহাদের কথা শুনে তাতারদের ভয়ে বহু মুসলমান দূরদূরান্তে ভেগে গিয়েছিল। তাদের অন্যান্য আমির ও নেতার মতো তারাও বাস্তবতা-বিরুদ্ধ সন্ধিপ্রিয়তার রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। নিরাপদে কিছুদিন বাঁচার জন্য আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত হয়ে তাতারদের সামনে অবনত করেছিল মস্তক। এই নাজুক পরিস্থিতিতেও গৃহযুদ্ধে লিপ্ত ছিল বহু আমির। এই রকমই যখন চিত্রপট, তখন এটা কোনোভাবেই সম্ভব না যে—তাতারদের মোকাবেলায় সুলতানের সুযোগ হয়েছিল ১০ লক্ষ অশ্বারোহীর নেতৃত্ব দেওয়ার। সুলতানের সেই প্রাণান্তকর চেষ্টা ও মুজাহাদার সুদীর্ঘ অব্যাহত ধারায় যে বাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন, তা ছিল শুধু ওই আফগান সরদারদের ঐক্যবদ্ধ শক্তি নিয়ে গঠিত বাহিনী। কিন্তু এদের সংখ্যাও ১ লাখের বেশি ছিল না।

যদি মার্কিন ঐতিহাসিক ১০ লাখ অশ্বারোহী দ্বারা মুসলিমদের সেইসব রাজ্যের সৈন্যদলগুলোকে উদ্দেশ্য করে থাকেন, যারা ছিল খাওয়ারিজমের প্রতিবেশী, তবু তার কথা ভুল। মার্কিন ঐতিহাসিকের কথা (অর্থাৎ চেঙ্গিজ খানের মোকাবেলায় ১০ লাখ অস্ত্রসজ্জিত অশ্বারোহী যুদ্ধযাত্রা করেছিল) থেকে দুটো বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে, ১. খাওয়ারিজমের প্রতিবেশী রাজ্যগুলোতে ১০ লক্ষ অস্ত্রসজ্জিত অশ্বারোহী ছিল, ২. এই বাহিনী চেঙ্গিজ খানের মোকাবেলায় অগ্রযাত্রা করেছিল।

এই দুটো কথাই বর্ণনার দিক থেকে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, ইতিহাসে এর কোনো প্রমাণ মেলে না। তা ছাড়া স্বয়ং হ্যারল্ড ল্যাম্বও তার স্বভাবসিদ্ধ রীতি অনুযায়ী এ ব্যাপারে কোনো রেফারেন্স টানেননি।

যুক্তির বিবেচনায়ও এ-দুটো কথা অস্বীকৃত। কারণ, খাওয়ারিজমের পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোতে টেনেটুনে মাত্র কয়েক হাজার সিপাহির একটা প্রতিরোধ-ব্যবস্থা ছিল। এই রাজ্যগুলো শক্তিশালী কোনো বাহিনী গঠন করে ওঠার মতো যোগ্যই ছিল না।

সে-সময় খাওয়ারিজমের পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোতে শুধু বাগদাদই ছিল এমন একটা কেন্দ্র, যেখান থেকে তাতারদের বিরুদ্ধে বাহিনী প্রেরণের মাধ্যমে কোনো সাহায্য আসতে পারত।

কিন্তু বাগদাদের অশ্বারোহী সৈন্যসংখ্যা ছিল ১ লাখের কম।[৪৩১] অন্যদিকে ছোট ছোট যেসব রাজ্য ছিল, সেগুলো তাতারদের কয়েকটা আক্রমণের পরেই নিজেদের সেনাশক্তি খুইয়ে বসেছিল। নিজেদের রক্ষা করতেই ছিল অপারগ। তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এসব মুসলিম রাজ্য যদি বাগদাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাতারদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ রণাঙ্গন গড়ে তুলত, তা হলে অত্যন্ত শক্তিশালী একটি সৈন্যদল গড়ে উঠতে পারত। এবং সেই বাহিনীর নেতৃত্ব যদি সুলতান জালালুদ্দীনের মতো উন্নত মনোবল ও সাহসিকতাসম্পন্ন সেনাপতির হাতে থাকত, তা হলে এই সম্মিলিত শক্তির সম্মুখে তাতাররা গোবি মরুভূমিতে পালিয়ে যাবার কোনো পথ খুঁজে পেত না। কিন্তু তবু এমন কোনো সম্ভাবনা নেই যে, সুলতানের বাহিনীতে ১০ লাখ লোক অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

মার্কিন ঐতিহাসিকের বর্ণনাভঙ্গি প্রকাশ করছে যে, এই মুসলিম-রাজ্যগুলোর সেনাবাহিনী ছিল অগ্রযাত্রার জন্য একপায়ে খাড়া। অথচ ইতিহাস বলছে এর বিপরীত কথা। সুলতানকে সহযোগিতা করার জন্য কিংবা তাতার-বিরোধী জিহাদের জন্য কোনো রাজ্যই নিজেদের বাহিনী প্রেরণ করেনি। স্বয়ং সুলতানই কেবল তার সংকল্পবদ্ধ সৈনিকদের নিয়ে তাতারদের বিরুদ্ধে একা ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

মার্কিন ঐতিহাসিক এই ভুল তথ্য প্রচার করে কী অর্জন করতে চান? আমার মনে হয়—তিনি পাঠকদের মনে এই প্রভাব প্রতিষ্ঠা করতে চান যে, মুসলিমরা এত কাপুরুষ ও দুর্বল ছিল, তাদের দশ গুণ বেশি সুবিন্যস্ত বাহিনী থাকতেও সভ্যতাবিবর্জিত স্বল্পসংখ্যক প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথেই পেরে ওঠেনি, জায়গায় জায়গায় লাগাতারভাবে তারা মার খেয়েছে, পরাজিত হয়েছে। অথচ বাস্তবতা হল—অনেক রণাঙ্গনে মুসলমানরা নিজেদের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি দুশমনের ধড় থেকেও মস্তক বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল।

---

[৪৩১] খলিফা নাসিরের নাতি খলিফা মুস্তানসির বিল্লাহর যুগে যখন বাগদাদে তাতারদের আক্রমণের আশংকা বেড়ে গিয়েছিল, তখন বাগদাদি বাহিনীর সংখ্যায় প্রবৃদ্ধি ঘটিয়ে ১ লাখ ২০ হাজার অশ্বারোহীর একটি ফৌজ গঠন করা হয়েছিল। এর পূর্বে বাগদাদের অশ্বারোহী সৈন্য ছিল ১ লাখের চেয়ে কম। দেখুন : তারিখে ইসলাম যাহাবি ২৪, এবং তারিখে ইসলাম শাহ মুঈনুদ্দিন নদভী ৪/৪৮৮ দুওয়ালুল ইসলাম ২/১১১ সূত্রে বর্ণিত।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

সিন্ধুতটের প্রলয়ংকরী যুদ্ধ

إِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ

যদি তোমাদের গায়ে জখম লেগে থাকে, জেনে রাখো, কাফের সম্প্রদায়ের গায়েও এমন জখম লেগেছে। আর আমি এই দিনগুলোকে লোকদের মাঝে আবর্তিত করে থাকি।[৪৩২]

মুসলিমবাহিনীর ভেতর ফাটল

একের পর এক কয়েকটি ময়দানে তাতারদের পরাজিত করবার পর চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গ বিজয়ের প্রায় দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিলেন সুলতান জালালুদ্দীন। তার লাগাতার ঘটে-যাওয়া এইসব বিজয়গাথা চেঙ্গিজ খানের সমস্ত প্রবঞ্চনা ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছিল। মারা পড়েছিল কয়েকজন বড় বড় তাতার সরদার।

পরবর্তী দুয়েকটি যুদ্ধের ফল স্বয়ং চেঙ্গিজ খানকেও গোবি মরুভূমিতে পালিয়ে যাবার পথ খুঁজে না-পেতে বাধ্য করতে পারত। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ও ইখতিয়ারে মঞ্জুর করা ছিল অন্যকিছু। সুলতান জালালুদ্দীনের আশার সেই প্রদীপশিখা আচমকা সংঘটিত এক ট্রাজেডির অন্ধকারে হারিয়ে গেল। ইসলামি বাগিচার স্ফুটনোন্মুখ যে কলিগুলো বসন্তের আগমন দেখে মৃদু হেসে মাথা তুলছিল, আচমকা আবহাওয়ার বিরূপতায় সেসব ছিটকে পড়ল শরতের ধূসর দিনের ভেতর। পারওয়ান যুদ্ধে সুলতানের সৈন্যদল যে অসংখ্য মালে গনিমত লাভ করেছিল, তার মধ্যে দামি, সুদর্শন ও দ্রুতগামী একটি ঘোড়াও ছিল। এই ঘোড়ার মালিকানা পেতে আমান মালিক ও সাইফুদ্দীন আগরাকের মাঝে আরম্ভ হয়ে গেল কথা কাটাকাটি। চক্রবৃদ্ধিহারে বেড়েই চলছিল তর্ক। তারপর ঘটনা এতদূর গড়িয়ে গেল যে, ক্রোধে আমান মালিক খাপছাড়া হয়ে গেলেন। তখন তিনি আর নিজের ভেতর নেই। সপাং করে তিনি সাইফুদ্দীনের ঘোড়ার মাথায় চাবুক মেরে বসলেন। তা দেখে সাইফুদ্দীনের বাহিনী মুহূর্তের মধ্যে খাপমুক্ত করে ফেলল তলোয়ার। অন্যদিকে তলোয়ার ধারণ করে ক্ষেপে উঠল আমান মালিকের সহযোদ্ধারাও। দুই দলের ভেতর বেধে গেল ঝগড়া। এই হুলস্থুলের মাঝে আমান মালিকের এক রক্ষীর হাতে সাইফুদ্দীন আগরাকের ভাই একেবারে প্রাণে মারা গেল।

---

[৪৩২] সুরা আলে ইমরান, আয়াত ১৪০

সুলতান জালালুদ্দীন যখন এই নাজুক পরিস্থিতির কথা জানলেন, তার মাথায় যেন ভেঙে পড়ল সপ্ত আকাশ। বাহিনীর এ দুই সরদারকে এক রাখতে-পারা তখন আগুন-পানির সংমিশ্রণের চেয়েও কঠিন হয়ে পড়েছিল। সুলতান এই বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতির লাগাম ধরে উঠতে পারছিলেন না। সাইফুদ্দীনের মধ্যেও ছাড় দেওয়ার মতো কোনো মানসিকতা দেখা যাচ্ছিল না। আমান মালিকের থেকেও আশা করা যাচ্ছিল না যে, তিনি হাজারও অশ্বারোহীর কমান্ডার হওয়া সত্ত্বেও নির্দ্বিধায় নিজেকে দাঁড় করাবেন ইনসাফের কাঠগড়ায়। সুলতানের মনে তখন দানা বাঁধছিল সংশয়—সঠিক ইনসাফ কায়েম করতে গিয়ে যদি আমান মালিকের উপর কঠোরতা আরোপ করা হয়, সুলতানের সঙ্গ ছেড়ে যেতে বিলম্ব করবেন না তিনি। আবার, সাইফুদ্দীনের ভাইয়ের কিসাসের ব্যাপারটা মুলতবি রাখলে অন্যদিকে ছিল সেনাবাহিনী থেকে ৪০ হাজার তুর্ক সৈনিকের পৃথক হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা। নিরুপায় সুলতান যেন দুটো চাক্কির মাঝখানে পড়ে পিষে যেতে লাগলেন।

তিনি শরিয়াহভিত্তিক ব্যাপারটার সমাধান বার করতে এবং আলেম ও কাজিদের পক্ষ থেকে ফয়সালা প্রদান করতে পুরোপুরি তৈরি ছিলেন। কিন্তু এই নাজুক মুহূর্তে বাহিনীর দুই পরস্পরবিরোধী সরদারকে তাতে রাজি করানোটাই ছিল মুশকিল ব্যাপার। সাইফুদ্দীন যখন দেখলেন আমান মালিক ও তার সঙ্গীদের থেকে কৈফিয়ত নেওয়ার ব্যাপারে ছাড় দেওয়া হচ্ছে, কিংবা ক্ষমা করা হচ্ছে, তখন সুলতানের নেক নিয়ত ও ন্যায়-ইনসাফের প্রতি সন্দেহ হতে লাগল তার। আমান মালিক ছিলেন সুলতান জালালুদ্দীনের শ্বশুর ও মামাত ভাই। সাইফুদ্দীন সুলতানের এই সাময়িক এড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারটাকে আমান মালিকের সাথে তার আত্মীয়তার কারণ ধরে ভুল বুঝে বসলেন। তিনি ব্যথিত গলায় বললেন—তাতারদের আমি পরাজিত করেছি। অথচ এখানে মালে গনিমতের ঝগড়ায় সেই আমার ভাইকেই কিনা হত্যা করা হয়েছে!

সাইফুদ্দীন আগত পরিস্থিতি ঘনকৃষ্ণ অন্ধকার হয়ে উঠছে দেখেও জেনেশুনে চোখ বন্ধ করে ফেললেন। অতীত ও ভবিষ্যৎ ভুলে গিয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন সুলতানের বাহিনী থেকে পৃথক হয়ে যাবার। আপন সৈনিকদের নিয়ে অভিমানী বালকের মতো মুখ কালো করে তিনি ছাউনি থেকে বেরিয়ে পড়তে লাগলেন। একথা সুলতান যখন জানতে পারলেন, পড়িমরি করে তৎক্ষণাৎ সাইফুদ্দীনের পেছন-পেছন দৌড়ে গেলেন তিনি। খুব কষ্টে সাইফুদ্দীনকে থামিয়ে তার এখনকার সমস্ত অপারগতার কথা বয়ান করলেন। অবস্থার নাজুকতার ভীতিকর অনুভূতির জাগরণ ঘটাতে চাইলেন সাইফুদ্দীনের ভেতর। তাকে জিহাদের ফরজ হওয়ারর কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। চপল জজবায় কথা বলার মাঝে সুলতানের কণ্ঠ তখন তিরতির করে কাঁপছিল। আচমকা ভেতরের নিয়ন্ত্রণের বন্ধন ভেঙে পড়ে তার। ধৈর্য, সহনশীলতা, বীরত্ব ও সাহসিকতার এই কঠিন পাহাড় আজ সাইফুদ্দীনের সামনে এক নিষ্পাপ বাচ্চার মতো গুঙিয়ে কেঁদে ওঠেন। কাঁদতে কাঁদতে তিনি বলেন—'সাইফুদ্দীন, আল্লাহকে ভয় করো! আল্লাহকে ভয় করো!'

সুলতানকে এতটা জজবাতি হয়ে উঠতে দেখে সাময়িকের জন্য বাহিনী থামালেন সাইফুদ্দীন। কিন্তু রাতে যখন অন্ধকারে চারপাশ ছেয়ে গেল, চুপচাপ নাঙ্ঘারের দিকে রওনা হয়ে গেলেন তিনি। আজম মালিকসহ অন্যান্য তুর্কমান ও ঘুরি আমিরও তার সঙ্গে যোগ দিল। পরদিন ভোরে উঠে সুলতান জালালুদ্দীন দেখলেন—সাইফুদ্দীন আগরাক ও তার সহযোগী আমিরদের তাঁবু একেবারে শূন্য পড়ে আছে। তিনি পুরোপুরি হয়রান হয়ে গেলেন। তাতারদের প্রবল ঝড়ের মুখে যে শক্ত প্রতিরোধ তিনি গড়ে তুলেছিলেন, মুহূর্তে যেন তা ভেঙে গেল।[৪৩৩]

সাইফুদ্দীনের ও তুর্কিদের চলে যাবার পর সুলতানের অবশিষ্ট যেসব সৈনিক রয়ে গিয়েছিল, ব্যাপারটা নিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য ও মতামত ব্যক্ত করতে লাগল। কারণ, শুরুতে আসল কাহিনি জানত না সবাই। কেউ বলতে লাগল, 'আসলে এই তুর্কিরা তাতারদের ভয় পেয়ে চলে গেছে। তারা মনে করেছে তাতাররা মানুষ নয়, কোনো ভয়ংকর প্রাণী। তির-তলোয়ার কোনোকিছুই তাদের শরীরে রেখাপাত করতে পারে না। তারা কখনোই প্রতিপক্ষকে ভয় পেয়ে পিছপা হয়ে যায় না।' কেউ বলছিল, এরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। অহংকার ও ধূর্ততার দরুন ওয়াদার বরখেলাপি করেছে। এই ধোঁকাবাজির বদলা অবশ্যই প্রবঞ্চকদের পেতে হবে।[৪৩৪]

মোটকথা, যত মুখ তত কথার ফুলঝুড়ি। কিন্তু যা হবার তা হয়েই গিয়েছিল। বাহ্যিক আসবাব-উপকরণের বিবেচনায় সুলতানের পক্ষে তখন চেঙ্গিজ খানের সামনে কোনো বাধ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল না।

শিক্ষা

সুলতান জালালুদ্দীনের নেতৃত্বে সমবেত এই মুজাহিদদের ভেতর ঘটে-যাওয়া পারস্পরিক মতানৈক্য শেষ বিজয়ের পূর্বক্ষণে পরাজয়ের যে ভয়ানক প্রেক্ষাপট রচনা করেছিল, আমাদের জন্য তা ইতিহাসের শিক্ষামূলক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বিশেষভাবে বর্তমানকালের মুসলিম নেতৃবৃন্দ এ থেকে ইবরত হাসিল করুন যে, অতি সাধারণ কথার রেশ ধরে যারা একে অন্যের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করতে থাকেন, এবং পরস্পরে লিপ্ত হন স্নায়বিক যুদ্ধে, মনে রাখবেন, নিজেদের ভেতরকার অনৈক্য আল্লাহ তায়ালার কাছে এতই ঘৃণিত অপরাধ যে, এর কারণে মুখলিস নেতা ও নির্লোভ মুজাহিদরাও বিজয়ের মনজিল থেকে অনেক দূরে ছিটকে পড়েন।

নোট : কয়েক সপ্তাহ পর, সাইফুদ্দীন, আজম মালিক ও তাদের সহচরদের মধ্যে কিছু ধ্বংস হয় পারস্পরিক বিবাদের অনলে আর কিছু নিহত হয় তাতারদের হাতে।

---

[৪৩৩] ইবনুল আসির, ৭/৫৯৩, ৫৯৪; জাহাঁকুশা, ২/১৩৯; ইবনে খালদুন, ৫/১১৮;

[৪৩৪] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, পৃষ্ঠা : ১৫৬

চেঙ্গিজ খানের আক্রমণ

চেঙ্গিজ খান এক হিংস্র পশুর মতো প্রতিশোধের বারুদে ঝলসে উঠেছিলেন। সুলতান জালালুদ্দীনের বাহিনীর ভেতর ফাটল ধরে গেছে শুনতেই বিক্ষিপ্ত সমস্ত তাতারকে তিনি দ্রুত একত্র করলেন। এই বিপুল শক্তি নিয়ে জলদগম্ভীর বাদলের মতো সুলতানের পিছু লেগে গেলেন।[৪৩৫] খলজি, ঘুরি ও তুর্কমান আমিরদের গাদ্দারির পর সুলতানের নিকট রয়ে গিয়েছিল সাকুল্যে ৩০ হাজার সৈনিক। চেঙ্গিজ খানের বাহিনীর অপ্রতিরোধ্য সয়লাবের সামনে এই সাধারণ সৈন্যদলের কোনো তুল্যমূল্যই ছিল না। এজন্য সুলতান এই বিদ্রোহী আমিরদের কাছে দ্রুত কিছু দূত পাঠালেন। তাদেরকে ইসলামের ইজ্জতের দোহাই দিয়ে এই যুদ্ধে মুসলিমদের সাহায্য করবার আহ্বান জানালেন এবং নিজে কোনো উন্মুক্ত প্রান্তরে মোকাবেলায় নামার পরিবর্তে গজনির পূর্বদিকে যাত্রা করতে তৈরি হলেন। তখন সুলতানের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল সংখ্যার স্বল্পতা কাটিয়ে ওঠার মতো একটা সময়-সুযোগ লাভ করা। সুলতানের জানা ছিল—তার সঙ্গে বিদ্রোহ করে চলে যাওয়া আমিরেরা পূর্বদিকের এলাকাগুলোর দিকেই গেছে। এজন্য তিনি যুদ্ধ থেকে পেছনে সরে এসে ওদিকেই চলে যাওয়া সমীচীন মনে করলেন। তার পরিকল্পনা ছিল—উম্মাহর দুর্দশা দেখে যদি বিদ্রোহী আমিরদের মনে একটুখানি দয়ার উদ্রেক ঘটে, তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সিন্ধুনদের আশপাশের কোনো উপযুক্ত স্থানে নতুনভাবে সারিবদ্ধ হয়ে চেঙ্গিজ খানের মোকাবেলায় নামবেন। আর যদি আমিররা যথারীতি সেই ভুলের মধ্যেই গোঁ ধরে থাকে, তবে ওদিক থেকে সিন্ধুনদ পার হয়ে তাতারদের এখনকার আক্রমণ থেকে বেঁচে যেতে পারবেন।[৪৩৬]

শেষমেশ ইসলামি বাহিনী গজনি থেকে যাত্রা আরম্ভ করল। গজনির পরিবেশ তখন অত্যন্ত ভারী ও বিষাদময় হয়ে উঠেছিল। পুরো শহরবাসীর চোখ দিয়ে ঝরছিল রক্তাশ্রু। কারণ, অনেক অনেক দিন পর তারা সুলতানের ছায়ায় খানিক নিরাপত্তা পেয়েছিল। এইবার সুলতানের চলে যাওয়াতে নিজেদের দেখছিল মৃত্যুমুখে দাঁড়িয়ে থাকতে। স্বয়ং সুলতানের অবস্থাও ছিল নাজেহাল। তখন শূল-বেদনায় তিনি ভেতরে-ভেতরে বিক্ষত হয়ে পড়েছিলেন। চিকিৎসক তাকে এদিক-ওদিক চলাফেরা করতে নিষেধ করেছিল। সুলতান এতটা দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, বিছানা থেকে ওঠাও ছিল তার পক্ষে দুঃসাধ্য। এমনতরো পরিস্থিতিতে এত দীর্ঘ সফর এবং এমন কঠিন সমরাভিযানের নেতৃত্ব করতে পারাটা ছিল নিশ্চয় মানবীয় শক্তির বাইরের কিছু। কিন্তু তখন যাত্রা না-করেও উপায় ছিল না। আরেকটা পন্থা হতে পারত—সুলতানকে পালকিতে তুলে নিয়ে যাওয়া। সুলতানের সেবায়েত ও বাহিনীর

---

[৪৩৫] জাহাঁকুশা, ২/১৩৯; ইবনে খালদুন, ৫/১১৮; ইবনুল আসির, ৭/৫৯৪;

[৪৩৬] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, ১৫৬, ১৫৬; নিহায়াতুল আরাব, ৭/৩৬৬;

আমিররা এটাই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু সুলতান জালালুদ্দীন তা প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি ভেবেছিলেন—এ মুহূর্তে নেতাকে নিরুপায় দেখে অবশিষ্ট সৈন্য যদি হিম্মত হারিয়ে ফেলে!

সুলতান বিস্ময়কর ঈমানি জজবা দেখিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে বসলেন যে, সাধারণ সৈনিকদের মতো তিনিও ঘোড়ার পিঠেই সফর করবেন। তারপর এমনটি করেও দেখিয়েছিলেন তিনি। অসহনীয় কষ্ট সইতে সইতে ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে তিনি গজনি থেকে বেরোলেন। জনসাধারণ ও সৈনিকরা টেরও পেল না যে, তাদের প্রিয় নেতা এক প্রাণঘাতী যাতনার ভেতর দিয়ে পথ চলছেন। সুলতানের এ হিম্মত ও কোরবানি দেখে তার উপর নেমে এল রহমতে ইলাহির বর্ষিত ধারা। ধীরে-ধীরে তার তবিয়ত সামলে উঠতে লাগল। শেষে সফরের মধ্যেই তিনি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠলেন।[৪৩৭]

এদিকে চেঙ্গিজ খান এক সুবিস্তৃত প্রশস্ত অঞ্চলজুড়ে ছড়িয়ে-থাকা অসংখ্য সৈন্য নিয়ে ভূকম্পনের মতো ধেয়ে আসছিলেন। তার সামনে তখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল সুলতানের বিরোধী হয়ে-ওঠা আমিররা যেন সুলতানের সাহায্যে দ্বিতীয়বার গিয়ে পৌঁছতে না-পারে। সুতরাং চেঙ্গিজ খান বাহিনীকে যাত্রা করার নির্দেশ দিলেন। বলে দিলেন—তোমাদের লক্ষ রাখতে হবে, সুলতান জালালুদ্দীনের কাছে কোনো দিক থেকেই যেন সাহায্য পৌঁছতে না পারে।

সুলতানের সেই বিদ্রোহী আমিররা নিজ নিজ সৈন্যদল নিয়ে বিভিন্ন এলাকার উদ্দেশে বেরিয়ে গিয়েছিল। তাতার-বাহিনী সেইসব এলাকার সমস্ত রাস্তা আটকে আমিরদের থেকে সুলতানের যোগসূত্রতা বিচ্ছিন্ন করে দিল।[৪৩৮]

চেঙ্গিজ খান গজনিতে এসে পৌঁছলেন। জানতে পারলেন—ইসলামি বাহিনী পাঁচদিন পূর্বেই এখান থেকে বেরিয়ে গেছে।[৪৩৯] চেঙ্গিজ খান তার পথের কাঁটাটা কোনোভাবেই ছেড়ে দেবেন না বলে অঙ্গীকার করেছিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যেকোনো মূল্যে সুলতানকে পাকড়াও করবেন। এজন্য কালবিলম্ব না-করে সুলতানের পেছন পেছন রওনা হয়ে গেলেন তিনি। সুলতান জালালুদ্দীন অনেক আগেই বেরিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এই কঠিন দুশমন হাত থেকে বেরিয়ে যাক, সেটা কোনোভাবেই চাচ্ছিলেন না চেঙ্গিজ খান। তিনি এই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলবার

---

[৪৩৭] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, ১৫৬, ১৫৭; নিহায়াতুল আরাব, ৭/৩৬৬;

[৪৩৮] ইবনে খালদুন, ৫/১১৯; নিহায়াতুল আরাব, ৭/৩৬৬; চেঙ্গিজখান, অধ্যায় ২০, পৃষ্ঠা ১৫১;

[৪৩৯] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় : ২০, পৃষ্ঠা : ১৫১ কিন্তু তারিখু মুখতাসারিদ দুওয়াল পৃষ্ঠা ১২৩৬ ও রওজাতুস সফা ৪/৮২৮ গ্রন্থে ১৫ দিন বিলম্ব হয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যা সম্পূর্ণ যুক্তি-বহির্ভূত। তাছাড়া দিরায়াতের নীতিমালা অনুসারে চেঙ্গিজ খানের গজনি পৌঁছার কোনো রেওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য নয়। সঠিক হলো—চেঙ্গিজ খান ভিন্নপথে সুলতানকে ধাওয়া করেছিলেন।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। বাহিনীকে হুকুম দিলেন—দিনে কিংবা রাতে কোথাও থামা যাবে না। সর্বোচ্চ গতিতে অবিরাম জারি রাখতে হবে সফর। খাদ্য তৈরির জন্য ঘোড়া থেকে নামবার অনুমতি নেই কারুর।[৪৪০]

খানের এই হুকুম পেয়ে তাতার-বাহিনী অত্যন্ত উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। একদিনের ভেতর পেরিয়ে যেতে থাকে কয়েক মনজিল। পূর্বের সব লড়াইয়ের তুলনায় এ অভিযানে চেঙ্গিজীয় বাহিনীর সদস্যসংখ্যা ছিল অনেক বেশি। চতুর্দিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা প্রায় সব তাতার এই সমরাভিযানে এসে যুক্ত হয়েছিল। তা ছাড়া সংখ্যাধিক্যের পাশাপাশি অগ্রযাত্রায় তাদের গতিও ছিল অবাক করে দেবার মতো বিস্ময়কর। শত্রুর উদ্দেশ্যে অস্বাভাবিক দ্রুতগতির এ ছিল এক ঐতিহাসিক পশ্চাদ্ধাবন। একদিকে সুলতান জালালুদ্দীনের অশ্বারোহী সৈন্যরা নিতান্ত সাধারণ গতিবেগ নিয়ে ঘোড়া দৌড়িয়ে যাচ্ছিল, অন্যদিকে চেঙ্গিজ খানের অশ্বারোহী বাহিনী বিদ্যুদ্বেগে, উড়ন্ত বালুর মেঘে চারপাশ অন্ধকার করে প্রতিমুহূর্তে কাছাকাছি অগ্রসর হচ্ছিল মুসলিমদের। দু-দলের মাঝখানের দূরত্ব প্রতিনিয়ত কমে আসছিল।[৪৪১] সুলতান জালালুদ্দীন পেশোয়ার থেকে মোড় নিয়ে সিন্ধুনদের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। তখন তার নদী পার হয়ে যাওয়া ছিল জরুরি, যাতে হিন্দুস্থানের মুসলিম বাদশাহ শামসুদ্দীন ইলতুৎমিশের নিকট গিয়ে সাহায্য লাভ করতে পারেন, এবং উভয়ের বাহিনী ঐক্যবদ্ধ হয়ে রুখে দিতে পারে তাতার-সয়লাবের প্রলয়ের পথ।

চেঙ্গিজ খান সুলতানের এই ইচ্ছা ও পরিকল্পনার ব্যাপারটাও ধরে ফেলেছিলেন। এজন্য বাহিনীর অগ্রগামী দলকে হুকুম দিলেন—যেকোনো মূল্যে আগে বেড়ে তোমরা সুলতানের নদী পেরোনো রুখে দাও। অবশিষ্ট তাতার-বাহিনী পৌঁছা পর্যন্ত তাদেরকে সেখানে যুদ্ধমত্ত রাখো। ফলে, অগ্রগামী দল খুব দ্রুততার সাথে মূল বাহিনী থেকে পৃথক হয়ে অনেক সামনে অগ্রসর হয়ে গেল।

অগ্রগামী দলের ধ্বংস-কথা

অগ্রগামী দলটি সুলতানের পিছু-পিছু যেতে যেতে জারদবাক পর্যন্ত পৌঁছে গেল। সংবাদ সরবরাহকারীরা সুলতানকে জানিয়ে দিল এই তাজা খবর। তিনি তখন জরুরি মনে করলেন—সিন্ধুনদ পর্যন্ত পৌঁছার পূর্বে দুশমনের এই অগ্রগামী দলটাকে আগে তছনছ করে দিতে হবে। ফলে সে-রাতেই জানবাজ সহযোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে আচানক দুশমনের ছাউনিতে এসে হামলা করে বসলেন। তাতার-বাহিনী পলাতক সৈন্যদলের পেছনে ধাওয়া করবার কালে রাত্রিবেলা কোনো টহলদার নিয়োগ করতে পারেনি। এ ব্যাপারে তারা বেখবর ছিল। ফলে এই দৈব আক্রমণে প্রচণ্ড ঘাবড়ে গেল তারা। তাদের সঙ্গে যে এমন কিছু ঘটে যাবে, সেই ধারণাও তাদের ছিল না।

---

[৪৪০] জামিউত-তাওয়ারিখ, ৩৭৫; মুখতাসারুদ-দুওয়াল, ২৩৬;

[৪৪১] রওজাতুস সফা, ৪/৮২৮;

আশাপাশের পাহাড়গুলো থেকে মুসলিম সৈনিকদের ছুটন্ত তিরের মুখে পড়ে তারা পুরোপুরি জ্ঞানশূন্য হয়ে গেল। ঠিক এই মুহূর্তটায় সিপাহিদের উদ্দেশ্য করে উচ্চকণ্ঠে সুলতান বললেন—এবার সবাই চলো সম্মুখে। মুজাহিদবাহিনী সামনে এগিয়ে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তাতারদের জমাটবদ্ধতা ভেঙে দিয়ে ছোট ছোট দলে পরিণত করল তাদের। তাতাররা তখন খণ্ডখণ্ড দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন দিক থেকে যুদ্ধে মেতে উঠতে চাচ্ছিল। মুসলিমবাহিনী জোরদার কয়েকটি হামলা চালিয়ে সাফ করে ফেলল পুরো ময়দান। দুশমনের অগ্রবর্তী দলের অধিকাংশ সৈন্য মৃত্যুঘাটে ছিটকে গেল। তাদের একটা ছোট সংখ্যাই কেবল পালাতে পেরেছিল সেদিন।

পলায়নপর এই তাতারদের পেছনে ধাওয়া করবার মতো কোনো ভুল করেননি সুলতান। তৎক্ষণাৎ তিনি সমস্ত সৈন্য নিয়ে নিম্নভূমির উপত্যকাগুলোর দিকে বেরিয়ে গেলেন।[৪৪২] অগ্রগামী দলের ধ্বংস ও বরবাদির খবর শুনে ফের একবার পাগলের মতো চেঁচিয়ে ওঠেন অস্থির চেঙ্গিজ খান। তবু বিরামহীন পশ্চাদ্ধাবন জারি রাখেন তিনি।

নৌকার খোঁজে

মুসলিমবাহিনী পাহাড় ও প্যাঁচানো গিরিপথ থেকে নিচে নেমে সিন্ধুনদের পারের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছল। নদী পেরিয়ে তারা চেঙ্গিজ খানের এবারের আক্রমণ থেকে যথেষ্ট নিরাপদ থাকতে পারত। কিন্তু এদিকটায় নদীর গভীরতা ছিল অনেক বেশি। শোঁ শোঁ গর্জনরত ধারালো স্রোত। নৌকা ছাড়া এই উত্তাল ঢেউয়ের উপর দিয়ে নদী পাড়ি দেওয়া সম্ভব ছিল না কোনোক্রমেই। ফলে অস্থির সুলতান কর্মচারীদের বলে উঠলেন—দ্রুত সীমান্তবর্তী গ্রামগুলির দিকে দৌড় লাগাও।

এর ভেতর সংবাদ সরবরাহক এসে জানাল—তাতার-বাহিনী কাছাকাছি এসে পড়েছে। ফলে সুলতান নদী পেরোবার সম্পূর্ণ সুযোগ পেতে তাতারদের ওই দূরেই আটকে রাখা জরুরি মনে করলেন। এ সময়ে ওরা যদি এখানটায় এসে পড়ে, বাহিনী-সমেত নদী পেরোতে পারবেন না তিনি। তাই মুসলিম বাহিনীর সর্বোচ্চ সামরিক অফিসার আওর খানের হাতে অগ্রগামী দলের সেনাকমান্ড প্রদান করে, ওদিকে চেঙ্গিজ খানের অগ্রগামী দলটিকে যুদ্ধে ব্যস্ত রাখার জন্য দ্রুত পেছনে রওনা করিয়ে

---

[৪৪২] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, ১৫৭; নিহায়াতুল আরাব, ৭/৩৬৬; ইবনে খালদুন, ৫/১১৮; দ্রষ্টব্য : এখানে যে জার্দিন নামক স্থানের উল্লেখ আছে, তা সঠিকভাবে সুনির্দিষ্ট করা যায়নি। ইয়াকুত হামাবি কাবুল ও গজনির মাঝখানে জর্দান নামক এক বস্তির কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই যুদ্ধ কাবুল ও গজনির মাঝখানে নয়, বরং গজনি ও পেশোয়ারের মাঝখানে সংঘটিত হয়েছিল। এজন্য এই দুটো স্থানকে পৃথক বলেই মানতে হবে।

দিলেন। আওর খান এই অভিযান পুরো সফলতার সাথে আঞ্জাম দিয়ে উঠতে পারল না। তবে তাতারদের অগ্রবর্তী দলের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি করে ফিরে এল সে। এদিকে নৌকার সন্ধানে-যাওয়া কর্মচারীরাও বহু খোঁজাখুঁজির পর এই এলাকায় পেল একটিমাত্র নৌকা।[৪৪৩] এর মধ্যে তাতারদের অগ্রগামী দলটি এসে গেল স্রেফ অর্ধদিনের দূরত্বের ভেতর। তাতাররা চলে আসতে আসতে এই একটিমাত্র নৌকা দিয়ে ৩০ হাজার মুসলিমের নদীর ওপারে গিয়ে নামতে পারা ছিল অসম্ভব। তা ছাড়া সুলতানের হেরেমও ছিল তার সঙ্গে। তাদের মাঝে সুলতানের আম্মা, বিবিগণ, বাচ্চাকাচ্চা এবং খানদানের অন্য নারীরাও ছিলেন। এদের নিরাপদ কোনো আশ্রয়ে পৌঁছে দেওয়া জরুরি হয়ে উঠেছিল। সুলতান দ্রুত এদের নৌকায় বসিয়ে ওপারে পাঠিয়ে দিতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু কুদরতের কলমে যা লেখা হয়ে গেছে, তা-ই তো ঘটে বাস্তবে। এই একমাত্র নৌকাটিও ছিল অনেক পুরাতন। কাঠ পচা পচা। এমন রুগ্‌ণ নৌকা সইতে পারল না এত লোকের ভার। যাত্রী উঠতেই তক্তা ভেঙে গিয়ে অকেজো হয়ে গেল সেটি। হেরেমকে সিন্ধুনদের ওপারে পাঠাবার সম্ভাব্য পথটিও বন্ধ হয়ে গেল।[৪৪৪]

সুলতানের গায়রত

সুলতান জালালুদ্দীনের বুকের গোপন কোনো কুঠুরিতেও যদি খানিক শান্তিপ্রিয়তা লুকোনো থাকত, এই পরিস্থিতিতে মৃত্যু যখন হা করে সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল, পরিবার-পরিজনের নিরাপত্তার বাহানায় কোথাও তিনি আত্মগোপন করে বসতে পারতেন। কিন্তু নিজ সত্তা ও তার প্রিয় পরিবারকে সাধারণতম এক সৈনিকের উপরেও প্রাধান্য দিলেন না তিনি। এই মুজাহিদদের সঙ্গ ছেড়ে যেতে তার গভীর আত্মমর্যাদাবোধ তাকে একটিবারের জন্যও উদ্বুদ্ধ করেনি। এই কঠিন সময়েও সৈনিকদের সঙ্গে দৃঢ়পদ রইলেন তিনি। সুলতান সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন—তার ও তার পরিবারের বাঁচন-মরণ এই বাহাদুর সেনাদের সাথেই ঘটবে। মোকাবেলা ছাড়া সম্মানজনক কোনো পথ খোলা নেই এখন। সরাসরি চেঙ্গিজ খানের সাথে যুদ্ধ করবার সময় সন্নিকটে এসে গেছে। ফলে, মুসলিমদের সংক্ষিপ্ত বাহিনী নিয়ে শক্তপোক্ত তাতারদের সাথে কঠিন সংঘর্ষের জন্য নদীর তীরে তিনি এমন একটা জায়গায় সৈনিকদের সারিবদ্ধ করতে চাচ্ছিলেন, যেখানে সম্মুখভাগের ও পেছনের সেনাদলকে সুরক্ষিত রাখবার পাশাপাশি শত্রুকেও তিনি দাঁতভাঙা জবাব দিতে পারবেন।

---

[৪৪৩] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, ১৫৭; জাহাঁকুশা, ২/১৩৯, ১৪০;

[৪৪৪] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, ১৫৭;

নিলাবের তট

চেঙ্গিজ খান তার বাহিনীকে অর্ধবৃত্ত আকারে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিলেন। মুসলিমদের পিছু হটবার সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শেষে একরাতে চেঙ্গিজ খানের উন্মত্ত সেনাদল এমন এক স্থানে এসে সুলতানের বাহিনীকে ঘিরে ধরল, যেখানে মুসলিমদের একদিকে গোত্তা খাচ্ছিল সিন্ধুনদের পাহাড়-উঁচু দামাল ঢেউ, অন্যদিকে মাথা উন্নত করে দাঁড়িয়ে ছিল বৃক্ষলতাশূন্য এক শুষ্ক পাহাড়।[৪৪৫] এই স্থানটি হল সিন্ধুনদের নিলাব নামক তট।[৪৪৬]

এখানে নদী এবং শুভ্র সেই পর্বতশ্রেণির মাঝখানে প্রায় পাঁচ মাইল চওড়া ও ১২ মাইল লম্বা সবুজ-শ্যামল একটি ময়দান রয়েছে। নদীর সমান্তরালবর্তী পর্বতশ্রেণি উত্তর-পূর্ব হতে দক্ষিণ-পশ্চিমের দিকে অগ্রসর হয়ে এই ময়দানটিকে একদম সংকীর্ণ করে দিয়েছে। শেষদিকটায় নদীর সঙ্গে পাহাড় এমনভাবে এসে মিশেছে যে, নদীর দুইদিকের পার সমুচ্চ পাহাড়ি প্রস্তরের ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে গেছে। উপত্যকার এমন দু-দিকে পাহাড় ও অন্যদিকের নদী এই ময়দানটাকে প্রাচীরবেষ্টিত দুর্গের মতো করে ফেলেছে। এই ময়দানের ভেতর প্রবেশ করার পথ শুধু উত্তর-পূর্বদিকের সিন্ধুনদ এবং লন্ডে নদীর (দরিয়ায়ে কাবুল) সঙ্গমস্থলের নিকট বিদ্যমান ছিল।

সেনাদল নিয়ে এখানটায় এসে পৌঁছেন সুলতান। উপত্যকার উল্লিখিত অবস্থানস্থল দেখামাত্র তিনি বুঝে ওঠেন—তাতার-সয়লাবের মুখোমুখি হতে এ মুহূর্তে এর চেয়ে উত্তম কোনো ময়দান হতে পারে না। তিনি সিন্ধু ও কাবুল নদীর সংযোগস্থলের কাছের নিম্নভূমি দিয়ে এই উপত্যকায় এসে ঢুকলেন। এর শেষমাথায় পৌঁছে দেখলেন—এখানে পাথুরে উপত্যকা সংকুচিত হয়ে নদীর সঙ্গে মিশে গেছে। ঠিক এই শেষমাথাতেই ছাউনি স্থাপন করলেন তিনি। এখানটায় সুলতানের বাহিনীর পেছনে কুলকুল করে বয়ে চলছিল একটি ঠান্ডা ও মিঠা পানির নদী। একে বলা হতো সাগাইনদী। এই নদী সাগাই গ্রামের ভেতর দিয়ে ঘোড়াতড়প নামক স্থানে সিন্ধুনদে গিয়ে পড়েছে। সুলতানের সৈন্যবাহিনী আগামীকালের নিষ্পত্তিমূলক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি সম্পন্ন করে রাতভর আরাম-বিশ্রাম করল। আঁধার কাটলে সুবহে সাদিকের মৃদু আলোর ভেতর সুলতান জালালুদ্দীন দেখলেন—উপত্যকায় অন্যদিক থেকে এসে ঢুকে গেছে তাতার-বাহিনী। বন্ধ করে ফেলেছে মুসলিমদের প্রত্যাবর্তন কিংবা পলায়নের সমস্ত পথ।[৪৪৭]

---

[৪৪৫] জাহাঁকুশা, ২/১৪০; চেঙ্গিজখান, অধ্যায় ২০, পৃষ্ঠা ১৫১;

[৪৪৬] তারিখে খাওয়ারিজম শাহি, ২১৯;

[৪৪৭] জাহাঁকুশা, ২/১৪০

সুলতানের সূক্ষ্ম সারিবদ্ধকরণ

ফজর নামাজের পর। সুলতান জালালুদ্দীন নিলাবের তটে জানবাজ সৈনিকদের কাতার ঠিক করছেন।[৪৪৮] ডানদিকে সিন্ধুনদের সরোষে ফুলে-ওঠা গোত্তা-খাওয়া ঢেউয়ের সারি তটে এসে ভয়ংকর শব্দে আছড়ে পড়ছে। গা হিম করে-দেওয়া এক অদ্ভুত আওয়াজ উৎপাদন করছে।[৪৪৯] বামদিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে অনতিক্রম্য সুউচ্চ পর্বতশ্রেণি। আর সম্মুখে সিন্ধুনদের পার-ঘেঁষা সেই চওড়া ও প্রশস্ত উপত্যকা, যার ভেতর দুই কওমের মাঝে বেধে উঠতে পারে আসন্ন চূড়ান্ত যুদ্ধ। এমন এক যুদ্ধ, যার পরিসমাপ্তিতে পূর্ণ বিজয় নাহয় পূর্ণ পরাজয় ছাড়া অন্যকিছু ঘটতে পারে না।

খোলা ময়দানের ওদিক থেকে চেঙ্গিজ খানের অসংখ্য সৈন্য এই উপত্যকা অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে। বাহিনীর মধ্যিখানে বিদ্যমান খোদ চেঙ্গিজ খান। সুলতানের বাহিনীর বিন্যাস-রীতি এবং তাদের আশপাশের পরিবেশগত বিষয়াদি দূর থেকে পরখ করছেন তিনি। তা দেখে সুলতান জালালুদ্দীনের যুদ্ধ-কৌশলের স্বীকৃতিও দিতে হল তাকে। চেঙ্গিজের ভেতর থেকে উদ্গত হল যে, তাতার-বাহিনীর বিপরীতে সুলতান জালালুদ্দীন তার ছোটখাটো সৈন্যদলকে এমন প্রভাবক শক্তিমত্তায় বিন্যস্ত করে তুলেছেন, মুসলিম-সেনারা ডান ও বাঁ-দিক থেকে নিরাপদ হবার পাশাপাশি সামনে বেড়ে অত্যন্ত প্রাণঘাতী আক্রমণ করে বসবারও যোগ্যতা ও সক্ষমতা রাখে এখন।

সুলতানের বাহিনীর ডান বাহু, যা আমান মালিকের নেতৃত্বে ছিল, সিন্ধুনদের একটি বাঁকের ভেতর থাকায় পার্শ্ববর্তী কোনো আক্রমণ থেকে নিরাপদ রইল।[৪৫০] পেছনের ও বাম বাহুর আশ্রয় মিলেছিল কঙ্করময় প্রান্তরের ভেতর। (গভীর দৃষ্টিতে তাকালে অনুভব করে উঠতে পারবেন, এখানে সৈন্যবাহিনীকে সুলতানের সারিবদ্ধকরণ, উহুদযুদ্ধে খাতামুন নাবিয়্যিন, ইমামুল মুজাহিদিন, নাবিয়্যুল মালাহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্থাপনকৃত সাহাবিদের যুদ্ধসারির সঙ্গে পুরোপুরি সাদৃশ্য রাখে। এ থেকে আন্দাজ করে ওঠা যায়, সিরাতে নবাবির এ-সমস্ত বিষয়ে গভীর দৃষ্টি রাখতেন সুলতান জালালুদ্দীন।)

সুলতান জীবন-মৃত্যু কিংবা জয়-পরাজয়ের দিকে না-তাকিয়ে সরাসরি জিহাদের ময়দানে নেমে এলেন। তিনি কেবল আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে অর্পিত জিহাদের ফরজ বিধান পালন করতে চাচ্ছিলেন। এই যুদ্ধের পরিণতি যা-ই দাঁড়াক, সুলতানের

---

[৪৪৮] তারিখে খাওয়ারিজমশাহি ২১৯, সিয়ারু আলামিন নুবালা ২২/২৪০ গ্রন্থে মুফাররিজুল কুরুব ৪/৬১ গ্রন্থের সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এখানে নৌকা ঠিকই পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু নদী পেরোতে না-পারার কারণ হয়েছিল এই—তখন অর্জিত কয়েকটি নৌকার মাধ্যমে এত সংক্ষিপ্ত সময়ে বাহিনীকে ওপারে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না।

[৪৪৯] রওজাতুস সফা, ৪/৮২৮;

[৪৫০] চেঙ্গিজখান, অধ্যায় ২০, পৃষ্ঠা ১৫১;

এতটুকু একিন অবশ্যই ছিল যে, রবের দরবারে তিনি কৃতকার্য হবেন। তার বাহাদুর মুজাহিদদের অন্তরের জজবাও ভিন্ন কিছু ছিল না। তাদের কাছে দীনের জন্য এই জাগতিক জীবন থেকে অব্যাহতি নিতে পারা ছিল অত্যন্ত প্রিয় বিষয়। যে পশুগুলো তাদের বাড়িঘর লুট করেছিল, আত্মীয় ও প্রিয়জনদের ধ্বংস করেছিল, জন্মভূমির মাটি থেকে তাদের করেছিল দেশান্তরিত, সেই পশুদের সামনে পেয়ে হাতিয়ার না-ওঠানো ছিল এই জানবাজদের জন্য অত্যন্ত অসহনীয় ব্যাপার। এমন কিছু করতে কখনোই তারা প্রস্তুত ছিল না। তাদের হৃদয়ের আকুতি ছিল—হাতিয়ার ফেলে দেবার বদলে শাহাদাতের মৃত্যু ঢের প্রিয়।

মুজাহিদদের সারির ভেতর, জায়গায়-জায়গায়, একেকজন বক্তা জোশদীপ্ত সমুন্নত কণ্ঠে জিহাদের আয়াত ও হাদিস শুনিয়ে-শুনিয়ে সহযোদ্ধাদের রক্ত উত্তপ্ত করে তুলছিল। বাহিনীর প্রত্যেক দিক থেকে ভেসে উঠছিল আকাশ-কাঁপানো তাকবিরধ্বনি। শোনা যাচ্ছিল রণসঙ্গীত ও জিহাদি গীতিকাব্যের গুঞ্জরণ।

নৌকা জ্বালিয়ে দাও

সুলতানের বাহিনীর চেয়ে চেঙ্গিজীয় বাহিনীর সংখ্যাধিক্যের পাশাপাশি তাদের আরেকটা সুযোগও ছিল। তা হল—পরাজয় ঘটতে দেখলে তাদের জন্য পালাবার পথ ছিল খোলা। কারণ, তারা যেদিক থেকে এসে ঢুকেছিল প্রান্তরের ভেতর, ওইদিকে মুসলিম-সেনাদের ঘাঁটি ছিল না। কিন্তু সুলতানের সৈন্যদের জন্য এই যুদ্ধ ছিল জীবন ও মৃত্যুর একটা চূড়ান্ত বাজি। অবস্থা ছিল এমন—যদি তারা এই যুদ্ধে জিততে না-পারে, তবে তাদের সামনে খোলা থাকবে স্রেফ মৃত্যুর অন্ধকার দরজা। পালানোর কোনো সম্ভাবনাই থাকবে না।

সুলতানের হিম্মত, তীক্ষ্ণ ধীশক্তি ও যুদ্ধক্ষেত্র নিরীক্ষণের চমৎকারিত্ব দেখে বিপুল বাহবা দিতে হয়। সেই মুহূর্তে তিনি বাহিনীর চূড়ান্ত দুর্বলতাকেও তাদের শক্তিমত্তায় রূপান্তর করে তুলেছিলেন। এমন এক সাহসী সেনাকমান্ডার ছিলেন তিনি, নিজেদের শত অক্ষমতার ভেতরেও একটা পথ বের করে ফেলতে পারতেন। শক্তিহীনতাকে শক্তিমত্তা-রূপে ব্যবহার করতে জানতেন। পলায়নের যাবতীয় পথ বন্ধ পেয়ে বাহিনীকে তিনি উদ্বুদ্ধ করলেন—চলো, এবার কেবল আল্লাহর পথেই পদযাত্রা করো!

পরিবার-পরিজনসহ একজন মুজাহিদও যেন ময়দান ছেড়ে ভাগতে না পারে, সেই ব্যবস্থা তিনি সম্পন্ন করে ফেললেন। মুছে ফেললেন পলায়নের সমস্ত সম্ভাবনা। সৈন্যদের আদেশ দিলেন পারে বিদ্যমান সমস্ত নৌকা জ্বালিয়ে দেওয়ার। কারুর মনে যেন প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে যাবার খেয়াল পর্যন্ত না আসে।

তৎক্ষণাৎ তার হুকুমের বাস্তবায়ন ঘটল। জ্বালিয়ে দেওয়া হল সমস্ত নৌকা।[৪৫১] এরপর কোনো মুসলিমের মনে এমনতরো ওয়াসওয়াসা জাগারও কোনো সুযোগ রইল না যে, যুদ্ধ চলাকালে কোথাও তারা পালিয়ে যাবে। ফলে, শেষনিঃশ্বাস পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া ব্যতীত তারা কিছু ভেবে ওঠেনি তখন।

সূর্য উদিত হতেই বেজে উঠল যুদ্ধের ডঙ্কা। খাওয়ারিজমি সিপাহিরা মুখোমুখি হয়ে মৃত্যুর শীতল চোখে চোখ রেখে, আল্লাহর সত্তার উপর ভরসা করে, নারায়ে তাকবিরের হুংকার তুলে, দুশমনের দিকে অগ্রসর হল। এবং অত্যন্ত রক্তঝরা এক যুদ্ধের অবতারণা ঘটল।

যুদ্ধের শুরু : প্রথম দিন

তাতাররা ঝাঁকে ঝাঁকে বেপরোয়া হাতির মতো সম্মুখে বাড়ছিল। তাদের ধারণা ছিল—মুহূর্তখানিকের ভেতর তারা মুসলিমদের পিষে চলে যাবে। কিন্তু মুজাহিদবাহিনী এতটা অবিচলতার সঙ্গে তাদের মোকাবেলা করে গেল যে, সেদিন যেন নতুন করে তাজা হয়ে উঠল ইসলামের সেই প্রথম যুদ্ধের স্মৃতি। তাতার-সেনারা নিজ নিজ সরদারদের পতাকাতলে জমায়েত হয়ে বারবার কঠিন হামলা করে যাচ্ছিল। কিন্তু প্রতিবারই মুসলিমবাহিনী ভারী জগদ্দলের মতো স্থির হয়ে ছিল স্ব-স্থানে। তাতাররা বাজেভাবে ব্যর্থ হতে লাগল। ময়দানে সুলতান জালালুদ্দীন সিংহবলে সংক্ষিপ্ত এই ফৌজকে দিয়ে যুদ্ধ করাচ্ছিলেন। মুজাহিদবাহিনী তার ডানে ও বাঁয়ে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছিল তাতারদের যুদ্ধসারি। তুর্কি ও আফগান বাহাদুরেরা একে অন্যের সাথে পাল্লা দিয়ে তরবারি চালনা ও বর্শাবাজির অনন্য বীরত্ব দেখাচ্ছিল। রক্তপাতের এই প্রবল যুদ্ধ জারি রইল দিনভর। অন্ধকারে চারপাশ ছেয়ে-যাওয়া নাগাদ হার-জিতের কোনো ফয়সালা ঘটল না।[৪৫২]

যুদ্ধের দ্বিতীয় দিন

পরদিন সকাল। তাতার-বাহিনী ফের একবার ক্ষুধার্ত হায়নার মতো হুল্লোড় ও চেঁচামেচি করতে করতে ছুটন্ত বেগে সামনে অগ্রসর হচ্ছিল। মুসলিম বীরসেনারা মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠেছিল পুরোপুরি। নিজেদের কমান্ডারের ইশারা পেতেই তারাও প্রবল শক্তিমত্তায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। ডানে-বাঁয়ে বর্শা চালনার অনন্য দক্ষতা দেখিয়ে আক্রমণকারীদের মুখ উলটো দিকে ফিরিয়ে দিল। তারপর আচমকা সমস্বরে নারায়ে তাকবির বুলন্দ করে কাফের-বাহিনীর উপর ফেটে পড়ল মুসলমান। তাতার-বাহিনীর বন্য সয়লাব মুসলিমদের নিশ্চিহ্ন করতে ব্যর্থ হল।

---

[৪৫১] চেঙ্গিজখান, অধ্যায় ২০, পৃষ্ঠা ১৫১;

[৪৫২] ইবনে খালদুন, ৫/১১৭;

প্রথম দিনের যুদ্ধের পর দুশমনকে আজ সীমাতিরিক্ত শক্ত-সমর্থ পেয়ে দ্বিতীয় দিনের লড়াইয়ের জন্য চেঙ্গিজ খান যে প্রস্তুতি নিয়েছিলেন, ভেস্তে গেল সবকিছু। তাতার-বাহিনী জোর কদমে ঠেলে সামনে এগুতে চাচ্ছিল। কিন্তু মুজাহিদদের ধারালো তরবারি ও চকচকে বর্শার ঘাত-প্রতিঘাতে রক্তাক্ত হয়ে প্রতিনিয়ত পিছু হটতে হচ্ছিল তাদের। দ্বিতীয় দিনের এই যুদ্ধটা এতই প্রচণ্ড হয়ে উঠেছিল যে, কলম-কালিতে তা প্রকাশ করতে অক্ষম সমস্ত শব্দগুচ্ছ। দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধও চূড়ান্ত ফয়সালা ছাড়াই সমাপ্ত হল। ইসলামের এ নিকৃষ্ট শত্রুদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, মুসলিমজাতি দুর্বলতা ও শক্তিহীনতার চূড়ান্তে পৌঁছেও মাথায় কাফন বেঁধে যখন অবতরণ করে ময়দানে, তখনও তারা অলৌকিক সব কাণ্ডকীর্তি আঞ্জাম দিয়ে ওঠার যোগ্যতা রাখে।

প্রকৃতপক্ষে মুষ্টিবদ্ধ এই মুসলমানেরা যে লাগাতার দুইদিন তলোয়ার ও বর্শার আঘাতে তাতারদের এ শয়তানি সয়লাব রুখে উঠেছিল, তা কোনো মুজিযার চেয়ে কম কিছু নয়। রাজ্যহারা, সামানপত্তরহীন স্বল্পসংখ্যক মুজাহিদ, যারা দু-দিনের কঠিন যুদ্ধে নিছক আল্লাহর অনুগ্রহ ও সাহায্যের জোরে শত্রুর সম্মুখে সিসাগলা প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, তৃতীয়দিনের যুদ্ধের জন্য আল্লাহর দরবারে এমন বিপুল সাহায্য প্রার্থনা করল যে, তিনি যেন আগামীকালের যুদ্ধে তার বিস্ময়কর কুদরতের স্পষ্ট প্রকাশ ঘটান, বাহ্যিকভাবে অসম্ভব মনে-হওয়া এ বিজয়কে যেন সহজতর করে দেন! তাদের এখন একটি সম্মানজনক জীবন কিংবা বীরোচিত শাহাদাতের মৃত্যু ব্যতীত কোনো কিছুর আশা নেই।

তৃতীয় দিন : নিষ্পত্তিমূলক লড়াই

৮ শাওয়াল, হিজরি ৬১৮ (২৪ নভেম্বর, ১২২১)। মরুভূমির বালুরাশির উপর মায়াময় কিরণ ছড়িয়ে উদিত হচ্ছে ভোরের রক্তিম সূর্য। আজ একটা নিষ্পত্তিমূলক চূড়ান্ত যুদ্ধের দিন।[৪৫৩] পুরো আসমান-জমিন আজ ঝিমধরা ঔৎসুক্য ও নীরবতা নিয়ে দুইপক্ষের মধ্যকার জীবন-মৃত্যুর লড়াইয়ের ফল দেখতে অপেক্ষমাণ। একদিকে সারিবদ্ধ হয়ে উঠেছে সেই সম্প্রদায়, যাদের পূর্বপুরুষেরা লাত-ওজ্জাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে মরু-আরবের ভেতর বিপুল শক্তি নিয়ে জেগে উঠেছিলেন এবং তাদের সয়লাবে ছেয়ে গিয়েছিল পুরো জাহান। এরা হচ্ছে সেই জাতি, বহু শতাব্দী ধরে সমস্ত বনি আদমের সুরক্ষার দায়িত্ব পালন করেছে যাদের তরবারি। যারা দুনিয়াকে ঈমান-

---

[৪৫৩] ইবনুল ওয়ারদি, ৩/২২৯; শাজারাতুয-যাহাব, ৫/৭৮; বিভিন্ন ইঙ্গিত দ্বারা বুঝা যায় এই ইতিহাসই সঠিক; কিন্তু আতা মালিক জুওয়াইনি ও মিরখান্দের বর্ণনা অনুযায়ী এই যুদ্ধ রজব মাসে সঙ্ঘটিত হয়েছে। দেখুন জাহাঁকুশা, ১/১৭; রওজাতুস সফা, ৪/৮২৮; এবং তারিখু মুখতাসারিদ-দুওয়াল, ২৩৬;

মারেফাত, আখলাক, পুরাকীর্তি, ইলম ও শাস্ত্রীয় জ্ঞানের মূল্যবান মূলনীতি আবিষ্কার করে দেখিয়েছে।

অন্যদিকে আছে সেই সম্প্রদায়, যারা ছিল গোবি মরুভূমির জাহিলিয়াত, পশুত্ব ও হিংস্রতার জনক। মানবজাতির রক্তে হস্ত-রঞ্জিত করে যাদের উত্থান ঘটেছে। ইতিহাসের সবচেয়ে জুলুমবাজ শাসক আজ বাহিনীর ঠিক মাঝখানে অনেকটা উঁচুতে দাঁড়িয়ে সীমাহীন ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের সাথে পর্যবেক্ষণ করছেন বিরোধীপক্ষের যুদ্ধসারি। তবে এই যুদ্ধসারি দেখে চেঙ্গিজের হঠাৎ মনে হল—মুসলিমদের শৃঙ্খলাবদ্ধ সারি আজ শক্ত লোহার একটা অনতিক্রম্য প্রাচীর হয়ে উঠেছে। চেঙ্গিজ খান অবশ্য আশার আলো ফুটে উঠতে দেখছিলেন। কারণ, আজকে তাতারদের অনেক বেশি সেনাশক্তি মিলেছে। খাওয়ারিজম থেকে উকতাই ও চোগতাইও নিজ নিজ বাহিনী-সমেত সিন্ধুপারের এই রণাঙ্গনে এসে পৌঁছেছে। এতে তাতাররা সর্বদিক থেকে ছাড়িয়ে গেছে মুসলিমদের।[৪৫৪]

বিগত দুদিনের যুদ্ধে তাতারদের ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি তাদের সৈন্য-সংখ্যাতেও একে-একে পতন ঘটছিল। কমে আসছিল শক্তি। তাতাররা সংখ্যাধিক্যের কারণে নিজেদের শতশত সেপাই মরে যাওয়াতেও তেমন চিন্তিত ছিল না, যতটা হয়রান হয়ে পড়েছিল মুসলিমবাহিনী তাদের দশজন লোকের স্বল্পতাতেই। তা ছাড়া এই পাহাড় ও নদীর কুদরতি দুর্গের ভেতর, যেখান থেকে কোথাও বেরিয়ে যাওয়া ছিল অসম্ভব, খাদ্যখোরাকি, রসদপত্রসহ মানবীয় মৌলিক প্রয়োজনগুলো পূরণ করতে-পারা থেকে সুলতানের সেনাশিবির ছিল বঞ্চিত। এই কঠিন মুহূর্তে, গতকাল যারা আঘাত পেয়েছিল, অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাদের সামলে রাখতে পারাও ছিল অনেক বড় একটা ব্যাপার। এই হালচিত্র দেখে সুলতান বুঝে গিয়েছিলেন আসল বাস্তবতা। তিনি বোধ করে উঠেছিলেন—সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রবল দুর্দশাগ্রস্ত হতে থাকবে মুসলিমদের অবস্থা। মুসলিমরা যদি আজকের যুদ্ধটাকে সিদ্ধান্ত-নিরূপক চূড়ান্ত যুদ্ধ বানিয়ে তুলতে না-পারে, তবে এই যুদ্ধে জেতার খানিক যে সম্ভাবনা রয়েছে, আগামীকাল সেটুকুও নিঃশেষ হয়ে যাবে।

সুলতানের হেকমতপূর্ণ কর্মপন্থা

এইসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ রেখে, যেভাবেই হোক, তৃতীয় দিনের যুদ্ধকে ফলদায়ক করে তুলবার জোরালো সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন সুলতান। তিনি জানতেন—তাতারদের জনসংখ্যা মুসলিমদের অনেক বেশি ছাড়িয়ে গেছে। এই সময়ে অস্বাভাবিক শক্ত একটা আঘাত দেওয়া ছাড়া তাদের জনসংখ্যার এই প্রবৃদ্ধি নিঃশেষ করা যাবে

---

[৪৫৪] জাহাঁকুশা, ১/১০৬;

না। সুলতানের এই বিশ্বাসও ছিল—তাতারদের জন্য তাদের নেতা চেঙ্গিজ খানের মৃত্যুর চেয়ে কঠিন ও ভয়ানক ঝটকা কিছু হতে পারে না।

এবার এই রক্তপায়ী দানবটা প্রথমবারের মতো নিজে এসে সুলতানের মোকাবেলায় যুদ্ধক্ষেত্রে বিদ্যমান। সুলতান ব্যাপারটা কাজে লাগাতে পরিকল্পনা করলেন—এইবার আমার প্রধান কাজ হচ্ছে খোলা ময়দানে চেঙ্গিজ খানকে হত্যা করা। সুলতানের বিশ্বাস—যদি তিনি এই কাজটা করে উঠতে পারেন, তাতারদের ভেতর ঢুকে পড়বে এক অলৌকিক কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা। সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও তাদের দৃঢ় কদম এমনভাবে উপড়ে যাবে যে, দ্বিতীয়বার কোথাও জমে দাঁড়ানো মুশকিল হয়ে উঠতে পারে তাদের জন্য। চেঙ্গিজের নাগাল পর্যন্ত পৌঁছতে তাতারদের মধ্যিখানের মূল রক্ষীবাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া ছিল জরুরি। তবে এটা কোনো সাধারণ ও সহজ কাজ ছিল না। তাতারদের অধিকাংশ সৈন্য সেন্টারের মূল বাহিনীকেই ঘিরে রয়েছিল। তাদের ভেতর স্বয়ং চেঙ্গিজ খানের লৌহবর্ম পরিহিত রক্ষীদলটির সংখ্যাই ১০ হাজারের কম ছিল না।

তবে সুলতানের জন্য তার সীমিতসংখ্যক সৈন্যকে নিয়ে চেঙ্গিজ খানের রক্ষীদলের কাতার চিরে আসল টার্গেট পর্যন্ত পৌঁছাও অসম্ভব কিছু ছিল না। এর জন্য প্রধান বাহিনীতে বেশিসংখ্যক সৈনিক নিযুক্তির দরকার ছিল। তখন এই কাজটা যেহেতু অবশ্যকর্তব্য হয়ে পড়েছিল, এজন্য সমস্ত শঙ্কা ধামাচাপা দিয়ে প্রয়োজন ছিল সৈনিকদের কাঙ্ক্ষিত সংখ্যা পূরণ করে ওঠা।

যথেষ্ট চিন্তাভাবনার পর এই উদ্দেশ্যে সুলতান ফয়সালা করলেন যে—মূল টার্গেট বাস্তবায়নের সময় বাম বাহুর সৈনিকরা মাঝখানে এসে যোগ দেবে। গতদিনের যুদ্ধে খাওয়ারিজমি সেপাইদের বাম বাহুকে তাতারদের আক্রমণের মুখে তেমন পড়তে হয়নি। কারণ, পাহাড়ি ঘাঁটির আশ্রয়ে থাকায়, বলা যায়, তারা একটি প্রাচীরের নিরাপত্তার ভেতর ছিল। তারা শুধু প্রতিরোধের মতো করে তাতারদের থেকে সৈন্যদলের বাম বাহুকে বাঁচিয়ে রাখতে একটি নিরাপদ সৈন্যদলের মতো ময়দানে বিদ্যমান ছিল। সুলতানের ধারণা, আজকেও তাতারদের সঙ্গে যুদ্ধ করার সুযোগ আসবে না বাম বাহুর। তবে তার এ অগ্রগামিতায় এই সংশয়ও নিশ্চয় ছিল যে, কোনোভাবে তাতাররা যদি পাহাড়ের পেছন থেকে এসে বাম বাহুর উপর হামলা করে বসে, তা হলে ওখানকার সৈন্য-স্বল্পতা পুরো বাহিনীর জন্য হয়ে উঠবে ধ্বংসাত্মক।

এইসব শঙ্কা সত্ত্বেও মুসলিমদের সেদিন এই ঝুঁকিটা নিতেই হয়েছিল।

আজকের সামগ্রিক কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হল—যুদ্ধের প্রথম কয়েক ঘণ্টায় তাতারদের বাম বাহুর উপর ধ্বংসাত্মক হামলা চালিয়ে রণক্ষেত্রে তাদেরকে এমনভাবে ব্যস্ত করে তুলতে হবে, যাতে সেন্টারের মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাদের মনোযোগ। কয়েক ঘণ্টার লড়াইয়ের পর প্রতিপক্ষ যখন তাদের সমস্ত

শক্তি যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়োগ করে দেবে, সকালবেলা তাদের ভেতর যে-রকম তেজ ও শক্তি কাজ করেছিল, তা কমে আসতে দেখা যাবে, সুলতান তখন বাম বাহুর তাজাপ্রাণ সৈনিকদের মূল সেনাদলে শামিল করে, চেঙ্গিজ খানের নেতৃত্বে-থাকা তাতারদের সেন্টারের ভেতর আক্রমণ চালিয়ে, চেঙ্গিজ খান পর্যন্ত পৌঁছার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাবেন। সুলতানের সম্মুখ থেকে পিছিয়ে যাবার অপমান নিশ্চয় সহ্য করবে না চেঙ্গিজ খান। তখন যদি মহান আল্লাহ সহায় হন, খানকে হত্যা করে এই তাতার-ফেতনা থেকে পুরো পৃথিবীকে মুক্ত করে ফেলতে পারবেন তিনি।

যুদ্ধের শুরু

সূর্যের রোশনি ছড়িয়ে পড়তেই শুরু হয়ে গেল এক ভয়ানক যুদ্ধ। মুজাহিদবাহিনী নিজেদের লোকস্বল্পতার দিকে না-তাকিয়ে, একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে, আপাত-অসম্ভব বিজয় নাহয় শাহাদাত লাভের জন্য রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে নেমে পড়লেন। কয়েকদিনের বিপুল ক্লান্তি সত্ত্বেও তাজা স্পৃহা নিয়ে দুশমনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলেন। যুদ্ধের ফাঁকে সূর্যটা কখন মাথার উপর উঠে গেছে, কারুর খবর রইল না। ওদিকে দিনের প্রথমভাগের সূর্য পুড়িয়ে দিচ্ছিল সমস্ত চরাচর, এদিকে যুদ্ধের দাউ দাউ অগ্নি মনুষ্যসম্প্রদায়কে জ্বালিয়ে করে দিচ্ছিল ছাইভস্ম। রক্তে লাল হয়ে গেল বালুকাময় জমিন। দেহ এফোঁড়-ওফোঁড় করে উড়ে যেতে লাগল বিষাক্ত তির। তরবারির কোপে ঘাড়ের উপর থেকে মস্তক আলাদা হয়ে ধপাধপ মাটিতে পড়তে লাগল।

আল্লামা ইবনুল আসির তার ইতিহাসগ্রন্থে এ যুদ্ধের অবস্থা সংক্ষিপ্ত অথচ বিপুল অর্থবোধক এক বাক্যে প্রকাশ করে গেছেন। লিখেছেন—'তাদের সবাই একথা স্বীকার করেছে যে, এই যুদ্ধের তুলনায় বিগত সমস্ত যুদ্ধ ছিল স্রেফ একটা তামাশা পর্যায়ের।'[৪৫৫]

আমান মালিকের বীরত্ব

লড়াইয়ের শুরুর দিকেই মুসলিম বীরদের অনুপম যুদ্ধকৌশল তাতারদের জন্য ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠেছিল। সুলতান জালালুদ্দীনের হুকুম অনুযায়ী দক্ষিণ হস্তের সেনানায়ক আমান মালিক তাতারদের বাম বাহুটিকে শুরু থেকেই জবরদস্ত আক্রমণের মুখে রেখেছিলেন। সেদিনকার আকাশ অবাক হয়ে দেখল যে, আমান মালিকের মাত্র কয়েক হাজার সিপাহি তাতারদের বাম বাহুকে অত্যন্ত মন্দভাবে পেছনে হটিয়ে দিয়েছে। ফলে, তাতারদের বাম বাহু সেনাদল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নদীর পার ধরে উত্তরদিকে পিছপা হয়ে গেল। পেছন থেকে তাদের শক্ত ধাওয়া করলেন আমান মালিক। এতে বিক্ষিপ্ত এ তাতার-বাহিনীটি নদীর পার ধরে পিছু হটতে থাকল।

---

[৪৫৫] ইবনুল আসির, ৭/৫৯৪;

অনুকূল এক জায়গায় পৌঁছে তারা চেঙ্গিজ খানের এক পুত্রের কমান্ডে দ্বিতীয়বার কাতারবন্দি হয়ে ওঠে। ঘুরে দাঁড়িয়ে আমান মালিকের বাহিনীর উপর আক্রমণ করে বসে। ফের একবার তলোয়ারের ঘাত-প্রতিঘাতে চমকে উঠতে থাকে অগ্নিময় বিজলি। আমান মালিকের বাহাদুর সৈনিকরা এতটা বীরত্বের সাথে আক্রমণ চালিয়ে যায় যে, আরও একবার হড়কে যায় তাতারদের যুদ্ধমত্ত পা। ফের তারা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বিক্ষিপ্তভাবে ভাগতে শুরু করে।[৪৫৬]

বাম বাহুর হালচিত্র

মুসলিম সৈন্যদলের বাম বাহু প্রস্তরকঠিন সেই পাহাড়ের কোলে কাতারবদ্ধভাবে অপেক্ষমাণ ছিল। পাহাড়ের চূড়াতেও জায়গায় জায়গায় মোতায়েন-করা ছিল তিরন্দাজ-বাহিনী। একসময় তাতার-বাহিনীর বাম বাহুটি ওদিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করল। কিন্তু একে তো ছিল পাহাড়ি দেয়ালের কুদরতি প্রতিবন্ধকতা, তদুপরি চূড়ায় পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তিরন্দাজ-বাহিনী। তাদের প্রচণ্ড তিরবৃষ্টির ভেতর সম্মুখে অগ্রসর হওয়া ছিল আত্মহননের সমার্থক। এ-কারণে আর সামনে এগোল না তাতারদের বাম বাহু। ওখানেই থেমে পড়ল।

যুদ্ধের সংকল্পে চোয়াল শক্ত হয়ে-ওঠা সুলতান জালালুদ্দীন খাওয়ারিজম শাহ মূল বাহিনীর মাঝখানে থেকে দৃঢ়ভাবে লড়ে যাচ্ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রের প্রতিটি কোণে অত্যন্ত হুঁশিয়ার ও সজাগ দৃষ্টি রাখছিলেন তিনি। তাতারদের আক্রমণ থেকে বাম বাহু নিরাপদ রয়েছে দেখে চুপিচুপি সেখান থেকে কয়েকজনকে সরিয়ে এনে আমান মালিকের অগ্রসরমান সৈন্যদলের সাহায্যের জন্য পাঠিয়ে দিলেন, যাতে ওদিকে তাতারদের বাম বাহুটাকে পুরোপুরিভাবে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা যায়।[৪৫৭]

মধ্য-আকাশে তখন পুরো দাপটের সঙ্গে ঝকঝক করছে সূর্য। লড়াইয়ের আগুন মৃত্যুর ভয়াল থাবা হয়ে লকলক করে ঝুলছে। যুদ্ধক্ষেত্রের গোধুমরঙা ধুলোবালির ঘনকৃষ্ণ ঝড়ে ছেয়ে গেছে চারপাশ। এর ভেতরেও ধারালো তরবারি ও বর্শার চকমকানি বিজলির মতো অনবরত ঝলকে উঠতে দেখা যাচ্ছে।

জীবন-মরণের বাজি

কয়েক ঘণ্টার লড়াইয়ের পরে যুদ্ধ সেই কেন্দ্রবিন্দুতে এসে পৌঁছল, সুলতান পূর্বেই যার পরিকল্পনা সাজিয়ে রেখেছিলেন। তা ছিল জীবন কিংবা মৃত্যুর দুঃসাহসিক বাজি। সুলতান ভেবে রেখেছিলেন—এতে আসতে পারে শানদার বিজয়, নতুবা আসবে গ্লানিকর পরাজয়। কিন্তু শাহাদাতের নেশায় পাগল মুসলিম বীরদের জন্য

---

[৪৫৬] চেঙ্গিজখান, অধ্যায় ২০, পৃষ্ঠা ১৫১, ১৫২;

[৪৫৭] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ১০, পৃষ্ঠা ১৫২;

এমন পরাজয়ও হয়ে ওঠে রহমত, যা স্রষ্টার নিকট তাদের অত্যধিক গ্রহণযোগ্য করে তোলে। এবার সুলতান বিজয় অর্জন নাহয় শাহাদাত পাবার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে প্রস্তুতি নিলেন সরাসরি চেঙ্গিজ খানের উপর হামলা করবার। অতি সন্তর্পণে বাম বাহুর নিরাপদ সেনাদল থেকে ছোট ছোট কয়েকটি সৈন্যদলকে সেন্টারে অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। তার যথাসাধ্য প্রচেষ্টা ছিল—তাতার-বাহিনী যেন মুসলিমদের বাম বাহুর এই সৈন্য-স্বল্পতার কথা টের না পায়। অন্যথায় ফল হয়ে যাবে খুব ভয়ানক। সুলতানের সাথে যুদ্ধরত বাহুর একাংশ প্রথমেই দক্ষিণ বাহুর সাহায্যে চলে গিয়েছিল। আর এখন বাম বাহুর বহু সিপাহি সুলতানের হুকুম-মাফিক রক্ষীদলে এসে যোগ দিল। এতে করে ইসলামি বাহিনীর বাম বাহুর অধিকাংশ ফৌজ সেন্টার ও ডান বাহুতে গিয়ে শামিল হল। বাম বাহুতে অবশিষ্ট রয়ে গেল মুষ্টিবদ্ধ কিছু সিপাহি ও তিরন্দাজ।

সুলতান জালালুদ্দীনের মতো দক্ষ, পারদর্শী ও যোদ্ধা লিডারের ব্যাপারে আমরা যেন এই ভুল ধারণার শিকার না হই যে, সেদিন বাম বাহুর সুরক্ষার ব্যাপারে গাফেল ছিলেন তিনি। বাস্তবতা হল—বাম বাহুর লোক কমিয়ে ফেলা তার গাফলতি কিংবা ভুল সিদ্ধান্ত ছিল না; বরং বলা যায়, এ ছিল সুলতানের একপ্রকার অপারগতা। সেদিন সুলতানের বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা শত্রুবাহিনীর এক-দশমাংশ পরিমাণও ছিল না।

সেন্টার ও বাম বাহু, যারা তাতারদের সাথে তুমুল যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল তখন, এই সৈন্য-স্বল্পতারই শিকার হয়েছিল। এই দুই অংশেই প্রতিমুহূর্তে তাজাপ্রাণ সৈনিকের দরকার পড়ছিল। যদি মুসলিমবাহিনীর বাম বাহু পাহাড়ের সেই দুর্গে নিরাপদ না-থাকত, তা হলে নিশ্চিত সুলতানের লড়াই চালিয়ে-যাওয়া এই সৈনিকদের সাহায্যের জন্য কোনোখান থেকেও দুয়েকজন লোকও মিলত না। ও-সময় বাম বাহু নিরাপদ থাকবার কারণেই লড়াইরত যুদ্ধসারির জন্য তাজাদম কিছু সিপাহি মিলেছিল।

বাম বাহু থেকে সাহায্য গ্রহণ করতে না-পারার ক্ষেত্রে ডান বাহুর ও সেন্টারের সৈন্যদলের পরাজয়ের যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল। এজন্য সুলতান এই দুই অংশকেই মজবুত করে-তোলা জরুরি মনে করেছিলেন। তিনি জানতেন, বাম বাহুতে লোকসংখ্যার স্বল্পতার দরুন যেকোনো মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। তা সত্ত্বেও বাম বাহু থেকে সৈন্য কমিয়ে এনে সাহায্য হিসাবে তাদেরকে অন্যদিকে পাঠিয়েছিলেন; তিনি দেখছিলেন—এমনটা না-করার ক্ষেত্রে রয়েছে সুনিশ্চিত পরাজয়। কারণ, জনশক্তির স্বল্পতার দরুন না বেশিক্ষণ ইসলামি বাহিনীর সেন্টারের সেনাদল শত্রুদের মোকাবেলা করতে পারত, না-পারত দক্ষিণ বাহু। বরং সৈন্য-স্বল্পতার কারণে যুদ্ধলিপ্ত এই দুই অংশেই যেকোনো মুহূর্তে পরাজয় ঘটে যেতে পারত।

প্রকাশ থাকে যে, সাধারণত তাৎক্ষণিক ও সুনিশ্চিত প্রয়োজনকে আগত সম্ভাব্য প্রয়োজনের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে। বাম বাহুর, যেখান থেকে সৈন্যবল কমিয়ে ফেলা হয়েছিল, সে-সময় তাদের কোনো ধরনের কর্মব্যস্ততা ছিল না। শত্রুর আক্রমণ থেকেও তারা নিরাপদ ছিল। তা ছাড়া এই আশাও করা গিয়েছিল যে, শত্রু যদি ওদিক থেকে হামলা করবার চেষ্টা করে, তা হলে সম্মুখে অনতিক্রম্য পর্বতশ্রেণি দেখে উবে যাবে তাদের সেই সাহস। তাদের দমিয়ে রাখার জন্য চূড়ায় বিদ্যমান তিরন্দাজ-বাহিনীই যথেষ্ট হয়ে উঠবে।

আমাদের একথা মনে রাখতে হবে, যে-নাজুক পরিস্থিতির ভেতর এই যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, সেখানে দুটো সম্ভাবনাই ছিল; হয়তো পূর্ণাঙ্গ বিজয় নতুবা একেবারে পরাজয়। যা-কিছুই তখন হবার ছিল, তার জন্য প্রথম কয়েক ঘণ্টাই ছিল কার্যকরী। না পিছু হটবার মওকা ছিল, না ছিল ভবিষ্যৎপ্রস্তুতির কোনোরূপ ধারণা, যে-ভরসায় বাঁচিয়ে রাখা যেত নিজেদের লোক-লশকর।

কঠিন সব পরীক্ষার ভেতর দিয়ে যাওয়া ইতিহাসের অন্যসব সেনাপতির মতো সুলতানও এমন এক ভয়ংকর পরিস্থিতির মুখে পড়েছিলেন, যেখানে কোনো-একটা সিদ্ধান্ত নেবার জন্য তার হাতে ছিল মাত্র একমুহূর্তকাল। আক্ষরিক অর্থেই একমুহূর্ত সময়। এমনতরো পরিস্থিতির ভেতর একজন দুঃসাহসী সেনাপতি তাৎক্ষণিকভাবে একটি দিক প্রাধান্য দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন স্বীয় মিশন বাস্তবায়নে।

সুলতান জালালুদ্দীন সেই নাজুক মুহূর্তে যে অগ্রযাত্রাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন, তাতে সুনিশ্চিত এবং আশু পরাজয়ের আশঙ্কা যেমন ছিল, তেমনি ছিল বিজয়েরও আশা ও সম্ভাবনা। তখন তিনি যদি এই অগ্রযাত্রা পরিত্যাগ করে বসতেন, যেকোনো মুহূর্তে কেবল তাতারদের যুদ্ধের একটা বাহানা ও মাধ্যম হয়ে উঠতে পারতেন; আর কিছু নয়।

সুলতানের ভয়ানক আক্রমণ

বাম বাহু থেকে একটা সহযোগী দল তলব করে নিজ নেতৃত্বেই মাঝখানের সেনাদলকে অধিকতর মজবুত করে তুললেন সুলতান জালালুদ্দীন। তারপর আল্লাহর কুদরতে কামেলার উপর ভরসা করে তিনি সংকল্পবদ্ধ হয়ে উঠলেন যে, চেঙ্গিজ খানকে হত্যা করে তার এই ফেতনা চিরতরে নির্মূল করে দেবেন। এই ইস্পাত-কঠিন সংকল্প নিয়ে প্রতিপক্ষের সেন্টারে থাকা বাহিনীতে শক্ত আক্রমণ করলেন তিনি। তাতারদের প্রথমদিককার যুদ্ধসারিগুলো প্রাণপণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মুজাহিদদের এই আক্রমণ রুখে উঠতে পারল না। মুহূর্তের ভেতর অজস্র লাশের স্তূপ ফেলে দিয়ে সম্মুখে এগিয়ে গেল সুলতানের চিকচিকে তলোয়ার। সম্পূর্ণ ওলটপালট হয়ে গেল তাতারদের যুদ্ধসারি।

মুখোমুখি : খাওয়ারিজমের শার্দূল ও গোবির ভল্লুক

খোলা প্রান্তরে, দূর থেকেই চেঙ্গিজ খানের অবস্থান ও তার উপর ছায়া বিস্তার করে-থাকা তাতারদের উড়ন্ত পতাকার দোলন দেখে ফেললেন সুলতান। দেখতে পেয়েই গায়ের সমস্ত শক্তি নিয়ে, ঘোড়া ছুটিয়ে, প্রবলবেগে সামনে অগ্রসর হতে লাগলেন। চলন্ত ঘোড়ার পিঠে বসেই ইসলামের নিকৃষ্ট শত্রু চেঙ্গিজ খানকে খুঁজছিলেন তিনি। চেঙ্গিজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, একেবারে চোখে চোখ রেখে, ঘাড় থেকে তার মস্তক আলাদা করে ফেলবার জন্য বড় উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। পরক্ষণেই, এই জোশ ও জজবার ভেতরেই শত্রুবাহিনীর যুদ্ধসারি পদদলিত করে দিয়ে চেঙ্গিজের রক্ষীদল পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন তিনি। দেখতে পেলেন—লৌহবর্ম পরিহিত হাজার-হাজার তরবারিধারী দেহরক্ষীর কঠোর পাহারার ভেতর, প্রশস্ত বক্ষ ও সুগঠিত-কঠিন দেহের ক্ষমতাধর এক লোক ঘোড়ার পিঠে বসে, সতর্ক চোখে, ডান ও বামদিকের পুরো যুদ্ধক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করে চলেছে। বয়সের আধিপত্যের কারণে লোকটার প্রশস্ত, চওড়া ও ভীতিপ্রদ চেহারা হালকা-হালকা কুঁচকে গেছে। থুতনির ঝিরঝিরে-অসংলগ্ন লম্বা দাড়ি হয়ে উঠেছে ধবধবে সাদা।[৪৫৮] সুলতান চিনতে পারলেন—এ-ই হচ্ছে সেই চেঙ্গিজ খান, জগতের সবচেয়ে বড় হন্তারক।

চেঙ্গিজকে দেখেই জালালুদ্দীনের চোখ দিয়ে ঠিকরে বেরোতে লাগল জ্বলন্ত অগ্নিশিখা। তিনি এমন প্রচণ্ড আক্রমণ করে বসলেন যে, লৌহবর্ম-পরা রক্ষীদলের সারি নিমেষে কচুকাটা হয়ে গেল। তখন চেঙ্গিজের চোখের সামনে ছিল মৃত্যুর কালো ছায়ার বিস্তার। আলাউদ্দীন মুহাম্মদ খাওয়ারিজম শাহের বীর পুত্রের তরবারি-ধরা হাত চেঙ্গিজ খানের গ্রীবা পর্যন্ত পৌঁছতে যাচ্ছিল। কয়েকজন মুজাহিদ চেঙ্গিজ খানের ডানে-বামে ও সামনে অপ্রতিরোধ্য দেয়াল হয়ে আশপাশ থেকে অগ্রসরমান আক্রমণোদ্যত তাতার রক্ষীদের ছিন্নভিন্ন করতে করতে চেঙ্গিজ খানের একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। চেঙ্গিজ খান নিজে অবশ্য এই যুদ্ধ থেকে শেষ পর্যন্ত বেঁচে গিয়েছিলেন। কিন্তু মারা পড়েছিল তার ঘোড়াটি। তারপর গোবি মরুভূমির এই হায়না খাওয়ারিজমের দুর্ধর্ষ সিংহের সামনা-সামনি মোকাবেলা করবার সাহস কর না। বীরত্ব ও সাহসিকতার পরীক্ষায় সুলতানের কাছে হেরে গেল সে।

সমস্ত লজ্জা-সম্মান ও ব্যক্তিত্বের উপর 'প্রাণ'টাকে প্রাধান্য দিয়ে তৎক্ষণাৎ চেঙ্গিজ খান ঘোড়া বদল করলেন। কিছু দেহরক্ষীর সহায়তায় চম্পট মেরে ছুটে ভাগতে লাগলেন।[৪৫৯] চোখের পলকে ধূলিঝড়ের ঝাপসা আঁধারের ভেতর মুজাহিদদের দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে গেলেন তিনি। খানের এ কর্মপন্থা এটাই প্রমাণ

---

[৪৫৮] ইসলামি এনসাইক্লোপিডিয়া, ৭১৭;

[৪৫৯] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২২/২৪০; চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ২০, পৃষ্ঠা ১৫২; নিহায়াতুল আরাব, ৭/৩৬৬; তারিখে খাওয়ারিজম শাহি, ১৪৫;

করে যে, সাধারণত তাকে উদ্দীপ্ত বীর কিংবা সাহসী ভাবা হতো, কিন্তু মূলত ততখানি তিনি ছিলেন না। তবে হ্যাঁ, মওকা বুঝে কর্মসম্পাদন, চতুরতা ও নিষ্ঠুরতায় তিনি নিজেই ছিলেন নিজের দৃষ্টান্ত।

চেঙ্গিজ খানের পলায়নের পর লক্ষ্যস্থল থেকে বহুদূরে ছিটকে পড়লেন সুলতান জালালুদ্দীন। তবু শত্রুদলের মূল বাহিনীর উপর ধাওয়া জারি রাখলেন তিনি। কিন্তু দুশমন নিজেদের লিডার নিরাপদ আছে জেনে স্থিরভাবে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। তা ছাড়া তাতারদের পেছন-দিকের সারিগুলো দু-দুবার শক্ত সংঘর্ষ করে তাদের মূল বাহিনীকে পুরোপুরিভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে-যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে ফেলল। তবু লড়াইয়ের আসল সুতো মুসলিমদের হাতেই ছিল তখনও। বিজয় খুবই নিকটে মনে হচ্ছিল। তাতারদের মাঝখানের সেনাদল ক্লান্তিতে একেবারে ভেঙে পড়েছিল। অনবরত পিছপা হচ্ছিল দক্ষিণ বাহু। বাম বাহু তখন অগ্রযাত্রায় সম্পূর্ণ অক্ষম।

কিন্তু দিনের শেষপ্রহরে এসে লড়াইয়ের দৃশ্যপট ধীরে-ধীরে বদলে যেতে লাগল। চেঙ্গিজ খানের এক সূক্ষ্ম চক্রান্তমূলক পরিকল্পনা মুসলিমদের প্রায় জয় হয়ে-যাওয়া এই যুদ্ধেরও মোড় ঘুরিয়ে দিল।

চেঙ্গিজ খানের চাল

তাতারদের মধ্যবর্তী সেনাদলে সুলতান জালালুদ্দীনের ঝটিকা হামলার পর চেঙ্গিজ খান সেখান থেকে পালিয়ে গেছেন। সুলতানের মোকাবেলা করার জন্য তখনও নতুন কোনো প্ল্যান করে ওঠেননি তিনি। আচমকা খান বিস্ময়কর একটি সংবাদ পেলেন। তাকে জানানো হল—ইসলামি বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্য ওদিক থেকে ডান বাহু ও সেন্টারে গিয়ে মিশেছে। আর তাদের বাম বাহুর যুদ্ধসারিতে বাকি রয়ে গেছে খুব কমসংখ্যক সিপাহি।

চেঙ্গিস খানের কাছে এই সংবাদটা তাতার গুপ্তচরেরা সরবরাহ করেছিল, নাকি এই অপরাধ করেছিল মুসলিমদের ভেতরকার কোনো গাদ্দার, সে ব্যাপারে ইতিহাস একদম নিশ্চুপ। তবে অসম্ভব কিছু না যে, সুলতানের বাহিনীরই কোনো নিমকহারাম বিজয় থেকে নিরাশ হয়ে এই মহা মুসিবত থেকে মুক্তি পেতে নিজের জন্য ভেবে রেখেছিল একটাই পথ—কোনোভাবে চেঙ্গিজ খানকে এই গোপন তথ্য জানিয়ে তার বিশ্বস্ত অনুগতদের ভেতর নিজের নামটাও অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া।

যা হোক, এ তথ্য জানামাত্র চেঙ্গিজ খান নির্বাচিত দশ হাজার যোদ্ধা বালা নৈয়ানের নেতৃত্ব প্রদান করে দ্রুতই ওদিকে প্রেরণ করলেন। যাবার সময় বালা নৈয়ানকে নির্দেশ দিয়ে দিলেন—অনেক দূর দিয়ে ঘুরে গিয়ে পাথুরে ওই পাহাড়ের একদম পেছনে গিয়ে পৌঁছবে। পাহাড়ের গা-বেয়ে উপরে উঠে যেকোনো মূল্যে পেছন থেকে সুলতানের বাম বাহুর উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করে বসবে।

পাহাড়টি ছিল অনতিক্রম্য, ডিঙিয়ে যাওয়া একেবারে দুঃসাধ্য। বালা নৈয়ান দশ হাজার যোদ্ধা নিয়ে সেই পাহাড়ের পেছনদিকে গিয়ে পৌঁছল। অদম্য সাহস নিয়ে, লটকে লটকে, পর্বতের পাথুরে গা বেয়ে উপরের দিকে উঠতে লাগল। মাঝেমধ্যেই পা হড়কে হড়কে কোনো-কোনো তাতার-সেনা ছিটকে পড়ছিল নিচে, মৃত্যুকূপে। তবু তারা থামেনি। তারপর দিনের শেষভাগে যুদ্ধ যখন পুরো প্রচণ্ডতায় চলমান, তলোয়ার ও বর্শা থেকে ছড়াচ্ছিল ফুলকি, বারবার পাহাড়ের সেই ঘাঁটির দিকে উঠে যাচ্ছিল চেঙ্গিজ খানের ভয়কাতুরে দৃষ্টি, আতঙ্কিত চোখে ক্রমাগত ওদিকেই তাকাচ্ছিলেন তিনি, ঠিক সেইসময় বালা নৈয়ান তার অধিকসংখ্যক সৈন্যসামন্ত নিয়ে পাহাড়ের ঘাঁটিতে গিয়ে উঠতে সক্ষম হল।

সুলতান জালালুদ্দীনের যে-সমস্ত সেপাই ওখানে পাহারা দিচ্ছিল, তাতারদের সাথে প্রচণ্ড সংঘর্ষ করতে করতে শহিদ হয়ে গেল। বালা নৈয়ানের নেতৃত্বে হাজার হাজার তাতার-সেনা এই শহিদদের লাশ মাড়িয়ে, সন্তর্পণে পাহাড়ের ঢালু বেয়ে, ময়দানে যুদ্ধরত মুসলিমদের অজ্ঞাতে পেছন থেকে নিচে নামতে লাগল। নেমেই বাম বাহুর ছোট সেনাদলটির উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করে বসল। কয়েক মুহূর্তের ভেতর ছিন্নভিন্ন করে দিল তাদের সারি।[৪৬০]

মুসলিমবাহিনীর বাম বাহুর পরাজয়

তখনও সুলতান জালালুদ্দীন চেঙ্গিজীয় বাহিনীর মধ্যবর্তী সেনাদলের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন। ময়দানে তখনও এক কঠিন যুদ্ধ চলমান। কিন্তু চেঙ্গিজ খান সুলতান জালালুদ্দীনের মুখোমুখি হবার মতো কোনো ভুল করে বসেননি। তার আন্দাজ ছিল—যুদ্ধদক্ষতায় এখনো তাকে মৃত্যুর ভয়ানক ঝলক দেখাতে পারেন সুলতান জালালুদ্দীন।

ফলে, প্রথমে তিনি উগ্র তাতার-সেনাদের মাধ্যমে যুদ্ধক্ষেত্রে সুলতানকে প্রতিমুহূর্তে অনিরাপদ রাখা জরুরি মনে করলেন। তারপর খাওয়ারিজমিদের সেন্টারের দিকে ধাবিত না হয়ে, নিজ নেতৃত্বে ভারী লৌহবর্ম-পরিহিত ১০ হাজার অশ্বারোহী নিয়ে যুদ্ধ-ময়দানের সেই অংশে গিয়ে পৌঁছলেন, যেখানে তখনও তাতার-বাহিনীর বাম বাহুর সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন আমান মালিক। আমান মালিকের এই বাহিনীর উপর চেঙ্গিজ খানের হামলা একদমই অকস্মাৎ ঘটে গেল। আমান মালিকের সৈন্যদলও তখন কঠিন সংঘর্ষে মেতে ওঠে। কিন্তু এর মধ্যেই মুসলিমদের বিপরীতে থাকা বাম বাহুর তাতাররাও নতুনভাবে সারিবদ্ধ হয়ে শুরু

---

[৪৬০] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, ১৫৮; নিহায়াতুল আরাব, ৭/৩৬৬; চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ২০, পৃষ্ঠা ১৫২; শাজারাতুয-যাহাব, ৫/৭৮;

করে দেয় রক্তঝরা আক্রমণ। আমান মালিকের সৈন্যদলের কদম উপড়ে যায়। পিছপা হতে হতে তাদের অধিকাংশ সৈন্যই হয়ে যায় শহিদ।

পিছু হটতে হটতে আমান মালিক দেখলেন—তার এবং সুলতান জালালুদ্দীনের নেতৃত্বে লড়াইরত মূল বাহিনীর মাঝখানে যে-দীর্ঘ ব্যবধান ছিল, তাতার-সেনাদের বিপুল সয়লাবে তা এখন ভরে গেছে। তরবারি দিয়ে এদের কেটে কেটে দ্বিতীয়বার মূল বাহিনীর সঙ্গে গিয়ে মিশতে-পারা সহজ ব্যাপার না। হাত থেকে বেরিয়ে গেছে মওকা। ফলে হতাশ হয়ে আমান মালিক প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করলেন। সঙ্গের সৈনিকদের নিয়ে নদীর উত্তর-দিকে রওনা হয়ে গেলেন। তিনি পেশোয়ার পৌঁছতে চাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে, জায়গায় জায়গায় সৈন্য মোতায়েন করে পলায়নরতদের পথ আটকে দিয়েছিলেন চেঙ্গিজ খান। এজন্য তিনি আমান মালিকের সেনাদলকে পালাতে দেখে তাদের পেছনে ধাওয়া করে সময় নষ্ট করেননি। আমান মালিক সহযোদ্ধাদের নিয়ে রাস্তায় নিযুক্ত তাতারদের হাতে পড়ে শহিদ হয়ে গেলেন।[৪৬১]

ছিঁড়ে গেছে যুদ্ধের সুতো

চেঙ্গিজ খান মুসলিমদের বাম বাহু ছিন্নভিন্ন করার পর, নদীর কিনার ধরে সরাসরি সুলতান জালালুদ্দীনের নেতৃত্বে যুদ্ধরত বাহিনীর উপর এসে হামলে পড়েন। এদিকটায় নদীর কিনারায় বিদ্যমান ছিল সুলতানের একটি রক্ষীদল। সুলতানের সৈন্যদলের ভেতর চেঙ্গিজের ভয়ানক আক্রমণ ঠেকাতে এই জানবাজ দলটি শক্ত প্রাচীরের মতো বাধা হয়ে দাঁড়াল। শেষ পর্যন্ত প্রচণ্ড বিক্রমে লড়াই করতে করতে শহিদ হয়ে গেল।[৪৬২]

সুলতান জালালুদ্দীন অনেকক্ষণ ধরে কয়েক কদম দূরত্বেই দেখতে পাচ্ছিলেন আপাত-অসম্ভব এক বিজয়। তার ডান ও বাম বাহু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাওয়ার পর তাকদিরের লিখন তিনি পড়ে ফেলেছিলেন। এক অনুপম মেহনত-মুজাহাদা, কোরবানি ও জানবাজির অসামান্য দাস্তান অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে পরিসমাপ্ত হতে চলছিল।

সুলতান তখন তিনদিক থেকেই তাতারদের কঠিন আক্রমণের মুখে পড়ে গিয়েছিলেন। তার অধিকাংশ সৈনিক শহিদ হয়ে গিয়েছিল। একটি সম্মানজনক মৃত্যু ছাড়া সম্মুখে তখন অন্যকোনো পথ খোলা ছিল না। ফলে সমস্ত শক্তি একত্র করে তিনি চেঙ্গিজ খানের রক্ষীদলের উপর ফের একবার ঝটিকা হামলা করে বসলেন। অসংখ্য শত্রুকে রক্তে-মাটিতে মাখামাখি করে দিয়ে তাদের ক্রমবর্ধমান আক্রমণের

---

[৪৬১] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ২০; পৃষ্ঠা ১৫৩; জাহাঁকুশা, ২/১৪০; সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, ১৫৮; নিহায়াতুল আরাব, ৭/৩৬৬;

[৪৬২] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ২০; পৃষ্ঠা ১৫৩; জাহাঁকুশা, ২/১৪১; সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, ১৫৮; তারিখে খাওয়ারিজম শাহি, ১৪৫;

মুখে উপত্যকার সেই শেষ কোনার দিকে ভিড়ে গেলেন, যেখানে সিন্ধুনদ ও পর্বতশ্রেণি পরস্পরে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে ছিল। সুলতানের বাহিনীর সেনা-শিবির ওদিকেই ছিল। সেখানে অবস্থানরত সুলতানের বিবি-বাচ্চা সবাই নিজেদের ভাগ্যের ফয়সালা দেখবার জন্য অপেক্ষমাণ ছিলেন।

হিংস্র তাতাররা সুলতানের সাধারণ পর্যায়ের সিপাহিদের বিক্ষিপ্ত ও পদদলিত করে, তাদের পেছনে লেগে গেল। বালা নৈয়ান, যে কিনা খাওয়ারিজমি বাহিনীর বাম বাহুর পরাজয়ের কারণ হয়ে উঠেছিল, একদিক থেকে সুলতানের অবশিষ্ট সৈনিকদের খুব করুণভাবে ধাওয়া করে চলছিল। সুলতান জালালুদ্দীন খাওয়ারিজম শাহ প্রায় পাঁচ মাইল পিছিয়ে আসতে আসতে নদীর তীরবর্তী সুউচ্চ পাথুরে পর্বতের পাদদেশে যখন আপন তাঁবুর কাছে এসে পৌঁছলেন, তখন তার সঙ্গে কেবল ৭০০ জানবাজ সৈনিক অবশিষ্ট ছিল।[৪৬৩]

শেষনিঃশ্বাস পর্যন্ত চলবে জিহাদ

এখানে দুপাশ থেকে ছিল পাহাড়ি পাথর আর পেছনদিকে উপমহাদেশের সিন্ধুনদের কিনার। এর মধ্যিখানে আশ্রয় নিয়ে সুলতান জালালুদ্দীন ভাবলেন—এই কয়েকজন সিপাহিকে সঙ্গে নিয়েই ফের নতুন জোশ ও জজবার সাথে তাতারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করবেন তিনি। এই জায়গাটার এমন আয়তনের কারণে তাতাররা স্রেফ সামনে থেকেই আক্রমণ করতে পারবে। এজন্য মুজাহিদরা এখানে খোলা ময়দানের তুলনায় অনেক বেশি সময় ধরে তরবারি চালনার নৈপুণ্য দেখাতে পারবেন।

হেলে-পড়া সূর্যের মৃত-ধূসর আলোয় সত্যের সাহসী সৈনিকবৃন্দ ওখানে ফের একবার ইসলামের চির শত্রুদের উপর আক্রমণ চালাল। সেই যুদ্ধক্ষেত্র, কয়েক ঘণ্টা আগে যা কয়েক মাইল প্রশস্ততাজুড়ে বিস্তার লাভ করেছিল, এবার সিন্ধুনদের তীরবর্তী একটা ছোট্ট কোণে গুটিয়ে এল। সুলতান জালালুদ্দীন দৃঢ়পদ সিপাহিদের নিয়ে শাহাদাতের সম্মানজনক মৃত্যুলাভের জন্য শেষনিঃশ্বাস ও শেষরক্তবিন্দু পর্যন্ত লড়ে যাবার প্রস্তুতি সম্পন্ন করে উঠলেন। তারপর হঠাৎই অগ্রসরমান শত্রুদলের উপর আক্রমণের জন্য উদ্যত ভঙ্গিতে ছুটে গেলেন। বিপুল হই-হুল্লোড়ের ভেতর কঠিন যুদ্ধ বেধে উঠল। সুলতানের তলোয়ার থেকে টপটপ করে পড়ছিল রক্ত। তরবারি চালাতে চালাতে মুঠোর ভেতরেও খানিক রক্ত জমে আঠালো হয়ে এসেছিল। লৌহবর্ম ও পোশাকেও স্থানে-স্থানে দেখা যাচ্ছিল ছোপ ছোপ রক্তের দাগ। সুলতান 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি সমুন্নত করে আহত সিংহের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ছিলেন দুশমনের উপর। তার শক্ত আঘাতে শত্রুদলের যুদ্ধসারিগুলো ওলটপালট হয়ে যাচ্ছিল। দূরদূর পর্যন্ত পিছু হটতে আরম্ভ করেছিল তারা। কিন্তু খুব শীঘ্রই তাদের

---

[৪৬৩] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ২০; পৃষ্ঠা ১৫৩;

তাজাপ্রাণ সৈনিকরা নতুন উদ্দীপনায় অগ্রে বেড়ে সুলতানের উপরে হামলে পড়তে লাগল। সুলতানের প্রাণপ্রিয় সহযোদ্ধারা এক এক করে শহিদ হয়ে যাচ্ছিল। আর সম্মুখ থেকে দুশমনের ত্রিভুজ আকারের বৃত্ত ধীরে-ধীরে সিন্ধুনদের দিকে সংকুচিত হয়ে আসছিল। মুজাহিদবাহিনী সকাল থেকে সন্ধ্যা নাগাদ লাগাতার লড়াই চালিয়ে যাবার পর জ্বলন্ত জখম ও গা অবশ-করা ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছিল তখন। তাদের হাত-পা অবশ ও অনুভূতিশূন্য হয়ে আসছিল। থেকে থেকে টাটিয়ে উঠছিল কাঁধের ও কব্জির হাড্ডি। কিন্তু এই তকলিফের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না-করে তারা স্রেফ শাহাদাতের আশায় লড়ে যাচ্ছিল।[৪৬৪]

সুলতানের পুত্রের শাহাদাত

সুলতান জালালুদ্দীন রক্ত-ঝরা এই যুদ্ধে এতটাই মগ্ন হয়ে পড়েছিলেন যে, নিজের ও পরিবারবর্গের সুরক্ষার খেয়াল থেকে আক্ষরিক অর্থেই বেপরোয়া হয়ে গেছিলেন। যুদ্ধের এই হাঙ্গামার ভেতর তার ৭ বছরের ফুটফুটে নিষ্পাপ পুত্র, যে কিনা বাম বাহুর সেনাকমান্ডার আমান মালিকের নিরাপত্তায় ছিল, বাম বাহু ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলে কীভাবে যেন সে দুশমনের হাতে পড়ে গেল। তাকে গ্রেফতার করে নিষ্ঠুর চেঙ্গিজ খানের সামনে পেশ করা হল। নির্দয় চেঙ্গিজ খান নিষ্পাপ এ জান্নাতি বাচ্চাটাকে তলোয়ারের এক কোপে দু-টুকরো করে ফেললেন।[৪৬৫] ফিনকি দিয়ে চেঙ্গিজ খানের চেহারায় ছিটকে পড়ল রক্তের একটি চিকন ধারা। বাম হাতের চেটো দিয়ে রক্ত মুছতে মুছতে হিংস্র চেঙ্গিজ খান গভীর তৃপ্তি অনুভব করলেন।

সুলতান জালালুদ্দীন যখন এ সংবাদ শুনলেন, বিপুল বেগে পুত্রবিয়োগের একটা বিষমিশ্রিত তির এসে যেন তার কলিজায় বিঁধল। কিন্তু তার অবিচলতায় এতটুকু চিড় ধরেনি। চোখের সামনে যখন ফুটে উঠেছে যুদ্ধের ভয়ানক দৃশ্যপট, হৃদয়ের উত্তাপ ও দরদ-ব্যথার দিকে তাকাবার মতো হুঁশই ছিল না তার। কোনো জিনিসই হয়তোবা রণক্ষেত্র থেকে হটাতে পারত না তার জমাটবাঁধা ধ্যান। কিন্তু হঠাৎ তার কর্ণকূহরে ছিটকে এল কয়েকটি নারীকণ্ঠের আকাশ-কাঁপানো আর্তনাদ। তৎক্ষণাৎ নিজের ভেতর ধাতস্থ হয়ে ওঠেন সুলতান। এই আর্তনাদ ইসলামি বাহিনীর তাঁবুর দিক থেকে আসছিল।

'জালাল, আসো, আমাদের হত্যা করে দাও!'

সুলতান জালালুদ্দীন পেছন ঘুরে দেখলেন, ওদিকে, সিন্ধুনদের তীরে, ক্রমাগত অগ্রসরমান শত্রুদলের ঢেউয়ের সামনে সুলতানের প্রিয়তম মা ও স্ত্রীগণ কোনো আশ্রয়স্থলের সন্ধানে অস্থির ছন্দে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি শুরু করে দিয়েছে। সেই

---

[৪৬৪] রওজাতুস সফা, ৪/৮২৮; জাহাঁকুশা, ২/১৪১;

[৪৬৫] ইবনে খালদুন, ৫/১১৯; ইবনুল ওয়ারদি, ৩/২২৯;

মহামতী মা, নিজের রক্তে যিনি সুলতানকে প্রতিপালন করেছেন, শৈশবকাল থেকে এখন পর্যন্ত পদে-পদে যিনি অজস্র স্নেহ-আদরে তাকে ভরিয়ে তুলেছেন, যাঁর বুদ্ধিদীপ্ত তরবিয়ত একটি মাসুম বাচ্চাকে বীরত্ব, আত্মসম্মানবোধ, সত্যবাদিতা এবং ইসারের (অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া) মণিমাণিক্যে সুসজ্জিত করে পৌঁছে দিয়েছে যৌবন পর্যন্ত, যাঁর সহস্র বরাভয় নিয়ে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে বেরোতেন সুলতান, সেই মা আজ স্বীয় সম্ভ্রমের নিষ্কলুষ আঁচল বাঁচাতে কম্পিত কণ্ঠে কলিজার টুকরোকে ডাকছেন। আর সেই সম্ভ্রম ও রক্ষণশীল বিবিগণ, যাঁরা নিষ্কলঙ্ক ও পবিত্রতার শুভ্র চাদরে আপাদমস্তক সমাবৃত, সুলতানের প্রতি যাঁদের একনিষ্ঠতা, হার্দিক প্রেম ও বিশ্বস্ততা শাহি মহলের প্রশান্তির ভেতর থেকে আরম্ভ করে তুমুল দুর্দশা-ক্লিষ্ট যুদ্ধক্ষেত্র পর্যন্ত এখনো সমানভাবে বহাল রয়েছে, যাঁদের প্রতিটি মুচকি হাসি সুলতানের পরম প্রশান্তির কারণ; আজ এক জান্তব দুশমনের হাতে বন্দি হতে চলেছেন।

সুলতান জালালুদ্দীন তেজোদ্দীপ্ত গতিতে তাদের দিকে ঘোড়া ছোটালেন। তাকে দেখতে পাওয়ামাত্র তার আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মা চিৎকার করে উঠলেন—জালাল!... জালাল!... মরিয়া হয়ে তিনি বলতে লাগলেন, আল্লাহর দোহাই দিচ্ছি তোকে, তুই এসে আমাদের হত্যা করে দে। দুশমনের বন্দিত্ব গ্রহণ থেকে আমাদের বাঁচিয়ে নে।

অতিরিক্ত কিছু বলার কিংবা শোনার সময় ছিল না তখন। সাধারণ অবস্থায় ফুটন্ত তেলের ভেতর ঝাঁপ দিয়ে বসা, নিজ হাতে দেহের গোশত কেটে কেটে ক্ষুধার্ত নেকড়েকে খেতে দেওয়া অথবা নিজেকে জিন্দা দাফন করে দেওয়াও এ থেকে অনেক সহজ বিষয় যে, নিজহাতে প্রিয়তম মাকে তিনি মৃত্যুর ঘুম পাড়াবেন। অথবা অর্ধাঙ্গিনী প্রিয়তমাদের পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে, কোনোকিছু না-ভেবেই সুলতান জালালুদ্দীন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন—এখন জন্মদাত্রী মা ও প্রিয়তমাদের জন্য সিন্ধুনদের পাহাড়সম ঢেউয়ের চেয়ে অন্যকিছু হতে পারে না উত্তম আশ্রয়স্থল।

সুলতান জালালুদ্দীন বুকের মাঝে একটা ভারী জগদ্দল রেখে, অনিচ্ছার সমস্ত বন্ধন ছিঁড়ে, এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য অগ্রসর হলেন। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন, এইসময় সুলতানের ভেতর কেমনতরো ঝড় বয়ে যাচ্ছিল। তারপর একে একে তিনি তার নিকট গচ্ছিত এই পবিত্র আমানতগুলো সিন্ধুনদের কোলে সোপর্দ করে দিলেন। সিন্ধুনদের শোঁ শোঁ গর্জনরত ঢেউয়ের সারি এসে এই পবিত্র দেহগুলি নিয়ে নিল তাদের আলিঙ্গনের ভেতর।[৪৬৬]

---

[৪৬৬] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, ১৫৯; নিহায়াতুল আরাব, ৭/৩৬৬; ইবনুল ওয়ারদি, ৩/২২৯; আবুল ফিদা, ৩/১৫০; ইবনে খালদুন, ৫/১১৯; মনে রাখা উচিত—এরকম পরিস্থিতিতে ইজ্জত বাঁচাবার জন্য পরিবারকে হত্যা করে ফেলা কিংবা আত্মহত্যা করা ইসলামি ফিকহের দৃষ্টিকোণ

সুলতান জালালুদ্দীনের তখন দু-ফোঁটা অশ্রুবর্ষণেরও সুযোগ ছিল না। আচানক ভেতর থেকে একটু আহ করে ওঠেন তিনি। ঝাড়া দিয়ে ওঠে তার সমস্ত শরীর। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে তলোয়ার হাতে ফের যুদ্ধ-ময়দানে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তার প্রতিটি আক্রমণে অনেকগুলো অশ্বারোহী তাতার ঘোড়ার জিন থেকে কর্তিত হয়ে ধপাধপ নিচে পড়ে যায়।

চেঙ্গিজ খানের খায়েশ

চেঙ্গিজ খান স্তম্ভিত নয়নে দেখছিলেন এই তামাশা। সৈনিকদের তিনি আদেশ দিলেন—'যেকোনো অবস্থাতে পড়ুক সুলতান, ওকে আমার নিকট জীবিত ধরে আনো।' এই আদেশ পেয়ে তাতার-সেনারা তির ও বর্শার ধ্বংসাত্মক সব আক্রমণ এড়িয়ে যেতে লাগল। পাশাপাশি তাদের চারপাশের ঘেরাও ধীরে-ধীরে সংকুচিত করে সামনে এগুতে লাগল। সুলতানের দিকে অগ্রসর হতে লাগল তাদের ছোট ছোট সব সৈন্যদল। আর সুলতান তরবারি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একের পর এক তাদের হত্যা করতে লাগলেন। চেঙ্গিজ খান গ্রন্থের লেখক আতা মালিক জুয়াইনি লিখেছেন, 'সুলতান ক্রুদ্ধ সিংহের মতো লড়ে যাচ্ছিলেন'।[৪৬৭]

সুলতানের তরবারি চালানোর এই দক্ষতা খুব আগ্রহ নিয়ে দেখছিলেন চেঙ্গিজ খান। তিনি জানতেন—মানবিক শক্তি ও সক্ষমতার একটা নির্দিষ্ট সীমা থাকে। এজন্য তিনি বিশ্বাস করেছিলেন—অল্পক্ষণের ভেতর এই খেল খতম হয়ে যাবে। ধীরে-ধীরে সুলতান জালালুদ্দীনের সহযোদ্ধারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে শেষে স্বয়ং সুলতানও ক্লান্তিতে হাঁপিয়ে উঠবেন এবং ডাঁটা-কর্তিত ফুলের মতো চেঙ্গিজ খানের ঝুলিতে এসে পড়বেন।

এদিকে তাতার-সেনাদের যুদ্ধের বদলে-যাওয়া ধরন দেখে সুলতান জালালুদ্দীনও চেঙ্গিজ খানের মূল উদ্দেশ্য বুঝে ফেললেন। তিনি শহিদি মৃত্যুর সাথে আলিঙ্গনাবদ্ধ হবার আশায় সর্বশক্তিতে লড়ে যাচ্ছিলেন। তার জন্য এটি ছিল সহ্যের অতীত যে, চেঙ্গিজ খান সুলতানের মস্তক তার থাবার ভেতর নিয়ে যাবে এবং জিল্লতির জিঞ্জিরে আবদ্ধ করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়বে।

ফলে 'যেকোনোভাবে চেঙ্গিজের গ্রেফতারির পরিকল্পনা নিষ্ফল করে ছাড়ব আমি'—এমন একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন সুলতান। এর মধ্যেই শত্রুর সাথে লড়তে লড়তে এমন একটা স্থানে পৌঁছে গেলেন, যেখান থেকে আর কয়েক কদম

থেকে সঠিক নয়; বরং ফুকাহায়ে ইসলাম যুদ্ধ করতে-করতে মারা যাওয়া কিংবা গ্রেফতার হয়ে বন্দিদশায় পড়া এবং তৎপরবর্তী বিভিন্ন পরীক্ষার ভেতর ধৈর্যধারণের জন্য তাকিদ করেন। এক্ষেত্রে অসংখ্য সাওয়াব লাভের নিশ্চয়তাও দেন তাঁরা। এজন্য সুলতান জালালুদ্দীনের এই আমল শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে অনুসরণ কিংবা প্রশংসাযোগ্য কোনোটাই নয়।

[৪৬৭] জাহাঁকুশা, ১/১০৬, ১০৭;

আগে বাড়লেই শত্রুর জালে ফেঁসে যেতেন তিনি। সুলতানের মামাত ভাই আখশ মালিক এতক্ষণ তার সঙ্গে সঙ্গে ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রের এই শঙ্কা দেখে বীরদর্পে সুলতানের ঘোড়ার লাগাম ধরে ফেলল সে। পুরো শক্তিতে টান দিয়ে তাকে শত্রুর আয়ত্তের বাইরে নিয়ে গেল।[৪৬৮]

মৃত্যুর নগ্ননৃত্য

সিন্ধুনদের তীরবর্তী সুউচ্চ পাথুরে টিলার উপর উঠে পেছনে দৃষ্টি দিলেন সুলতান। শত্রুসেনাদের দীর্ঘ বহর বন্যার ফুঁসে-ওঠা জলের মতো তার দিকে এগিয়ে আসছিল। অন্যদিকে পেছনে সিন্ধুনদ এত জোরেশোরে গর্জন করছিল, মনে হচ্ছিল আছড়ে-পড়া একেকটা ঢেউয়ের সাথে কেঁপে উঠছে পুরো মানববিশ্ব। কিংবা ঢেউয়ের আঘাতে আস্ত পাহাড় ভেঙে ঝপাৎ করে নদীর ভেতর পড়ে যাচ্ছে। এমনতরো ঢেউয়ের ভেতর একমুহূর্তের জন্য ঢুকে পড়বার একটুখানি কল্পনাই বড় বড় বীরসেনাদের শরীর ঘর্মসিক্ত করে তোলার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু সুলতান জালালুদ্দীন আল্লাহর উপর ভরসা করে সিদ্ধান্ত নিলেন, শত্রু থেকে বাঁচতে রোষকষায়িত এই সিন্ধুর বুকে ঝাঁপ দেবেন তিনি। সারাদিনের শক্ত যুদ্ধে সুলতানের ঘোড়াটিও খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। ফলে দ্রুত তিনি অন্য একটি তাজাপ্রাণ ঘোড়া নিলেন। সেই ঘোড়া ছিল সিংহের মতো দুঃসাহসী ও চিতাবাঘের মতো দ্রুতগামী। সুলতান ওটায় আরোহণ করলেন। এইদিকে ছুটে এসে ফের একবার আক্রমণ চালালেন সেই তাতারদের উপর, যারা সুলতানের একদম কাছাকাছি পৌঁছে গিয়ে তার শেষ ক'জন সহযোদ্ধার সাথে সংঘর্ষ করছিল।[৪৬৯]

বড় আশ্চর্যের ব্যাপার, এই কঠিন পরিস্থিতিতেও সুলতানের তলোয়ার আকাশের বিজলির মতো ঝলকানি দিয়ে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে অসংখ্য দুশমনের গর্দান থেকে মস্তক কেটে ফেলল। তার এই আক্রমণে তাতার-সেনারা পিছু হটে যেতেই সুলতান জালালুদ্দীন তার ঘোড়ার লাগাম টেনে সিন্ধুর দিকে ফেরালেন। ঘোড়ার উরুর কাছে শক্ত গুঁতো লাগাতেই একছুটে সেটি সিন্ধুতীরের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছল। তীরের এই সুউচ্চ পাথুরে পাহাড় থেকে চল্লিশ ফিট নিচে টক্কর খাচ্ছিল সিন্ধুনদের জোয়ার।

তারিখে খাওয়ারিজম শাহি গ্রন্থের সংকলকের মতে, এই স্থানে সিন্ধুনদের গভীরতা ছিল ১৮০ ফিট।[৪৭০] সেখানে জায়গায় জায়গায় পানির ভেতর থেকে বিরাটাকৃতির ভয়ংকর সব পাথর মাথা উঠিয়ে রেখেছিল।

সুলতান শেষবারের মতো সঙ্গীদেরকে আল-বিদা জানালেন। গায়ের লৌহবর্ম খুলে সজোরে ছুড়ে ফেললেন। তাতারদের উড়ন্ত তির থেকে পিঠ বাঁচাতে হাতের

---

[৪৬৮] জাহাঁকুশা, ২/১৪১;

[৪৬৯] জাহাঁকুশা, ২/১৪১, ১/১০৭; মুখতাসারুদ-দুওয়াল, ২৩৬;

[৪৭০] খাওয়ারিজম শাহি, ২১৯;

ঢালটি পেছনে লটকালেন। সামলে নিলেন রাজকীয় ছাতা। সঙ্গে নিলেন বর্শা ও তূণীর। তারপর ঘোড়ার পিঠে শক্ত চাবুক লাগিয়ে, আল্লাহকে স্মরণ করে নিঃশঙ্কচিত্তে এই ভয়ানক উচ্চতা থেকে সিন্ধুর মাথা-উঁচু ঢেউয়ের ভেতর উদ্দাম ঝাঁপ লাগালেন।[৪৭১] উত্তাল বাতাসে শোঁ শোঁ শব্দে বয়ে-যাওয়া সেই ঢেউয়ের সারিতে ঝাঁপিয়ে পড়তেই বজ্রপাতের মতো ভয়ংকর একটা আওয়াজ সৃষ্টি হল। ঘোড়া-সমেত সুলতানের সবেগে পতনের ফলে কয়েক গজ উপরে উছলে উঠল নদীর পানি। তারপর অনেকক্ষণের জন্য সুলতান জালালুদ্দীন গুম হয়ে গেলেন ঢেউয়ের ভেতর।

তবে খানিক পরেই তাকে সিন্ধুর পাক দিয়ে-ওঠা জোয়ারের সাথে মোকাবেলা করে হিড়হিড় করে ওপারের দিকে এগিয়ে যেতে দেখা গেল। বারবার সিন্ধুনদের পাহাড়-উঁচু ঢেউ আছড়ে এসে তাকে গোপন করে ফেলছিল। উত্তাল নদী অত্যন্ত প্রচণ্ডতায় উলটো প্রবাহে বয়ে যেতে বাধ্য করছিল তাকে।

নদীতে তখন নভেম্বরের শীত মৌসুমের বরফশীতল পানি। তার উপর সুলতানের খুজলি-পাঁচড়া ও জখম-ক্ষতের আমূল বিধ্বস্ত শরীর। তার যুদ্ধক্লান্ত বিবশ দেহের উপর দিয়ে আস্ত একটা কেয়ামত বয়ে যাচ্ছিল তখন। কিন্তু জালালুদ্দীন তার অতুলনীয় ধৈর্য, সহনশীলতা ও বিস্ময়জাগানিয়া সাহসিকতা দেখিয়ে হুঁশজ্ঞান যথাসাধ্য বহাল রাখতে পেরেছিলেন। রোষকষায়িত জোয়ারের ভেতর সমস্ত শক্তি একত্র করে ঘোড়ার গর্দান ও পিঠ খামচে ধরে প্রাণপণে লটকে রইলেন তিনি। বিশ্বস্ত সেই ঘোড়া প্রিয় মনিবকে নিয়ে হামাগুড়ি দেওয়ার মতো সাঁতরে কখনো তীরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, কখনো-বা উলটো ঢেউ এসে এক ধাক্কায় লক্ষ্যস্থল থেকে পিছু হটিয়ে দিচ্ছিল অনেক দূর। আচমকা খুব জোরদার একটা ঢেউ এল। সেই ঢেউয়ের আঘাতে বিগড়ে গেল সাঁতারু ঘোড়ার ভারসাম্য। কিন্তু ঢেউটা চলে যেতেই সুলতান দেখতে পেলেন—এখন তিনি ওপারের খুব কাছাকাছি।[৪৭২] তারপর খানিকটা চেষ্টা করে সিন্ধুর পূর্ব তীর পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়ে গেলেন জালালুদ্দীন।

মুজাহিদের অট্টহাসি

চেঙ্গিজ খান যেকোনো মূল্যে সুলতান জালালুদ্দীনকে জীবিত পাকড়াও করবার আদেশ দিয়েছিলেন। সুলতান যখন সিন্ধুনদের তীরবর্তী সুউচ্চ পাথুরে পাহাড় থেকে ঝাঁপ দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, চেঙ্গিজ খান মাতালের মতো আরোহণের ঘোড়াকে চাবুক মেরে বিদ্যুদ্বেগে সেদিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন। চেঙ্গিজের পেছনে তার পুত্র ও সৈন্যদলের সরদাররাও ছিল। চেঙ্গিজ খান মাঝখানের ময়দানটা পেরিয়ে সিন্ধুর সেই কিনারে এসে পৌঁছলেন। ততক্ষণে সুলতান জালালুদ্দীন পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে

---

[৪৭১] জাহাঁকুশা, ২/১২১, ১/১০৭; সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, ৮৩;

[৪৭২] ইবনুল ওয়ারদি, ৩/২৩০; আবুল ফিদা, ৩/১৫০

ঢেউয়ের ভেতর সাঁতরাচ্ছিলেন। সুলতানের এই ভীতিপ্রদ প্রচণ্ড ঝাঁপ আর প্রবহমান নদীতে সন্তরণ দেখে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন চেঙ্গিজ খান। বিপুল বিস্ময়ে তিনি নিজের অজান্তেই মুখে হাত চাপা দিয়ে চোখ বড়-বড় করে দাঁড়িয়ে থাকলেন। হয়তো নিজের চোখজোড়াকেও বিশ্বাস করে উঠতে পারছিলেন না। তার পুত্র ও সরদাররাও হতবিহ্বল চোখে নিচে জলের দিকে তাকিয়ে এই বিস্ময়কর দৃশ্য দেখছিল।[৪৭৩]

চেঙ্গিজ খানের লেখক আতা মালিক জুয়াইনি সুলতানের এই হিম্মত ও বীরত্বের প্রকাশ ঘটাতে কবিতা রচনা করেছেন : 'এই ধরণীপৃষ্ঠে এমন জোয়ানমর্দ আমি আর দেখিনি। পূর্ববর্তী জগদ্বিখ্যাতদের মাঝেও এমন কিছু কেউ কখনো শোনেনি।'

অনেকক্ষণ পর চেঙ্গিজ খান দেখলেন—সুলতান জালালুদ্দীন সহিসালামতে পৌঁছে গেছেন ওপারে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত তার সর্বাঙ্গ জলসিক্ত। বালুময় পারে ঘোড়া থেকে নেমে গায়ের জামা খুললেন সুলতান। ঘোড়ার পিঠ থেকে জিন হটিয়ে বসবার পশমি গদিটা বের করলেন। তূণীর থেকে তিরগুলো বের করে বাইরে ফেললেন। সবক'টি জিনিস ঢলে-পড়া সূর্যের ধূসর ও মলিন আলোয় শুকোবার জন্য পারে ছড়িয়ে দিলেন। তারপর সেই বালুকাময় পারে বর্শা পুঁতে উপরে টাঙিয়ে দিলেন শাহি ছাতা।

হঠাৎ এই মর্দে মুজাহিদের একটি চকিত দৃষ্টি অজান্তে এ-পারে দণ্ডায়মান চেঙ্গিজ খানের উপরে এসে পড়ে। চেঙ্গিজ খান উন্মাদের মতো অস্থির ছন্দে ওপারে পায়চারি করছেন। তা দেখে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিকট অট্টহাসি দিয়ে ওঠেন সুলতান। সুলতানের এই এক অট্টহাসি মজলুমদের আর্তচিৎকার ও হা-হুতাশ শুনে অভ্যস্ত এ-পারে দণ্ডায়মান চেঙ্গিজ খানকে জ্বালিয়ে কয়লা করে দিয়েছিল। তখন জগতের সবচেয়ে বড় দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দুইদিক থেকে একে অন্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন। ওপারে সুলতান, এ-পারে চেঙ্গিজ খান। তাদের এবারকার মুখোমুখি হয়ে-ওঠা ছিল রণক্ষেত্রের মোকাবেলা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। রণক্ষেত্রে থাকে অস্ত্রে-অস্ত্রে ঠোকাঠুকি, ঘাত-প্রতিঘাত। কিন্তু ওখানে ছিল চোখ থেকে চোখের, এবং দিল থেকে দিলের সংঘর্ষ।[৪৭৪] ওখানে তারা পরস্পরকে ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছিলেন। পড়তে পারছিলেন একে অন্যের চেহারায় লেখা রণকাব্য।

সেবার অভ্যাস-পরিপন্থিভাবে সুলতানের সেই অট্টহাসি দিয়ে ওঠার ব্যাপারটা নিশ্চয় 'আত্মিকভাবে' তার স্পষ্ট বিজয়েরই প্রমাণ ছিল। অন্যদিকে চেঙ্গিজ খানের জন্য ছিল সীমাহীন অস্থিরতার। তার সবচেয়ে বড় শত্রু তখন তার থেকে স্রেফ কয়েকশ কদম দূরত্বে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু খান তার পশমটা পর্যন্তও বাঁকাতে

---

[৪৭৩] রওজাতুস সফা, ৪/৮২৮; জাহাঁকুশা, ২/১৪২, ১/১০৭; মুখতাসারুদ-দুওয়াল, ২৩৬;

[৪৭৪] আফগানিস্তান দর মাসিরে তারিখ, ২২২৫;

পারছিলেন না। যে-শত্রুকে খতম করবার প্রস্তুতি নিয়ে আমুদরিয়া থেকে তিনি বহু ক্রোশ দূরত্ব অতিক্রম করে এ পর্যন্ত এসেছিলেন, সেই শত্রু তার সামনা-সামনি থেকেও তখন নাগালের সম্পূর্ণ বাইরে। ফলে বিশ্ববিজেতা এই চেঙ্গিজ সিন্ধুর যুদ্ধে জিতে গিয়েও নিজেকে ভাবতে লাগলেন শক্তিহীন এক পরাজিত সেনা। তিনি ভাবছিলেন—আমার সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত শত্রু হাত থেকে বেঁচে বেরিয়ে গেছে। ফলে ময়দান থেকে এমনতরো বিজয় নিয়ে প্রত্যাবর্তন আর কী অর্থ রাখে?

তিনি জানতেন—এই বাহাদুর যোদ্ধা (সুলতান) যখনই চান, ধুলো থেকেও গড়ে তুলতে পারেন দুর্গ। প্রাণহীন মানবদেহের ভেতর থেকেও বের করে আনতে পারেন শক্তিশালী বাহিনী।

চেঙ্গিজ খান পরাজয়ের গ্লানিবোধে বিক্ষত হতে হতে এপার থেকে ওপারের খাওয়ারিজমের সিংহের চেহারায় নতুন এক সংকল্পের বিজলি চমকাতে দেখছিলেন। মৃত্যুর যে বিশাল দন্ত বের করে হা করে ছিল সিন্ধুনদ, তা নির্দ্বিধায় ডিঙিয়ে যাওয়া একমাত্র সুলতান জালালুদ্দীনের পক্ষেই সম্ভব ছিল।

কিছু মুহূর্ত কাটল। সুলতান ধীরে-সুস্থে বর্শায় টাঙানো শাহি ছাতার নিচে বসলেন। খানিক আরাম করলেন।[৪৭৫]

চেঙ্গিজ খানের প্রশংসা

চেঙ্গিজ খান হতভম্ব হয়ে এই দৃশ্য দেখছিলেন। তার মাথার কলকব্জা হয়ে পড়েছিল সম্পূর্ণ বিকল। পুত্র উকতাই ও চোগতাইও পিটপিট করে দেখছিল এ বিস্ময়কর দৃশ্য। হঠাৎ চেঙ্গিজ খান স্বতঃস্ফূর্ত ভঙ্গিতে স্বগতোক্তি করে ওঠেন। সুলতানের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে ওঠেন—'ব্যাটা হবি তো এমনই হ। সেই পিতা খুব সৌভাগ্যবান, যার পুত্র এমন বিস্ময়কর বাহাদুর। ওর মতো জোয়ানমর্দ সারা দুনিয়ায় কখনো পয়দা হয়নি, আর হবেও না।'[৪৭৬]

চিরশত্রুর প্রশংসা করতে করতে চেঙ্গিজ খান আরও বলতে থাকেন—'এই লোক (সুলতান) আগুন-পানি দুটোরই মরণছোবল থেকে বেঁচে অনন্য শক্তিমত্তা দিয়ে উঠে গেছে মুক্তির তটে। হুম, খুব বিস্ময়কর...খুবই বিস্ময়কর...' মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলতে থাকেন চেঙ্গিজ খান।

তারপর তিন পুত্র ও সরদারদের সম্বোধন করে তিনি বলেন—'এই লোক আমাদের জন্য সামনে আরও বিপদ ও ফেতনার কারণ হয়ে উঠবে। ওর থেকে কখনো গাফেল হয়ে-যাওয়া আমাদের জন্য উচিত হবে না।'[৪৭৭]

---

[৪৭৫] রওজাতুস সফা, ৪/৮২৪; জাহাঁকুশা, ২/২৪২;

[৪৭৬] চেঙ্গিজ খান, অধ্যায় ২০, পৃষ্ঠা ১৫৩; মুকদ্দমায়ে মসনবি মাওলানা রুমি, ৫/১৯, মাওলানা কাজি সাজ্জাদ হুসাইন প্রণীত, হামিদ এন্ড কোম্পানি লাহোর,

[৪৭৭] রওজাতুস সফা, ৪/৮২৮; জাহাঁকুশা, ২/১২৪;

আবেগদীপ্ত কয়েকজন তাতার সরদার চেঙ্গিজ খানের কাছে নদী পেরোবার অনুমতি চেয়ে বসল। বলল—আমরা ওপারে পৌঁছে সুলতানকে ধাওয়া করতে চাই, মহারাজ।

সিন্ধুনদের ভয়ংকর ঢেউ দেখে তাদের এই আগ্রহকে আহাম্মকি গণ্য করলেন চেঙ্গিজ খান। কারণ তিনি জানতেন—এদের ভেতর কেউ সুলতান জালালুদ্দীনের মতো নয় যে, মৃত্যুর এই গহীন দরিয়া পাড়ি দিয়ে ওপার যেতে পারবে।

তিনি সরদারদের নিষেধ করে বললেন—তোমরা কেউ-ই তো ওর মতো জোয়ানমর্দ নও। ভুলো না যেন, সিন্ধু পেরোতে নামলে ওপার থেকে তির মেরে নদীর মধ্যেই তোমাদের হত্যা করে ফেলবে সে।[৪৭৮]

সিন্ধু পার হবার আগে সুলতান জালালুদ্দীন নদীতেই নিক্ষেপ করে দিয়েছিলেন শাহি খাজানা। চেঙ্গিজ খান ডুবুরিদের ডাকিয়ে এনে নদীগর্ভ থেকে তার বড় একটা অংশ উদ্ধার করে ফেললেন।[৪৭৯]

সুলতান জালালুদ্দীনের ঝাঁপিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সাধারণ শ্রেণির অনেক সিপাহিও সুলতানের পেছন পেছন নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। পার থেকে তাতার-তিরন্দাজরা তাদের উপর তির নিক্ষেপ করতে শুরু করেছিল। সেইসব তিরে নদীতে ঝাঁপ-দেওয়া অনেক জানবাজ ঘায়েল হয়ে, অনেকে পাহাড়সম ঢেউয়ের ভেতর তলিয়ে গিয়ে শহিদ হয়ে গেল। সিন্ধুর চওড়া বুকের যে-অংশ পর্যন্ত দুশমনদের তির পৌঁছতে পারছিল, সেখান পর্যন্ত রক্তে লাল হয়ে উঠেছিল পানি। এই হুলস্থুলের ভেতর সুলতানের ঘরের কিছু নারী ও তাদের দুগ্ধপোষ্য শিশু, যারা ঝাঁপ দিতে পারেনি নদীতে, শত্রুদের কবলে পড়ে গিয়েছিল। চেঙ্গিজ খান এক এক করে এই নিরীহ লোকগুলোকে সামনে ডেকে নিয়ে কল্লা উড়িয়ে দিলেন। ওপার থেকে ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে সুলতান অবলোকন করছিলেন এই বিষাদময় ভয়ানক দৃশ্য। কিন্তু করবার মতো তার কিছুই ছিল না তখন।

মাগরিবের সময় ঘনিয়ে এসেছে। সিন্ধুর খরস্রোতা জলে গুঁড়ো গুঁড়ো রক্তিমাভা ছড়িয়ে ডুবে যাচ্ছে সূর্য। নদীর বুক ঘেঁষে পাখিরা ফিরে চলেছে আপন আপন গন্তব্যে। এর ভেতর সাতজন মুজাহিদ নিরাপদে ওপারে পৌঁছে সুলতানের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়েছে। সহযোদ্ধাদের একে অন্যকে জীবিত পেয়ে সবার মনে তখন সে কী আনন্দ! খুশিতে এই ভেবে তাদের মন ভিজে উঠছিল যে, তারা মৃত্যুর লোকমায় পরিণত হওয়ার পর এক নতুন জীবনের নিরাপদ তটে এসে ভিড়েছে!

সূর্য পশ্চিমাকাশে অস্ত যাচ্ছিল। চরাচরজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল ঘন কৃষ্ণ অন্ধকারের নিশ্ছিদ্র জাল। এই সাতজনকে সুলতান জালালুদ্দীন সফরসঙ্গী বানিয়ে

---

[৪৭৮] মুখতাসারুদ-দুওয়াল, ২৩৬;

[৪৭৯] রওজাতুস সফা, ৪/৮২৮;

নিলেন। তারপর সিন্ধুর বালুময় তট থেকে ধীরে-ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন সামনের নিস্তব্ধ গহীন অরণ্যের ভেতর।[৪৮০]

সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরে দণ্ডায়মান চেঙ্গিজ খান পেছন থেকে বিপুল বিস্ময় ও আক্ষেপ নিয়ে জঙ্গলের দিকে আগুয়ান কালের এই লৌহমানবের অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার দৃশ্যটি দেখছিলেন। আর সেই লৌহমানব যুগের সকল তামাশাকে এই পয়গাম দিতে দিতে যাচ্ছিলেন :

کیوں تعجب ہے مری صحرا نوردی پر تجھے
یہ تگاپوئے دما دم زندگی کی ہے دلیل
اے رہین خانہ تونے وہ سماں دیکھا نہیں
گونجتی ہے جب فضائے دشت میں بانگ رحیل
ریت کے ٹیلے سب وہ آہو کا بے پروا خرام
وہ حضر بے برگ و ساماں وہ سفر بے سنگ و میل

সুলতান জালালুদ্দীন যে ঘোড়াটির পিঠে করে নদী পার হয়েছিলেন, সেটি তার খুব প্রিয় হয়ে গিয়েছিল। এই বাহাদুর পশুটি পরবর্তী আরও কয়েক বছর বন্ধু হয়ে সঙ্গে ছিল সুলতানের। সিন্ধুপারের যুদ্ধের পাঁচ বছর পরের তিফলিস বিজয় পর্যন্ত সুলতানের নিকট রয়ে গিয়েছিল এই ঘোড়া। ওটার সম্মানে পরবর্তীতে আর কখনো ওর পিঠে আরোহণ করা হতো না। সুলতান অত্যন্ত আদর-যতনে ওকে পালন করেছিলেন।[৪৮১]

সিন্ধুযুদ্ধের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া

সিন্ধুতীরের এই ঐতিহাসিক যুদ্ধে মুসলমানদের যদিও পরাজয় ঘটেছিল; কিন্তু তাদের এই কঠিন কোরবানি ও জানবাজি বিফলে যায়নি। ইতিহাসে এই যুদ্ধের প্রভাব-প্রতিপত্তি সদর্পে বিদ্যমান রয়েছে এবং থাকবে। এই যুদ্ধে তাতাররা তাদের বিক্ষিপ্ত সমস্ত সেনাশক্তি জমায়েত করে নামিয়ে দিয়েছিল মুসলিমদের মোকাবেলায়। কিন্তু তাদের তুলনায় মুজাহিদদের সংখ্যা বহুগুণ কম হলেও তিনদিন পর্যন্ত মুসলিমরা এমন প্রচণ্ড মোকাবেলা করে গিয়েছিল, ইতিহাসে যার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। আবার এ যুদ্ধে যে-পরিমাণ মুসলিম শহিদ হয়েছিল, মুসলিমদের তরবারির আঘাতে তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি তাতার ছিটকে পড়েছিল অগ্নিগর্ভ জাহান্নামে।

---

[৪৮০] রওজাতুস সফা, ৪/৮২৮;

[৪৮১] সিরাতু সুলতান জালালুদ্দীন, পৃষ্ঠা : ১৬২

ইতিহাসকার ইবনুল আসির লেখেন, কাফেরদের নিহত ও আহতদের সংখ্যা মুসলিমদের থেকে অনেক বেশি ছিল। যদিও লড়াইয়ের শেষদিকে ময়দান চলে গিয়েছিল তাতারদের হাতে; কিন্তু তাদের নিহতদের আধিক্যের কারণে তারা লোকস্বল্পতার শিকার হয়েছিল। ফলে এটার প্রতিক্রিয়া দাঁড়িয়েছিল এই—সিন্ধু উপত্যকা ও পাঞ্জাব থেকে আর সামনে বাড়তে পারেননি চেঙ্গিজ খান। তার সেই তুফানময় অগ্রযাত্রা চোখের পলকেই ধসিয়ে দিয়েছিল বড় বড় অনেক প্রদেশ। কিন্তু এই সিন্ধু উপত্যকায় এসে একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত থেমে গেল সেই ঝড়। চেঙ্গিজ খান আনুষঙ্গিক বিভিন্ন বিষয়ে পেরেশান হয়ে কারাকোরামে ফিরে গেলেন।

যদি সিন্ধুতীরে শহিদ হওয়া সহস্র মুজাহিদের এই বিপুল কোরবানি প্রকাশ না-পেত, তা হলে হিন্দুস্থান, যেখানে তখন গড়ে উঠেছিল কয়েকটি হুকুমত, চেঙ্গিজ খানের সেই আগ্রাসী হামলার নিরীহ গ্রাসে পরিণত হতো। সুলতানের হাতে এ-যুদ্ধে তাতাররা যদি ব্যাপকভাবে রক্তাক্ত না হতো, তা হলে কয়েক মাসের ভেতর দিল্লি, বাগদাদ ও দামেশক দখল করে নেওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার ছিল না।

হাফেজ যাহাবির মতো একজন মহান পর্যবেক্ষক তখনই তো দৃপ্ত গলায় বলে উঠেছিলেন, 'সুলতান জালালুদ্দীন যদি না হতেন, তাতার-জাতি পুরো ভূপৃষ্ঠ ধসিয়ে দিত।'[৪৮২]

নিলাব কোথায় বিদ্যমান

নিলাব নামক সেই ঐতিহাসিক তট, যেখানে চেঙ্গিজ খান ও সুলতান জালালুদ্দীনের সৈন্যদলের মাঝে সংঘটিত হয়েছিল এই প্রলয়যুদ্ধ। ইতিহাসের প্রতি আমাদের যত্নহীনতা ও অমনোযোগিতার ফলে এই জায়গাটা অজ্ঞাত হয়ে গিয়েছিল। একটা দীর্ঘ সময় ধরে আমি এই অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছিলাম যে, এই ঐতিহাসিক যুদ্ধক্ষেত্রটি নির্দিষ্টভাবে শনাক্ত করে উঠে নিজ চোখে একটুখানি দেখব। কিন্তু বহু চেষ্টার পরও সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারিনি। এ-সংক্রান্ত বিচার-ভাবনার ভেতরেই কেটে গেছে একটা যুগ। শেষমেশ, যিনি এ গ্রন্থের খসড়া প্রস্তুত ও বিন্যস্তকরণের কালে প্রতিটি ছত্রে আমার সাথে শামিলেহাল ছিলেন, সেই মহান আল্লাহর পরম অনুগ্রহে এই জটিলতাও কেটে গেল। ফলে ২০০৩ সালে আমি এই যুদ্ধক্ষেত্রে সফর করে এসেছি। সেই সফরের কারগুজারি নিয়ে 'তেরে নকশে পা কি তালাশ মে' নামে একটি সফরনামা বাজারে ছেপে এসেছে।

নিলাব অটব জেলার একটি মায়াবী গ্রাম। এটি সিন্ধুনদের তীরে অবস্থিত। অটক থেকে পিন্ডিঘিপ চলে-যাওয়া রাজপথটাতে ৮ মাইল স্টপ থেকে নিলাব যাবার একটি

---

[৪৮২] সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২২/৩২৮

সড়ক বেরিয়েছে। এই সড়কটাই সেই 'ঘোড়া-তড়প'র দিকে এগিয়ে গেছে, যেখান থেকে সুলতান জালালুদ্দীন সিন্ধুনদের বুকে ঝাঁপ লাগিয়েছিলেন।

নিলাবকে আজকাল বাগ বা বাগেনিলাব নামে ডাকা হয়। সম্ভবত সিন্ধুনদের নিকটে হওয়ার কারণেই এই গ্রামের নাম রাখা হয়েছিল নিলাব। কারণ, এখানটায় সিন্ধুনদের পানি ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং নিলাভ। মনে হয় নিলাব শব্দটি আবেনিলা থেকে গড়ে উঠেছে। এখানকার পানির রঙের সাথে মিল থাকার কারণে নিলাব শব্দটিকে এই নদী-তট ও নিকটবর্তী গ্রামগুলির উপর প্রয়োগ করে দেওয়া হয়েছে।

প্রাচীন যুগে নিলাব ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। নুযহাতুল খাওয়াতির গ্রন্থের রচয়িতার মতে—হিন্দুস্থানের প্রসিদ্ধ বাদশাহ শেরশাহ শুরি কর্তৃক নির্মিত প্রশস্ত একটি সড়ক বাঙ্গাল মুলুকের রাজধানী সোনারগাঁও থেকে আরম্ভ হয়ে একেবারে নিলাব পর্যন্ত এসে থামত। সিন্ধুনদের উপর কোনো পুল ছিল না তখন। নিলাব সিন্ধুর ঘাট হিসেবে ব্যবহৃত হতো। অর্থাৎ, নৌকার মাধ্যমে এখান থেকে লোকজন নদী পারাপার হতো। এখানটায় আজও নৌকা ব্যবহৃত হয়; কিন্তু পূর্বের তুলনায় খুবই কম। সুলতান জালালুদ্দীন নৌকা পাবার জন্যই এদিকে এসেছিলেন। কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ নৌকা পাননি তিনি। ফলে, তাতারদের আগমনের পূর্বে ইসলামি বাহিনীকে আর নদী পার করাতে পারেননি। সেই পাথুরে শক্ত পাহাড়, যেখান থেকে সুলতান জালালুদ্দীন ঝাঁপ দিয়েছিলেন, তা জালালিয়্যাহ অথবা চৌঙ্গ জালালিয়া নামে প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। প্রাচীন ভাষায় চৌঙ্গ ঝাঁপ দেওয়াকে বলা হয়। জামিয়ে তারিখে হিন্দ গ্রন্থেও এর উল্লেখ রয়েছে।

সিন্ধুনদের তীরবর্তী খায়রাবাদ স্টপ থেকে নেজামপুর যাবার পথে (যা নদীর একদম সমান্তরাল খাতে বয়ে গেছে) প্রায় দশ কিলোমিটার সামনে এগোলে দেখতে পাবেন—পেছন থেকে সংকীর্ণ হয়ে এসে এখানটায় সিন্ধুনদের বুক একদম চওড়া হয়ে গেছে। এখানে নদী প্রথমে দক্ষিণ, তারপর পশ্চিম, তারপর আবার দক্ষিণের দিকে রোখ বদল করেছে। এখানে পাথুরে পর্বতশ্রেণি ও সিন্ধুনদের মাঝখানে একটা বড় ময়দান পড়ে। সেই ময়দানেই সুলতান জালালুদ্দীন ও চেঙ্গিজ খানের মাঝে সেই ঐতিহাসিক যুদ্ধটা সংঘটিত হয়েছিল।[৪৮৩] এমনকি সিন্ধুনদের এ-পারের সীমান্তপ্রদেশে সুলতান জালালুদ্দীন খাওয়ারিজম শাহের স্মরণে জালালাসার নামে একটি পাহাড় বিদ্যমান আছে। সম্ভবত এটাই সেই পাহাড়, যার আপাত-গোপন আশ্রয়ে জালালুদ্দীনের বাহিনীর বাম বাহু মোতায়েন করা হয়েছিল। মূলত ইয়াসার-জালালি থেকে বর্ণবিপর্যয়ের ফলে জালালাসার হয়ে গেছে।

---

[৪৮৩] উর্দু ডাইজেস্ট এপ্রিল ২০০২। জামিয়ে তারিখে হিন্দের তৃতীয় অধ্যায়ের টীকায় (পৃষ্ঠা : ৩৭৬, টীকা : ৭৪) লেখা হয়েছে—সুলতানের ঘোড়া যে স্থানটি থেকে ঝাঁপ দিয়েছিল, তা এখন চাঁও-জালালি নামে প্রসিদ্ধ।

এখান থেকে নদী আরও কয়েক কিলোমিটার সামনে গিয়ে দু-দুবার মোড় ঘুরিয়ে একেবারে সংকুচিত হয়ে গেছে। সেখানে পাহাড়ি গ্রামগুলোর কাছে সিন্ধুনদের বাঁকের ভেতর সেই পাথুরে টিলা অবস্থিত, যেখান থেকে ঘোড়া নিয়ে নদীতে লাফিয়ে পড়েছিলেন সুলতান। এই জায়গাটাকে ঘোড়া-তড়প কিংবা ঘোড়া-টপ নামে ডাকা হয়ে থাকে।




আল মদিনা মাদরাসা ও মসজিদ কমপ্লেক্স
স্থাপিতঃ ২০২০ইং
جامع المدرسة والمسجد المدينة

নাশাত
পাবলিকেশন